তিন সঙ্গী

সমরেশ মজুমদার

শরৎ পাবলিশিং হাউস
১।৪, টেমার লেন,
কলকাতা-৭০০ ০০৯

বৈশাখ, ১৩৬৭ ॥ এপ্রিল, ১৯৬০

প্রকাশক :

ছায়া চট্টোপাধ্যায়

শরৎ পাবলিশিং হাউস

১।৪, টেমার লেন,

কলকাতা-৭০০ ০০৯

মুদ্রাকর :

নীলরতন পাল

উদিত উদ্যোগ

৪২, মহেন্দ্র গোঁসাই লেন,

কলকাতা-৭০০ ০০৬

প্রচ্ছদ :

প্রবীর সেন

তিন সঙ্গী

সওয়ার

স্বপন ও দীপ্তিকে

বোয়িং ৭৩৭ যখন দমদম এয়ারপোর্টের ওপর দুটো পাক খেয়ে রানওয়ে ছোঁয়ার জন্যে মুখ নামাচ্ছে তখন এয়ারহোস্টেসের মিষ্টি গলা মাইকে ভেসে এল, 'ভদ্রমহিলা এবং ভদ্রমহোদয়গণ, আমরা এবার কলকাতার মাটি স্পর্শ করছি। এই যাত্রা সুন্দর হওয়ার জন্যে ক্যাপ্টেন গুপ্তা এবং তাঁর সহকর্মীরা আপনাদের ধন্যবাদ জানাচ্ছেন। যাত্রীদের অনুরোধ করা হচ্ছে এরোপ্লেন থেমে যাওয়ার পর যেন কয়েক সেকেণ্ড অপেক্ষা করেন। বাইরের তাপমাত্রা এখন ।'

চোখ বন্ধ করে কথাগুলো শুনে গেল বীরেন্দ্রনাথ সেন। জানলার ধারে এই আসনটায় সে পুরোটা পথই অলসভঙ্গীতে চোখ বন্ধ করেই কাটিয়েছে। সেই সান্তাক্রুজ ছাড়বার পরই উত্তেজনাটা দ্রিমি দ্রিমি বেড়ে চলেছে। এরোপ্লেনে চড়া এখন তার খুব সাধারণ ব্যাপার, বিশ্রাম নেবার জায়গা প্রয়োজনে ঘুমিয়ে নিতেও পারে। মাদ্রাজ-বোম্বে-বাঙ্গালোর এবেলা ওবেলায় ছুটোছুটি করতে হয় যাকে তাকে অনেক কিছু অভ্যেস করে নিতে হয়। কিন্তু এবারের যাত্রা ওকে কিছুতেই সহজ হতে দিচ্ছিল না। দীর্ঘকাল সে মনে মনে অপেক্ষা করেছে আজকের দিনটার জন্যে। এত বছরের প্রস্তুতির ফল এবং প্রত্যাশা মেটানোর সময় আসছে। কত বছর পর কলকাতাকে দেখবে সে, আহ্ কলকাতা, যে কলকাতা তাকে লাথি মেরে তাড়িয়ে দিয়েছিল। ওপর থেকে স্যুটকেসটা টেনে নিয়ে অন্য যাত্রীদের সঙ্গে পা বাড়াল বীরেন্দ্রনাথ সেন। দরজায় পৌঁছাবার আগে এক পলক দাঁড়িয়ে নিজেকে দেখে নিল সে।

হ্যাঁ, তার পোশাক বেশ টিপটপ। পাশে দাঁড়ানো এয়ারহোস্টেস হেসে বলল,

'স্যর, আশা করি আপনার ফেরার সময় আমি সাহায্য করার সৌভাগ্য পাব।'

'আশা করি।'

'স্যর, আপনি যদি কিছু জানিয়ে যান—আই মিন—আমার বন্ধুরা বলছিল—'

'আমি জানি না, সরি, আমরা জানতে পারি না' কথাটি বলার সঙ্গে সঙ্গে বীরেন্দ্রনাথ সেন আচম্বিতে বায়রণ সেইনে রূপান্তরিত হয়ে গেল। বোয়িং ৭৩৭-এর সিঁড়ি দিয়ে বাইরণ সেইন নেমে আসছিল, উচ্চতা পাঁচ ফুট দুই, ওজন আটচল্লিশ কেজি, বয়স ত্রিশ, ভারতবর্ষের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ঘোড়সওয়ার।

বোয়িংটা দাঁড়িয়েছিল এয়ারপোর্ট বিল্ডিং থেকে অনেকটা দূরে। দুটো লম্বা গাড়ি ছুটে এল যাত্রীদের সেখানে পৌঁছে দিতে। তার একটাতে পা দিতেই বায়রণ শুনতে পেল, 'গুড আফটারনুন। আপনাকে একটু বিরক্ত করতে পারি?'

বেশ কালো এবং মোটা একজন ভদ্রলোক রঙিন চশমার আড়ালে হাসলেন;

'আপনার ছবি গতকালের কাগজে দেখেছি। আমি আপনার সঙ্গেই বোম্বে থেকে আসছি। আপনি তো আগামী কাল পরশু রাইড করবেন এখানে?'

'হ্যাঁ, সে রকম কথা আছে।' বায়রণ মুখ ঘুরিয়ে নিল। এয়ারপোর্ট বিল্ডিংটা খুব দ্রুত এগিয়ে আসছে।

'একটা সিওর হর্স পেতে পারি?' লোকটি ফিসফিস করে বলল।

'হর্স, ও ভগবান, ঘোড়ারা কখনো নিশ্চিত হয় না, দুঃখিত।' বায়রণ উঠে দাঁড়াল। গাড়িটা থেমে গেছে। দ্রুত নীচে নেমে দরজার দিকে এগোতে লাগল। যাত্রীদের অপেক্ষার ঘরটার মধ্যে দিয়ে কাস্টম্‌স চেকিং-এর বেড়া ডিঙ্গিয়ে কয়েক পা এগোতেই সে থমকে দাঁড়াল। আহা, কি দৃশ্য! চারজন মানুষ হাসি হাসি মুখে তার জন্যে দাঁড়িয়ে। বাঁ দিক দিয়ে প্রথম জন পল রোজারিও, ট্রেনার, এখন চুলে পাক ধরলেও শরীরের বাঁধুনি বেশ শক্ত। ইস্পাত রঙা স্যুটে মানিয়েছে চমৎকার। গত মরশুমে কলকাতা রেসকোর্সের চ্যাম্পিয়ন ট্রেনার বলে স্বীকৃত। এক মরশুমে একজন ট্রেনারের জয়ী ঘোড়ার রেকর্ড এতদিন ছিল উনপঞ্চাশ, গতবার পল পঞ্চাশ করেছে। অত্যন্ত রাশভারী মানুষ। পলের বাঁ পাশে যিনি দাঁড়িয়ে তাঁকে একদিনই বোম্বেতে দেখেছে বায়রণ। হরি শর্মা। কোটিপতি মানুষ। বিখ্যাত শর্মা এণ্ড শর্মার মালিক। ওঁর পঞ্চাশ রকমের ব্যবসার সঙ্গে কয়েক বছর হল উনি ঘোড়ার রাজত্বেও এসেছেন। পল রোজারিওর স্টেব্‌লে ওঁর ঘোড়াগুলো আছে। খুব দামী দামী ঘোড়া! ওঁর একমাত্র আশা এবারের ইনভিটেশন কাপ বিজয়ীর সম্মান যেন তিনি পান। গত সপ্তাহে পলের সঙ্গে বোম্বাই গিয়ে তিনিই বায়রণের সঙ্গে কথাবার্তা বলেছেন। হরি শর্মার পাশে যে দীর্ঘাঙ্গিনী মহিলা দাঁড়িয়ে তাঁকে চেনে না বায়রণ। কিন্তু দেখামাত্র নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হল তার। মেয়েমানুষের রূপ সে অনেক দেখেছে কিন্তু এমনভাবে সব কটি অঙ্গ একসঙ্গে দিয়ে বিধাতা কাউকে পৃথিবীতে পাঠাতে পারেন এই মহিলাকে না দেখলে বোঝা যেত না। কি অবহেলায় মহিলা তাকিয়ে আছেন কিন্তু সেই ভঙ্গিতেই এমন একটা আকর্ষণ আছে যে বুকের ভেতর গ্রীষ্মের বাতাস বয়ে যায়। হরি শর্মার পাশে মহিলাকে যেন আরো উজ্জ্বল দেখাচ্ছে। হরি শর্মার মাথায় বিশাল টাক, ভুঁড়ি প্রবলভাবে এগিয়ে আছে, কোট আর প্যাণ্টে মাঝে মাঝে ক্লাউনের ভঙ্গী আনে। তার পাশে, হঠাৎই বায়রণের মনে ক্লিওপেট্রার ছবিটা ভেসে এল। শি ইজ ক্লিওপেট্রা। ক্লিওপেট্রার পাশে যে তরুণটি দাঁড়িয়ে আছে সে যে হরি শর্মার ছেলে তা বলে দিতে হবে না। মুখের আদল এক। তবে ছিমছাম, বয়স অল্প থাকায় এখনও মেদ সংগৃহীত হয় নি।

তিনটি মুখে প্রায় একসঙ্গে তিন রকমের হাসি জ্বলে উঠল। চতুর্থ মুখটি খুবই নিস্পৃহ চোখে তাকে দেখছে। বায়রণ ক্লিওপেট্রার দিকে তাকাল না। কাছাকাছি হতেই পল রোজারিও এগিয়ে এল, 'হেলো সেইন। আসতে কোন কষ্ট হয় নি আশা করি।'

বায়রণ মাথা নাড়ল, 'নো নো, খুব আরামে এসেছি।' হাত মেলালো সে। পলের হাত খুব খসখসে। শক্ত। স্পর্শেই বোঝা যায় বেশ পোড় খাওয়া মানুষ!

হরি শর্মা এণ্ড পার্টি কিন্তু এগোন নি। সারবন্ধ হয়ে হাসিমুখে হরি শর্মা দাঁড়িয়ে বললেন, 'ওয়েলকাম, ওয়েলকাম কলকাত্তামে।'

বায়রণ হাত বাড়াল, 'থ্যাঙ্ক য়ু মিঃ শর্মা। আপনারা আমাকে রিসিভ করতে এসেছেন বলে গর্ব অনুভব করছি।'

শর্মার চোখ যেন কপালে উঠে গেল, 'আরে দেখো পল, সেইন কি কথা বলছে। সারে কলকাত্তা আজ তুমারা লিয়ে গরম হো গয়া। এভরিবডি ইজ স্পিকিং বায়রণ ইজ কামিং টু রাইড ফর মি। তো তুমকো রিসিভ করনে হাম নেহি আয়েগা তো কোন্ আয়েগা। ইউ নো উই ইণ্ডিয়ান, গেস্টকো সেবা করনে জনতা হু।'

বায়রণ লক্ষ্য করল ক্লিওপেট্রার চোখের পাতা যেন বড়। ভ্রমের মতো মুখে সেই পাতা দুটো সুন্দর খেলা করে। হরি শর্মা বললেন, 'মিট মাই ওয়াইফ লীনা, লীনা ইউ নো হু ইজ হি?'

'গ্লাড টু মিট ইউ।' খসখসে গলা, ঠোঁট দুটো সামান্য ফাঁক হল কি হল না বোঝা গেল না। কিন্তু বায়রণের শরীরে যেন কাঁটা উঠল। এ এমন একটা কণ্ঠস্বর যাতে শিরিষ কাগজ জড়ানো আছে বলে ভুল হয়। বায়রণ একটু দেরীতেই মাথা নুয়ে সম্ভাষণ গ্রহণ করল। এত তাপবিহীন কথা বলার শক্তি সব মানুষ পায় না।

শর্মা বললেন, 'আউর ইয়ে মেরা লেড়কা, শ্যাম শর্মা।'

পল চাপা গলায় বলল, 'প্রিন্স অফ শর্মা ইণ্ডাস্ট্রিস।'

হাত বাড়াবার জন্যে যেন এতক্ষণ উদগ্রীব হয়ে ছিল ছেলেটি, ঝাঁকুনি দিতে দিতে বলল, 'কল মি স্যামু। আপনার কথা এতদিন অনেক শুনেছি প্রাক্‌টিক্যালি কলকাতার পাণ্টারদের কাছে আপনি ফিল্মের হিরোর চেয়ে বেশী পপুলার।

কাঁধ নাচাল বায়রণ, সেই সঙ্গে আলতো হাসি। এই রকম কথার মুখোমুখি হলে এইসব ভঙ্গী করতে হয়। করে অভ্যেস হয়ে গেছে। শর্মা বললেন, 'নাউ, লেট্‌স মুভ। পল, কল সাম পোর্টার। বায়রণ সাহেবকো স্যুটকেস লেনে পড়েগা।'

বায়রণ বললো, 'না, না, এটা এমন কিছু একটা ভারী নয়। দরকার হবে না কুলীর।'

শর্মা বললো, 'ওকথা বলবে না। আমি তোমাকে আরামে রাখতে চাই। তুমি আমার অনারেবল গেস্ট।'

অতএব বায়রণের দশ কেজি স্যুটকেশটা পোর্টারের কাঁধে চাপল। এয়ার-পোর্ট বিল্ডিং-এর বিরাট হলঘর দিয়ে ওরা হাঁটছিল। মাইক্রোফোনে তখন হংকং-এর যাত্রীদের ডাকা হচ্ছে। দিশি বিদেশী মানুষরা চারপাশে অপেক্ষা করছে। একটা মিনি মার্কেটের চেহারা নিয়েছে জায়গাটা। পলের পাশাপাশি হাঁটছিল বায়রণ। এই প্রথম সে দমদম এয়ারপোর্ট দেখছে। কলকাতা থেকে শেষবার, প্রায় বছর দশেক আগে, সে যখন চলে গিয়েছিল তখন হাওড়া স্টেশন

থেকে সেকেণ্ড ক্লাশ ট্রেন ধরতে হয়েছিল তাকে পয়সার অভাবে। পল জিজ্ঞাসা করল, 'তোমার হাঁটুতে শুনলাম একটা পেইন হচ্ছে, সত্যি নাকি?'

'কে বলল?' হাঁটতে হাঁটতে অবাক গলায় বলল বায়রণ।

'শুনলাম।'

'ও হো নো। একদম গুজব। আমার পা চমৎকার আছে।'

'আমি একটু চিন্তায় ছিলাম।'

'না চিন্তার কোন কারণ নেই।'

'ধন্যবাদ।' কথাটা বলে ডানদিকের একটা জটলার দিকে তাকিয়ে শক্ত হয়ে গেল পল রোজারিও। তার চোখে একটা কাঠিন্য এল, হাঁটার গতি শ্লথ হয়ে যাওয়ায় হরি শর্মা তাকে ধরে ফেললেন। পল পিছিয়ে যাওয়ায় বায়রণকেও থামতে হয়েছিল। পল বলল, 'মিঃ শর্মা, দে হ্যাভ কাম।'

শর্মার মুখ গম্ভীর হল, 'তুমি দেখেছ? ঠিক দেখেছ?'

'ও সিওর।'

'না না, দাঁড়িও না, হাঁটা থামিও না, এমনভাবে চল যেন তুমি কিছুই দ্যাখো নি। ওরা যদি এসে থাকে তাতে যেন আমাদের কিছুই যায় আসে না এমন ভাব কর।'

হাঁটতে হাঁটতে পল বলল, 'ব্যাপারটা ভাবনায় ফেলে দিল!'

শর্মা উত্তর দিলেন না। কিন্তু তাঁর ভাবভঙ্গী খুব স্বাভাবিক নয়। ওঁর পেছনে ক্লিওপেট্রা আর স্যামু নির্বিকার ভঙ্গিতে হেঁটে আসছে। এসব কথা-বার্তা নিশ্চয়ই তাদের কানে যায় নি।

পল খুব চাপা গলায় জিজ্ঞাসা করল, 'আমি কি সেইনকে এ ব্যাপারে সতর্ক করে দেব?'

শর্মা ধমকে উঠলেন, 'তুমি একটি গর্দভ। ওর হাতে অস্ত্র তুলে দিয়ে লাভ কি। যদি প্রয়োজন মনে করি তাহলে আমিই বলব।'

বায়রণ বুঝতে পারছিল না ওদের এত উত্তেজনার কারণটা কি? কেউ নিজে থেকে না জানালে কৌতূহল দেখানোর অভ্যেসটাকে এই কয়বছরে নিয়ন্ত্রণ করতে শিখেছে সে। তাই পল যখন এবার ওর পাশে এসে বলল, তোমাকে বেশ স্মার্ট দেখাচ্ছে, তখন সে সেই অভ্যেসেই মাথা নাড়ল।

টার্মিনাল বিল্ডিং-এর বাইরে অনেকটা ফাঁকা জায়গা দেখতে পেল বায়রণ। তার চেনা কলকাতা এখানে নেই। প্রচুর গাড়ি যাত্রীদের নিয়ে যাওয়ার জন্যে দাঁড়িয়ে। ওরা বাইরে এসে দাঁড়াতেই দুটো গাড়ি গড়িয়ে ওদের সামনে চলে এল। একটা মার্সিডিজ অন্যটা অ্যাম্বাসাডার। ড্রাইভার দুজন নেমে এসে যেভাবে বিনীত ভঙ্গীতে দরজা খুলে দাঁড়াল তাতে বুঝতে অসুবিধে হবার কথা নয় এ দুটো শর্মা এণ্ড শর্মার সম্পত্তি।

হরি শর্মা মার্সিডিজের দিকে হাত বাড়িয়ে বললেন, 'উঠে পড় সেইন!'

বায়রণ মার্সিডিজের পেছনে বসে দেখল ওর পাশে ক্লিওপেট্রা সেইরকম অনাসক্তি নিয়ে উঠলেন। হরি শর্মাকে দেখা গেল ড্রাইভারের পাশের সিটে

বসতে। বায়রণ একটু অবাক হয়ে লক্ষ্য করল স্যামু আর পল পেছনের অ্যাম্বাসাডারটায় গিয়ে উঠল। পলকে যে এই গাড়িতে হরি শর্মা তুলবেন না তা ভাবতে পারে নি বায়রণ। হাজার হোক পল রেকর্ড হোল্ডার ট্রেনার, তাঁকে গাড়িতে না তোলার ক্ষমতা কম কথা নয়। একটা কানাঘুষো শুনেছিল বায়রণ, যে-কোন কারণেই হোক এ বছর পলের বাজার মন্দা যাচ্ছে।

গাড়ি চলতে আরম্ভ করলে শর্মা ঘুরে বসলেন, 'কলকাতার বাজার খুব লিমিটেড। ভাবছি সামনের বছরে ব্যাঙ্গালোরে ঘোড়া রাখবো। তোমার সঙ্গে মার্টিনের তো খুব ভাল সম্পর্ক !'

মার্টিনের নাম শুনে এবার পলের প্রতি এই ব্যবহারের কারণটা ধরতে পারল বায়রণ। মার্টিন এখন ভারতবর্ষের সেরা হর্সট্রেনার। বড় বড় শিল্পপতি যারা এই লাইনে এসেছে তারাই মার্টিনকে ট্রেনার করতে চায়। কিন্তু মার্টিন ঘোড়া নেয় অনেক দেখেশুনে এবং তার স্টেবলের ঘোড়ার ওপর কোন মালিকের হুকুম চলবে না। মালিকরা মার্টিনকে এসব জেনেশুনেই খাতির করে কারণ তাঁর ট্রেনিং-এর ঘোড়াগুলো অবধারিত ভাল ফল করবেই। মার্টিনের কয়েকজন প্রিয় জকি আছে। একজন তো সব সময়েই বাঁধা থাকে। বিদেশ থেকে প্রতিবছর দুজন আসে কিছুদিনের জন্যে। সম্প্রতি বায়রণকে পছন্দ করছে মার্টিন। এবং এই খবরটা যখন শর্মাও কলকাতায় বসে জেনে গেছেন তখন ভেতরে ভেতরে অনেক দূর এগিয়ে গেছেন তিনি। মার্টিনের সঙ্গে যোগাযোগ হয়ে গেলে পলের মতো কলকাতার ট্রেনারকে নস্যাৎ করা কোন সমস্যাই নয়।

হরি শর্মা সামনের আয়নায় দেখে নিলেন পেছনে অ্যাম্বাসাডারটা রয়েছে কিনা। একটু যেন অন্যমনস্ক দেখালো তাঁকে। তারপর হঠাৎ বলল, 'জানো সেইন, আমার মাঝে মাঝে মনে হয় রাস্তার নর্দমা মানুষের চেয়ে অনেক পরিষ্কার।'

বায়রণ হেসে ফেলল, 'সেকি স্যর !'

'ইয়েস। কারো ভাল কাজ কেউ সহ্য করতে পারে না। আমি ইনভিটেশন কাপ জিতবো এইটে অনেকের সহ্য হচ্ছে না। ইভ্ন, এই যে আমি তোমাকে কণ্ট্রাক্ট করেছি এইটে হজম করতে ওদের অসুবিধে হচ্ছে। ইনভিটেশন থেকে আমি ক'লাখ পাব ? আমার কি টাকার অভাব আছে ? কিন্তু আমি সম্মানটা চাই। আমি তোমার ওপর ভীষণভাবে নির্ভর করছি সেইন।'

'আই উইল ট্রাই মাই বেস্ট।'

আচমকা ঘাড় ঘুরিয়ে হরি শর্মা ড্রাইভারকে বললেন, 'গ্র্যাণ্ড হোটেল মে নেহি, তুম্ হিন্দুস্থান ইণ্টারন্যাশনালমে চলো।'

'জী সাব।' ড্রাইভার মাথা দোলালো।

এবার বাঁ পাশ থেকে সেই শিরশিরানি গলাটা ভেসে এল, 'তুমি হোটেল চেঞ্জ করছ হঠাৎ ?'

'করছি। মনে হচ্ছে করার প্রয়োজন হবে।'

'তাহলে হোটেল কেন ? আমাদের আলিপুরের রেস্টহাউসে নিয়ে গেলেই তো হয়। ওরকম নিরিবিলি জায়গা আর পাবে ?'

বায়রণ লক্ষ্য করল প্রতিটি শব্দ নিরাসক্ত ভঙ্গীতেই বলা কিন্তু কোথায় যেন একটা হুকুমের সুর বাঁধা আছে। সে মুখ ফিরিয়ে মহিলাকে দেখল। এর মধ্যে রোদ চশমা উঠেছে চোখে। ফলে আরো রহস্যময়ী দেখাচ্ছে এখন। কিন্তু বায়রণ কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারল না স্যামু শর্মার মতো একটা প্রায় যুবক ছেলের মা ইনি। মুখের চামড়া এবং শরীরের গড়নে কোথাও বয়েসের ছায়া নেই, দাগ তো দূরের কথা। এমন কি ওর পরনের শাড়িটা এমন ভঙ্গীতে অলসভাবে শরীরে জড়ানো যে ওটাকে শাড়ি বলে ভাবতে কষ্ট হচ্ছিল বায়রণের। যেন ম্যাক্সী কিংবা কাফতান হয়ে আছে ফিনফিনে শাড়িটা ওঁর অঙ্গে। বায়রণ চোখ সরিয়ে নিল। ক্লিওপেট্রা তার দিকে একটুও তাকাচ্ছে না। অথচ তার বিষয়েই কথা বলছে। সে যে ওঁকে দেখল সেটাও বোধহয় লক্ষ্য করল না ! নাকি লক্ষ্য করেছে বলেই তাকাচ্ছে না।

হরি শর্মা বলল, 'ভাল বলেছ লীন। কিন্তু মুস্কিল হল ওখানে সেইন খুব লোনলি ফিল করবে। ওকে কম্পানি দেবার তো লোক দরকার। আমি সেটা হোটেলে এ্যারেঞ্জ করতে পারি। সেখানে কতরকমের সময় কাটানোর রাস্তা আছে যা তুমি রেস্টহাউসে পাবে না।'

বায়রণের চোখ ড্রাইভারের মাথার পাশে যেতেই সামনের আয়নাটাকে দেখতে পেল। এবং দেখা মাত্রই শক্ত হয়ে গেল সে। সেখানে রোদ-চশমার প্রতিবিম্ব ঝকঝক করছে। অর্থাৎ এতক্ষণ ক্লিওপেট্রা ওকে সামনে দেখে যাচ্ছেন। ক্লিওপেট্রার ঠোঁটের কোণে সামান্য ভাঁজ পড়ল, 'ইচ্ছে করলে ওসবের ব্যবস্থা তুমি রেস্টহাউসেই করতে পারো। দুটো ডবলু থাকলে তো পুরুষমানুষের সময় লাফিয়ে লাফিয়ে কেটে যাবে ! আসলে সিকিউরিটির দিকে ভাবলে এর কোন বিকল্প নেই।'

হরি শর্মা ঘাড় নাড়লেন। তারপর ড্রাইভারকে বললেন, 'ঠিক হ্যায়, তুম আলিপুর রেস্টহাউসমে চলো।'

এতক্ষণ একটি কথাও বলে নি বায়রণ। ওঁরা ওর সিকিউরিটি নিয়ে এত দুর্ভাবনা করছে কেন ? হঠাৎ ওর মনে হল কোন বিরাট ঝামেলায় সে বোধহয় জড়িয়ে পড়ছে। তুমি আমাকে টাকা দেবে আমি তোমার ঘোড়াকে জেতাতে আপ্রাণ চেষ্টা করব, ব্যাস। এর বাইরে অন্য ঝামেলার কথা আসে কি করে ! কিন্তু না, কোন কৌতূহল দেখানো নয়। অবশ্য ক্লিওপেট্রার ওই মন্তব্যটার প্রতিবাদ সে করতে পারত। দুটো ডবলু ? মদ এবং মেয়েমানুষ ছাড়াও যে কারো কারো কারো চলতে পারে এ ধারণা ক্লিওপেট্রার নেই। বাট শি ইজ সামথিং। বায়রণ সিদ্ধান্ত নিল স্যামু শর্মা ক্লিওপেট্রার গর্ভজাত সন্তান নয়। অবশ্যই সে সৎ ছেলে।

এতক্ষণে গাড়িটা ভি আই পি রোড ধরে তীব্র বেগে ভেসে যাচ্ছে। কলকাতার চেহারা দেখে চমকে গেল বায়রণ। আহ্‌ কি সুন্দর। এমন সুন্দর

রাস্তা এই শহরে তৈরি হয়েছে? একটাও চেনা দৃশ্য নেই? সেই কলকাতাও কি হারিয়ে গেল? দশ বছরে এতটা পরিবর্তন হতে পারে। ভুল ভাঙলো অবশ্য মৌলালিতে এসে। বাঃ, কলকাতা আছে সেই কলকাতাতেই। অবিকল এক। এইসব পরিচিত রাস্তায় তাকে কতদিন বিমর্ষমুখে হেঁটে যেতে হয়েছে। কতদিন! অন্যমনস্ক হয়ে গেল বায়রণ, আর সেই ফাঁকে বীরেন্দ্রনাথ সেন একটু একটু করে মুখ তুলে বেরিয়ে আসতে চাইছিল। কিন্তু হরি শর্মার গলার স্বরে সে আবার দ্রুত মুখ লুকলো, 'সেইন, তোমার কি চাই তা আমার গেস্ট হাউসের ম্যানেজারকে বলে দেবে। ও তোমার সব হুকুম তামিল করবে।'

'থ্যাঙ্ক স্যার।'

হরি শর্মা পকেট থেকে ধবধবে রুমাল বের করে বিশাল মুখখানা মুছে নিলেন। গাড়ি ততক্ষণে আলিপুরের রাস্তা ধরেছে। দুপাশে বাংলো প্যাটার্নের ফাঁকা ফাঁকা বাড়ি। বেশীর ভাগ বাড়ির গায়েই গাছগাছালি দেখা যাচ্ছে। বেশ নির্জন শান্ত রাস্তা এটি। চলতে চলতে গাড়িটা বাঁ দিকে ঘুরল। সরু একটা প্যাসেজ গিয়ে পড়েছে সাদা গেটের ওপর। গেটের গায়ে সুন্দর করে লেখা, 'বিনা অনুমতিতে প্রবেশ নিষিদ্ধ।'

গাড়ির আওয়াজ শুনে একটা উর্দিপরা লোক ছুটে এল। তারপর সেলাম করে সসম্ভ্রমে গেট খুলে মাথা নিচু করে দাঁড়াল। ওদের নিয়ে সিমেন্ট বাঁধানো পথ দিয়ে গাড়িটা চলে এল একটা-গাড়ি-বারান্দার নীচে। হরি শর্মা নামলেন। ড্রাইভার দ্রুত বেরিয়ে এসে ক্লিওপেট্রার দরজা খুলে দাঁড়াতেই তিনি মাথা নাড়লেন, না, নামবেন না। অতএব বায়রণকে এপাশের দরজা ব্যবহার করতে হল। সে মাটিতে পা দিতেই দেখতে পেল অ্যাম্বাসাডারটা গেট ছাড়িয়ে ভেতরে ঢুকছে। সামনেই সুন্দর লন। টেনিস খেলা যায়। লনের পাশে ফুলের বেড। গাড়ির রাস্তাটা এদের বৃত্তের মতো ঘুরে আবার গেটে পৌঁছে গেছে। লনের ওপাশে উঁচু পাঁচিল। পাঁচিলের গা ধরে বড় বড় ইউক্যালিপটাস গাছে সাজানো। গেস্ট হাউসটি রঙিন এবং একতলা বাংলো প্যাটার্নের।

অ্যাম্বাসাডার থেকে পল আর স্যামু নেমে এল। পল জিজ্ঞাসা করল, 'হঠাৎ এখানে চলে এলেন যে!'

'চেঞ্জ করতে হল। আমি কোন রিস্ক নিতে চাই না। সেইন এখানে বেশ আরামে থাকবে, তোমার কি মনে হয়?' হরি শর্মা বললেন।

'ও সিওর!' পল মাথা নাড়ল, 'আপনার যে এরকম রেস্ট হাউস আছে তা আমি জানতামই না। দারুণ।'

হরি শর্মা গম্ভীর গলায় বললেন, 'তুমি আমার কতটুকু জানো!'

'সিওর, সিওর।' একটু থতমত হয়ে গেল পল।

স্যামু এসে বায়রণের পাশে দাঁড়িয়েছিল, 'কিন্তু পাপা, এখানে ওঁর খুব একঘেয়ে লাগবে না? নো ফান!'

'দ্যাট উইল বি এ্যারেঞ্জড্।' হরি শর্মা ব্যস্ত হয়ে ঘড়ি দেখলেন, নাউ সেইন,

এই বাংলো এখন থেকে তোমার। নিজের মতো ব্যবহার কর। চারটে ঘর আছে, দুটো এয়ার কন্ডিশন্ড। এখন তুমি বিশ্রাম নাও। সন্ধে হয়ে এল বলে। আমার মনে হয় আজ তোমার বাইরে বের না হওয়াই ভাল। কাল সকালে আমরা আলোচনায় বসব। এই যে ভারালু এসে গেছে। হি ইজ ম্যানেজার কাম কেয়ারটেকার। ভারালু, ইনি আমার খুব দামী গেস্ট। এঁর যেন কোন অসুবিধে না হয় দেখবে।'

মাথায় ধবধবে পাকা চুল এক বৃদ্ধ মাথা নাড়ল। বায়রণ লক্ষ্য করল বয়স হওয়া সত্ত্বেও লোকটির শরীরের গড়ন বেশ শক্ত। এবার পল রোজারিও কথা বলল, 'তুমি কাল থেকেই মাঠে যাবে আশা করি!'

অভ্যেসবশত মাথা নাড়তে গিয়ে সামলে নিল বায়রণ, 'আমাকে তো পরশু রাইড করতে হচ্ছে তাই না? ওয়েল! কাল আমি প্র্যাকটিশে যাব।'

প্র্যাকটিশ শব্দটা ইচ্ছে করে ব্যবহার করল বায়রণ। জকিরা মর্ণিং স্পার্ট দিতে গেলে এই শব্দটা সচরাচর ব্যবহার করে না। পলের কপালে ভাঁজ পড়ল, সে হরি শর্মার দিকে তাকিয়ে বলল, 'স্যার, আমি আজ রাত্রে ওর সঙ্গে ডিনারে বসতে চাই।'

'ডিনার! ডিনারের তো এখন অনেক দেরী আছে। স্যামু, তুমি সেইনকে ওর ঘর দেখিয়ে দিয়ে এসো চটপট।' হরি শর্মা নিজের গাড়ির দিকে এগোলেন। শ্যাম শর্মা কয়েক পা এগিয়ে বিনীত গলায় বলল, 'পাপা, আমি একটু ক্লাব থেকে ঘুরে যাব, তোমরা বরং এগিয়ে যাও।'

হরি শর্মার কথাটা ভাল লাগল না বোঝা গেল। তিনি কাঁধ নেড়ে বিরক্তটা প্রকাশও করলেন। বায়রণ লক্ষ্য করছিল লোকটার ব্যবহারে খুব দ্রুত পরিবর্তন ঘটছে। এর মধ্যে চাকর অ্যাম্বাসাডারের পেছন থেকে বায়রণের স্যুটকেস নিয়ে ভেতরে ঢুকে গেছে। শ্যাম শর্মা বায়রণকে বলল, 'চলুন।'

সিঁড়িতে পা রাখার আগে বায়রণ আর একবার পিছন ফিরে তাকাল। মার্সিডিজের পেছনে যিনি বসে আছেন তাঁকে এখন সম্পূর্ণ দেখা যাচ্ছে না। এতক্ষণ কথাবার্তা হল কিন্তু তিনি গাড়ি থেকে নামেন নি এবং কোন মন্তব্য করেন নি। এমন কি তার দিকে ফিরে তাকিয়েছেন বলে মনে হল না! বড় শিল্পপতির স্ত্রীর এই আচরণ খুব স্বাভাবিক।

পাশে শ্যাম শর্মা পেছনে ভারালুকে নিয়ে বাংলোয় ঢুকল বায়রণ। মার্সিডিজটা তখন লনের বৃত্তে পাক খেয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে গেটের দিকে। পল রোজারিও এখন ড্রাইভারের পাশের আসনে, তার ঠান্ডা চোখ বায়রণের পিঠের ওপর। পেছনে বসা হরি শর্মা বললেন, 'পল, তুমি একজন ভাল ঘোড়ার-ট্রেনার হতে পার কিন্তু মানুষের চরিত্র বোঝার মতো ক্ষমতা তোমার নেই। ইটস সামথিং ডিফারেন্ট।'

চমকে উঠল পল, তারপর সহজ গলায় বলতে চেষ্টা করল, 'ঠিক বুঝলাম না স্যার! আমি কি কিছু ভুল করেছি?'

হাসলেন হরি শর্মা। তারপর বললেন, 'বায়রণ সেইনকে আমার ওপর ছেড়ে

দাও। আমাকে ইনভিটেশন কাপ এনে দিয়ে তবে সে কলকাতা থেকে যাবে। এ বছর আমাকে ওটা পেতেই হবে। বাই দি বাই, স্টেবলে এক্সট্রা লোক রেখেছে পাহারা দেবার জন্যে ?'

'হ্যাঁ স্যার, প্রিন্স খুব ভাল আছে।'

'ব্যাপারটার দায়িত্ব তোমার। এখনই আমাকে কিছু গার্ড এখানে পাঠিয়ে দিতে হবে। আমি কোন রিস্ক নিতে চাই না। সেইনকে চব্বিশ ঘণ্টা ওয়াচ এবং প্রটেক্ট করা দরকার। কিন্তু শ্যাম ওর সঙ্গে থেকে গেল কেন ? তোমরা কেউ এর কারণ জানো ?'

পল এবং স্ত্রীব দিকে মুখ ফেরালেন হরি শর্মা প্রশ্নটা করেই। রোদ-চশমার এখন কোন প্রয়োজন নেই তবু পরে থাকা মুখটায় কোন পরিবর্তন ঘটল না। পল মাথা নাড়ল, 'না স্যার, তবে হিরো ওয়ারশিপ বলে মনে হচ্ছে।' 'দ্যাটস নট গুড। আফটার অল হি ইজ এ জকি এন্ড নাথিং বাট এ জকি।' হরি শর্মা এবার চোখ বন্ধ করে ভাবতে লাগলেন।

নিজের ঘরটা দেখে খুশী হল বায়রণ। বিশাল ঘর, চমৎকার সাজানো। যদিও জানালাগুলো বন্ধ এবং বাইরের হাওয়া ঢোকে না এয়ারকন্ডিশনড্ বলেই তবু শরীরের আরাম দেওয়ার সব আধুনিক ব্যবস্থাই আছে। ঘরের একপাশে সোফার ওপর আরাম করে বসল শ্যাম। তার চোখে এক ধরনের উজ্জ্বল প্রশংসা। পেছনের দরজা বন্ধ করে ভারালু পাশের একটা দরজা দেখিয়ে বলল, 'এদিকে টয়লেটের দরজা। আর খাটের গায়েই কলিং বেলের সুইচ আছে। আপনার যখন যা প্রয়োজন হবে বলবেন স্যার।'

মাথা নাড়ল বায়রণ। তারপর ধীরে ধীরে এসে শ্যামের পাশে বসল। শ্যাম জিজ্ঞাসা করল, 'কি খাবেন ?'

বায়রণ বলল, 'কফি, ব্যাস।'

শ্যাম ইঙ্গিত করতেই ভারালু দরজা বন্ধ করে বেরিয়ে গেল। সত্যি এখন একটু বিশ্রাম দরকার। কিন্তু এই ছোকরা বসে থাকলে সেটা সম্ভব নয়। বায়রণ ভাবল এই উৎপাতটি কখন শেষ হবে কে জানে !

শ্যাম বলল, হোটেলের বদলে এখানে থাকতে আপনার ভাল লাগছে ?'

বায়রণ কাঁধ নাচালো যার মানে দুটোই হয়। শ্যাম বলল, আমাদের 'ক্যালকাটা কোর্সে ইন্টারেস্টেট রিলে হয়—।'

'ইন্টার স্টেট রিলে মানে ?'

'ওহো ! আপনারা বোম্বে কিংবা ব্যাঙ্গালোরে যেসব রেস করেন তার ধারাবিবরণী আমরা কলকাতার মাঠে শুনতে পাই। সেইমত বুকিরা বেটিংও নিয়ে থাকে। ইন দ্যাট ওয়ে, আপনি এখানকার রেস গোয়ারদের কাছে খুব পপুলার।'

'কি রকম ?' বায়রণ জানতো এখানে বেটিং নেওয়া হয় তবু ছোকরার মুখে শুনতে ভাল লাগছিল।

'এখানকার লোক মনে করে আপনি যে ঘোড়ায় চড়বেন সেটা অনেস্ট ট্রাই করবে। অর্থাৎ আপনি পান্টার্স'দের চিট্ করেন না।'

'তবু তো মাঝে মাঝে আমি হেরে যাই, তখন ওরা কি বলে?'

'চেষ্টা করে হেরেছেন এটা বুঝতে পারে ওরা। ব্যাঙ্গালোরে এখন অনেক ফরেন জকি রাইড করছে, স্টিল আপনি ফেবারিট।'

'থ্যাঙ্ক, থ্যাঙ্কু ভেরি মাচ।'

'আপনি জানেন কোন্ ঘোড়ায় আপনাকে চড়তে হবে?'

'ডিটেলস জানি না। শুধু প্রিন্স বলে একটা ঘোড়ার নাম শুনেছি।'

'হ্যাঁ প্রিন্স। দারুণ ঘোড়া। বাবা এক লাখ আটত্রিশ হাজারে কিনেছিল কিন্তু অলরেডি ও সেটা রিটার্ন দিয়ে দিয়েছে।'

'তুমি এত জানলে কি করে?'

'বাঃ, আমি তো মায়ের সঙ্গে প্রত্যেকটা ঘোড়ার পার্টনার। বাবার নামে তো কোন ঘোড়া নেই। সবই তো আমাদের নামে।'

'তাই নাকি!'

ছেলেটি ফিসফিসিয়ে বলল, 'টাকা অবশ্য সবই বাবার!'

হেসে ফেলল বায়রণ। এটা যেন খুব গোপন কথা। ব্ল্যাক মানি যত থাকবে রেস তত জমবে। এ তো দিনের মতো পরিষ্কার ঘটনা।

এই সময় একটি চাকর কফির কাপ হাতে ঢুকল। সে চলে না যাওয়া পর্যন্ত শ্যাম কোন কথা বলল না। তারপর কফি শেষ করে আচমকা জিজ্ঞাসা করল, 'আপনাকে আমি বিশ্বাস করতে পারি?'

'নিশ্চয়ই।' একটা রহস্যের গন্ধ পেল বায়রণ।

'বাবা পলকে ইদানিং পছন্দ করছেন না। পলও সেটা বুঝতে পেরে সমান অপছন্দ করছেন। অথচ মজার ব্যাপার কেউ কাউকে স্পষ্ট সেকথা বলছেন না কিংবা বলবেন না। এই দুজন আপনাকে নিজের নিজের মতো করে গাইড করতে চাইবে। কিন্তু আপনার বোধহয় তৃতীয় পক্ষের ওপর নির্ভর করা ভাল।'

'তৃতীয় পক্ষ?'

'আমি এবং আমার মা। মা তাই চান।'

বিস্ময়ে কিছুক্ষণ কথা বলতে পারল না বায়রণ। হঠাৎ মনে হল শ্যাম কি ক্লিওপেট্রার নির্দেশ পালন করছে? তাহলে এই ছোকরাটিকে যতটা নাবালক মনে হয়েছিল ততটা নয়। শ্যাম শর্মা তখন সতর্ক চোখে ওর দিকে তাকিয়ে আছে।

সে বলল, 'ব্যাপারটা পুরো না জানলে—।'

শ্যাম বলল. 'এখন নয়। আমরা পরে এ বিষয়ে আলোচনা করব।'

হঠাৎ বায়রণ প্রশ্নটা করে ফেলল, 'তোমার মা, আই মিন মিসেস শর্মা—।'

কথাটা কিন্তু শেষ করতে ভদ্রতায় আটকে গেল। শ্যাম বুঝতে পেরে মাথা নেড়ে উঠে দাঁড়াল, 'ইয়েস শি ইজ মাই স্টেপ মাদার। মাত্র আট বছরের বড় আমার থেকে এবং আমার বাবার ঠিক অর্ধেক। ওয়েল, গুড্‌বাই।' গট গট

করে বেরিয়ে গেল শ্যাম শর্মা।

কিছুক্ষণ স্তম্ভিতের মতো বসে থাকল বায়রণ। প্রতি সপ্তাহে তাকে ভারতবর্ষের বিভিন্ন সেণ্টারে ঘোড়ায় চাপতে যেতে হয়। কিন্তু এইরকম পরিস্থিতিতে তাকে কখনো পড়তে হয় নি। শ্যাম শর্মা এবং তার মা কি হরি শর্মার প্রতিদ্বন্দ্বী? আবার পল রোজারিও কি এদের বিপরীত কোন চিন্তা করছেন? তাহলে তো সব প্রথমে ওদের উচিত ছিল পলের মন পাওয়া। কারণ রেসের মাঠে একজন ট্রেনার ঈশ্বরের ক্ষমতা পেয়ে থাকেন। তাঁর নির্দেশমত জকিকে প্রতিটি পা ফেলতে হয়। এটা এদের জানা আছে নিশ্চয়ই। তাহলে পলও কি এদের বিরাগভাজন হয়েছেন? বায়রণ মাথা ঝাঁকালো। এসব চিন্তা মাথা থেকে তাড়াতে হবে। আগামী পরশু এবং তারপরের দিন কলকাতায় রেস। মোট চারটে ঘোড়ায় চড়তে হবে তাকে। প্রথম দিন বারো'শ মিটারের প্রিণ্টার্স কাপ যার মূল্য এক লাখ পনের হাজার এবং তারপরের দিন চব্বিশ শো মিটারের দি ইণ্ডিয়ান টার্ফ ইনভিটেশন কাপ যার মূল্য এক লাখ পঁচাত্তর হাজার টাকা। এই দুটোতেই ভারতবর্ষের সেরা ঘোড়াগুলো দৌড়াবে। সব সেণ্টার থেকে ঘোড়া তাদের মালিক এবং জকি এখানে আসছে। স্বল্প পাল্লার এবং দীর্ঘপাল্লার দ্রুততম ঘোড়ার সম্মান পাওয়ার জন্যে তাদের মালিকেরা নিশ্চয়ই উদগ্রীব। কিন্তু এখানে এসে পাশাপাশি আর একটা রহস্যের গন্ধ পাচ্ছে সে। থাক রহস্য, সে তার নিজের মতো চলবে। কারোর ফাঁদে জেনে শুনে পা দেবে না। এদিক দিয়ে একটা উপকার হল, শ্যাম শর্মা ভিতরের দ্বন্দ্বের কথা আগেভাগে তাকে জানিয়ে কিছুটা সুবিধে করে দিল।

সত্যি রাজকীয় ব্যাপার। বায়রণ ভারতবর্ষের সেরা হোটেলগুলোতে থেকেছে। কিন্তু শর্মাসাহেবের এই রেস্টহাউস তাদের থেকে কোন অংশেই কম নয়। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে পোশাক পাল্টে বায়রণ বিছানায় শরীর এলিয়ে দিতেই কোকিল ডাকার শব্দ হয়। ওটা যে টেলিফোনের আওয়াজ বুঝতে কষ্ট হচ্ছিল প্রথমে। বাব্বাঃ; কলকাতায় এত আধুনিক রিসিভার। দ্রুত হাতে বিছানায় শুয়েই রিসিভারটা কানে টেনে নিল সে। তারপর একটু বিরক্তি মিশিয়ে বলল, 'হ্যালো!'

'হেলো।' গলার স্বর কানে যেতেই গায়ে কাঁটা উঠল বায়রণের। না এই কণ্ঠ ভুল হবার নয়। ওপাশে কিন্তু শব্দটা উচ্চারণ হবার পর নীরবতা নেমে এসেছে। বায়রণ দ্রুত বলে উঠল, 'দিস ইজ বায়রণ, হু আর ইউ প্লিজ?'

'শ্যামু চলে গেছে?'

'হ্যাঁ, অনেকক্ষণ!'

'দ্যাটস অলরাইট। গুড বাই!'

বায়রণ তাড়াতাড়ি বলে উঠল, 'এক মিনিট প্লিজ—।'

'ইয়েস।'

'আপনি কে কথা বলছেন?'

রিসিভারটা কান থেকে সরিয়ে নিতে বাধ্য হল বায়রণ। খিল খিল হাসিতে

কানে তালা ধরার যোগাড়। শেষ পর্যন্ত হাসি থামাল 'পুরুষমানুষকে ন্যাকামি একদম মানায় না। অন্তত আমি পছন্দ করি না।'

'না, আমি নিশ্চিন্ত হতে চাইছিলাম।'

'আপনি নিশ্চিন্ত ছিলেন। তাই না?'

'ওয়েল, টেলিফোনের জন্য ধন্যবাদ। আমি কথা না বলতে পেরে হাঁপিয়ে উঠছিলাম। না ঘুমুলে এইভাবে ঘরে মুখ বুজে থাকা কণ্টকর।'

'আফসোস করবেন না। শর্মাসাহেব এ ব্যাপারে চিন্তা করেছেন। একটু বাদেই আপনি কথা বলার লোক পেয়ে যাবেন। আচ্ছা—।'

কট্ করে লাইন কেটে গেল। রিসিভারটার দিকে তাকিয়ে দাঁতে দাঁত ঘষল বায়রণ। কিন্তু তারপরেই মনে হল এ সবই খেলা, খেলার তাস সাজানো, চিন্তা করে কোন লাভ নেই। রিসিভারটা রেখে সে আবার চোখ বন্ধ করল। বেশ আরামদায়ক বিছানা। কলকাতায় এরকম বিছানায় কোনদিন শোয়নি সে। আঃ, কত বছর পর কলকাতায় এসে সে শুয়ে আছে। কিন্তু এভাবে ঘরে বসে থেকে কি লাভ। এই ঘরটার বাইরে বোম্বে দিল্লী মাদ্রাজ থাকলেও তো একই ব্যাপার হতো। ক্লিওপেট্রার কথাটা মনে এল। কথা বলার লোক আসছে। কে? মেজাজ গরম হয়ে গেল বায়রণের। কলিং বেলের বোতামটা টিপতেই ইণ্টারকমে গলা ভেসে এল, 'ইয়েস স্যার। হোয়াট ক্যান আই ডু স্যার।'

বায়রণ লক্ষ্য করল খাটের পাশেই ইণ্টারকম লুকোন ছিল। সে কড়া গলায় জানিয়ে দিল, 'শোন, আমি এখন ডিস্টার্বড হতে চাই না। কেউ যেন আমার ঘরে না আসে। আর একটা বড় বোতল স্কচ পাঠিয়ে দাও কাউকে দিয়ে। ও কে?'

'জনি ওয়াকার, সিভাস রিগ্যাল আর ব্ল্যাক লেভেল—কোনটা পাঠাবো?'

'সিভাস উইথ ওয়াটার।'

'থ্যাঙ্কু স্যার।'

বিছানায় শুয়ে হাসি পেয়ে গেল বায়রণের। এখন আমি রাজা। দি কিং। এই কলকাতায় বসে হুকুম করছি। যে কলকাতা একদিন আমায় লাথি মেরে তাড়িয়ে দিয়েছিল। ভিখিরী থেকে রাজা। এখন আমার বদলা নেবার পালা।

এই ব্যাপারটা নিয়ে ভাবনা শুরু হতেই বীরেন্দ্রনাথ সেন মুখ তোলে। বীরেন সেন থেকে বায়রণ সেইন। বঙ্গসন্তান থেকে বিদেশী সাহেব। বীরেন বলে ডাকার মতো কেউ নেই চারপাশে। অন্তত যাঁরা তাকে ডাকতে পারতেন তাঁদের সঙ্গ সে পায় নি গত দশ বছর। বীরেন সেন ভাল করে খেতে পেতো না, মানুষের লাথি ঝাঁটার ওপর বেঁচে ছিল আর বায়রণ সেইন এখন এয়ার-কণ্ডিশণ্ড ঘরে শুয়ে পা নাচাচ্ছে। সবটাই খেলা গুরু, সবটাই খেলা। এই আটচল্লিশ কেজি শরীর নিয়ে ঘোড়ার পিঠে ভেসে বেড়াও, ছুটে যাও আরও জোরে, আরও আরও।

হঠাৎ এক ঝাঁকুনি দিয়ে উঠে বসল বায়রণ। নো মোর বীরেন সেন। ওসব সেণ্টিমেণ্ট নিয়ে জাবর-কাটার কোন মানে হয় না। দিন যা গেছে তা গেছেই।

এখন কাজের কথা একটু ভেবে নেওয়া দরকার। দুদিনে যে চারটে ঘোড়ায় সে চাপবে তাদের নেড়ে-চেড়ে দেখে নেওয়া দরকার। কাল ভোরে রেসকোর্সে গিয়ে কিছুক্ষণ গ্যালপ করিয়ে নেবে ওদের। ভারতবর্ষের সব সেরা বাজি ওই ইনভিটেশন এবং স্প্রিণ্টার্স কাপ। মার্টিন যে ওকে ছেড়ে দিতে রাজী হল, পল রোজারিওর হয়ে দৌড়াতে, এটা একটা ঘটনা। মার্টিনের স্টেবল থেকে ঘোড়া এসেছে এই দুই বাজীতে ছোটার জন্য। ডিক্ এবং বার্জি তাদের চালাবে। দুজনেই বিদেশী এবং খুব ভাল চালায়। মার্টিনের ঘোড়া লর্ড কৃষ্ণা চব্বিশ শ' মিটার দৌড়েছে দু'মিনিট তেত্রিশ সেকেণ্ডে। সেদিনই সবাই ধরে নিয়েছে লর্ড কৃষ্ণা এবার ইনভিটেশন জিতবে। পলের ঘোড়া প্রিন্সের সময় খুব খারাপ, দু মিনিট পঁয়ত্রিশ সেকেণ্ড। দু সেকেণ্ডের তফাৎ কিন্তু মাঠেরও তো হের-ফের আছে। কলকাতার মাঠে ছুটলে যে সময় হবে ব্যাঙ্গালোরে তার থেকে কম হওয়া স্বাভাবিক। কারণ ওখানকার মাটি অনেক শক্ত। শুধু এটুকুই ভরসা। হরি শর্মা তাকে অনেক দিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ কিন্তু ভদ্রলোক জানেন না এই দুটো বাজী না জেতা পর্যন্ত বীরেন্দ্রনাথ সেন শান্ত হবে না। কোলকাতা থেকে তাকে এই সম্মান নিয়ে ফিরে যেতে হবেই। হরি শর্মার আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে তার কোন পার্থক্য নেই। মার্টিনের স্টেবলে এই দুই বাজীতে চাপলে সে হয়তো উইনার ঘোড়া পেত না। হরি শর্মা জানেন না, উনি যদি একটাও পয়সা খরচনা করতেন তবু বীরেন্দ্রনাথ প্রস্তাবে রাজী হয়ে যেত। এটা বদলা নেবার ব্যাপার।

দরজায় শব্দ হল। তারপর সন্তর্পণে ঘরে ঢুকল ভারালু। পেছনে একটি ছেলের হাতে ট্রে। ট্রের ওপর সিভাস রিগ্যালের বোতল, জলের জাগ এবং দুটো গ্লাস। বিছানার পাশে একটা ছোট্ট টিপয় টেনে এনে এগুলো সেখানে সাজিয়ে বয় কফির কাপ নিয়ে বেরিয়ে গেলে ভারালু বলল, 'স্যার!'

'ইয়েস!'

'সঙ্গে ফুড্ দেব?'

'নো।'

'ডিনার কখন খাবেন?'

'বলব।'

'স্যার!'

'ইয়েস?' এবার বিরক্ত হল বায়রণ। লোকটা তো বেশ বিরক্তিকর।

'একজন আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছে।'

'না, কারো সঙ্গে দেখা করা সম্ভব হবে না।'

'সেটা আমি জানি স্যার। কিন্তু মিঃ শর্মার ইচ্ছে আপনি এর সঙ্গে দেখা করুন।'

বায়রণ ভারালুর মুখের দিকে তাকাল। অত্যন্ত নির্লিপ্ত ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে আছে লোকটা। তেমন কোন প্রতিক্রিয়া নেই।

'কার সঙ্গে আমি দেখা করব সেটা কি মিঃ শর্মা ঠিক করবেন?'

'আমি শুধু আদেশ পালন করছি স্যার।'

'নো, আই ডোণ্ট ওয়াণ্ট টু মিট এনিবডি।'

কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে ভারালু জিজ্ঞাসা করল, আপনার ড্রিঙ্ক ঢেলে দেব স্যার।'

'নো, আমাকে একা থাকতে দাও।'

ভারালু বেরিয়ে গেলে বায়রণ উঠে বসল। দরজাটা লক করে দিলে কেমন হয়? হরি শর্মা মনে করেছেন কি? তাঁর ইচ্ছে অনিচ্ছেয় তাকে চলতে হবে? তাঁর ঘোড়া সে চাপতে এসেছে, ব্যাস এইটুকু। স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করার কি রাইট আছে ওঁর। দ্রুত হাতে গ্লাসে অনেকটা স্কচ ঢেলে নিয়ে সামান্য জল মেশালো বায়রণ। তারপর খানিকটা গলায় চালান করে দিয়ে চোখ বন্ধ করল। না, মদ খাওয়া তার অভ্যাসে নেই। মদ এবং সিগারেট যে-কোন জকির ক্ষতি করতে পারে। অনেক বড় বড় জকিকে শুধু মদের প্রতি আসক্তির জন্য রেস কোর্স ছেড়ে চলে যেতে হয়েছে। ডিক্‌কে নিয়ে যেমন মার্টিন এখন বেশ সমস্যায় পড়েছে। অসাধারণ চালায় লোকটা, মদ সিগারেট ছোঁয় না। কিন্তু এদেশে এসে কি করে যে তার চণ্ডুর নেশা ধরে গেল তাই বোঝা গেল না। আগের বছরগুলোতে ডিক মাত্র মাস চারেকের জন্যে এদেশে আসতো। গরম পড়লেই সে পালাতো বিলেতে। কিন্তু যেই সে চণ্ডুর স্বাদ পেয়ে গেল আর তার দেশে ফেরার কথা মনে পড়ে না। শোনা যাচ্ছে এখানেই নাকি পাকা-পাকি থেকে যাবে। যত সব ছোটলোকদের আখড়া থেকে মার্টিন প্রায়ই ওকে তুলে নিয়ে আসে। এখন মাঝে মাঝেই সে জেতা রেস হারছে। আবার হারা রেস জিতিয়ে দিতে ডিকের জুড়ি নেই। কিন্তু মার্টিনের মাথাব্যথা শুরু হয়ে গেছে। এমন করলে হয়তো সামনের সিজনে ওকে নেওয়া খুব রিস্কি হয়ে যাবে। বায়রণ তাই রেসের আগের দিন থেকে মদ ছোঁয় না। কালেভদ্রে পার্টিতে দণ্ডলে পড়লে খেয়ে থাকে এইমাত্র। আজ হঠাৎ মেজাজের মাথায় বলে দিয়েছে সে ড্রিঙ্কস দিতে। দুটো বড় খাওয়ার পর টেলিফোন বাজলো। বায়রণ প্রথমে শীতল চোখে রিসিভারটাকে দেখল। না, ধরবে না সে। কিন্তু কানের কাছে ওটা যতই মিষ্টি শব্দ করুক একসময় ধৈর্যচ্যুতি ঘটেই।

'সেইন, শর্মা বলছি।'

'ইয়েস স্যার।'

'খুব বোর ফিল করছ?'

'আমি এখন ড্রিঙ্ক করছি।'

'জানি। কিন্তু তুমি খাও না বলেই জানতাম। ঠিক আছে।'

'কিছু বলবেন?'

'আমার সেক্রেটারি তোমাকে কিছু বলবে। ওর সঙ্গে দেখা করো!'

'সেক্রেটারি?'

'হ্যাঁ, তোমার উপকার হবে।' লাইনটাকে ছেড়ে দেওয়া হল ওপাশ থেকে। সেক্রেটারি যে ধান্দায় আসুক লোকটাকে নাজেহাল করবে ঠিক করল

বায়রণ। রিসিভার নামিয়ে রাখতেই ওটা আবার বাজলো, 'আমি কি এবার আসতে পারি ?' খুব মিষ্টি গলা, গলাতেই বোঝা যায় মেয়েটির বয়স পঁচিশের নীচে অবশ্যই। বায়রণ মনে মনে বলল, যাচ্চলে! এ কি খেলা খেলছে হরি শর্মা! মেয়েছেলে সেক্রেটারি পাঠিয়ে দিয়েছে কি কারণে ? ক্লিওপেট্রা যে এর কথাই তখন ইঙ্গিতে বলল তা বুঝতে অসুবিধে হচ্ছে না। কি আছে কপালে তা না ঘটার আগে তো বোঝা যাবে না। অতএব ঘটতে দেওয়া যাক। সে রিসিভারের দিকে তাকিয়ে বলল, 'দু' মিনিট, দু' মিনিটের জন্য আসতে পারেন।'

ইচ্ছে করেই বায়রণ খাট থেকে উঠল না। স্কচের বোতলটা সামনে পড়ে রইল। তৃতীয় পেগ গ্লাসে ঢেলে নিয়ে প্রস্তুত হল সে। এই সময় দরজা খুলে গেল। বায়রণ আশা করেছিল অন্তত একবার নক্ হবে, হল না।

ছিপছিপে বলা যায় না আবার মোটা বললেও আপত্তি হবে। দরজায় দাঁড়ানো শরীরটা দেখে বায়রণ বুঝলো পাঁচ ফুট এক ইঞ্চির বেশী হবে না। অর্থাৎ তার থেকে ইঞ্চিটাক ছোট হবেই। দরজাটা পেছনে বন্ধ হয়ে গেল। সেই ফ্রেমে মেয়েটি এক পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে; ঈষৎ ঘাড় কাৎ করে তার দিকে তাকিয়ে, মুখে বেশ খাই খাই মার্কা হাসি। মেয়েটির বিশেষত্ব হল বুক এবং নিতম্বের ক্ষেত্রে সে খুব বিত্তশালিনী এবং সে তুলনায় কোমর সিংহীর মতো সরু। শর্মা সাহেবের এই সেক্রেটারিটির দিকে তাকিয়ে হঠাৎ একটা ভিজে অনুভূতি ছড়িয়ে গেল মনে। এরকম মেয়ে বোম্বে মাদ্রাজে সে অনেক দেখেছে। গম্ভীর গলায় বলল, 'ইয়েস।'

'মে আই কাম ইন ?'

'তুমি অলরেডি এসে গেছ!'

'হাউ ফানি! আমি ডলি, ডলি নাজির, শর্মা এন্ড শর্মায় আছি।'

'কি করতে পারি ?'

'ওহ! ওরকম ফর্মাল না হলেও চলবে! সিনিয়র শর্মা আমাকে বলেছেন যতদিন আমাদের অনারেবল গেস্ট এখানে থাকবে ততদিন তার সব ভার আমার ওপর। খুব শক্ত কাজ, তবে সাহায্য করলে সহজ হয়ে যাবে।' মেয়েটি দরজা থেকে নড়ছিল না। চেষ্টা করছিল খুব কায়দা করে কথা বলতে।

হঠাৎ মাথায় একটা উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ল, বায়রণ উঠে বসল, 'আমি শিশু নই। অতএব কারো কেয়ারে থাকার কোন দরকার নেই।'

'ওহ! তুমি খুব রাগী। এত রাগ হলে চলে? এখন পর্যন্ত আমাকে বসতেই বললে না। আমি কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকব ?' চোখের তলা দিয়ে তাকাল ডলি।

'ওইখানে বসতে পারো।' সোফাটাকে দেখিয়ে দিল বায়রণ।

সমস্ত শরীর নাচিয়ে ডলি এগিয়ে এল। তারপর চলতে চলতেই দুটো পা থেকে জুতো ছুঁড়ে দিয়ে বিরাট খাটের ওপর উঠে বসল, 'অত দূর থেকে কথা বলা যায় না। কাছাকাছি না এলে বন্ধুত্ব হয় ? আমাকে একটা পেগ দাও,

ডার্লিং।'

কিছুক্ষণ একদৃষ্টে মেয়েটিকে দেখল বায়রণ। তারপর ধীরে ধীরে বলল, 'আই ওয়াণ্ট টু সি ইউ।'

খিলখিল করে হেসে উঠল ডলি নাজির। তারপর কোনরকমে হাসি থামিয়ে কাঁধ ছোঁওয়া চুল ঝাঁকিয়ে বলল, 'তুমি জানো আমি কে?'

একটু বেশী করে মাল ঢালল সে গ্লাসে। ডলির দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, 'তুমি বললে মিঃ শর্মার সেক্রেটারি, তাই না।'

'নো, আই হ্যাভ নট সেইড দ্যাট। আমি শর্মা এণ্ড শর্মায় আছি।'

'বেশ, সেটাই আমার পক্ষে যথেষ্ট, বেশী জেনে লাভ কি?'

হাত থেকে গ্লাসটা নিয়ে বেশ কিছুটা গলায় ঢেলে দিয়ে মুখ বিকৃত করল ডলি। তারপর ধীরে ধীরে বলল, 'তুমি কি এখনই দেখা শুরু করবে?' তার পাঁচটা আঙুল বুকের ওপর। সেখানে একটা স্কিনটাইট জামা এবং তার তলায় মিনি স্কার্ট। স্কার্টটি গাঢ় কালো রঙের। ডলি পা ছড়িয়ে আধশোয়া হয়ে থাকায় তার সাদা থাই-এর অনেকটা চকচক করছে।

'তুমি কি চাও?'

'আমি কিছু চাই না। আমাকে মিঃ শর্মা বলেছেন তোমাকে দেখাশোনা করতে। দ্যাটস এনাফ।' ব্লাউজের প্রথম বোতামটা খুলল ডলি।

'আর ইউ ইন দিস বিজনেস?'

'মি? নো, নেভর।'

'দেন স্টপ ইট। তুমি কেন এসেছ?'

গ্লাসটা শেষ করে ফিরিয়ে দিয়ে ডলি বলল, 'আমার না এসে উপায় নেই। জুনিয়ার চায় আমি আসি তাই এসেছি।'

'জুনিয়ার?'

'শ্যামু শর্মা।'

'তার সঙ্গে তোমার কি সম্পর্ক?'

'আমি ওকে ভালবাসি।'

সোজা হয়ে বসল বায়রণ। এরকম চমক সে আশা করে নি। এতক্ষণ সে এই মেয়েটাকে উচ্চ পর্যায়ের বারবনিতা বলে মনে করছিল। এ্যালকোহলের নেশা আর একটু গাঢ় হলে একে নিয়ে রাতটা কাটিয়ে দিতে একসময় হয়তো দ্বিধা থাকতো না। আপাতদৃষ্টিতে মেয়েটিকে শরীরসর্বস্ব বলে মনে হয়, বুদ্ধির তিলমাত্র ছাপ নেই। এ ধরনের মেয়ের জন্যে কোনরকম আকর্ষণ বোধ করে না বায়রণ। হরি শর্মা তার একাকিত্ব ঘোচাবার জন্যে একে পাঠিয়েছে বলে মনে হচ্ছিল এতক্ষণ। কিন্তু শেষ সংলাপটা ওকে বিমূঢ় করল।

ডলির গ্লাসটা ভরে দিয়ে নিজেরটা নিয়ে সে উঠে দাঁড়াল। তারপর কয়েক পা হেঁটে সোফায় গিয়ে বসল, 'তুমি শ্যামুকে ভালবাস?'

'ইয়েস।'

'হরি শর্মা এ কথা জানে?'

'জানে বলেই আমাকে এখানে আসতে হল।'

'আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।'

'ইট্‌স সিম্পল। শর্মা এণ্ড শর্মায় একজন কর্মচারী প্রিন্সকে ভালবাসবে এবং সেটা যদি পরিণতিতে পেঁাছায় তাহলে কিংএর সম্মানে লাগবে। শ্যামুকে নিয়ন্ত্রণ করে একটা ডাকিনী, হিজ স্টেপ মাদার। শ্যামুর মুখে আমার খবর শুনেই সে হরি শর্মাকে লাগালো। দে অফারড মি মানি। আমি শ্যামুকে সব দিয়েছি। ফাস্ট ওয়্যান টু টেস্ট হিজ ইয়ুথ এণ্ড আই লাভ হিম। লোকে এখন বলে বুড়ো হরি শর্মার থেকে শ্যামুর সঙ্গে নাকি ডাকিনীর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। হরি শর্মা আমাকে শাসালো আর যেন শ্যামুর সঙ্গে দেখা না করি। তারপর হুকুম হল এখানে আসতে। আসব কিনা ভাবছিলাম, যদিও জানতাম না এসে উপায় নেই, এমন সময় শ্যামুর ফোন এল। তাই আসতে হল।' পর পর বোতামগুলো খুলে ফেলল ডলি নাজির। মাখনের মতো শরীরে এখন শুধু চিলতে ব্রা যেন আঠা দিয়ে আটকানো। ভারী বুক কাপড়ের বেষ্টনী ছিঁড়ে বেরিয়ে আসতে চাইছে।

ডলি বলল, 'এই বুকের দিকে তাকিয়ে শ্যামু বলতো ও মরে যাবে। তোমারও কি তাই মনে হচ্ছে না?'

বায়রণ দেখল। মেয়েটি সত্যিই লোভনীয়। কিন্তু সে প্রশ্ন করতে চাইল, 'শ্যামুর সঙ্গে ওর বাবা হরি শর্মার সম্পর্কটা কি?'

'দে আর এনিমিস। শত্রু। ওই ডাকিনী এটা করেছে।'

'এসব জেনেশুনে তুমি এলে?'

'এলাম। কারণ আমি শ্যামুকে চাই। আমি ওকে ভুলতে পারছি না।'

হকচকিয়ে গেল বায়রণ। তারপর বলল, 'আমার কাছে রাত কাটালে তুমি শ্যামুকে কি ভাবে পেতে পারো? সে তো তোমাকে ঘেন্না করবে।'

'নো। ইট্‌স বিজনেস। সে বলেছে।'

'কি বলেছে?'

'আমি যদি তোমাকে রাজী করাতে পারি তাহলে সে আর হরি শর্মার আণ্ডারে থাকবে না, স্টেপ মাদারকে ভুলে যাবে আর আমাকে নিয়ে কণ্টিনেণ্টে চলে যাবে। আমি কি স্কার্টটা খুলবো।'

'নো এখন নয়। তুমি আমাকে কি রাজী করাবে?'

'শ্যামু চায়, না এখন নয়, আফটার দি গেম আমি তোমাকে বলব।' ডলি যেন আচমকা সচেতন হয়ে গেল। ওর গ্লাস শেষ হয়ে গিয়েছিল। সেটা তুলে নিয়ে আবার ঢেলে দিল বায়রণ, 'এটাও কি শ্যামু বলে দিয়েছে?'

'হ্যাঁ। আগে বললে তুমি যদি হরি শর্মাকে বলে দাও।'

'সে তো পরেও বলতে পারতাম। তুমি নিশ্চিন্ত থাকো তুমি যা বলবে তা কেউ জানবে না। ইটস বিটুইন ইউ এণ্ড মি।'

'সত্যি?'

'প্রমিস।'

'শ্যামু চায় তুমি প্রিন্সকে যেন না জেতাও। তোমাকে হারতে হবে।'

'আমাকে ইনভিটেশন কাপে হারতে হবে?'

'ইয়েস।'

'ফর গডস সেক, হোয়াই?' প্রচণ্ড উত্তেজিত হয়ে গেল বায়রণ।

মেয়েটা চোখ বন্ধ করে কারণটা যেন চিন্তা করতে লাগল। ওর মুখের দিকে তাকালে বোঝা যায় এর মধ্যেই বেশ নেশা হয়ে এসেছে, কথা জড়িয়ে আসছে। তারপর চোখ খুলে বলল, 'তুমি যদি রাজী থাকো তাহলে প্রচুর টাকা পাবে।'

'কিন্তু প্রিন্সই যে জিতবে তা কি করে জানলে?'

'ওরা জানে, ওরা সব জানে। তুমি রাজী হয়ে যাও, প্লিজ।'

'প্রিন্সের মালিক তো শ্যামু শর্মা এণ্ড মিসেস শর্মা। ওরা নিজেদের ঘোড়াকেই হারিয়ে দিতে চাইছে! কেন?'

'আমি জানি না। বিশ্বাস করো জানি না। আমাকে শ্যামু বলেছে তোমাকে রাজী করালেই ও আমাকে বিয়ে করবে। ওর তখন এমন ক্ষমতা এসে যাবে যে ও আর হরি শর্মাকে ভয় পাবে না। তুমি জানো না শ্যামু কি সুইট, হি ইজ বিউটিফুল। প্লিজ। তুমি ইচ্ছে করে ঘোড়াটাকে হারিয়ে দাও। ফর মি ফর শ্যামু। বায়রণ দেখল মাতাল দুটো হাত স্কার্টের হুক খুঁজছে। তার ইচ্ছে হল উঠে গিয়ে ঠাস ঠাস করে কয়েকটা চড় বসিয়ে দেয় বোকা মেয়েটার গালে। তাকে আনন্দ দিয়ে রাজী করালেই যেন শ্যাম শর্মা ওকে বিয়ে করবে। গর্দভ। মেয়েরা মাঝে মাঝে কি রকম গর্দভ হয়ে যায়।

বায়রণ বসে দেখতে লাগল ডলি নাজিরের কাণ্ড। অসংলগ্ন হাতে কোনরকমে স্কার্টটাকে খুলে ফেলল সে। এখন যেন তার শরীরে শক্তি কমে আসছে। শুধু শুধু ব্রা এবং জাঙ্গিয়া পরা সাদা মাংসপিণ্ড হয়ে গেল ডলি নাজির। তারপর বালিশ জড়িয়ে ধরে হাউ হাউ করে কাঁদতে লাগল। কান্নার দমকের সঙ্গে সে বালিশে মুখ গুঁজছে আর বলছে, 'হেল্প মি, হেল্প মি প্লিজ।' আস্তে আস্তে সমস্ত শরীরটা শান্ত হয়ে এল। আউট হয়ে গেছে মেয়েটা।

মিনিট দশেক চুপচাপ বসে থাকল বায়রণ? অদ্ভুত খেলা চলছে এখানে। ক্রমশ তার নিজেকে পুতুল বলে মনে হচ্ছে। অবশ্য একজন জকি পুতুল ছাড়া আর কি। দম দেওয়া পুতুল। যেমন হুকুম হবে তেমন চলতে হবে। খাঁচা থেকে সহজ হয়ে বের হও, প্রথম দু'শো মিটার ঘোড়াটাকে চতুর্থ কিংবা পঞ্চম পজিশনে রেখে দাও, বাঁক ঘোরার মুখে আউটসাইড দিয়ে তৃতীয় পজিশনে নিয়ে এসো, চারশ' গজ থাকতে চার্জ করো এবং রেস জেতো। ট্রেনারের নির্দেশ না মেনে হেরে গেলে কৈফিয়ৎ দিতে দিতে প্রাণান্ত হবে। কিংবা যদি দ্যাখো যে ঘোড়াটা জিতছে তাকে তুমি কিছুতেই হারাতে পারবেনা তাহলে পুরো চেষ্টা না করে সহজভঙ্গীতে চালাও, অন্য ঘোড়াকে পজিশনে আসতে দাও। পায়ে পায়ে এই ধরনের নির্দেশ অমান্য করেছ কি গিয়েছ। অতএব পুতুল ছাড়া আর কি? কিন্তু এক্ষেত্রে? হরি শর্মা স্বপ্ন দেখছেন তিনি

ভারতবর্ষের সেরা বাজী দি ইণ্ডিয়ান টার্ফ ইনভিটেশন কাপ জেতার সম্মান পাবেন। যে-কোন ঘোড়ার মালিক এই স্বপ্ন দেখে, যে-কোন জকি সেই ঘোড়া চালাবার গৌরব পেতে চায়, যে-কোন ট্রেনার তার অংশীদার হওয়ার বাসনা রাখে। কিন্তু হরি শর্মার ছেলে, যার নামে তার বাবা ঘোড়া কিনেছে, চায় না যে ঘোড়াটা জিতুক। কেন? এই মেয়েটাকে হাজার জিজ্ঞাসা করলেও এই কেনর উত্তর পাওয়া যাবে না সে তা জানে। শ্যামু শর্মা এই বোকামী নিশ্চয়ই করবে না। কিন্তু আজ যখন এয়ারপোর্টে শ্যামু বাবার সঙ্গে তাকে রিসিভ করতে গিয়েছিল তখন ঘূণাক্ষরেও মনে হয় নি সে তার বাবার বিপরীত মতলব মাথায় নিয়ে এসেছে। অবশ্য এই ঘরে খানিকক্ষণ বসে একটু অন্যরকম ভাবভঙ্গী সে করেছে সেটা এখন বুঝতে পারছে বায়রণ। কিন্তু কেন? কি জন্যে সন্তান পিতাকে সম্মান থেকে বঞ্চিত করতে চায়? এই বোকা মেয়েটার দুর্বলতাকে কাজে লাগাতে ওর একটুও দ্বিধা হয় নি। অথচ ছেলেটাকে নেহাতই বাচ্চা বলে মনে হয়েছিল বায়রণের।

তৃতীয়জন কি চান তা এখনও অনুমান করা যাচ্ছে না। তিনি সব কিছুতেই জড়িয়ে আছেন আবার কোনটাতেই ধরা-ছোঁয়ার মধ্যে নেই বলে বোঝা যাচ্ছে। শি ইজ সামথিং। ক্লিওপেট্রার থেকে এই মেয়েটি হয়তো শরীরের সম্পদে সম্পদশালিনী হতে পারে কিন্তু তাঁর বাইরের ছিটেফোঁটাও এ পায় নি। সেই ক্লিওপেট্রা কি চান? এয়ারপোর্ট থেকে আসা পর্যন্ত অত্যন্ত দাম্ভিক রমণীর মতো ব্যবহার করেছেন যা কিনা ক্লিওপেট্রাকেই মানায়। বোঝা যাচ্ছে, হরি শর্মার সঙ্গে তার বয়স ও মনের বিস্তর ব্যবধান। মেয়েটার কথামত শ্যাম শর্মার সঙ্গেই তাঁর ভাবসাব! যুবক সৎ ছেলেকে হাতে রাখতে নিশ্চয়ই চাইবেন মহিলা। কিন্তু ওঁকে ডাকিনী বলল কেন মেয়েটা? বায়রণের মনে হল ডলি নাজিরের এই ঘরে আসার পেছনে ক্লিওপেট্রার হাত আছে। কিন্তু এই রহস্যময়ীকে বোঝার কোন সূত্র এখনও পাওয়া যাচ্ছে না।

এইসব ভাবনা মাথায় জুড়ে বসতেই কখন যে তির তির করে মাথাটা ধরে গেছে বুঝতে পারে নি। একসময় ব্যথাটা প্রবল হল। এই বন্ধ ঘরে আরো অস্বস্তিকর হয়ে উঠল ওটা। একটা ট্যাবলেট খেল সে। মাথা ধরার রোগ তার আছে, সঙ্গে এ্যাসপিরিন সে রাখে। কিন্তু এ্যালকোহল পেটে পড়লে ওগুলো খেতে নিষেধ করেছে ডাক্তার। অথচ এই ঘর অসহ্য হয়ে উঠেছে তার কাছে।

দরজা খুলে বেরোবার আগে সে আর একবার মেয়েটাকে দেখল। শিশুর মতো ঘুমুচ্ছে অর্ধমগ্ন হয়ে। কি মনে করে দরজা থেকে আবার সে ফিরে এল রিসিভারের কাছে। রিসিভারটা তুলে তার মনে হল সে হরি শর্মার টেলিফোন নম্বর জানে না। ইণ্টারকমে ভারালুকে জিজ্ঞাসা করলে হয়। সে বোতাম টিপলে কিছুক্ষণ সময় গেল, 'ইয়েস স্যার।'

'মিঃ শর্মার টেলিফোন নাম্বার।'

নম্বরটা বলল ভারালু, 'কোন অসুবিধে হচ্ছে স্যার। আমাকে বলুন, আমি থাকতে কোন অসুবিধে হবে না স্যার।'

'দরকার হলে বলব।'

এবার টেলিফোনের ডায়াল ঘোরাল বায়রণ। হ্যাঁ রিং হচ্ছে। খুব সাধারণ শব্দ। তারপর ওপাশে রিসিভার উঠল, 'হেলো।'

'এটা কি মিঃ শর্মার বাড়ি?'

'ইয়েস।'

'আমি ওঁর সঙ্গে কথা বলতে চাই।'

'আপনি কি এখনও একা বোধ করছেন মিঃ বায়রণ?'

'আমি একটু ব্যক্তিগত কথা বলতে চাই।'

'হ্যারি এখনও ফেরে নি।'

'ওয়েল। উনি এলে আমায় রিং করতে বলবেন।'

'হ্যারি ফিরলে কথা বলার অবস্থায় থাকবে না।'

'তাহলে আপনাকেই বলতে হচ্ছে। আপনারা যাকে পাঠিয়েছেন সে বেহুঁশ হয়ে এই ঘরে পড়ে আছে। দয়া করে তাকে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করুন।'

'আমি কাউকে পাঠাই নি।'

'মিঃ শর্মা ওকে সেক্রেটারি বলেছিলেন।'

'বেহুঁশ কেন?'

'সেটা ওকেই জিজ্ঞাসা করবেন।' এবার নিজে রিসিভার নামিয়ে রেখে বেরিয়ে এল বায়রণ। দরজা বন্ধ হবার আগেই টেলিফোনটা আবার বেজে উঠল। বায়রণ আর আমল দিল না। বাজুক, বেজে যাক।

হলঘরটায় একটা নীলচে আলো জ্বলছে। কবজি ঘুরিয়ে সময় দেখল বায়রণ, প্রায় নটা। এমন কিছু রাত নয়, কিন্তু মনে হচ্ছিল বেশ গভীর হয়েছে সময়। চারপাশ নিশ্চুপ। কাছাকাছি কোন মানুষ আছে বলে মনে হচ্ছে না। বায়রণ হঠাৎ সতর্ক হল। হরি শর্মা কি নির্দেশ দিয়ে গেছে সে জানে না। অতএব নিঃসাড়ে দেখা যাক। সে বারান্দায় বেরিয়ে এসে চুপ করে দাঁড়াল। বাড়ির সামনের লনে অনেকটা আলো ছড়ানো। ওপরে মার্কারি জ্বলছে বোধহয়। ওপাশের ছোট্ট একটা বাড়ির বারান্দায় তিনজন মানুষ চেয়ারে বসে গল্প করছে। ওদের একজন যে ভারালু তা অনুমান করল বায়রণ। মাথাটা বেশ টিপ-টিপ করছে। এখন একটু খোলা হাওয়ায় ঘোরা দরকার। হঠাৎ একটু খেলা করার ইচ্ছে পেয়ে বসল ওকে। ঠিক সেই সময় গেটের দিক থেকে আরো দুজন লোক বাঁধানো প্যাসেজ দিয়ে এগিয়ে এল। তারা খানিকটা এসে আবার ফিরে গেল গেটের দিকে। মিনিট তিনেক দাঁড়িয়ে বায়রণ বুঝতে পারল গেটেও পাহারা বসেছে। কেন? আর এইসব দেখে ওর খেলা করার প্রবণতা আরও বেড়ে গেল। এরা নিশ্চিন্তে পাহারা দিক, তার ফাঁকে সে বাইরের রাস্তায় ঘুরে আসবে। ওদের জানানো দরকার যে সে কারো কাছে স্বাধীনতা বিক্রী করে নি। সরাসরি গেটের দিকে হাঁটা যায়। ওরা হয়তো ছুটে আসবে, বলবে শর্মা সাহেবের নিষেধ আছে। সে জোর করে হয়তো বাইরে যেতে পারে কিন্তু তাতে ঝামেলাই বাড়বে। তার চেয়ে চুপচাপ কেটে পড়া যাক।

দেওয়াল ঘেঁষে বায়রণ বিপরীত দিকের বাগানে নেমে এল। সামনেই ফুলের বাগান, তারপর ইউক্যালিপটাস গাছ এবং বাউণ্ডারি দেওয়াল। কোন্‌দিক দিয়ে যাওয়া সুবিধেজনক বুঝতে পারছিল না সে। ওই অতবড় দেওয়ালে ওঠা তার পক্ষে সম্ভবও নয়। না, যা ভেবেছিল তা হবে না। চুপচাপ চলে যাওয়া যাবে না। বায়রণ ইউক্যালিপটাস গাছের ধারে এক দৌড়ে পৌঁছে গেল। এখান থেকে রেস্টহাউসটা বেশকিছু দূরে। সে দেওয়াল ঘেঁষে এগোতে লাগল। গেটের কাছে পৌছতে তাকে অনেকটা ঘুরে যেতে হবে। কিন্তু এইভাবে এগোতে তার বেশ মজা লাগছিল। উত্তেজনায় মাথার যন্ত্রণাটা এখন চাপা পড়েছে। সে যখন গেটের কাছাকাছি পৌঁছে গেছে তখন ভারালুরা স্পষ্ট চোখের সামনে এল। বারান্দার আলোয় তিনজন খোস-মেজাজে গল্প করছিল। আচমকা ভারালুটা উঠে ভেতরে চলে গেল। কয়েক সেকেণ্ড মাত্র তারপরেই সে ব্যস্ত হয়ে বাইরে বেরিয়ে এল। সঙ্গী দুজনকে ডেকে সে দ্রুত পায়ে রেস্টহাউসের দিকে এগোতে লাগল। তার মানে শর্মা এণ্ড শর্মা থেকে হুকুম এসেছে কিছু। ওরা রেস্ট হাউসের মধ্যে ঢুকে যেতেই বড় বড় পা ফেলে বায়রণ গেটের সামনে এসে পড়ল। দুটো লোক তখন গেট অবধি পৌঁছে পায়চারি করতে করতে সবে মাত্র পেছন ফিরেছে। বায়রণ গলা তুলে বলল, 'হেই, ভারালু তোমাদের ডাকছে। তাড়াতাড়ি ভেতরে যাও। কুইক কুইক।'

লোকদুটো হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। বোঝাই যাচ্ছিল ওরা বায়রণকে কোনদিক থেকেই আসতে দ্যাখেনি। বায়রণ আবার ধমকালো, 'কথা শুনতে পাচ্ছ না? জলদি যাও অন্দরমে।' তখন ওদের একজন যেন হুঁশ পেল, 'আপ্‌?'

'বায়রণ, বায়রণ সেইন, জর্মক।'

ওরা দুজন একসঙ্গেই সেলাম করল ওকে। তারপর একজন ছুটে গেল রেস্ট হাউসের দিকে। বায়রণ গেটের দিকে এগোতে এগোতে বলল, 'তুমি এখানে দাঁড়িয়ে থাক, বুঝলে? আমি ঘণ্টাখানেকের মধ্যে ঘুরে আসছি।'

আর সময় নষ্ট করল না সে। হতভম্ব লোকটার সামনে দিয়ে গেট খুলে বেরিয়ে এল বায়রণ। সে যখন চওড়া রাস্তায় এসে পৌঁছেছে তখন ভেতরে চেঁচামেচি শোনা গেল। বায়রণ আর ধৈর্য রাখতে পারল না। প্রাণপণে ছুটতে লাগল সামনে। বেশ কিছুটা যাওয়ার পর তার হুঁশ হল এভাবে ছোটা ঠিক হচ্ছে না। যে দেখবে সেই সন্দেহ করবে। রাস্তার একপাশে সরে গিয়ে সে পেছনে তাকাল। দূরে গেটের কাছে জনাকয়েক মানুষ এসে গেছে। তবে গাড়ি না থাকলে এতদূরে ওদের পক্ষে এসে তাকে ধরা সম্ভব নয়। ভাগ্য ভাল বলতে হবে সেইসময় একটা ট্যাক্সী পেয়ে গেল বায়রণ। কাউকে ছাড়তে এ পাড়ায় এসে বিরক্ত মুখে ফিরে যাচ্ছিল ড্রাইভার, বায়রণকে বসিয়ে সেই মুখেই প্রশ্ন করল, 'কিধার যায়েগা সাব?'

'কলকাতা।' গাড়ির সিটে শরীর এলিয়ে দিয়ে নিঃশ্বাস ফেলল বায়রণ।

আঃ কি আরাম। ভেতরে ভেতরে হুইস্কি চুপচাপ বিস্তারিত হচ্ছিল, এতক্ষণের উত্তেজনার পর বায়রণের মনে হল সমস্ত শরীর শিথিল হয়ে আসছে। খোলা জানালা দিয়ে হাওয়া আসছে হু হু করে। বায়রণ চোখ বন্ধ করল।

ট্যাক্সীওয়ালা আবার জিজ্ঞাসা করল, 'কাঁহা বোলা সাব ?'

'কলকাত্তা।' চোখ বন্ধ করেই জবাব দিল বায়রণ।

'এই পুরো শহরটাই তো কোলকাতা, ঠিক করে বলুন।'

'আমি পুরো শহরটাই ঘুরতে চাই।'

ট্যাক্সীওয়ালার মনে বোধহয় সন্দেহ হচ্ছিল। সে গাড়ির গতি কমিয়ে দিল। রাস্তার একপাশে দাঁড়িয়ে ভেতরের আলো জেবলে দিয়ে সে বায়রণের মুখ দেখার চেষ্টা করছিল, 'সাব, আপনি কি নেশা করেছেন ?'

'একথা কেন ?'

'এত রাতে কেউ কলকাতা ঘুরতে চায় না।'

বায়রণ সেইনের ভেতর থেকে কোন ফাঁকে যে বীরেন্দ্রনাথ সেন মাথা তুলেছে এবং সেই জবাব দিল, 'যা বলছি তাই করো। তোমার টাকা পেলেই তো হল।'

'নেহি সাব। আমি গ্যারেজ করব গাড়ি।'

'কোথায় তোমার গ্যারেজ ?'

'পার্ক সার্কাস।'

নামটা শোনামাত্র চোখ খুলল বীরেন্দ্রনাথ সেন। পার্ক সার্কাস ? মাথা নাড়ল সে, 'চল পার্ক সার্কাস।'

ট্যাক্সীড্রাইভার আবার অবাক হল। তারপর ঘুরে বসে প্রচণ্ড গতিতে গাড়ি ছোটালো সে। গাড়ির গতি বেড়েছিল বলেই হাওয়া প্রবল হয়েছিল। ফলে সেই হাওয়া মুখে লাগায় কিছুক্ষণের মধ্যে বীরেন সেন সুস্থ হয়ে উঠল। এই তো সার্কুলার রোড, হ্যাঁ বাঁ দিকে ঘুরলেই ক্যামাক স্ট্রীট, সব চেনা সবই জানা। কতদিন এই রাস্তা দিয়ে হেঁটে গেছে সে। ডানদিকে ওভারসিজ রেস্তোরাঁর ওপর আলো জ্বলছে। সাবাস এই তো ইলিয়ট রোড, সেই বাটার দোকানটা। কি মনে করে ট্যাক্সীড্রাইভার ইলিয়ট রোড না ধরে রিপন লেন ধরল। পার্ক সার্কাস যেতে হলে এদিকটা দিয়ে যাওয়ার মানে হয় না। কিন্তু তেকোণা পার্কটা নজরে আসামাত্র বীরেন সেন লাফিয়ে উঠল। ট্যাক্সীটা থামলে একটা দশ টাকার নোট ছুঁড়ে দিয়ে সে নেমে এল রাস্তায়। ব্যালেন্সের জন্য অপেক্ষা না করে হন-হন করে হাঁটতে লাগল ফুটপাত দিয়ে।

এ কি করে হল ? ট্যাক্সীড্রাইভারটা কি ভগবান ? না হলে কোলকাতার এত জায়গা থাকতে এখানে নিয়ে এল কেন তাকে ? বীরেন্দ্রনাথ দেখল গত দশ বছরে রিপন লেন একটুও পাল্টায় নি। সেই ময়লা জমা ডাস্টবিন, চারধারে কেমন নোংরা অগোছালো ভাব। এমন কি মোড়ের মাংসের দোকানেও এই রাত্রে সেই রকম শুকনো মাংস ঝুলছে। বীরেন্দ্রনাথ বুক ভরে নিঃশ্বাস নিল। এই রাস্তায় তার ছেলেবেলা কেটেছে। দশ বছর আগে এই রাস্তা দিয়ে

সে চোরের মতো পালিয়ে গিয়েছিল।

আর একটু এগোলেই সেই গলিটা দেখতে পেল সে। স্যার টমাস লেন। কে এই স্যার টমাস কে জানে। অনিতা বলতো ওর ঠাকুরদার খুব বন্ধু ছিল নাকি লোকটা। অনেকে বলত ব্যাপারটা নাকি স্রেফ ব্লাফ। অনিতা অবশ্য সব কথাই একটু বাড়িয়ে বলতে ভালবাসতো। এ পাড়ার ছেলেদের কাছে অনিতা ছিল ফিল্মের হিরোইন। রোজ রোজ পোশাক পাল্টাতো। ওর সঙ্গে হাঁটতে পারলে সবার বুক ফুলে যেত।

গলির মুখে মড়া শোওয়ানোর দোকানটা একই রকম আছে। বুড়ী ফার্ণাণ্ডেজ কি এখনও বেঁচে আছে? কৌতূহলে ভেতরে ঢুকল বীরেন্দ্রনাথ। গেটের ওপর সাদা অক্ষরে লেখা আছে, ঈশ্বর কখন আসবেন জানি না তাই দিনরাত অপেক্ষায় আছি। অর্থাৎ এই কফিন বিক্রির দোকানটা সারা দিন সারা রাত খোলা থাকে। সিঁড়ির ওপরে উঠতেই পরিচিত দৃশ্যটা দেখতে পেল সে। একটা বেতের চেয়ারে বসে টেবিলের ওপর ঝুঁকে পড়ে পেশেন্স খেলছেন মিসেস ফার্ণাণ্ডেজ। বিশাল থমথমে শরীর যাতে একটুও না দেখা যায় তাই অনেকটা কাপড় লাগে তাঁর স্কার্টের জন্যে। চোখে পুরু লেন্সের চশমা, চামড়া ঝুলে গেছে। বুড়ীর বয়স একশও হতে পারে। পায়ের শব্দ পেয়ে বুড়ী চোখ তুলল, 'কে? অ! কফিন চাই? কে মারা গেল, কোন্ পাড়ার?'

হেসে ফেলল বীরেন্দ্রনাথ। যার নিজের অনেকদিন আগেই কফিনে শোও-য়ার কথা সে এখনও কফিন বিক্রি করছে।

বীরেন্দ্রনাথ চাপা গলায় ডাকল, 'আণ্টি!'

'হু দি হেল য়ু আর! আমি তোমার আণ্টি হতে যাব কোন্ দুঃখে। আমাকে মিসেস ফার্ণাণ্ডেজ বলে ডাকতে পারছ না?' খেঁকিয়ে উঠল বুড়ী।

'আণ্টি আমি বীরেন।' বাকী সিঁড়ি কটা ধীরে ধীরে ডিঙিয়ে সামনে এসে দাঁড়াল সে, 'আমাকে চিনতে পারছ না আণ্টি?'

প্রথমে বিরক্তি তারপরে উৎসুক হয়ে তাকাল এবং শেষ পর্যন্ত ফোকলা মুখে হাসি ছড়াল, 'ও মাই লর্ড', বীরেন, তুমি, হায় আমি কি ঠিক দেখছি!' দ্রুত হাতে চশমা খুলে চোখ রগড়ে নিলেন মিসেস ফার্ণাণ্ডেজ। তারপর উজ্জ্বল মুখে বললেন, 'কবে এসেছ, কোথায় উঠেছ?'

বীরেন বলল, 'আজকে এসেছি। কেমন আছ তুমি?'

'আমি? ফাইন! এখনও কফিন সিলেক্ট করে রাখি নি। আঃ বীরেন, তোমাকে কত দিন পরে দেখলাম। শুনেছি তুমি নাকি এখন খুব বিখ্যাত জকি হয়েছ। প্রচুর টাকা রোজগার করছ। লোকে বলে তুমি নাকি তোমার নামের সঙ্গে ব্যবহার পর্যন্ত চেঞ্জ করে ফেলেছ। ইনভিটেশনে দৌড়তে আসছ বলে স্টেটসম্যান লিখছে। তাই?'

'হ্যাঁ।'

হঠাৎ ঝুঁকে পড়লো বুড়ী টেবিলের ওপর। তিন চারটে বই উল্টে একটা

হালকা রঙের রেসের বই বের করে সামনে এগিয়ে ধরলো, 'তুমি জানো আমি আড়াই টাকার বেশী রেস খেলি না। কিন্তু তুমি যখন এবার ইনভিটেশনে রাইড করছ তখন পাঁচ টাকা খেলব। কোন্ ঘোড়াটা জিতবে বলে দাও।'

বীরেন্দ্রনাথ অনেক কষ্টে বায়রণকে চেপে রাখল, 'আমি জানি না জিতবো কিনা তবে প্রিন্সকে চালাব আমি।'

'প্রিন্স?' বই খুলে একটা লাল পেন্সিলের গোল দাগ দিল বুড়ী, 'পল রোজারিওর ঘোড়া! বীরেন তোমাকে জিততেই হবে বুঝলে! আমি পাঁচ টাকা খেলব, দেখো যেন হেরে না যাই!'

বীরেন্দ্রনাথের এই সমস্ত কথা আর ভাল লাগছিল না। সে প্রসঙ্গ ঘোরাতে চাইল, 'আর সব খবর কি বল!'

'খবর? নাথিং নিউ। আমার নাতি এখন অস্ট্রেলিয়ায় আছে। কলকাতায় আমি একা পড়ে রয়েছি। একা এই বিজনেস দেখতে পারি না বলে একটা ছোকরাকে পার্টনার করেছি। ব্যাটা এক নম্বরের বদমাশ।'

'পাড়ার খবর?'

'ওফ্, পাড়ার খবর আর জিজ্ঞাসা করো না। এ পাড়ার সব ক'টা ছেলে জোচ্চর আর প্রত্যেকটা মেয়ে—।' মুখ বাঁকালো বুড়ী।

'ওয়েল, আমি আসছি।' বীরেন নামবার জন্যে ঘুরে দাঁড়াল।

বুড়ী বলল, 'ওহো, তুমি বসলে না, এত রাত্রে বসতে বলিই বা কি করে! তাহলে প্রিন্স যেন জেতে, নাহলে, ইউ নো, আজকালকার বাজারে পাঁচ টাকার কি দাম!'

মাথা নেড়ে বেরিয়ে এল বীরেন্দ্রনাথ। শালা। সব জায়গায় একই ধান্দা। তাকে দেখলেই সবার ঘোড়ার কথা মনে পড়ে। অথচ এককালে এই বুড়ী তাদের কত রকম গল্প শোনাতো। কত সুন্দর দিন কেটেছে এখানে। বুড়ী রেস খেলবে। ঘরে বসে পেন্সিলারের কাছে পাঁচ আনা, দশ আনা দিত। এটা নিয়ে ওরা ঠাট্টা করত এক সময়। এ-পাড়ার অনেকেই রেস খেলে। রেসের মাঠে না গিয়েও রেস খেলা যায়। এপাড়ায় তখন তিনজন পেন্সিলার ছিল। তারা ঘরে ঘরে ঘুরে ওই রকম পয়সা তুলে বুকির কাছে জমা দেয়। পেমেন্ট হলে তারাই এদের কাছে পৌঁছে দেয়। এদের কোন লাইসেন্স নেই, পুলিশ মাঝে মাঝেই এদের ধরে আবার ছেড়েও দেয়। আজ বুড়ী তাকে এতদিন বাদে দেখল অথচ অন্য কথা না বলে ঘোড়ার টিপ চাইল।

বিরক্ত হয়ে গলিতে ঢুকল বীরেন্দ্রনাথ। মোড়ে দুটো রিক্সা দাঁড়িয়ে ঠুন ঠুন শব্দ করছে। বীরেন্দ্রনাথ জানে ওই ঢাকা রিক্সায় দুটো মেয়েছেলে বসে আছে। রিক্সাওয়ালা খদ্দের যোগাড় করে ওই রিক্সায় ঢুকিয়ে কোন খালি-কুঠিতে নিয়ে যায়। স্যার টমাস লেনের এই ছবিটা বাল্যকাল থেকে দেখে এসেছে বীরেন। দিনের বেলায় আর পাঁচটা রাস্তার মতো নিরীহ, রাত ঘন হলেই এই দৃশ্য। বীরেনকে দেখে রিক্সায় ঘণ্টি বাজলো। সে চুপচাপ ভেতরে ঢুকে এল। অনিতাদের বাড়ির সামনে এসে একটু থমকে দাঁড়াল সে। স্টিরি-

ওতে ইংরেজী গান বাজছে। তিন চারটে গলা চিৎকার করে সেই সঙ্গে তাল দিচ্ছে। বীরেন আর একটু এগোল। লাইটপোস্টের গা ঘেঁষে সেই ছোট্ট বাড়িটার সামনে এসে ওর শরীরে এক ধরনের কাঁপুনি এল। দু' একজন মানুষ রাস্তা দিয়ে চলাফেরা করছে। ওর অস্তিত্ব কেউ লক্ষ্যই করছে না। বাড়িটার দরজা বন্ধ। দশ বছর আগে তাকে বাড়ি থেকে মাথা নীচু করে বেরিয়ে যেতে হয়েছিল। জামাইবাবু সেদিন চিৎকার করে উঠেছিল, 'গেট আউট, আভি নিকলো। একটা পয়সা রোজগার করার ক্ষমতা নেই আবার বড় বড় কথা। জকি হয়েছ! একটাও রেস যে জিততে পারে না সে আবার জকি! তার চেয়ে সহিস হলে মাস মাইনে ঘরে আসতো।'

দিদি বলেছিল, 'ছেড়ে দে, ছেড়ে দে ওসব। তোকে পেট পুরে খাইয়ে এত বড় করলাম তার বদলে একটা পয়সাও দিবি না। অন্য চাকরী-বাকরী দ্যাখ।' জামাইবাবু বলেছিল, 'আমি কোন কথা শুনতে চাই না। কাল ও বলেছিল ব্ল্যাক মুন জিতবে। অথচ আজ দেখলাম ট্রাই করা দূরের কথা একটা চাবুক মারল না। আমাকে টাকা দেবার বদলে আমার পঞ্চাশ টাকা বেটিং জলে গেল। নো, আর সহ্য করতে রাজী নই আমি। তুমি আমার বাড়িতে আর থাকতে পারবে না।'

সেই মুহূর্তে সে জামাইবাবুকে বলতে পারতো এই বাড়িটা আমার বাবার। আপনি দিদিকে বিয়ে করে ওর অধিকারী হয়েছেন। হ্যাঁ, মা বাবা মারা যাওয়ার সময় সে সত্যি খুব ছোট ছিল। দিদি জামাইবাবু তাকে খাইয়েছে পরিয়েছে। সেদিন এই বাড়ি থেকে চলে যাওয়ার সময় দিদি কিন্তু এক ফোঁটা চোখের জল ফেলে নি। তারপর দশ বছর কেটে গেছে। দশ বছরে সে দিদির কাছ থেকে অনেক চিঠি পেয়েছে। ভগ্নীরা বড় হয়েছে তারা নাকি তাদের মামাকে দেখতে চায়। কিন্তু একটা চিঠিরও জবাব দেয় নি বীরেন্দ্রনাথ। অপমানের জ্বালা মেটাতে প্রতি মাসে সে মোটা মোটা টাকা পাঠিয়ে গিয়েছে শুধু। একবার জামাইবাবু বোম্বের ফ্ল্যাটে গিয়ে হাজির হয়েছিল। সেদিন তার সঙ্গে দেখা না করে অদ্ভুত শান্তি পেয়েছিল সে।

রিক্সার শব্দে চমক ভাঙলো বীরেন্দ্রনাথের। জড়ানো গলায় কেউ একজন রিক্সাওয়ালাকে থামতে বলছে। মাতাল লোকটিকে এক পলকেই চিনতে পারল সে। জামাইবাবু প্রায় আউট অবস্থায় বাড়ি ফিরছে। বীরেন্দ্রনাথ আর দাঁড়াল না। হন হন করে স্যার টমাস লেন থেকে বেরিয়ে এল। না, দিদির সঙ্গে আর দেখা করবে না সে। ওই বাড়িতে না ঢোকার যে প্রতিজ্ঞা করেছিল তা ক্ষণিকের দুর্বলতায় ভেঙে ফেলার কোন যুক্তি নেই। না, সত্যিই আর দুর্বল হলে চলবে না। যে বদলা নেবার জন্যে এতদিন সে অপেক্ষা করেছে সেটা মিইয়ে যেতে পারে তাহলে। রিপন লেন থেকে একটা ট্যাক্সি নিল বীরেন্দ্রনাথ। ড্রাইভারকে বলল, 'আলিপুর চলো।'

লোকটা একটু গাঁইগুঁই করে বলল, 'পাঁচ টাকা এক্সট্রা লাগবে।'

ঘাড় নাড়ল বীরেন্দ্রনাথ, তাই হবে, পাঁচ টাকার আজ কোন মূল্য নেই

তার কাছে।

স্যার টমাস লেনে থাকে না এমন জাত নেই। তবে এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান পরিবারের সংখ্যাই বেশী। বাঙালী হিন্দু বলতে ওই এক ঘর। কি করে ওই পাড়ায় বীরেন্দ্রনাথের বাবা বাড়ি পেয়েছিলেন কিংবা এসেছিলেন তা সে জানে না। কিন্তু বন্ধু-বান্ধব বলতে ছেলেবেলা থেকেই ও মিশত অ-বাঙালীদের সঙ্গে, এছাড়া উপায়ও ছিল না। মনে পড়ে একমাত্র বিজয়া দশমীর দিনেই বুঝতে পারত যে ওরা হিন্দু। এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান স্কুলেই পড়াশুনা শুরু হয়েছিল, কথাবার্তা আদব-কায়দায় ওদের ছাপ পড়েছিল খুব। মা গিয়েছিল আগেই, দিদির বিয়ে দিয়ে ঘরজামাই করে বাবা চলে গেল এক সময়। তখন বাড়িতে খুব তোয়াক্কা ছিল তার। জামাইবাবুকে ঠিক বাঙালী বলে মনে হতো না কিন্তু বাঙালী টাইটেল ছিল। কি একটা দালালী করত তখন। প্রচুর পয়সা পেত। আর রেস খেলত। প্রতি রবিবার ইলিয়ট রোডের এণ্টনীর বাড়িতে যেত জামাইবাবু। বেড়াবার নাম করে তার সঙ্গ ধরত বীরেন। তখন তার কত বয়স আট দশ হবে। এণ্টনীর তখন খুব নাম ডাক। রেসের জকি ছিল লোকটা। ওকে দেখে তখন স্বপ্নের রাজা বলে মনে হতো। কত লোক আসছে, খাতির করছে। জামাইবাবুকে বোধহয় খুব একটা পাত্তা দিত না লোকটা। কিন্তু ওকে দেখার পর এণ্টনী খুব আদর করত কাছে ডেকে। ক্যাডবেরী খেতে দিত। জামাইবাবু যেই বুঝল যে তাকে এণ্টনী পছন্দ করে তখন থেকে তাকে না নিয়ে সে রবিবারে বের হতো না। পরে বুঝেছে, জামাই-বাবু ওখানে যেত রেসের টিপ নিতে। জিতলে এণ্টনীকে কিছু ভেট দিয়ে আসতো। একটু একটু করে সে এণ্টনীর খুব প্রিয় হয়ে গেল। এণ্টনীর বউ তাকে ভেতরে নিয়ে গিয়ে কত কি খাওয়াতো। ওদের কোন ছেলেমেয়ে ছিল না। এণ্টনীকে দেখতে দেখতে এক সময় হঠাৎ ইচ্ছেটা মাথা চাড়া দিল। সে বড় হয়ে রেসের জকি হবে। মাথায় চিন্তাটা আসামাত্র পড়াশুনা থেকে মন গেল। তখনও সে ঘোড়দৌড় দ্যাখেনি। এণ্টনীকে বললে সে বলত, 'বাচ্চাদের ওখানে ঢোকা নিষেধ।'

আর একটু বড় হলে সে নিজেই চলে যেত এণ্টনীদের বাড়ি। তখন জামাই-বাবু তাকে তাতাতো, 'তোকে এত ভালবাসে ও, জিজ্ঞেস কর তো কোন্ ঘোড়াটা পরের দিন জিতবে!' এই প্রশ্নটা সে কোনদিন করতে পারে নি এণ্টনীকে। ওই বয়সেই বুঝে গিয়েছিল এটা করা খুব অন্যায় হবে। এণ্টনী হয়তো রেগে যেতে পারে। কিন্তু তার সামনেই এণ্টনী বউ-এর সঙ্গে ঘোড়া নিয়ে আলোচনা করত। তা থেকে শুনে শুনে নিজে বানিয়ে সে জামাই-বাবুকে ঘোড়ার কথা বলত। তাতে হল আর এক মুশকিল। জামাইবাবু এণ্টনীর বাড়িতে যাওয়া বন্ধ করে দিল। জিতলে ভেট দিতে হতো, শালার মুখে যদি খবরটা পাওয়া যায় তাহলে ওই খরচটা বেঁচে যাবে। প্রতি সপ্তাহে ঠিকঠাক বলতে পারত না সে, কিন্তু জামাইবাবু তা নিয়ে ওকে কিছু বলত না। শুধু রেসের রাত্রে দমভর মাল টেনে এসে দিদিকে জড়িয়ে কাঁদতো!

সামনের একটা গাড়ি হেডলাইট জ্বালিয়ে আসাতে ট্যাক্সি ড্রাইভার রেগে গিয়ে খিস্তি করাতে বীরেন্দ্রনাথ সজাগ হল। দিদিটা এখন কেমন আছে কে জানে! জামাইবাবুর সঙ্গে এতকাল থাকল দিদি, কতটা সুখ পেল! মানুষ কখন কিভাবে সুখ পায় কে জানে! না দেখা করে ভালই হয়েছে। দিদি যদি তাকে কতগুলো আদুরে কথাবার্তা শোনাতো তাহলে কি তার ভাল লাগতো? মনে পড়তো না সেই বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে যাওয়ার দিনটার কথা। সোজা হয়ে বসতে গিয়ে বীরেন্দ্রনাথের নজরে এল দূরে আলোয় সাজানো বাড়িটা। নিজের অজান্তেই সে ট্যাক্সি ড্রাইভারের দিকে ঝুঁকে বলল, 'এই যে ভাই, ট্যাক্সিটা একটু থামান তো।'

লোকটা হঠাৎ যেন শক্ত হয়ে গেল, 'কেন? এখানে থামাবো কেন?'

'আমি একটু দেখতে চাই।'

'কি দেখবেন? জায়গা ভাল নয়।'

'বেশ, তাহলে ডানদিকে ঘুরুন। রেসকোর্সটাকে একটা পাক দিয়ে তারপর আলিপুরে যাবেন।' বীরেন্দ্রনাথ বুঝতে পারছিল লোকটা তাকে সন্দেহ করছে। ছিনতাইকারী বলে ভাবছে হয়তো। তারপর একটু দোনামনা করে ড্রাইভার গাড়িটাকে ক্যাসুরিনা এভিন্যুতে নিয়ে এল। বাঁ দিকেই রেসকোর্স, মাঝখানে একটা লোহার রেলিং। আটশ হাজার বারোশ চোদ্দশ মিটার বোর্ডগুলো চোখে পড়ল বীরেন্দ্রনাথের। ট্রাম লাইন ধরে আবার হেস্টিংসের মোড় অবধি গিয়ে ট্যাক্সি ড্রাইভার বামদিকে ঘুরতেই প্রায় জোর করেই গাড়িটাকে দাঁড় করালো বীরেন্দ্রনাথ। তারপর স্খলিত পায়ে হেঁটে গেল মাঠের রেলিং পর্যন্ত। চুপচাপ কবরখানার মতো পড়ে আছে বিশাল রেসকোর্স। পুরো মাঠটা অন্ধকারে ডোবা শুধু ক্লাব-হাউসটার ওপর আলোর ফোয়ারা। এই বিখ্যাত রেসমাঠে সে ঘোড়ায় চেপেছিল দশবছর আগে। পরাজিত ঘোড়ার সওয়ার। এই মাঠের প্রতিটি ঘাস সে চেনে, মাটির শরীর জানে। বাঁকগুলোয় কখন কিভাবে ঘুরলে কম জায়গা লাগবে, ওয়াইড হয়ে যাবে না। এসব তার নখদর্পণে ছিল। বীরেন্দ্রনাথের খুব ইচ্ছে করছিল একবার এই মাঠের বুকে ঘুরে বেড়াতে। এই রাতের রেসকোর্সে হাঁটতে পারলে তার সুখ হতো। কিন্তু সেটা সম্ভব নয়, প্রহরীরা কিছুতেই অনুমতি দেবে না। অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে সেই দৃশ্যটা চোখে ভাসল। শেষ রেস হয়ে গেছে। পরাজিত ব্ল্যাক মুনে বসে সে মাথা হেঁট করে ফিরছিল। কারণ তখন মাঠের হাজার হাজার দর্শক তাকে অকথ্য গালিগালাজ করছে। কেউ কেউ ঢিল ছুঁড়ছে তার দিকে। চোর, চিট ইত্যাদি গালি চোখ বন্ধ করে শোনা ছাড়া কোন উপায় ছিল না। ঘোড়া থেকে নামতেই ট্রেনারের গলা শুনতে পেয়েছিল, 'কি হল, তুমি অত পেছিয়ে গেলে কেন? হোয়াই।'

সবাইকে শুনিয়ে জিজ্ঞাসা করে চাপাগলায় বলেছিল, 'স্টুয়ার্ডরা জিজ্ঞাসা করলে বলবে ঘোড়া রেসপন্স করে নি।' সবটাই সাজানো, তাই স্টুয়ার্ডদের এই কথা বলেও কোন লাভ হয় নি। তিনমাসের জন্যে তাকে সাসপেন্ড

করেছিল স্টুয়ার্ডরা। ওই শেষ রাইডিং, ঠিক দশ বছর আগে। হঠাৎ হাউ হাউ করে কেঁদে উঠল বীরেন্দ্রনাথ। অন্ধকার নির্জন রেসমাঠের দিকে তাকিয়ে সে এই মুহূর্তে আর কিছুই দেখতে পেল না। চোখের জলের আড়াল বড় কঠিন।

টেলিফোনটা বাজতেই ঘুম ভেঙে গেল। এখনো ভোর হয় নি। হাত-ঘড়ি উল্টে দেখল বায়রণ। ঠিক চারটে চল্লিশ। কোকিলটা ডেকেই চলেছে। হাত বাড়িয়ে রিসিভারটা তুলতেই পলের গলা শোনা গেল, 'গুড মর্নিং বায়রণ। আধঘণ্টার মধ্যে রেডি হয়ে নাও।'

'মর্নিং। কিন্তু ভাবছি আজ সকালে মাঠে যাব না। শরীরটা ঠিক—।'

পল রোজারিও প্রায় চেঁচিয়ে উঠল, 'সে কি? কাল রেস আর আজ তুমি ঘোড়াগুলোকে একটু দেখে নেবে না? কি হয়েছে তোমার?'

'বললাম তো, ভাল লাগছে না। তোমাদের ঘোড়া তো বেশ ভাল। ও ঠিক ম্যানেজ হয়ে যাবে, চিন্তা করো না।'

'কিন্তু বায়রণ, এটা ছেলেমানুষী করার সময় নয়। তুমি ভারতবর্ষের সেরা বাজী দৌড়তে যাচ্ছ, নো জোক! ঠিক আছে আমি আসছি।' পল রিসিভার রেখে দিল। বালিস আঁকড়ে ধরে হাসল বায়রণ। দশ বছর আগে তার সাহস হতো না ট্রেনারকে এইরকম কথা বলার। তখন ট্রেনার তাকে ফোন করা দূরের কথা রাত থাকতে সে হাজির হতো আগে-ভাগে। কিন্তু দিন পাল্টে গেছে। এখন এদের তাকে তোয়াজ করতে হবে। হ্যাঁ, শরীরটা একটু ভারী ভারী লাগছে তার। কাল যখন রাত্রে এই রেস্ট হাউসে ফিরেছিল তখন রাত প্রায় সাড়ে বারোটা হবে। ট্যাক্সিওয়ালাকে নিয়ে জায়গাটা চিনতে বেশ অসুবিধে হয়েছিল তার। মোটা বকশিশ দিয়ে তাকে বিদায় করে সে গেটের কাছে এসে দেখল দরোয়ানটা দাঁড়িয়ে আছে। ওকে দেখে সেলাম করে গেট খুলে দিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকল লোকটা। যেন কিছুই হয় নি এমন ভঙ্গীতে প্রবেশ করেছিল বায়রণ। বীরেন্দ্রনাথ সেন ততক্ষণে মুখ লুকিয়ে ফেলেছে। এখন সে পুরোদস্তুর বায়রণ সেইন। দূরে রেস্টহাউসটাকে রহস্যপুরীর মতো মনে হচ্ছে আবছা অন্ধকারে। শিস দিতে দিতে বায়রণ গাড়ি-বারান্দার তলায় এসে দেখল কেউ নেই কোথাও। ভারালু কিংবা তার কর্মীবাহিনীর কাউকে দেখা যাচ্ছে না। ডানদিকে ভারালুর ঘরের দরজা পর্যন্ত বন্ধ। সে একটু সন্দিগ্ধমনে হলে ঢুকল। ব্যাপারটা কি? বেরুবার সময় এত পাহারাদার, এত কড়াকড়ি আর এখন চারধার জনমানবশূন্য কেন? ওর না বলে চলে যাওয়ার খবর নিশ্চয়ই শর্মা এণ্ড শর্মায় ঠিকসময়ে পৌঁছেছে। তাহলে? ওরা তাকে কিছু না বলে ছেড়ে দেবে? অস্বস্তি হচ্ছিল বায়রণের। নিজের ঘরের দরজা খুলে ভেতরে ঢুকে দেখল এর মধ্যে কেউ এসে ঘরটাকে পরিচ্ছন্ন করে রেখে গেছে। মদের বোতল গ্লাসগুলো নেই এবং ডলি নাজিরের শরীরটাকে সরিয়ে ফেলা হয়েছে। যাক, বাঁচা গেল। মেয়েটার কথা তার এতক্ষণে মনে পড়ল। এখন একটু ঘুম দরকার তার। বাথরুম থেকে ঘরে আসামাত্র ইন্টারকমে গলা ভেসে

এল। ভারাল্‌ বলছে, 'স্যার, ডিনার সার্ভ করতে বলব ?'

যেন কিছুই হয় নি, কোন ব্যতিক্রম হয় নি এমন ভঙ্গীতে প্রশ্ন করল লোকটা।

ক্ষুধাবোধটা উধাও হয়ে গিয়েছিল শরীর থেকে। এত রাত্রে আর খেতে ইচ্ছে করছিল না। সে কিছু দিতে হবে না জানিয়ে দিয়ে আলো নিভিয়ে দিল। তারপর কখন ঘুমিয়ে পড়েছে সে জানে না।

পলের টেলিফোন পাওয়ার পর তার আর ঘুম আসছিল না। না, শরীর তার খারাপ নয় শুধু একটু আলসেমি লাগছে। কাল রাত্রের নানারকম উত্তেজনা হয়তো শরীরটাকে আলসে করে তুলেছে এখন। পল আসছে, পলকে তো সে কাটিয়ে দিতে পারে। একজন নামকরা জকি তো নানান বায়না করে এবং সেগুলোকে ট্রেনাররা শুনতে বাধ্য হয়। দশ বছর আগে পল রোজারিও সবে ট্রেনারশিপ পেয়েছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাকে কোনদিন রাইডিং দেয় নি। লোকটাকে সেসব কথা মনে করিয়ে দিলে কেমন হয় ? এণ্টনী এখনও ক্যালকাটা কোর্সে রাইড করছে। পঞ্চাশ পেরিয়ে গেছে লোকটা। শুনেছে বছরে একটা দুটো উইনিং হর্স পায়। কাল পরশুর বড় বাজিগুলো নিশ্চয়ই এণ্টনী রাইড করার সুযোগ পাবে না। আজ সকালে মাঠে গেলে লোকটার সঙ্গে দেখা হলেও হতে পারে।

এক দুপুরে এণ্টনী শোফায় শুয়ে নভেল পড়ছিল। দশ বছরের বীরেন্দ্রনাথ তার পাশে গিয়ে বসল। বই থেকে চোখ সরিয়ে এণ্টনী জিজ্ঞাসা করেছিল 'কি হয়েছে. কেউ কিছু বলেছে ?'

'নো।' মাথা নেড়েছিল বায়রণ।

'তাহলে মুখ গম্ভীর কেন ? স্কুলে যাওনি ?'

'ছুটি হয়ে গেল।'

'তাহলে ভেতরের ঘরে চলে যাও। তোমার জন্যে ফ্রিজে খাবার রাখা আছে।' আবার বইতে চোখ রেখেও এণ্টনীর মনে হয়েছিল ছোঁড়াটা খাবারের লোভেও নড়ছে না। একটু অবাক গলায় জিজ্ঞাসা করেছিল, 'কি হয়েছে ?'

মুখ নীচু করে খুব ধীর গলায় কথাটা বলে ফেলল বীরেন্দ্রনাথ, 'আমি ঘোড়ায় চড়া শিখতে চাই।'

মজা পেয়েছিল এণ্টনী, 'ঘোড়ায় চড়া শিখবে ? বেশ তো। বিকেলে ভিক্টোরিয়ার পাশে চলে গেলে শেখা যাবে। ঠিক হ্যায়, নেক্সট সানডে।'

'না, ওইসব ঘোড়া না। আমি জকি হবো।'

সঙ্গে সঙ্গে উঠে বসেছিল এণ্টনী। তারপর ছোট ছোট চোখে অবাক হয়ে বীরেনকে দেখেছিল। রোগা ছেলেটার চেহারায় জকি হবার গুণগুলো মিলিয়ে দেখতে দেখতে বলেছিল, 'ইটস ভেরি টাফ, খুব শক্ত প্রফেসন। তুমি সহ্য করতে পারবে না।

'পারব।'

ঠিক সেইসময় এণ্টনীর স্ত্রী ঘরে ঢুকেছিল। এণ্টনী চিৎকার করে তাকে

বলেছিল, 'শোন, আওয়ার লিট্‌ল হিরো কি বলছে। ও জকি হতে চায়।'

সঙ্গে সঙ্গে ঝাঁঝিয়ে উঠেছিল মিসেস এণ্টনী, 'নো নেভার। ভুলেও ও কথা উচ্চারণ করো না। জকিদের মতো আনসার্টেন লাইফ কারো নেই।'

এণ্টনী মাথা দুলিয়ে বলেছিল, 'শুনলে তো!'

মুখ শক্ত করে বীরেন আবার বলল, 'আমি জকি হব।'

কদিন ধরে এইরকম টানাপোড়েন চলল। বালক বীরেন বুঝতে পারছিল যে মিসেস এণ্টনী যতই রাগ করুন এণ্টনী কিন্তু মনে মনে একসময় নরম হয়ে আসছে। সেও চাইছে বীরেন জকি হোক।

জকি হতে গেলে দীর্ঘসময় প্রস্তুতি নেওয়া দরকার। এখন বিভিন্ন সেণ্টারে জকিদের ট্রেনিং স্কুল হয়েছে। সেখানে কোর্স কমপ্লিট করে পরীক্ষা দিয়ে পাশ করে কোন ট্রেনারের সঙ্গে ব্যবস্থা করতে হয়। এণ্টনীরা সেই সুযোগ পায় নি। বেশিরভাগ অবস্থাপন্ন জকির ছেলেই এই প্রফেসনে আসে। তারা এখানে হাতেখড়ি নিয়ে বিদেশে যায় ট্রেনিং নিতে। বিভিন্ন টার্ফ ক্লাব তাদের নাম রেজেস্ট্রি করার সময় নানারকম কায়দায় বাজিয়ে নেয়।

এণ্টনীর সঙ্গে সে প্রথম যে দিন রেসকোর্সে এসেছিল সেদিনটা তার এখনও স্পষ্ট মনে আছে। বিকেল তিনটে। এণ্টনীর চেহারা ছিল রোগাটে এবং পাঁচফুটের মতো উচ্চতা। হেস্টিংস-এর দিক থেকে বিরাট গেট পেরিয়ে কাঁচা রাস্তা দিয়ে ওরা ঢুকেছিল। এণ্টনী বলছিল, 'এটা মেম্বারস এনক্লোজার। ওইটে প্যাডক। রেস শুরু হবার আগে আমরা ওখান থেকে ঘোড়ায় চাপি।' দুচোখ ভরে দেখছিল বীরেন। লম্বা লম্বা গাছ ছায়া ফেলেছে, ছবির মতো বাড়ি চারধারে, পায়ের তলায় সবুজ ঘাসের গালচে বিছানো। বালকের চোখে যেন স্বপ্নপুরীর মতো মনে হচ্ছিল। সেদিন রেস ছিল না। চারধার ফাঁকা। এণ্টনীর সঙ্গে হাঁটতে হাঁটতে মাঠের দিকে এল সে। ডান দিকে বিরাট গ্যালারী। পর পর তিনটে। সামনে বিরাট রেস ট্র্যাক। দীর্ঘ মাঠটা গোল হয়ে ঘুরে এসেছে। বীরেন দেখল, একটা নয় দুটো ট্র্যাক পাশাপাশি রয়েছে। এণ্টনী বলেছিল, 'দিস ইজ রেসকোর্স। তুমি যদি কখনও জকি হও এই মাঠ তোমাকে খাওয়াবে। তাই এই মাঠের প্রতিটি ঘাসের কাছে তুমি সবসময় কৃতজ্ঞ থাকবে। ওই হল উইনিং পোস্ট। ওটা আগে পার হবার স্বপ্ন যেন সবসময় তোমার থাকে। অবশ্য—।' আর একটা কি কথা বলতে গিয়ে যেন বলল না এণ্টনী। বালক বীরেন্দ্রনাথ তখন বুঝতে পারে নি এবং প্রশ্নও করে নি।

এণ্টনীর সঙ্গে খাতির ছিল ডিকসন সাহেবের। এককালে খুব ভাল জকি ছিলেন ভদ্রলোক। রিটায়ার করে ট্রেনার হয়েছেন। এণ্টনীর মুখে প্রস্তাবটা শুনে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকলেন তিনি বীরেন্দ্রনাথের দিকে। ওঁর স্টেবলের ঘোড়াগুলোকে তখন সাহসরা পরিচর্যা করছে। সামনে সেদিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে ডিকসন বললেন, 'ওই ঘোড়াটা দেখছ, কুচকুচে কালো, ওটার পিঠে উঠে বসো।'

বীরেন্দ্রনাথ সেই দিকে তাকাল। বিরাট একটা ঘোড়া খুঁটির সঙ্গে বাঁধা রয়েছে। মুখ নীচু চোখ বন্ধ করে মাঝে মাঝে লেজ নাড়ছে। ঘোড়াটা এত উঁচু যে দশ বছরের বীরেন তার নাগাল কিছুতেই পাবে না। কিন্তু ওর গায়ের রঙ এত ঘন কালো যে শরীর থেকে জেল্লা বের হচ্ছে। ডিকসন ওটাকে দেখানো মাত্র এণ্টনীর মুখ থেকে চাপা আর্তনাদ বেরিয়েছিল। হাত তুলে তাকে থামিয়ে দিয়ে ডিকসন বলেছিল, 'গো !'

এর আগে মাত্র দুদিন ঘোড়ায় চেপেছে বীরেন্দ্রনাথ। ওই ভিক্টোরিয়ার পাশে দুই রবিবার বিকেলে এণ্টনীর সঙ্গে এসে আট আনা পয়সা দিয়ে হাড় জিরজিরে ঘোড়াগুলোতে বসে রাস্তার পাশ ধরে হেঁটেছে। হাজার চেষ্টা করেও ঘোড়াগুলোকে ছোটাতে পারে নি। প্রথম ঘোড়ায় ওঠার উত্তেজনাটা একসময় নেতিয়ে এসেছিল। কিন্তু ঘোড়ার গায়ের গন্ধটা শরীরে লেগেছিল। ডিকসনের দ্বিতীয়বার হুকুম হওয়ামাত্র সে ধীরপায়ে এগিয়ে গেল ঘোড়াটার দিকে। ব্যাপারটা স্টেবলের আরো অনেকের নজরে পড়েছিল। দেখা গেল সবাই যে যার কাজ ফেলে হাসিচাপা মুখে জড়ো হচ্ছে একটা মজা দেখার জন্যে। বীরেন্দ্রনাথের সেদিকে লক্ষ্য নেই। সে ঘোড়াটার সামনে দাঁড়িয়ে ওকে খুঁটিয়ে দেখতে লাগল। তার চার ফুট শরীরটার কাছে ঘোড়াটাকে দৈত্যের মতো মনে হচ্ছিল।

এণ্টনীর গলা ভেসে এল, 'ডিক, এটা কি করছ ? ও মারা যাবে। ওই পাগল ঘোড়াটা ওকে মেরে ফেলবে।'

ডিকসন কোন জবাব দিল না, নিষেধও করল না। বীরেন্দ্রনাথ দেখছিল ঘোড়াটা ধীরে ধীরে মুখ তুলে ওর চোখে চোখ রাখল। তাকে সন্দেহ করছে যেন ঘোড়াটা। একটু একটু করে মাথা দোলাচ্ছে, লেজ স্থির। ওই বয়সে বীরেন্দ্রনাথ এটুকু বুঝেছিল ঘোড়াটা খুব রাগী। সে আর একটু এগোলো। ঘোড়াটা বাঁধা অবস্থায় এক পা পিছলো তারপর আচমকা চিৎকার করে দুই পা আকাশে ছুঁড়ে তিন চারবার লাফিয়ে দড়িটা ছেঁড়বার চেষ্টা করল। এই প্রথম ঘোড়ার চিৎকার শুনল বীরেন্দ্রনাথ। মনে হল ভয়ে বুক থেকে কলজেটা যেন ছিটকে বেরিয়ে আসছে। ঘোড়াটা লাফিয়ে ওঠার সময়েই সে নিজের অজান্তে অনেকটা দূরে ছিটকে পড়েছিল। একটু সামলে নিতেই সমবেত উচ্চহাস্য শুনতে পেল। স্টেবলের সমস্ত মানুষ হো হো করে হাসছে। একসঙ্গে ভয় এবং লজ্জা নিয়ে উঠে দাঁড়াল বীরেন্দ্রনাথ। ঘোড়াটা অত কাণ্ড করে ততক্ষণে আবার চুপচাপ দাঁড়িয়ে পড়েছে। তার চোখ এখন বীরেনের ওপর স্থির। ডিকসনের গলা শুনতে পেল সে, 'প্রথম চান্স মিস করলে, ট্রাই এগেন।'

কাঁপুনি এল বীরেন্দ্রনাথের। সামনে গেলেই যে অমন ব্যবহার করে তার পিঠে চড়া যে অসম্ভব এটুকু সে বুঝতে পেরেছে। কিন্তু তাকে জকি হতেই হবে। ওই ঘোড়াটার পিঠে তাকে চড়তেই হবে। কিন্তু কিভাবে চড়তে হয় সে জানে না। আবার পায়ে পায়ে বীরেন্দ্রনাথ এগিয়ে গেল ঘোড়াটার সামনে। ওর পেছনের একটা পায়ের সঙ্গে মোটা দড়িটা বাঁধা। ঘোড়াটা চোখে চোখ

রেখে বোধহয় আবার একবার লাফাবার জন্যে তৈরী হচ্ছিল, বীরেন্দ্রনাথ ওর কপালে হাত ছুঁইয়ে চট করে সরে দাঁড়াল। ঘোড়াটা বোধহয় একটু অবাক হয়ে গিয়েছিল কিংবা কখনো কোন বালকের স্পর্শ পায় নি বলেই এবার চিৎকার না করে বীরেন্দ্রনাথের দিকে ঘুরে দাঁড়াল। ততক্ষণে বীরেন্দ্রনাথের মাথায় মতলব খেলে গেছে। ঘোড়াটার পেছনের পা বাঁধা, সে যা করছে সামনের পায়ে। দ্রুত পেছনে চলে গেল বীরেন্দ্রনাথ। ঘোড়াটা বোধহয় কিছুই বুঝতে পারে নি কারণ সে আবার স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছিল। বীরেন্দ্রনাথ দেখল এই সুযোগ। একটা মোটা বেল্ট ঘোড়াটার পেট এবং পিঠ বেড় দিয়ে পরানো ছিল। সে পা টিপে টিপে পেছন দিক দিয়ে এগিয়ে সেই বেল্ট খপ করে ধরে দুই হাতের কনুই-এ ভর দিয়ে পিঠের ওপর ওঠার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করতে লাগল। ঘোড়াটা যেই বুঝল কেউ তার পিঠে উঠছে অমনি সে চিৎকার করে শূন্যে পা ছুঁড়তে লাগল। কিন্তু বীরেন্দ্রনাথ ততক্ষণে শরীরটাকে অনেকটা তুলতে পেরেছে বেল্ট ধরে। হাঁটু এবং কনুই-এর সাহায্যে সে যখন একটা পা ঘোড়ার পিঠের ওপর তুলে দিয়েছে তখনই ঘোড়াটা পেছনের খোলা পা ছুঁড়লো। বীরেন্দ্রনাথের মনে হল সে যেন শূন্যে ভেসে যাচ্ছে। তারপর মাটির ওপর তার শরীরটা আছড়ে পড়ল। হাত প্রচণ্ড ব্যথা, চোখের সামনে পৃথিবীটা যেন অন্ধকার হয়ে গেল।

জ্ঞান ফিরলে বীরেন্দ্রনাথ দেখল সে একটা বেঞ্চির ওপর শুয়ে আছে। তাকে ঘিরে কয়েকটা উৎকণ্ঠিত মুখ। এণ্টনী ঝুঁকে পড়ে বলল, 'কেমন লাগছে? খুব কষ্ট হচ্ছে? কোথায় লেগেছে তোমার?'

বাঁ হাতের ব্যথাটা সঙ্গে সঙ্গে অনুভবে এল। সে হাতটা তুলতে চেষ্টা করল। তারপর কোনরকমে উঠে বসল। এণ্টনী ততক্ষণে ওর হাতটা সোজা করার চেষ্টায় লেগেছে। যত নরম করে সে হাতটা ঠিক করার চেষ্টা করছে তত ব্যথাটা বেড়ে যাচ্ছে। বীরেন্দ্রনাথ দাঁতে দাঁত চেপে বসেছিল কিন্তু তার চোখ উপচে আসা জলের ধারাকে সে সামলাতে পারল না।

এই সময় একটা হাত তার কাঁধে বেশ জোরেই চেপে বসল, 'ফাইন। হোয়াটস ইওর নেম, মাই বয়?'

ভেজা চোখে বীরেন্দ্রনাথ দেখল ডিকসন সাহেব ওর পাশে দাঁড়িয়ে হাসছে।

সে কথা বলতে চেষ্টা করল কিন্তু গলাটা যে কখন বুজে গেছে। অনেক কষ্টে কোনরকমে উচ্চারণ করতে পারল, 'বীরেন সেন।'

'বায়রণ সেইন?'

'বীরেন্দ্রনাথ সেন?'

'তুমি বাঙালী?'

ঘাড় নাড়ল বীরেন্দ্রনাথ। ততক্ষণে ডিকসন সাহেবের গলা থেকে একটা আফসোসের চুক চুক শব্দ বেরিয়ে এসেছে! আজ অবধি কোন বাঙালী জকি হয় নি। বাঙালীরা এই প্রফেসনে স্ট্যাণ্ড করতে পারে না। হাউএভার আই উইল এ্যাকসেপ্ট ইউ। হাতের ব্যথাটা সারিয়ে তুমি আমার সঙ্গে দেখা

করো। তারপর এণ্টনীর দিকে তাকিয়ে বলল, 'লুক এণ্টনী, এই ছেলে যদি স্টিক করে থাকে তাহলে একদিন ভারতবর্ষের সেরা জকি হবে। শুধু ও যদি বাঙালী না হতো! তুমি ওর ফ্যামিলিকে চেন?'

'চিনি।'

'তারা ওকে এই প্রফেসনে আসতে এ্যালাউ করবে?'

'আই ডোণ্ট নো।'

'খোঁজ নাও, আর ওকে একবার হাসপাতালে নিয়ে যাও।'

না, হাত ভাঙে নি সেদিন। তবে খুব জোর মচকে গিয়েছিল, কোমরে ব্যথা হয়েছিল খুব। চারদিন ধরে ঘরের বাইরে যেতে পারে নি। দিদি অনর্গল গালাগালি করে গেছে এণ্টনীকে। জামাইবাবু কিছু বলে নি। সেরে উঠেই আবার এণ্টনীর বাড়ীতে ছুটে গিয়েছিল সে। এণ্টনী সেদিন মুখ গোমড়া করে বসেছিল। একটা লোক সমানে তাকে অভিযুক্ত করে যাচ্ছে। আগের দিন রেস ছিল। যে ঘোড়াটা জিতবে বলে এণ্টনী কথা দিয়ে গিয়েছিল সেটা জেতে নি। মোটা টাকা নষ্ট হয়েছে লোকটার। এণ্টনী বলল, 'আমি নিশ্চিন্ত ছিলাম যে জিতবে। কিন্তু লাস্ট মোমেণ্টে ট্রেনার। আই এ্যাম সরি। আমি তোমাকে কথা দিচ্ছি নেক্সট টাইম আমি তোমাকে পুষিয়ে দেব।'

লোকটি চলে গেলে বীরেন্দ্রনাথ এণ্টনীর সামনে এসে দাঁড়িয়েছিল। এণ্টনী হাসবার চেষ্টা করল, 'কেমন আছ? হাতের ব্যথা সেরে গেছে?'

'হ্যাঁ।' বীরেন্দ্রনাথ বলল, 'আমাকে কবে নিয়ে যাবে?'

'লুক বীরেন, একজন জকির জীবনে কোন সুখ নেই, স্বাধীনতা নেই। যে ঘোড়াটা সে চালাবে সেটার ওপরও সব সময় তার কর্তৃত্ব থাকে না! রেস জিতলে সেটাই স্বাভাবিক বলে ধরে নেওয়া হয় হারলে পৃথিবীসুদ্ধ লোক গালাগালি দেবে। ক্লাশ ওয়ান জকি হতে না পারলে অবহেলা ছাড়া কপালে কিছু জুটবে না।' এণ্টনীকে এই মুহূর্তে খুব বিমর্ষ দেখাচ্ছিল। তার দুটো হাত বীরেন্দ্রনাথের কাঁধে।

বীরেন্দ্রনাথ মাথা নাড়ল, 'না, আমি জকি হবই, আমি ক্লাশ ওয়ান জকি হব।'

দরজায় নক হতেই লাফিয়ে বিছানা ছাড়ল বায়রণ। একটু ভদ্রস্থ হয়ে সে এগিয়ে ওটাকে খুলতেই পলকে দেখতে পেল। পলের চোখে বিস্ময়, 'তুমি এখনও তৈরী হও নি?'

বীরেন্দ্রনাথ হাসল. 'পাঁচ মিনিট প্লিজ!'

'আমি বাইরে অপেক্ষা করছি।'

ঠিক পাঁচ মিনিটের মধ্যে তৈরী হয়ে বেরিয়ে এল বায়রণ। বারান্দায় বেতের চেয়ারে বসেছিল পল, ওকে দেখেই উঠে দাঁড়াল। তখনও অন্ধকার আকাশ থেকে মুছে যায় নি। মাটিতে পা দেবার সময় বায়রণ দেখল ভারালু একপাশে দাঁড়িয়ে তাকে সেলাম করছে। মাথাটা বাঁকিয়ে সে এ্যাম্বাসাডারে ঢুকে পড়ল। নির্জন আলিপুরের প্রায়-অন্ধকার রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে বলল, 'কাল রাতটা

কিরকম এনজয় করলে ?'

'ফাইন।' কথাটা বলার সময়েও মনে হল আর একটু ঘুমুতে পারলে ভাল হতো।

'তুমি আজকাল ড্রিঙ্ক করো ?'

'মাঝে মাঝে।'

'কাল রাত্রে কোথায় গিয়েছিলে ?'

'কি করে জানলেন ?'

'তোমার খোঁজে আমার ওখানে মিসেস শর্মা ফোন করেছিল।'

'কলকাতা দেখছিলাম।'

'অন্যায় করেছ। একদল লোক চায় না যে আমরা ইনভিটেশন জিতি। তাই একটু সাবধানে থাকা দরকার। কেন, মেয়েটিকে পছন্দ হল না ?' স্টিয়ারিং-এ হাত রেখে আচমকা প্রশ্ন করল পল রোজারিও।

'রক্তহীন মাংস আমার ভাল লাগে না। মিসেস শর্মার সেটা বোঝা উচিত।'

পল ভাল করে বায়রণকে দেখে আবার রাস্তার ওপর চোখ রাখল।

এইসব জায়গা দিয়ে চললে কলকাতাকে বিদেশী শহর বলে মনে হয়। বাঁক ঘুরতেই দূরে রেসকোর্স দেখা গেল। হিমেল বাতাসে অন্ধকার সরে যেতে শুরু করেছে। হঠাৎ রাস্তার একদিকে গাড়িটাকে থামিয়ে পল ওর হাত চেপে ধরল, 'বায়রণ, তোমার কি মনে হয় মার্টিনের ঘোড়া দারুণ আউট-স্ট্যাণ্ডিং ?'

বায়রণ অবাক হয়ে গিয়েছিল পলের এইরকম ব্যবহারে। বলল, 'হ্যাঁ, খুবই ভাল ঘোড়া। মার্টিনের ইনভিটেশন-হোপ। ওর লাস্ট ডার্বি রান চমৎকার।'

'তুমি কি ওকে হারাতে পারবে না ?'

'আপনাদের ঘোড়া কেমন ?'

'প্রিন্স ঘোড়া হিসেবে দারুণ। ওর বাবা হল এভারডে টু। অনেক ভাল ঘোড়ার জন্ম দিয়েছে সে। এক মিনিট দশ পয়েণ্ট আট সেকেণ্ড দৌড়বার রেকর্ড আছে ওর। আর মা হল ক্লকড্। প্রচুর রেস জিতেছে ঘোড়াটা। একটু ভাল হ্যাণ্ডলিং করতে পারলে হয়তো উইনিং পোস্ট দেখতে পারে। তুমি জানো আমি ক্যালকাটা কোর্সের রেকর্ড হোল্ডার ট্রেনার। কিন্তু আমি কখনো ইনভিটেশন জিতি নি। ইট্স সামথিং এলস। এবছরটা আমার খুব খারাপ যাচ্ছে। ইনভিটেশনটা আমাকে পেতেই হবে। তুমি কি আমার জন্যে শেষ চেষ্টা করবে ?'

মাথা নাড়ল বায়রণ, 'আই উইল ট্রাই।'

সোজা হয়ে বসল পল, দ্যাট সোয়াইন মার্টিন। সবাই ওকে বলে ভারতবর্ষের বেস্ট ট্রেনার। আরে সব ভাল ভাল বাচ্চা ঘোড়া যদি ও পায় তবে বেস্ট হবে না কেন ? আমরা তো ভাঙা তলোয়ার নিয়ে যুদ্ধ করি। আমাদের ঘোড়া বোম্বে বাঙ্গালোর গেলে জিততে পারে না তো সেইজন্যেই। কিন্তু পাবলিক বুঝবে না, ওনাররা বিরক্ত হবে। আমরা কি করতে পারি ?'

বায়রণ কিছু বলল না। কথাটা মিথ্যে নয়। বাঙ্গালোর সিজনে কলকাতা থেকে এবার আঠারোটা ঘোড়া গিয়েছিল। মাত্র একটি ঘোড়া জিতেছে ডিমো-টেড হয়ে। ওদিকের কোর্স বোধহয় এদের স্যুট করে না। কারণ একই বাবা মায়ের দুই ছেলে বাঙ্গালোর এবং কলকাতায় ট্রেইন্ড হয়ে দুরকম ফল করছে।

পল গাড়িটাকে রেসকোর্সের মধ্যে ঢুকিয়ে নিতেই সোজা হয়ে বসল বায়রণ। ঠিক দশ বছর পর সে ঢুকছে এখানে! মাঠের মধ্যে এখনও কুয়াশা ছড়ানো। ট্রাকে মর্নিং স্পার্ট চলছে। কোন কিছুই তার অচেনা নয়, পোশাক পাল্টে বাইরে বেরিয়ে আসতেই পল বলল, 'চল, আগে প্রিন্সের সঙ্গে তোমার আলাপ করিয়ে দিই!' ঘোড়াটাকে দেখার আগ্রহ ছিল বায়রণের। সে পাখীর পায়ে হাঁটতে হাঁটতে দেখল পলের লোকজন ছাড়াও অন্য ট্রেনারের সহিসরা তার দিকে সপ্রশংস দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। ওদের মধ্যে বেশ কিছু চেনামুখ দেখতে পেল সে। দশবছর আগে এদের সে ভালভাবেই চিনতো। কিন্তু আজ ওদের ব্যবহারে যে দূরত্ব দেখতে পাচ্ছে সে সেটা ঘোচাবার কোন মানে হয় না। যা স্বাভাবিক তাই করা ভাল। এখন বাইরণ সেইনের সঙ্গে ওদের প্রচুর ব্যবধান। কিন্তু একটা কথা ওর মাথায় কিছুতেই আসছিল না, পল কিংবা শর্মা অথবা অন্য কেউ ওকে একবারও মনে করিয়ে দিচ্ছে না সে মূলত এই কলকাতারই জকি। দশবছর আগে এই মাঠে সে একটা রাইডের প্রত্যাশায় দিন গুনতো!

'হাই!' চিৎকারটা ভেসে আসতেই মুখ ফেরালো বায়রণ। বার্নি আসছে। কাছাকাছি হতেই বলল, 'দারুণ জায়গা, কি সবুজ মাঠ, তাই না?'

বায়রণ ঘাড় নাড়ল, 'ডিক কোথায়?'

বার্নি কাঁধ নাচালো, 'ঘুমুচ্ছে। কাল রাত্রে একটু হেভী ডোজ হয়ে গেছে বোধহয়। ওয়েল, তোমাকে মার্টিন একবার দেখা করতে বলেছে। বাই।'

পল বলল, 'ছোঁড়াটা নাকি খুব ভাল চালায়, সত্যি?'

'হ্যাঁ। নার্ভ খুব শক্ত।'

'লর্ড কৃষ্ণাকে কে চালাবে? ডিক না বার্নি, তুমি জানো?'

'জানি না। তবে ডিক চালালে বেশী ভয়ের কথা আপনার।'

পল ওর দিকে তাকাল। কিন্তু কিছু বলল না।

পুরো রেসকোর্স জুড়ে মর্নিং স্পার্ট চলছে। আগামী দু দিনে যত ঘোড়া দৌড়োবে তাদের অভ্যেস করিয়ে নিচ্ছে ট্রেনাররা। কোন ঘোড়া চারশ' কেউ আটশ' কাউকে বা পুরো দূরত্বে দৌড় করিয়ে সময় টুকে রাখা হচ্ছে। স্যান্ড ট্রাক কিংবা গ্রাস ট্রাক ব্যবহার করা হচ্ছে এজন্যে নিয়মিত জকিরা ছাড়া রাইডিং বয়রাও মর্নিং স্পার্টে অংশ নিচ্ছে।

পলের ইঙ্গিতে ওর সহিসরা যে ঘোড়াটাকে সামনে নিয়ে এল সেটার খুব মজবুত চেহারা। ঘাড় এমন বেঁকিয়ে আছে যে মনে হয় আদেশ পাওয়া মাত্র দৌড়ে যাবে! ওর গায়ে হাত বুলিয়ে পল বলল, 'এ হল সিজার। স্পিন্টার্স

কাপে আমাদের হোপ। ষাট কেজি ওজন নিয়ে বারোশ' মিটার দৌড়েছে এক মিনিট চোদ্দ এণ্ড টু ফিফ্‌থ সেকেণ্ডে। মাইটি স্প্যারোর বাচ্চা।'

বায়রণ এক লাফে ঘোড়াটার পিঠে উঠতেই সে নেচে নিল খানিকটা। পল বলল, 'গ্রাসে ছ'শ মিটার দৌড়ে নাও। খুব বেশী স্পীড নেবার দরকার নেই, বি ইজি, ওকে?' ঘাড় নেড়ে হিসেব মতো ছ'শ মিটার মার্কের কাছে চলে গেল বায়রণ। ওরা গ্যালারির বিপরীত দিকে রয়েছে। সিজারের পিঠে ওঠামাত্র বায়রণের অদ্ভুত রোমাঞ্চ হল গ্যালারির দিকে তাকিয়ে। শেষ দিন ওই গ্যালারির হাজার হাজার মানুষ তাকে ধিক্কার জানিয়েছিল। ভগবান! সিজারের মাথায় হাত বুলিয়ে সে ওকে ঘুরিয়ে নিল। তারপর নির্দেশ পাওয়ামাত্র সিজারকে ছুটিয়ে দিল। বাঃ, সুন্দর ঘোড়া। চমৎকার গ্যালপ করছে। চাবুক ব্যবহার করল না। শুধু কবজির মোচড়ে লাগামের টানের ওপর ঘোড়াটাকে রাখল সে। না কোন জড়তা নেই ঘোড়াটার শরীরে। পল একে খুব ভাল ট্রেইণ্ড করেছে। নিমেষে দূরত্বটা পেরিয়ে যেতে সে গতি মন্থর করে নিয়ে আবার পলের কাছে ফিরে এল। পল বলল, 'কি বুঝলে?'

'ফাইন। কোন কমপ্লেন নেই। সময় কত হ'ল।'

'ব্রিলিয়াণ্ট। সিক্স হাণ্ড্রেড ইন থার্টিফাইভ সেকেণ্ডস। এই একটা স্পার্ট থেকেই সিজার স্পিণ্টার্স কাপে ফেবারিট হতে পারে। কিন্তু মুশকিল হল ওর একটা খুব খারাপ অভ্যেস আছে।'

'কি সেটা?'

'দৌড়োতে দৌড়োতে সিজার হঠাৎ লেগ চেঞ্জ করে। সেটা করতে গেলেই ওকে তিন চার লেংথ লুজ করতে হয়। অনেক চেষ্টা করেও আমি ওর এই স্বভাবটাকে বদলাতে পারি নি। আবার কোন কোন দিন সেটা করে না এবং সেদিন ওকে হারানো খুব মুশকিল।'

এবার পলের ইঙ্গিতে আর একটা ঘোড়াকে কাছে নিয়ে আসা হল। খুব শান্ত একটু লম্বাটে ঘোড়াটার গায়ের রং ছাই ছাই। পেট খুব সরু, একটুও বাড়তি চর্বি নেই। পল ওর মুখ জড়িয়ে ধরে আদর করল। তারপর বায়রণের দিকে ঘুরে বলল, 'এই হল প্রিন্স। দ্যাখো একে।'

বায়রণ অনুমান করেছিল। সে ঘোড়াটাকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে গেল। না প্রথম দর্শনে চমকিত হবার মতো কোন ঐশ্বর্য ঘোড়াটার নেই। লর্ড কৃষ্ণাকে দেখলেই যেমন মনে হয় ও হল ঘোড়ার রাজা একে দেখলে তেমন কিছুই বোধহয় না। বায়রণ প্রিন্সের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। সামান্য মুখ তুলে ঘোড়াটা তাকে দেখল। চোখে চোখ রাখল বায়রণ। চোখ দুটো অদ্ভুত সুন্দর ঘোড়াটার। হাত তুলে আদর করতে যেতেই এবার ঘোড়াটা মুখ সরিয়ে নিল। পেছনে থেকে পলের সাংকেতিক বকুনি ভেসে আসতেই ঘোড়াটা আবার সোজা হল। বায়রণ এবার ওর গলায় হাত বোলাতে লাগল। তারপর যেন কানে কানে বলছে, 'হেই বয়, রাগ করো না। এখন থেকে আমরা একসঙ্গে থাকবো। আমাদের বন্ধু হতে হবে, রাগ করলে চলবে কেন?'

পল কথাগুলো শুনতে পায় নি। চেঁচিয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'কি বলছ?'

'তোমাকে নয়। প্রিন্সের সঙ্গে আলাপ করে নিচ্ছি।' এবার প্রিন্স মুখ ফিরিয়ে বায়রণের মাথাটা যেন শুঁকলো।

'আমার মনে হয় ওকে নিয়ে তোমার পুরো কোর্সটা ঘুরে আসাই ভাল।'

পল এগিয়ে এসে স্যাডল ঠিকঠাক করে দিতে লাগল।

'তুমি একে কিভাবে রান করাতে চাও?' বায়রণ সরাসরি জিজ্ঞাসা করল। পলের মুখ শক্ত হল, 'সেটা এখনও ঠিক করিনি সেইন। প্যাডকে তোমাকে আমি জানিয়ে দেব। আমার প্রতিপক্ষ খুব শক্তিশালী, বুঝলে!'

বায়রণ হেসে ফেলল। কোন বুদ্ধিমান ট্রেনার আগেভাগে তার পরিকল্পনা জানিয়ে দেয় না তবু সে আচমকা জিজ্ঞাসা করেছিল। পল সুন্দরভাবে সেটাকে এড়িয়ে গেল। বায়রণ প্রিন্সের লাগাম ধরে এবার হাঁটা শুরু করল। পলকে বলে গেল। 'আমি ওর সঙ্গে একটু হাঁটি। তুমি কি টাইম নোট করতে চাও?'

পল ঘাড় নাড়ল, 'না তার দরকার নেই। কিন্তু হাঁটবে কেন?'

বায়রণ হাসল, 'একটু আলাপ জমাতে।'

আশেপাশে প্রচুর ঘোড়া এবং জকি রয়েছে। ওদের অনেকেই ওকে দেখে হাত তুলছে। বাঙ্গালোর কিম্বা বোম্বেতে একসঙ্গে ওঠা বসা করতে হয়। যথেষ্ট বন্ধুত্ব থাকা সত্ত্বেও রেসের আগে কেউ কাউকে নিজের গোপনতা প্রকাশ করে না। অথবা জকিতে জকিতে বন্ধুত্ব বলে যেটা মনে হয় সেটা কতটা খাঁটি সে বিষয়েও পলের সন্দেহ আছে।

প্রিন্সের গলা ঘেঁষে হাঁটছিল বায়রণ। বড্ড শান্ত ঘোড়াটা। হাঁটতে হাঁটতে কথা বলছিল সে, 'হেই প্রিন্স, তুমি আমাকে আগে কখনো দ্যাখো নি, আমিও তোমাকে দেখি নি। কিন্তু আমাদের দুজনের উদ্দেশ্য এক। ইনভিটেশন আমাদের জিততেই হবে। আমি খুব একা প্রিন্স, এই পৃথিবীতে আমার কেউ নেই। এই মাঠে আমি একদিন রেস করতাম। এখানকার মানুষ আমাকে বিনা অপরাধে তাড়িয়ে দিয়েছিল। তুমি আমাকে বদলা নিতে সাহায্য কর। করবে না?' প্রিন্স যেন তার দুটো কান নাড়লো বলে মনে হল বায়রণের। বায়রণের বিশ্বাস যদি ঠিকঠাক বলা যায় তাহলে ঘোড়া মানুষের কথা বুঝতে পারে। ওর আবেগ আরো বেড়ে গেল, 'লর্ড কৃষ্ণা যত বড় ঘোড়াই হোক সে তো এখানে ফরেনার। তার জকিও এই মাঠে কখনো রাইড করে নি। অথচ গত বছর যখন তুমি প্রথম রেস করতে মাঠে নামলে, সেই দু'বছর বয়স থেকেই তুমি এই মাঠ চেনো। আর আমি তো জন্মই নিয়েছি এই মাঠে। সুতরাং আমাদের হারাবে কি করে লর্ড কৃষ্ণা? প্রিন্স, আমাকে জেতাও তুমি, আমাকে জেতাতেই হবে!'

বায়রণ আর একটু আদর করে একা একাই প্রিন্সের পিঠে চড়ল। অন্য সময় সহিস কিংবা ট্রেনার তাদের সাহায্য করে কিন্তু এখন ধারে কাছে কেউ নেই ওর। পিঠে চড়া মাত্র প্রিন্স টগবগিয়ে উঠল। পল বলেছে খুব ইজি দৌড়

করাতে। বোধহয় আজকে ঘোড়াটার কোন পরিশ্রম হোক সে চায় না। লাগাম চেপে রেখে সে প্রিন্সকে ছোটালো। বেশ ভালই গ্যালপ করছে ঘোড়াটা। একই গতিতে প্রায় দু'হাজার মিটার ঘুরে এসে সে চার্জ করল। কিন্তু খুব হতাশ হল বায়রণ। ঘোড়াটা মোটেই চার্জ নিচ্ছে না। একটুও স্পীড বাড়ছে না তার। বরং ও খুব দ্রুত পরিশ্রান্ত হয়ে পড়ছে। ব্যাপারটা বোঝা মাত্র বায়রণ চট করে ইজি হয়ে গেল। শেষ পর্যন্ত প্রায় হাঁটিয়ে নিয়ে এল সে প্রিন্সকে। হাঁটবার সময় বারংবার ওর কানে বলতে লাগল, 'আমাদের জিততেই হবে।'

সহিসরা এসে লাগাম ধরতেই বায়রণ এক লাফে নেমে পড়ে প্রিন্সের মুখে আদর করতেই দেখল ঘোড়াটা ওকে দেখছে। চাহনিটা অদ্ভুত। সে ওর মুখে হাত বুলিয়ে ঘুরে দাঁড়াতেই পল এগিয়ে এল, 'কেমন দেখলে?'

'ফাইন। ওর কোন বদ অভ্যেস আছে?'

'না। পারফেক্টলি অলরাইট। কি বুঝছ, চান্স আছে?'

'চেষ্টা করব পল, আই উইল ট্রাই মাই বেস্ট।'

'তুমি কি ওকে চার্জ করেছিলে?'

আড়চোখে পলকে দেখল বায়রণ। তারপর অম্লানবদনে মিথ্যে কথাটা বলে ফেলল. 'না, জাস্ট একটু স্পীড বাড়াচ্ছিলাম।'

'বেড়েছিল?'

'হ্যাঁ। সুন্দর।'

'ঠিকই। চার্জ করলেই প্রিন্স তীরের মতো বেরিয়ে আসে।' বায়রণ লক্ষ্য করল পলের কথা শুনে সহিসটাও বেশ অবাক হল। সে কিছুতেই বুঝতে পারছিল না পল তাকে মিথ্যে কথা বলছে কেন? গোপনীয়তা রক্ষার নামে তাকে বিভ্রান্ত করে পলের কি লাভ?

পল জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি কি অন্য ঘোড়াদুটো দেখতে চাও?'

বায়রণ মাথা নাড়ল, 'না, তার কি কোন দরকার আছে?'

'ইটস অলরাইট। যাও চেঞ্জ করে নাও।' পল এবার তার স্টেবলের অন্য জকিদের নিয়ে পড়ল। ড্রেসিংরুমের দিকে হাঁটতে হাঁটতে বায়রণ ঠিক করল এতদিন যে প্রিন্সকে চালিয়েছে তার সঙ্গে সে একবার কথা বলে নেবে। সেই লোকটা নিশ্চয়ই প্রিন্সকে খুব ভাল করে চেনে।

ড্রেসিংরুমের দরজায় প্রায় পৌঁছে গেছে বায়রণ এমন সময় চিৎকারটা কানে এল, 'বায়রণ?'

সে ঘুরে তাকাল। দলবল নিয়ে মার্টিন সকালের কাজ সেরে ফিরে আসছে। না, ডিক ওঁর সঙ্গে নেই। বায়রণ টুপিতে হাত ছোঁয়ালো। তারপর দ্রুত পায়ে এগিয়ে গেল মার্টিনের দিকে। ছিমছাম চেহারায় বাজপাখীর মতো স্মার্টনেস, মার্টিন মুখোমুখী হতেই বলল. 'কাল বিকেলে এসেছ জানি কিন্তু কোথায় উঠেছ?'

'শর্মা এন্ড শর্মার রেস্ট হাউসে।'

'আই সি। কাল রাত্রে সব বড় হোটেলে তোমার খোঁজ নিয়েছিলাম।'

'আমাকে কেন— !'

'জাস্ট একটু উইশ করা। তুমি পলের গাধাটাকে দেখলে ?'

'গাধা ?'

'ওই যে, প্রিন্স না কি একটা নাম !'

হেসে ফেলল বায়রণ। মার্টিনের স্বভাবই এইরকম। সে জবাব দিল, 'শুনলাম মিঃ শর্মা নাকি ওই গাধাগুলোকে সামনের বছরে আপনার কাছে পাঠিয়ে দেবেন।'

'ওয়েল আমি যদি সেটা এ্যাকসেপ্ট করি তাহলে গাধা পিটিয়ে ঘোড়া করে নেব। যাহোক, তোমার উচিত ছিল পলের অফার নেওয়ার আগে আমাকে জানানো। ডিক আমাকে ট্রাবল দিচ্ছে। এখান থেকে ফিরে গিয়ে আমি ওকে রিজেক্ট করব এবং ইউ উইল বি মাই জকি।'

'সো কাইণ্ড অফ ইউ স্যার।'

মার্টিন খুশী হল। ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ হর্সট্রেনার সব সময়েই একটু তৈল-মর্দন আশা করেন। মাথা নেড়ে চলে যেতে যেতে হঠাৎ দাঁড়াল মার্টিন, 'বাই দি বাই, বায়রণ, তুমি তো কলকাতায় প্রথম ক্যারিয়ার শুরু করেছিলে, তাই না ?'

শক্ত হয়ে গেল বায়রণ। এই প্রথম তাকে মুখের ওপর যে কথাটা জিজ্ঞাসা করল সে কিনা শেষ পর্যন্ত মার্টিন। লোকটা তাহলে সব খবর রাখে ?

বায়রণ মাথা নাড়ল, 'ইয়েস স্যার।'

'এবং ওরা তোমাকে তাড়িয়ে দিয়েছিল ?'

'অলমোস্ট।'

'তাহলে তোমার এই অফার গ্রহণ করা উচিত হয় নি।' হনহন করে দলবল নিয়ে চলে গেল মার্টিন। কিছুটা বিস্ময় কিছুটা জ্বালা নিয়ে কিছুক্ষণ ওদের যাওয়া লক্ষ্য করল বায়রণ। তারপর মনে মনে বলল, মোটেই না, আমি ঠিক করেছি। প্রিন্স যদি ঠিক থাকে তাহলে আমি জিতবোই এবং তাহলেই প্রমাণ হবে আমি ঠিক করেছি।

ড্রেসিংরুমে তখন জকিদের ভীড়। সবাই পোশাক পাল্টে নিচ্ছে। সম্ভাষণ-প্রতিসম্ভাষণে মুখর হল ঘরটা। বায়রণ লক্ষ্য করল, কলকাতার যে তিন-চারজন জকি আজ সকালে এসেছে তারা যেন বেশ চুপচাপ, অন্য সেণ্টারের জকিরাই বেশী কথা বলছে। এণ্টনীকে খুঁজছিল বায়রণ। না, সে এদের মধ্যে নেই। গত রাত্রে রিপন লেনে গিয়েও কিন্তু এণ্টনীর কথা তার খেয়ালে ছিল না। পোশাক পাল্টে বেরিয়ে আসছে এমন সময় একটা বুড়ো সহিস নমস্কার করে দাঁড়াল একপাশে। অন্যমনস্ক হয়ে মাথা নেড়ে চলে যেতে যেতে হঠাৎ কি মনে হতে আবার ঘুরে দাঁড়াল বায়রণ। লোকটা যেন চেনা চেনা।

'ছোটেসাব।' বৃদ্ধ হাসবার চেষ্টা করল।

সঙ্গে সঙ্গে মাথার ভেতর স্মৃতিগুলো নড়ে চড়ে উঠল। কি যেন নাম,

কামাল। সে এগিয়ে এসে হাত ধরল, 'আরে কামাল, তুমি কেমন আছ ?'

'আল্লার দয়ায় চলে যাচ্ছে সাব, এখন মাটি পেলেই হয়।'

'তুমি খুব বুড়ো হয়ে গেছ কামাল। চেহারা খারাপ হয়ে গিয়েছে।' বায়রণ একধরনের আত্মীয়তা অনুভব করল।

'মানুষ তো একদিন বুড়ো হবেই ছোটসাহেব।'

অন্য জকিরা এবার বেরিয়ে আসছে। অনেকের চোখে কৌতূহল। বায়রণ হাত ছেড়ে দিয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'তা তুমি কিছু বলবে কামাল ?'

মাথা নাড়ল কামাল, 'বেশ কিছুদিন থেকেই শুনছিলাম আপনি এখানে আসবেন প্রিন্সকে চালাতে। এণ্টনীসাব বলল, আপনি কাল এসে গেছেন। দূর থেকে আজ দেখছিলাম আপনাকে, একদম পাল্টে গেছেন। এমনকি ঘোড়ায় আগে যে ভাবে বসতেন এখন সেভাবে বসেন না। পিগট সাহেবের মতো দেখাচ্ছিল আপনাকে।'

'পিগট ? লেসলি পিগট ? তুমি কার সঙ্গে তুলনা করছ জানো ?'

'আমরা কি সব কিছু অনুমান করতে পারি সাব ? দশ বছর আগে আপনি কি ভাবতে পেরেছিলেন আজ সবাই আপনাকে এত সম্মান করবে ? আল্লা যা চান তাই হয়।'

হাসল বায়রণ, 'বলো, আর কি খবর।'

'ছোটেসাব, আপনি এণ্টনী সাবের কথা জানেন ?'

'না। আমি ওঁর সঙ্গে দেখা করব।'

'হ্যাঁ ছোটেসাব, আমি এণ্টনীসাবকে বলেছি আপনি এলে না দেখা করে যাবেন না। এণ্টনীসাবের এখন খুব খারাপ অবস্থা। মাঝে মাঝে মাসে দু-তিনটে রাইড পান আর যত বেতো ঘোড়া ওঁকে দেয় ট্রেনার সাবরা। সেগুলো যে কোনদিন জিতবে না তা সবাই জানে। সংসার চালাতে খুব কষ্ট করতে হচ্ছে ওঁকে।'

বায়রণ ঢোক গিলল। এণ্টনীর এই অবস্থা যেন বিশ্বাস করা যায় না। সে জিজ্ঞাসা করল, 'এণ্টনী সাব এখন কোথায় ? এখানে দেখছি না কেন ?'

কামাল মুখ নীচু করল, 'উনি সিক্ বলে রিপোর্ট করেছেন সাব।'

'কি হয়েছে ?' বায়রণের ভ্রূ কুঁচকে গেল।

'আমি জানি না।'

'ঠিক আছে।' বায়রণের এবার অস্বস্তি হচ্ছিল। এণ্টনীর অনুপস্থিতির কারণটা যেন চেপে যাচ্ছে কামাল। সে আর জোর করল না। বলল, 'ঠিক আছে. তোমাকে অনেক ধন্যবাদ কামাল যে তুমি আমাকে মনে রেখেছ। আমি এণ্টনী সাহেবের সঙ্গে দেখা করব কিন্তু তুমি ওঁকে কিছু বলো না।'

হাসি ফুটে উঠল বৃদ্ধের মুখে, 'আল্লা আপনার ভাল করুন। এবার আপনি ঠিক কাপ জিতবেন সাব, এ আমি বলে দিচ্ছি।'

বায়রণ বৃদ্ধের মুখের দিকে তাকাল। এণ্টনীর সঙ্গে ডিকসন সাহেবের স্টেবলে আসার পর থেকে এই মানুষটি তাকে প্রায় হাতে গড়ে মানুষ করেছে।

কোনদিন কৃতিত্ব দাবী করে নি। ওকে বকেছে ভুল করলে, কষ্ট পেলে ভোলাতে চেষ্টা করেছে কিন্তু যখনই সম্বোধন করেছে তখনই সম্মান দিয়েছে ছোটেসাব বলে।

বায়রণ মাথা ঝাঁকালো তারপর হনহন করে বেরিয়ে এল প্যাডকের কাছে। একটা নতুন গাছ প্যাডকে পোঁতা হয়েছে। বাকী তিনটে সেই আগের মতোই ঝাঁকালো। রেসের আগে এখানেই ঘোড়াগুলোকে ঘোরানো হয়, দর্শকরা দেখে নেয় তাদের পছন্দের ঘোড়া ফিট কিনা। ট্রেনাররা জকিদের মাঝখানে দাঁড়িয়ে শেষ নির্দেশ দেয়, অনেকেই নিজের হাতে ওদের ঘোড়ার ওপর চাপিয়ে দেয়। ওই রেসে যেসব ঘোড়া ছুটছে তার মালিকরা এসে দাঁত বের করে দাঁড়ায়, কেউ বা উদ্বেগে গম্ভীর, কিন্তু সবাই জানতে চায় তার ঘোড়াটা জিতবে কিনা। একটি রেসের ভাগ্য অনেকটা নির্ভর করে এই প্যাডকে!

ডিকসন সাহেব এখন হংকং-এ চলে গেছেন। হাত ভাল হয়ে গেলে বালক বীরেন্দ্রনাথ যখন এণ্টনীর সঙ্গে তার কাছে এসেছিল তখন ডিকসন হেসেছিল, 'গুড, তোমার জকি হবার ইচ্ছেটা তাহলে মরে যায় নি?'

এণ্টনী বলেছিল, 'খুব জেদী ছেলে স্যার।'

'দ্যাটস গুড় মাই বয়। কিন্তু একটা অসুবিধে হয়ে যাচ্ছে যে!'

অসুবিধের কথা শুনে বুক কেঁপে গিয়েছিল বীরেন্দ্রনাথের। আবার কি হল?

ডিকসন সাহেব বলল, 'আজ অবধি কোন বাঙালী রেসে কিছু করতে পারে নি। তোমার আগে এক আধজন এসেছিল কিন্তু খুব খারাপ রেজাল্ট করে সরে গেছে। সত্যি বলতে কি আমরা সবাই মনে করি বাঙালীদের দিয়ে হর্সরাইডিং হয় না। তাই তোমাকে এ্যাকসেপ্ট করানো খুব মুশকিল হবে।'

বীরেন্দ্রনাথ জেদী গলায় বলল, 'আমি পারব স্যার।'

'ইওর নেম ইজ বীরেন্দ্রনাথ সেন?'

'ইয়েস স্যার।'

'বাকীগুলো সব ছেঁটে ফেল। আজ থেকে তুমি শুধু বীরেন্দ্র। ঠিক আছে?' এণ্টনী হেসে ফেলেছিল। মুখ নামিয়েছিল বীরেন্দ্রনাথ।

ডিকসন সাহেব চিৎকার করে ডেকেছিল, 'কামাল, কামাল।'

মধ্যবয়সী একটি সহিস এগিয়ে এসেছিল, 'ইয়েস সাব।'

'এই হল বীরেন্দ্র। সেদিন যে খুব সাহস দেখিয়েছিল, মনে আছে? এ এখন থেকে স্টেবলে থাকবে, রাইডিং শিখবে।'

'ঠিক হ্যায় সাব।'

পড়াশুনা মাথায় উঠল বীরেন্দ্রনাথের। দিদি তখন প্রচণ্ড রাগারাগি করত। জামাইবাবু তেমন কিছু বলত না অবশ্য। সেই রাত থাকতে সে রিপন লেন থেকে দৌড় শুরু করত। প্রায় মাইল আড়াই দৌড়ে হেঁটে ভোর হবার আগেই হেস্টিংসে পৌঁছে যেতে হতো তাকে। এণ্টনী সাহেবকে রোজ ভোরে যেতে হয় না। মর্নিং স্পার্ট থাকলে কোন কোন দিন রেসকোর্সে যায়। কামাল

ওকে হাতে কলমে কাজ শেখাতো। না, রাইডিং নয়, ঘোড়াদের পরিচর্যা করতে হতো তাকে। দলাই মলাই থেকে শুরু করে কখনো কখনো ময়লা পরিষ্কার পর্যন্ত করতো সে। একটা ঘোড়ার শরীর তাকে পরিষ্কার বুঝিয়ে দিয়েছিল কামাল। শরীরের কোন জায়গায় আঘাত করলে তার কি রকম অনুভূতি হয়, শরীর খারাপ থাকলে তার আচরণ কি ধরনের হবে তার বিশদ তথ্য জানা হয়ে গিয়েছিল সেই বয়সেই। খাইয়ে দাইয়ে সকাল ন'টা নাগাদ চলে আসতো বীরেন্দ্রনাথ। এসে কোনরকমে তৈরী হয়ে স্কুলে যেত। বন্ধুরা বলত তোর শরীর থেকে ঘোড়ার গায়ের গন্ধ বের হচ্ছে। প্রথম প্রথম টের পেলেও পরে সেটা অনুভব করত না বীরেন্দ্রনাথ। স্কুল ছুটির পর আবার যেত সে স্টেবলে। এই সময়টাই ছিল সবচেয়ে আকর্ষণের। কামাল ওকে এক একটা ঘোড়ায় রোজ চড়িয়ে দিত। রেকাবে পা রেখে এক লাফে জিনের ওপর বসা ক্রমশ জলভাত হয়ে গেল। রেসকোর্স নয়, সামনের এক চিলতে জমিতে ওকে ঘুরতে হতো। ডিকসন সাহেব একদিন দেখতে পেল এই দৃশ্য। আর তার পর থেকেই শুরু হল তার হাতে-কলমে শিক্ষা। না, এখানে নয়। রেসকোর্সে মর্নিং গ্যালপে যেতে হবে তাকে। রেজিস্টার্ড জকি ছাড়াও রাইডিং বয়রা মর্নিং গ্যালপে অংশ নিতে পারে। ডিকসন সাহেবের চেষ্টায় বীরেন্দ্র নামটা রাইডিং বয়দের তালিকায় জায়গা পেল। রাইডিং বয়দের রেস করবার কোন অধিকার নেই, শুধু স্টেবলের ঘোড়াগুলোকে সতেজ রাখার জন্যে ট্রেনারের নির্দেশে সকাল বিকেলে দৌড় করানোই তাদের কাজ। কলকাতার মাঠে অবশ্য রাইডিং বয়দের সংখ্যা খুবই কম। যারা আছে তাদের বেশীর ভাগই এ্যাংলো ইন্ডিয়ান। বীরেন্দ্রনাথ দেখতো তারা যেন ওকে এড়িয়ে চলে। দু'একজন যে বাঁকা কথা শোনায় না তা নয়। কামাল বলতো, 'ওসব দিকে কান দিও না ছোটেসাব। রাস্তা দিয়ে যখন হাতি চলে তখন হাজার কুকুর শব্দ করে তাতে হাতির কি এসে যায়।'

প্রথম চমক লেগেছিল ওর ঘোড়ার দাম শুনে। ডিকসন সাহেবের স্টেবলে তিনটে ঘোড়া আছে যাদের দাম দু' লাখ থেকে সাড়ে তিন লাখ পর্যন্ত। একটা ঘোড়ার যে এত দাম হতে পারে কল্পনায় ছিল না। মানুষের চেয়ে অনেক, অনেক দামী ওরা। তাই অত তোয়াজে রাখা হয় ওদের। অন্য ট্রেনারদের স্টেবলেও এইরকম দামী ঘোড়া আছে। ডিকসন সাহেবের স্টেবলে সবচেয়ে কম দামী ঘোড়ার দাম দশ হাজার। তার বংশপরিচয় তেমন কুলীন নয়। রেসে ঘোড়াদের ছটি শ্রেণী থাকে। ক্লাশ ওয়ানের ঘোড়াগুলো সবচেয়ে দ্রুতগতির এবং দামী। বি ক্লাশের ঘোড়াদের সে তুলনার কোন সম্মান নেই। স্টেবলে যত্ন-আত্তির ব্যাপারেও তাই শ্রেণীবিভাগ দেখা যায়। বি ক্লাশের ঘোড়া বাজি জিতলে পুরস্কার পায় বড় জোর সাত হাজার টাকা। আর ক্লাশ ওয়ান ঘোড়া পাবে কুড়ি থেকে এক লাখ। কখনো কখনো দেখা গেছে বি ক্লাশে দৌড় শুরু করে জিততে জিততে প্রমোশন নিয়ে কোন কোন ঘোড়া ক্লাশ টু পর্যন্ত উঠে গেছে। আবার হারতে হারতে ডিমোটেড হয়ে ক্লাশ ওয়ানের ঘোড়াও বি ক্লাশে

নেমে যায় এবং তখন তাদের আর খাতির থাকে না। যে ঘোড়াটায় প্রথম সে মর্নিং গ্যালপ শুরু করেছিল তার বয়স বারো বছর। রেসের দৃষ্টিতে বুড়ো ঘোড়া। এককালে ও নাকি ক্লাশ ওয়ানে দৌড়োতো। এখন হারতে হারতে বি ক্লাশে নেমে এসেছে। বায়রণের মনে আছে ঘোড়াটা ছিল খুব শান্ত। ডিকসন বলতো, 'একদম রেস্ট দেবে না ঘোড়াটাকে। প্রথম থেকেই ফুল গ্যালপে ওকে রান করাবে।' বেশ কিছুদিন এমন করার পর একদিন একটা অল্প পাল্লার দৌড়ে এনট্রি করানো হল ঘোড়াটাকে। সেদিন কেউ ওকে পছন্দ না করায় দশের দর ছিল বুকিদের কাছে। দেখা গেল জকি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সমান ছুটিয়ে ওকে জিতিয়ে দিল। ডিকসন সাহেব খুব খুশী হয়েছিল সেদিন। রাইডিং বয় বীরেন্দ্রর পিঠ চাপড়ে বলেছিল, 'খুব ভাল গ্যালপ করিয়েছ।'

ডিকসন সাহেব তখন হাতে ধরে ঘোড়া চালানো শিখিয়েছে ওকে। কখন ঘোড়াকে চার্জ করতে হয়, খাঁচা থেকে কিভাবে বেরুলে রেসের সময় ঘোড়া পিছিয়ে না যায়, দূর পাল্লার রেস হলে কোন্ পজিসনে ঘোড়াকে রাখতে হয়, এক হাতে লাগাম অন্যহাতে চাবুক কিরকম ব্যবহার করতে হয়। এইসব বুঝিয়ে দিত ডিকসন সাহেব। এন্টনী তখন কলকাতার অন্যতম সেরা জকি। ওর কাছেও নানান কায়দা কানুন জানা যেত। এন্টনী বলত, 'একজন বড় জকি হবে সে-ই যে হারা রেস জিতিয়ে দিতে পারে। আবার একজন বড় জকি হবে সে-ও যে নিশ্চিত জেতা রেস এমন করে হারিয়ে দেবে যাতে কারো মনে সন্দেহ আসবে না।'

বীরেন্দ্রনাথ অবাক হয়েছিল। তা কি করে সম্ভব? কোন জকি কি জেতা রেস ইচ্ছে করে হারিয়ে দেয়? রেস তো সবাই করে জেতবার জন্যেই। এন্টনী ঘাড় নেড়েছিল, 'না, মাঝে মাঝে তাও করতে হয়, অবশ্য মুখে কেউ সেকথা স্বীকার করবে না। যেমন ধরো গত সপ্তাহে বড়বাজারের নাগরমল এসে আমাকে ধরল, একটা ঘোড়া বলতে হবে যেটা জিতবেই। আমি বললাম। নাগরমল বলল সে দশ হাজার টাকা খেলবে। জিতলে পঞ্চাশ হাজার পাবে এবং আমাকে পাঁচ হাজার দেবে। অর্থাৎ টেন পার্সেন্ট। ঘোড়াটাকে আপ্রাণ চালিয়ে জেতালাম। কিন্তু নাগরমলের সঙ্গে দেখা হতে বলল সে নাকি খেলে নি এক পয়সা। বুঝলাম মিথ্যে কথা বলছে। কারণ রেস শুরু হবার সময় ঘোড়াটার দর খুব নেমে গিয়েছিল। টাকা না লাগালে এটা হয় না। ঠিক করেছি সামনের রেসে ওকে সর্বস্বান্ত করব। বদলা নিতে হবে।'

এন্টনীর দিকে অবাক চোখে তাকিয়ে বীরেন্দ্রনাথ প্রশ্ন করেছিল, 'কিভাবে?'

'ওকে বলেছি সুইটি জিতবেই। পঞ্চাশ হাজার লাগিয়ে দাও। ও টোপ গিলেছে। দুই-এর দর আছে ঘোড়াটার।'

সত্যি তাই হল। সুইটিকে চালাচ্ছিল এন্টনী। রেস শুরু হওয়ার দশ মিনিট আগে দর হয়ে গেল হাফ মানি। সবাই বলতে লাগল সুইটি অবশ্যই জিতবে। ওকে হারাবে এমন কোন ঘোড়া নেই। এন্টনী রেস শুরু হওয়ার

সময় থেকেই পিছিয়ে ছিল। অন্য একটা ঘোড়া যখন প্রায় জিতে যাচ্ছে তখন তীরের মতো চালাতে লাগল সে সুইটিকে। লোকে দেখল অল্পের জন্য সুইটি জিততে পারল না। নাগরমলের মাথায় নিশ্চয়ই আকাশ ভেঙে পড়েছে ততক্ষণে। অথচ কেউ এণ্টনীকে দোষ দিতে পারছে না, প্রত্যেকের চোখে পড়েছে যে সে খুব চেষ্টা করেছিল।

ডিকসন সাহেব ওকে হ্যাণ্ডিক্যাপ শিখিয়েছিল। প্রত্যেক ঘোড়ার ওপর রেসের সময় ওজন চাপিয়ে দেওয়া হয়। খুব ভাল মেরিটের ঘোড়া হলে ষাট কেজি জকি সমেত পিঠে উঠবে আর সাধারণ ঘোড়ার পিঠে পঁয়তাল্লিশ কেজির মতো চাপে। কোন ঘোড়া জিতলে পরের রেসে আরও পাঁচ কেজি বাড়তি চাপানো হয়। প্রমোশন পেয়ে ওপরে উঠলে ওজন কমে যায়। ডিকসন সাহেব বলতো, 'শরীরের ওজন কখনই আটচল্লিশ কেজির বেশী হতে দেবে না। কারণ ঘোড়ার পিঠে যে ওজন চাপাবে হ্যাণ্ডিক্যাপার তা থেকে তোমার ওজন বাদ যাবে। ধরো তোমার ঘোড়ায় ওজন চাপল পঞ্চাশ কেজি। যেহেতু তুমি চাপছ এবং তোমার ওজন আটচল্লিশ তাহলে মাত্র দু'কেজি বেশী ওকে বইতে হবে। যত কম ওজন ওর পিঠে উঠবে তত সে জোরে ছুটবে। হিসেব নিয়ে দেখা গেছে দেড় কেজি ওজন কম বেশী হলে দৌড়ের সময় একটি ঘোড়ার এক লেংথ আগুপিছু হয়ে যায়। তখন একদিকে ডিকসন সাহেব অন্যদিকে কামাল, দু'জনের কাছ থেকে দু'হাত ভরে কুড়িয়ে নিচ্ছিল বীরেন্দ্রনাথ। আর এণ্টনীর কাছে গিয়ে বসা যে আর এক অভিজ্ঞতা। ওর জীবনের বিভিন্ন উল্লেখযোগ্য রেসের কথা বলত এণ্টনী। সেগুলোতে সে কোন্‌টা ঠিক কোন্‌টা ভুল করেছে জেনে বীরেন্দ্রনাথ স্থির করে নিত সে নিজে দৌড়োলে কি করবে। এই করতে করতে বয়স আরো বাড়ল। ষোল বছর বয়সে ডিকসন সাহেবের চেষ্টায় সে একদিন স্বপ্নের দরজায় পা বাড়াল। মজার কথা, সে বছরই স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষা দিয়েছে। রেজাল্ট বেরুলে দেখা গেল তৃতীয় শ্রেণী তার কপালে জুটেছে। দিদি বোধহয় সেটুকুও আশা করে নি। বিভিন্ন পরীক্ষার পর বীরেন্দ্রর নাম রয়্যাল ক্যালকাটা টার্ফ ক্লাবে এ্যাপ্রেণ্টিস জকি হিসেবে নথীভুক্ত হল।

কাঁধের ওপর হাতের ছোঁয়া পেয়ে চমকে ফিরে তাকাল বায়রণ। পল হাসছে, 'কি এত তন্ময় হয়ে ভাবছিলে ?'

মাথা ঝাঁকালো বায়রণ, 'কিছু না, তোমার কাজ শেষ ?'

চোখে চোখ রাখল পল, 'হ্যাঁ। মার্টিন তোমায় কি বলছিল ?'

'মার্টিন ?' বায়রণ একটু সময় নিল ব্যাপারটা মনে করতে, 'ওহো, ও জিজ্ঞাসা করছিল আমি কবে এসেছি, কোথায় এসেছি, এই সব।'

'প্রিন্স সম্পর্কে কিছু জিজ্ঞাসা করে নি ?'

ইচ্ছে করেই অপ্রিয় কথা এড়িয়ে গেল বায়রণ, 'না। ও নিজের ঘোড়া সম্পর্কে খুব নিশ্চিত। কাউকে প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে ভাবছেই না।'

পলের মুখ বেঁকে গেল, 'হ্যাঁ, আমি লর্ড কৃষ্ণাকে দেখলাম। ওটা তো

প্রায় দৈত্যবিশেষ। তোমাকে খুব লড়তে হবে বায়রণ। আমি একটা পরিকল্পনা করছি সময়মতো তোমাকে বলব। আমাকে এই বাজী জিততে হবেই।'

পলের সঙ্গে কথা বলতে বলতে বায়রণ এগিয়ে যাচ্ছিল। ওপেন এয়ার বারের পাশে আসতেই ওর শরীর শক্ত হয়ে গেল। হঠাৎ পা থেকে মাথা অবধি সমস্ত রক্তে জ্বলুনি ধরল। হাফ প্যাণ্ট আর টিশার্ট পরা মোটাসোটা লোকটি পলকে দেখে হাত তুলল, 'তুমি মার্টিনের ঘোড়াটাকে দেখেছ? মনে হচ্ছে কেউ ওকে হারাতে পারবে না। দি রেস ইজ ওভার। কলকাতায় পড়ে থাকলে আমরা ওরকম ঘোড়া পাব না।' কথা বলতে বলতে তার নজর বায়রণের ওপর পড়ল। একটু যেন বিব্রত কিন্তু পরমুহূর্তে সেই ভাব কাটিয়ে উঠে একটা নকল হাসি ঝুলতে লাগল মিঃ কানিৎকারের মুখে 'হ্যালো বীরেন্দ্র।'

'আই অ্যাম বায়রণ সেইন। আপনি নিশ্চয়ই সেটা জানেন।' খুব ঠাণ্ডা গলায় বলল সে।

'হ্যাঁ হ্যাঁ আমি ভুলে গিয়েছিলাম। আমি তো সবাইকে বলেছি একসময় তুমি আবার সঙ্গে কাজ করেছ, আমি তার জন্যে গর্ব অনুভব করি। যখন শুনলাম তুমি পলের ঘোড়া রাইড করতে আসছ তখন খুব খুশী হয়েছি। এখন তো তোমার খুব নাম, আমি অবশ্য ভাবতে পারি না, কিন্তু সবই তো কপাল, কি বল?'

বায়রণের মুখ শক্ত হল, 'অনেকটা কিন্তু সবটা নয়। মানুষেরও হাত থাকে যেমন আপনার ছিল। আপনি যদি তখন ওই কাণ্ডটি না করতেন তাহলে আজ পল আমাকে ইনভাইট করতেন না।'

'আমি? আমি কি করেছি। লুক পল, বায়রণ কি বলছে দ্যাখো।' বুড়ো কানিংকার খ্যা খ্যা করে হেসে উঠল, 'আই হ্যাভ ডান নাথিং।'

বায়রণ আর দাঁড়াল না। লোকটাকে সহ্য করতে পারছে না সে। পল এতক্ষণ চুপ করে ছিল। হঠাৎ বায়রণকে হাঁটতে দেখে সে কানিৎকারকে নড করে ওর সঙ্গ নিল, 'কি হল? শুনেছিলাম তোমাদের মধ্যে এককালে—।'

'দশ বছর আগে। ওই লোকটা আমাকে কলকাতা থেকে তাড়িয়েছিল!'

'হাউ?'

'ওর জন্যে আমি সাসপেণ্ডেড হই '

'কেন?'

'সে বিরাট গল্প পল। ছেড়ে দাও ওসব কথা। লোকটার স্টেবলে এখন কি রকম ঘোড়া আছে?' পলের দিকে তাকাল বায়রণ।

পল হাসলো, 'গোটা পনের হবে। কানিৎকার সম্পর্কে পাণ্টারদের খুব ভাল ধারণা নেই। লোকে বলে ও নাকি কম দরের ঘোড়া ট্রাই করে না। ছেড়ে দাও, অন্যের কুৎসা গেয়ে আমাদের কি লাভ।'

শরীরে তখনও জ্বলুনি ছিল। এই দশ বছরের প্রথমদিকে সে অনেকবার ভেবেছে একদিন গিয়ে লোকটার ভুঁড়ি ফাঁসিয়ে দেবে। তার জীবন অন্ধকার করে দেবার বদলা নেবে। অথচ আজ হাতের কাছে পেয়ে শুধু ঘেন্না ছাড়া

তার অন্য কোন ইচ্ছে এল না। পলের গাড়িতে বসে গুম হয়ে রইল। মনে হচ্ছে আজ সারাটা সকাল নষ্ট হয়ে গেল।

বাইরে এখন কাঁচ কলাপাতার মতো রোদ উঠেছে। আলিপুরের রাস্তাটাকে ছবির মতো দেখাচ্ছে। ওরা সারাটা পথ কেউ কোন কথা বলল না। বাড়ির গেটের কাছে পল ওকে নামিয়ে দিয়ে চলে গেল। বলল তাকে এখনই একবার স্টেবলে যেতে হবে। লাঞ্চের আগে সে আসবে আলোচনা করতে।

কানিৎকারকে মন থেকে সরাতে পারছিল না বায়রণ। গম্ভীর মুখে সামনে দাঁড়াতেই দারোয়ান সেলাম করে গেট খুলে দিল। নিজেকে সহজ করার চেষ্টা করছিল বায়রণ। যা স্মৃতি তা ভুলে যাওয়াই ভাল। তাছাড়া আজ কানিৎকারের মতো ট্রেইনারকে কটা লোক জানে অথচ অল ইন্ডিয়া রেসিং ওয়ার্ল্ডে তার জনপ্রিয়তা বেশ সর্বজনস্বীকৃত। এটাই তো কানিৎকারের ব্যবহারের উপযুক্ত জবাব। তাহলে মন খারাপ করার কি আছে। প্যাসেজ দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে ওর চোখ পড়ল রেস্ট হাউসের লনের ওপর একটা রঙিন ছাতার তলায় শর্মা এন্ড শর্মারা বসে আছেন। এই সাতসকালে হরি শর্মা কেডস সাদা মোজা আর সাদা হাফপ্যান্ট গেঞ্জিশার্ট পরে ওর দিকে তাকিয়ে। মিসেস শর্মা কমলা রঙের ম্যাক্সীতে অঙ্গ ঢেকেছেন কিন্তু এখনও তাঁর চোখে রোদচশমা, চুল আঁট করে একটা রিং-এর ভেতর দিয়ে ঘাড়ের কাছে লাগানো। পাশে পাজামা পাঞ্জাবি পরে শ্যাম শর্মা নিষ্পাপ মুখে বসে আছে। ওকে দেখে হরি শর্মা মাথা নাড়লেন। চারটে বেতের চেয়ার টেবিলটি ঘিরে, খালি চেয়ারের দিকে যেতে যেতে বায়রণ ঘাড় নাড়ল, 'গুড মর্নিং স্যার।'

হরি শর্মা মাথা ঝাঁকালেন, 'গুড মর্নিং।'

'গুড মর্নিং ম্যাডাম!' রোদ-চশমার দিকে সাগ্রহে তাকাল বায়রণ। ঈষৎ মাথাটা দুলল কি দুলল না বোঝা গেল না। কিন্তু শ্যাম শর্মা বলে উঠল, 'হ্যালো, গুড মর্নিং! পল এলো না?'

'না। পল আমাকে নামিয়ে দিয়ে গেল। বোধহয় ওর কোন জরুরী কাজ আছে স্টেবলে। আপনারা কতক্ষণ এসেছেন?' শেষ প্রশ্নটা হরি শর্মার দিকে তাকিয়ে।

হরি শর্মা ঘড়ি দেখলেন, 'মিনিট দশেক। বসো।'

চেয়ার টেনে বসতেই মিষ্টি গন্ধটা নাকে এল। নিজের ঘামশুকনো শরীরে নিশ্চয়ই সুগন্ধ নেই, স্নান করতে পারলে সুবিধে হতো। সে উঠে দাঁড়াল, 'স্যার. আমাকে পাঁচ মিনিট সময় দেবেন?'

হরি শর্মা অবাক হতে গিয়ে হলেন না, নিঃশব্দে ঘাড় নাড়লেন। কোন-দিকে না তাকিয়ে নিজের ঘরে চলে এলো বায়রণ। এই শীতেও চটপট স্নান করে গোলাপী গেঞ্জী আর ক্রিম কালারের প্যান্টটা পরে ফ্রেশ হয়ে বেরিয়ে এল। এখন ওর শরীর থেকে এ্যাভন ব্ল্যাক সুয়েড কোলনের মৃদু অথচ মোলায়েম গন্ধ বেরুচ্ছে। মর্নিং স্পার্ট করে আসা গা ঘিনঘিনে ভাবটা আর নেই। এবার স্বচ্ছন্দে রোদ-চশমার মুখোমুখী বসে কথা বলা যায়।

শ্যাম শর্মার চোখে বিস্ময়সূচক প্রশংসা দেখতে পেল বায়রণ। এই পোশাক-টায় তাকে সুন্দর দেখায়। রোদ-চশমার প্রতিক্রিয়া বোঝা গেল না। চেয়ারে বসামাত্র ভারালুর পেছন পেছন একটা উর্দিপরা বেয়ারা চায়ের ট্রলি নিয়ে এলো। ভারালু ট্রলি থেকে নিজের হাতে চা ঢেলে ওদের সামনে পরিবেশন করল। সঙ্গে চিকেন স্যাণ্ডউইচের দুটো পাহাড়প্রমাণ প্লেট।

ভারালুরা চলে গেলে হরি শর্মা প্রশ্ন করলেন, প্রিন্সকে দেখেছ?'

'দেখেছি। এতক্ষণ তো ওকে নিয়েই কাটালাম।'

'কেমন দেখলে?'

'ফাইন। ঘোড়াটা মনে হয় কথা শুনবে।'

'আঃ ওসব সেন্টিমেন্টাল কথা জানতে চাইছি না। ওটায় চড়ে তোমার কি মনে হলো ইনভিটেশন জিততে পারবে?'

'দেখুন মিঃ শর্মা, রেসে কি হবে কেউ বলতে পারে না। পেডিগ্রি এবং পারফর্মেন্সের দিক থেকে মার্টিনের ঘোড়া খুব ভাল আছে। প্রিন্সকেও দেখলাম বেশ ফিট। এখন রেস রানের সময় বোঝা যাবে কে কিরকম রেসপন্স করছে।'

'কিন্তু বাজারে খবর মার্টিন নাকি রেস জিতছেই।'

'হতে পারে। কিন্তু রেস না শেষ হলে তো একথা বলা উচিত নয়। প্রিন্সের পক্ষে সুবিধে হলো সে নিজের মাঠে দৌড়োচ্ছে।' বায়রণ চায়ের কাপে চুমুক দিল।

'কিন্তু আমি জিততে চাই। আচ্ছা, মাদ্রাজ থেকে কুমারমঙ্গলম যে ঘোড়াটাকে নিয়ে এসেছে তাকে তুমি দেখেছ?'

'না স্যার।'

'দারুণ ঘোড়া। লর্ড কৃষ্ণাকে হারাতে পারলে ওই হারাবে, একথা রিপোর্টাররা লিখেছে।' শ্যামু শর্মা বলে উঠল।

হরি শর্মা ছেলের দিকে তাকালেন, 'কি নাম?'

'জুপিটার। কাল ছয়শ' মিটার প'য়ত্রিশ সেকেন্ডে ছুটেছে।'

'গড্। তাহলে তো আমার নো চান্স। কেমন ফ্যাকাসে দেখাল এবার হরি শর্মাকে। এক চুমুকে পুরো চাটা খেয়ে রুমাল বের করে মুখ মুছলেন হরি শর্মা।

হঠাৎ রোদ-চশমা নড়ে বসলেন, 'তোমরা লর্ড কৃষ্ণার কথা ভাবছ। কিন্তু মার্টিনের স্টেবলের আর একটা ঘোড়া ইনভিটেশনে দৌড়োচ্ছে। দি সান্। ওর কথা কেউ চিন্তা করছ না কেন?'

শ্যাম শর্মা বলল, 'হ্যাঁ, ঘোড়াটা ভাল। বোম্বে ডার্বি জিতেছে। লোকে বলে ওর ওনারশিপে মার্টিনের শেয়ার আছে। কিন্তু মার্টিন ট্রাই করবে লর্ড কৃষ্ণাকে দিয়ে। নইলে ওর ওনার ওকে খেয়ে ফেলবে।'

রোদ-চশমা বলল, 'কে বলতে পারে। মার্টিনকে বোঝা অত সহজ নয়। শুনেছি ও নাকি লর্ড কৃষ্ণাকেই গ্যালপ করাচ্ছে আর টাইম নিচ্ছে। কিন্তু মাইবয়কে লোকের সামনে আনছেই না।'

হরি শর্মা একবার স্ত্রীর দিকে তাকালেন। তারপর মাথায় হাত বোলাতে বোলাতে বললেন, 'তুমি কি এই মাইবয়কে দেখেছ সেইন ?'

'ইয়েস স্যার। ভেরি গুড হর্স।'

'দেন, আই হ্যাভ নো চান্স।'

'আমি তো আপনাকে বলেছি স্যার, রেস শেষ না হওয়া অবধি অপেক্ষা করুন। আমাদের কিছুই আগে থাকতে কল্পনা করা উচিত নয়।' বায়রণের কথা শেষ হওয়া মাত্র দেখা গেল পলের এ্যাম্বাসাডার বেশ দ্রুত গতিতে প্যাসেজ দিয়ে ভেতরে ঢুকে মার্সিডিজের পাশে দাঁড়াল। হরি শর্মার কপালে ভাঁজ পড়েছিল। পল দ্রুত দরজা খুলে ছুটে এল। ওকে খুব উত্তেজিত দেখাচ্ছে। কাছে এসে পল বলল, 'স্যার, ইটস এ নিউজ ফর আস। একটু আগে লর্ড কৃষ্ণার একটা এ্যাক-সিডেণ্ট হয়েছে।'

কথাটা বুঝতে কয়েক মুহূর্ত গেল। তারপরই হরি শর্মা লাফিয়ে উঠলেন, 'সত্যি ? তুমি সত্যি বলছ পল। মার্টিনের ঘোড়া এ্যাকসিডেণ্ট করেছে ? ওহ্, ভগবান, তোমাকে ধন্যবাদ।' উত্তেজনায় নিজেকে ভুলে তিনি পলের সঙ্গে হ্যাণ্ডশেক করলেন।

'হ্যাঁ স্যার। স্টেবলে ফেরার সময় রাস্তা ক্রশ করতে গিয়ে একটা গর্তে ওর পা পড়ে যায়। তারপরই খোঁড়াতে থাকে। মার্টিন ভেটেনারী সার্জেনকে নিয়ে ছোটা-ছুটি করছে পাগলের মতো। শুনলাম ও নাকি এক সপ্তাহের মধ্যে দৌড়োতে পারবে না।' পল হাসল।

সঙ্গে সঙ্গে উজ্জ্বল হয়ে উঠলেন হরি শর্মা। দেন আই অ্যাম উইনার। লর্ড কৃষ্ণা যখন নেই তখন আমার প্রিন্সকে কে আটকায়। আমি এবার ইনভিটেশন জিতব। সেইন, তোমার আর কোন ভয় নেই। আমার স্বপ্ন সফল হচ্ছে। কিন্তু, কিন্তু পল, আমাদের একবার মার্টিনের সঙ্গে দেখা করা উচিত। তাকে সমবেদনা জানিয়ে আসা উচিত, কি বলো ?' হাসতে হাসতে বললেন হরি শর্মা।

পল বলল, 'সেটা আমি আপনার হয়ে জানিয়ে দিতে পারি।'

'নো নো। ঘোড়াটা আহত হয়ে আমাকে ইনভিটেশন পাইয়ে দিচ্ছে আর আমি নিজে যাব না, তা কি হয় ? লেটস গো। আমরাই প্রথমে ওর কাছে গিয়ে দুঃখ প্রকাশ করে আসি। তোমরা আসবে নাকি ?'

রোদ-চশমা নীরবে ঘাড় নাড়লেন। না। শ্যাম শর্মা বলল, 'আমার একটু কাজ আছে পাপা—।'

বিরক্ত হলেন হরি শর্মা। কিন্তু আর সময় নষ্ট না করে মার্সিডিজের দিকে যেতে যেতে কি মনে করে পলের এ্যাম্বাসাডারেই গিয়ে উঠলেন। ওদের গাড়ি দ্রুত লনটাকে পাক খেয়ে বেরিয়ে গেল।

পুরো ঘটনাটা ছবির মতো ঘটে গেল। বায়রণ খুব অবাক হয়ে যাচ্ছিল। মার্টিনের সিস্টেমের কথা সে জানে। স্টেবল থেকে মাঠে আনার সময় সে খুব সজাগ থাকে যাতে ঘোড়ার কোন ক্ষতি না হয়। তাহলে আজ ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার সময় এরকম দুর্ঘটনা ঘটল কি করে। কেমন যেন অস্বস্তি হচ্ছিল ওর।

কথাটা শুনে হরি শর্মার আনন্দ হওয়া স্বাভাবিক। পথের কাঁটা দূর হলে কে না খুশী হয়। কিন্তু পল এসে খবরটা জানাতেই ওদিকে হরি শর্মার উল্লাসের পাশা-পাশি শ্যাম শর্মা এমন নিষ্প্রভ হয়ে গেল কেন? রোদ-চশমার প্রতিক্রিয়া সে বুঝতে পারছে না কিন্তু শ্যাম শর্মা কেমন যেন চুপসে গেছে।

বায়রণ বলল, 'ক্যালকাটার রেস গোয়ার্সরা একটা ভাল ঘোড়ার দৌড় দেখা থেকে বঞ্চিত হলো। ব্যাড লাক।'

আচমকা রোদ-চশমা প্রশ্ন করলেন, 'কাল রাত্রে আপনার কি হয়েছিল?'

অবাক হয়ে গেল বায়রণ। কালকের কথাটা তার এতক্ষণ খেয়ালই ছিল না। এমন কি হরি শর্মাও তাকে কোন প্রশ্ন করেন নি। এখন সমস্ত ব্যাপারটা মনে পড়তেই সে আড়ষ্ট হলো। হাসতে চেষ্টা করল, 'কিছুই নয়।'

একজন পুরুষের যা যা প্রয়োজন তাই তো পেয়েছিলেন, বোধহয় তার চেয়ে বেশী, কিন্তু তাতেও মন উঠল না কেন?'

বায়রণ শ্যাম শর্মার দিকে তাকাল। সৎ ছেলে হলেও ছেলে, কিন্তু ক্লিওপেট্রা একটুও সঙ্কোচ করছে না এ ধরনের কথা বলতে। সে ঠাণ্ডা গলায় জবাব দিল, 'সকলের মনের গঠন একরকম তো হয় না। তাই না।'

এবার শ্যাম শর্মা বলল, ডলিকে পাঠানো খুব ভুল হয়েছিল। ও নিশ্চয়ই আপনাকে বিরক্ত করেছে?'

চমকে ফিরে তাকাল শ্যাম শর্মার দিকে বায়রণ। ছোকরা বলে কি। কাল রাত্রে ডলি বলেছিল সে নাকি এই মালটিকে প্রাণ দিয়ে ভালবাসে। একে বিয়ে করে কণ্টিনেণ্টে চলে যাওয়ার প্ল্যান আছে। অথচ এর কথা শুনে মনে হচ্ছে কোন বেশ্যার কাজকর্ম নিয়ে বলছে।

রোদ-চশমার মুখ এখন বায়রণের দিকে স্থির হয়ে আছে। সে শ্যাম শর্মাকে জিজ্ঞাসা করল, 'মেয়েটি কি বিরক্তিকর?'

'ওর শরীর ছাড়া।' শ্যাম শর্মা উঠে দাঁড়াল, 'ডলি কি আপনাকে কিছু বলেছে, মানে, ইনভিটেশন কাপের ব্যাপারে?'

বায়রণ ধীরে ধীরে মাথা নাড়ল, হঁ্যা।

'আপনি কি ভেবেছেন?'

'মিঃ শর্মাকে জেতাবার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করব।'

সঙ্গে সঙ্গে শ্যাম শর্মার দুটো চোখ যেন জ্বলে উঠল। তারপরেই সে কয়েক পা এগিয়ে এল, 'আপনি কত টাকা চান?'

হাসল বায়রণ, 'আমি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।'

'ছাড়ুন ওসব কথা। আমি আপনাদের জানি। টাকা ছুঁড়লেই মুখ বন্ধ হয়ে যাবে। লর্ড কৃষ্ণ সরে গিয়ে খুব ভাল হয়েছে। আপনি আমার কথা শুনুন, এই রেসে আপনাকে হারতেই হবে। ওই বুড়ো ভামটা যা চাইছে তা হবে না।' সঙ্গে সঙ্গে ক্লিওপেট্রা ঘুরে বসল, 'আঃ শ্যাম, আমার সামনে এসব কথা বলো না।'

'তুমি চুপ করো।' ধমকে উঠল শ্যাম শর্মা, 'আমি যা বলছি তাই তোমাকে শুনতে হবে। হঠাৎ সতীত্ব মাথা চাড়া দিয়ে উঠল কেন?'

'সাট্ আপ।' বায়রণ দেখল উত্তেজনায় ক্লিওপেট্রার মুখ থরথর করে কাঁপছে, 'হাউ ডেয়ার য়ু আর। লাই দিয়েছি বলে মাথায় উঠবে।'

'ও। তাই নাকি? এখন দেখছি ভামটার হয়ে লড়ছ। যখন আমায় প্রেমবাক্য শোনাতে তখন মনে ছিল না? না, আমি চাই প্রিন্স হারুক। ওই বুড়োর দম্ভ শেষ হয়ে যাক। জুপিটারকে জিততেই হবে। আই হ্যাভ সেট্‌লড।'

শ্যাম শর্মার মুখে এই কথা শুনে হতভম্ব হয়ে গেল বায়রণ। জুপিটারকে জেতানোয় শ্যামের কি স্বার্থ বুঝতে পারছে না সে। বাবাকে হারাতে তো সে মার্টিনের ঘোড়াও জেতাতে চাইতে পারত। কুমারমঙ্গলম-এর সঙ্গে ওর কি সম্পর্ক? ততক্ষণে ক্লিওপেট্রা উঠে দাঁড়িয়েছেন। এক মুহূর্ত অপেক্ষা না করে হনহন করে লনটা পেরিয়ে মার্সিডিজে উঠে বসলেন তিনি। ড্রাইভার ছুটে এসে তাঁকে নিয়ে বেড়িয়ে গেল। ওঁর চলে যাওয়া দেখল শ্যাম শর্মা। তারপর দাঁতে দাঁত চেপে বলল, 'ডাইনি। আস্ত ডাইনি।'

'একথা বলছ কেন?' বায়রণ খুব নিচু গলায় জিজ্ঞাসা করল।

'বলব না কেন? আমার সঙ্গে প্রেম করে কিন্তু হাত ছাড়া কিছু ছুঁতেও দেয় না। নাচাচ্ছে আমাকে। ও চায় মার্টিনের ঘোড়া জিতুক। জিতলে মার্টিন ওকে অনেক টাকা দেবে। ডাইনি।' হিসহিস করে উঠল শ্যাম। বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেল বায়রণ। তারপর কোনরকমে জিজ্ঞাসা করল, 'একি কথা বলছ তুমি। মিসেস শর্মার কি টাকার অভাব?'

হা হা করে হাসল শ্যাম, 'আপনি বুড়ো ভামটাকে চেনেন না। শুধু ঘোড়া ছাড়া সব সম্পত্তি নিজের নামে রেখেছে। ডাইনিটাকে মাসে পাঁচশো করে হাতখরচ দেয়। ওর এখন অনেক টাকার দরকার। বুড়োটার দুটো স্ট্রোক হয়ে গেছে। আর একটা শক পেলেই হয়ে যাবে। জানেন, ডাইনিটা বলেছে কিছু টাকা হাতাতে পারলে ও আমার সঙ্গে কন্টিনেন্টে চলে যাবে। সে শোক বুড়ো সইতে পারবে না। বুঝেছেন?'

'তাই যদি হয়, মিসেস শর্মা জুপিটারকে ব্যাক করলেই পারেন, তোমার সঙ্গে মিলে-মিশে থাকা যায়।' বায়রণ কারণটা বুঝতে চাইছিল।

'পাগল। ও আমাকে একটুও বিশ্বাস করে না। যদি কুমারমঙ্গলমের সঙ্গে সেট্‌লড করে ওকে একটা পয়সাও আমি না দিই।'

'শ্যাম।'

'কল্ মি শ্যামু।'

'ওয়েল, শ্যামু, এয়ারপোর্টে কারা আমাকে ফলো করতে গিয়েছিল?'

'ওই ডাইনির লোক। ও চায় নি তুমি রাইড করো।'

'কি আশ্চর্য। উনিই হোটেলের বদলে এখানে নিয়ে এলেন।'

'মে বি, তোমাকে দেখার পর ও ধারণা চেঞ্জ করেছে। আমি ওকে বিশ্বাস করি না। ডলিকে কাল রাত্রেই স্যাক্ করা হয়েছে। বাট আই উইল টিচ হার।'

'যাহোক, তুমি আমার কথা শুনবে কিনা?'

'তোমার কি মনে হয় প্রিন্স জুপিটারকে হারাতে পারবে?'

'আই ডোণ্ট থিংক সো। তবে শুনেছি তুমি খুব বড় জকি। আমি কোন চান্স নিতে চাই না। কত টাকা চাও?'

বায়রণ বুঝল এখন এই ছেলের সঙ্গে কথা বলে কোন লাভ হবে না। সে উঠে দাঁড়াল, 'কথাটা যদি তোমার বাবা জানতে পারেন?'

'ডাইনি বলবে না। একমাত্র তুমি—তাহলে তোমাকে ফিরে যেতে দেব না।'

'ওয়েল। এরকম হলে তো আমায় ব্যাপারটা নিয়ে ভাবতে হয়।'

'গুড। আমি কাল রেসের আগে দেখা করব। গুডবাই।' শ্যাম শর্মা লন ছেড়ে প্যাসেজে গিয়ে দাঁড়াল। ওকে দেখে ভারালু ছুটে এল। বায়রণ আর অপেক্ষা করল না। রেস্ট হাউসে ফিরে এল সে।

নিজের বিছানায় শুয়ে ব্যাপারটা নিয়ে ভাবতে লাগল বায়রণ। মার্টিনের ঘোড়াটার কি সত্যি এ্যাকসিডেণ্ট হয়েছে? শ্যাম শর্মাদের এব্যাপারে কোন হাত নেই তো? তা যদি হয় তাহলে মার্টিন কিছুতেই ছাড়বে না। কিন্তু এসবই তো অনুমান, এ নিয়ে ভেবে কি লাভ। এখন সকাল নটা। বায়রণ ইণ্টারকমে কিছু খাবার পাঠিয়ে দিতে বলল। পল আসবে লাঞ্চের আগে। দেখা যাক ও ঘোড়া-দুটোর গোপন তথ্য তাকে জানায় কিনা। প্রত্যেক ট্রেনারের কাছে এরকম তথ্য থাকে। রেসের আগে জকিকে বলে দিলে অন্য ঘোড়ার ট্রেনারদের চমকে ভাল রেজাল্ট করা যায়।

একা একা ব্রেকফাস্ট সারল বায়রণ। তারপর রেসকোর্সে টেলিফোন করে মার্টিনের টেলিফোন নাম্বার জেনে নিল। সে এখনও স্টেবলেই আছে।

মার্টিন খুব বিরক্তির সঙ্গে টেলিফোন ধরল, 'হু দি হেল য়ু আর?'

'বায়রণ স্পিকিং।'

'ওঃ বায়রণ। তুমি শুনেছ কি হয়েছে? কলকাতা একটা নরককুণ্ড। সমস্ত রাস্তাঘাট খুঁড়ে রেখে আমার বারোটা বাজিয়ে দিল।' মার্টিনের গলায় হতাশা।

'ঠিক কি হয়েছিল?'

'ট্রেনিং শেষে সাহিসরা ঘোড়াগুলোকে ফিরিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল স্টেবলে। হঠাৎ লর্ড কৃষ্ণা লাফিয়ে ওঠে এবং গর্তে পড়ে যায়। ভি এস বলছে দিন সাতেক লাগবে সেরে উঠতে। ব্যাড লাক্।'

'লাফিয়ে উঠল কেন? ওর কি এরকম হ্যাবিট আছে?'

'না।'

'তাহলে?'

'তুমি কি বলতে চাইছ?' মার্টিনের গলা শক্ত হয়ে গেল।

'কিছু না। আচ্ছা, ঠিক আছে। গুডবাই।' টেলিফোনটা ছেড়ে দিল বায়রণ। যথেষ্ট হয়েছে। বায়রণ হাসল, মার্টিনের মনে এই চিন্তাটা ঢুকিয়ে দেওয়া দরকার ছিল। অবশ্য তাকেও পরে সে জেরা করবে কেন সে ওই প্রশ্নটা করল। সে তখন যাহোক একটা কিছু বলা যাবে।

কিন্তু একটা কথা তার কিছুতেই বিশ্বাস হচ্ছে না। ক্লিওপেট্রা টাকার জন্যে মার্টিনের ঘোড়াকে জেতাতে চাইবে? অসম্ভব। ইনভিটেশনে নিজের ঘোড়া জিতলে

হয়তো টাকাটা শর্মার হাতে চলে যাবে কিন্তু এত বড় একটা সাম্রাজ্যের মহারানীর টাকার অভাব মানতে মন চায় না। শ্যাম শর্মা কুমারমঙ্গলমের ঘোড়া জিতিয়ে কি পাবে ? একটি পরিবারের মধ্যে এই ত্রিমুখী প্রতিযোগিতার কোন কারণ ধরতে পারছিল না বায়রণ। ছেড়ে দাও এসব, নিজেকে বোঝাল, আমি হরি শর্মার ঘোড়া চালাতে এসেছি সেটাই মন দিয়ে চালাবো। দ্যাটস অল।

ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এল বায়রণ। লনে দাঁড়িয়ে ভারালু একটা মালীকে কিছু বলছিল এমন সময় বায়রণকে দেখতে পেয়ে এগিয়ে এল, 'কিছু প্রয়োজন আছে স্যার ?'

'নো থ্যাঙ্কস। পল আসবে, ওকে বলো আমি লাঞ্চের আগেই ফিরে আসব।' বায়রণ প্যাসেজে নামল।

ভারালু ব্যস্ত হয়ে উঠল, 'আপনি কি বাইরে যাচ্ছেন স্যার ?'

'হ্যাঁ, কেন ?'

'মানে বড় সাহেবের অর্ডার আছে, আপনার সিকিউরিটির জন্যেই—!'

'তার মানে ? আমি কি বন্দী ?'

'না, না, মানে— ।'

'লুক ভারালু, আমার যদি কিছু হয় তাহলে আমিই তার জন্যে দায়ী হবো। ঠিক আছে, এখানে কোথায় টেলিফোন আছে ?' উত্তেজিত গলায় প্রশ্ন করল সে।

'টেলিফোন ? ওই ঘরে আছে। কেন স্যার ?'

'আমি মিঃ শর্মার সঙ্গে কথা বলতে চাই।' বায়রণ সোজা ওই ঘরটায় চলে এল। পেছনে পেছনে এসে ভারালু বলল, 'হ্যাঁ, স্যার, আপনার কথা বলে নেওয়া উচিত। আমি চাকরি করি, চাকরি গেলে খাব কি।'

একবার ডায়াল ঘুরিয়ে লাইন পেল না বায়রণ। এনগেজড টোন বাজছে। সে রিসিভার নামিয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি রেস খেল না ?'

মাথা নাড়ল ভারালু, 'নো স্যার। আজ থেকে অনেক বছর আগে একদিন আমি দুশো টাকা হেরেছিলাম। তারপর থেকে প্রতিজ্ঞা করেছি আর রেস খেলব না। যা পরিশ্রম দিয়ে রোজগার হয় না তা আমার ভাগ্যে নেই। তাছাড়া, সত্যি যদি বলতে হয়, রেসে কোন গরীব বড়লোক হয় না।'

এবার রিং বাজলো। যে ধরল তাকে বায়রণ জানালো সে হরি শর্মার সঙ্গে কথা বলতে চায়। জানলো হরি শর্মা এখনো বাড়ি ফেরেন নি। রিসিভার নামিয়ে সে ভারালুকে বলল, 'যা কৈফিয়ত দেবার তা আমি তোমার সাহেবকে দেব। আমাকে বাধা দেবার চেষ্টা করো না।'

পেছনে না তাকিয়ে বেরিয়ে এল বায়রণ। সোজা প্যাসেজ দিয়ে হেঁটে গেট খুলে বাইরে চলে এল। রাস্তা ফাঁকা। মাঝে মাঝে একটা দুটো গাড়ি তীব্র বেগে ছুটে যাচ্ছে। বোধহয় এই পথে বাস চলে না। ট্যাক্সীরও চেহারা দেখা যাচ্ছে না। এখন বেশ মিষ্টি রোদ চারধারে ছড়ানো। বায়রণ হাঁটতে লাগল ডানদিকে।

প্রথম দিনটার কথা এখনও স্পষ্ট মনে আছে। আগের রাত্রে এক ফোঁটাও

ঘুমুতে পারে নি সে। উত্তেজনায় ছটফট করেছিল বীরেন্দ্র। এ্যাপ্রেণ্টিস হওয়ার পর দীর্ঘ তিনমাস তাকে শুধু রেস দেখতে হয়েছে আর মর্নিং স্পার্ট দিতে হয়েছে। রেস রান করার কোন সুযোগ সে পায় নি। চল্লিশটা রেস না জিতলে কোন জকির এ্যাপ্রেণ্টিসত্ব ঘোচে না। দশটা বাজি জেতা অবধি প্রতিটি এ্যাপ্রেণ্টিস পাঁচ কেজি, বিশটা অবধি সাড়ে তিন কেজি, ত্রিশটা অবধি আড়াই কেজি এবং শেষ দশটায় দেড় কেজি এ্যালাউন্স পায়। অর্থাৎ ঘোড়ার ওপর তার সামর্থ্য অনুযায়ী যে বাড়তি ওজন চাপানো হয়ে থাকে রেস শুরু হবার আগে, কোন এ্যাপ্রেণ্টিস জকি সেই ঘোড়ায় চাপলে ওই অনুপাতে ওজন কমিয়ে কিছু বাড়তি সুবিধে দেওয়া হয়। প্রথমদিন তাকে যে ঘোড়াটায় চাপতে নির্দেশ দিয়েছে ডিকসন সেটির বয়স পাঁচ এবং বি-ক্লাসে দৌড়োচ্ছে। ঘোড়াটার কোন কৌলিন্য নেই। ওই সিজিনে মাত্র একটি রেস জিতেছিল ঘোড়াটা কোনমতে। ঘোড়াটাকে সবাই এগারশ' মিটার ভাল ছোটে বলে জানে কিন্তু এদিন ওটা চৌদ্দশ' মিটার ছুটছে। মনে আছে, ভোর বেলায় জামাইবাবু তাকে ডেকেছিলেন, 'কিরে, তোর ঘোড়া আজ জিতবে ?'

কথা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল বীরেন্দ্রর। সে নিজেই জানে না তো বলবে কি ? কোন রকমে বলেছিল, 'জানি না।'

জামাইবাবু বলেছিলেন, 'যদি ট্রেনার বলে তোকে জোর ট্রাই করতে হয় তাহলে প্যাডকে যখন ঘুরবি তখন আমাকে জানিয়ে দিবি।'

আঁতকে উঠেছিল বীরেন্দ্র। বলে কি লোকটা। প্যাডকে ট্রেনাররা, মালিকরা এবং রেসকোর্সের কর্তা-ব্যক্তিরা থাকবেন। তাছাড়া প্যাডক ঘিরে হাজার হাজার মানুষ ঘোড়া দেখে নেয়। তখন জকিরা ঘোড়ার পিঠে ট্রেনারের নির্দেশ জেনে দর্শকদের সামনে এক আধ পাক ঘুরে মাঠে চলে যায় রেস করতে। সেসময় সামান্য কথা বলা প্রচণ্ড অপরাধ। জামাইবাবুকে কিছু বললে সবাই শুনতে পাবে এবং এই অপরাধে ওর লাইসেন্স বাতিল হয়ে যাবে। জামাইবাবু সেটা বুঝতে পারলেন। বললেন, 'আমি নেমবোর্ডটার দিকে থাকবো। যদি দেখিস ডিকসন বলছে তোকে ট্রাই করতে তাহলে আমার সামনে দিয়ে ঘোরার সময় ঘোড়াটার পিঠে একবার নড়ে চড়ে বসবি। মুখে কিছু বলতে হবে না। আমি ওই দেখে বুঝে নিয়ে টাকা লাগিয়ে দেব। তুই জানিস তোর ঘোড়ার আজ কত দর আছে ?

ঘাড় নেড়েছিল বীরেন্দ্র, না।

'পঞ্চাশের দর। দশটাকা খেললে পাঁচশো দশ টাকা পাওয়া যাবে। মনে থাকে যেন, শুধু আমার সামনে এসে নড়ে চড়ে বসবি।'

ঘাড় নেড়ে কোনরকমে সরে এসেছিল সে। এত দর তার ঘোড়ার। অর্থাৎ কেউ তাকে আমল দিচ্ছে না। যে কোনোদিন রেস করেনি সে জিতবে কি ? এণ্টনীর সঙ্গে গাড়িতে মাঠে যেতে যেতে ঘামছিল বীরেন্দ্র। এণ্টনী তার কাঁধে হাত রেখে বলল, 'নার্ভাস হচ্ছ কেন ? এই দিনটার জন্যেই তো এতদিন অপেক্ষা করছিলে। কোনদিকে না তাকিয়ে নিজের বিদ্যেমত চালাবে। প্যাডকে ট্রেনার যা বলবে সেই মতো চলবে। মনে রাখবে, ট্রেনারের কথা কখনো অমান্য করবে না। হয়তো অনেক এক্সপেরিয়েন্সড জকি তোমার রেসে দৌড়োচ্ছে। তাতে কি হয়েছে। তাদের

রাইডিংএর দিকে লক্ষ্য রেখো, অনেক কিছু শিখতে পারবে যা ট্রেনিংএর সময় শেখা যায় না।'

চুপ করে বসেছিল বীরেন্দ্র। মনে মনে বলেছিল, আই মাস্ট ট্রাই। কিন্তু একটা কথা ভেবে অবাক হল। এন্টনী একবারও বলল না, ওই একই রেসে সে বীরেন্দ্রের সঙ্গে অন্য ঘোড়া চালাবে। এ নিয়ে কোন ভ্রূক্ষেপই নেই তার।

সেদিনের প্রথম রেসই ছিল বি-ক্লাশের। অন্য জকিদের সঙ্গে সে জার্সি গায়ে দিয়ে যখন প্যাডকে এল তখন পা কাঁপছে। ডিকসন এগিয়ে এসে ওর হাত ধরল, 'কনগ্র্যাচুলেশন।'

হাসবার চেষ্টা করেও পারল না বীরেন্দ্র। সহিসরা তখন ঘোড়াগুলোকে নিয়ে আসছে প্যাডকে। এন্টনী তার ট্রেনারের সঙ্গে কথা বলছে, তাকে ঘিরে সেই ঘোড়ার দুই মালিক। বীরেন্দ্র চুপচাপ দেখল সে যে ঘোড়ায় চাপবে তার মালিক আজ প্যাডকে আসেন নি। অর্থাৎ তিনিও জানেন যে বীরেন্দ্র জেতাতে পারবে না। একটু বাদেই জকিরা একে একে ঘোড়ায় উঠতে লাগল। সাত নম্বর ঘোড়াটাকে কাছে নিয়ে আসা হলে ডিকসন বলল, 'এসো, জীবনের প্রথম রাইডিং শুভ হোক।' বলে তাকে প্রায় কোলে করেই ঘোড়াটার পিঠে চাপিয়ে দিল। লাগাম ধরে ছয় নম্বরের পেছন পেছন যেতে যেতে বীরেন্দ্রর সব গুলিয়ে গেল। ডিকসন কি ওকে ট্রাই করতে বলল? শুভ হোক মানে কি? উত্তেজনায় মনে হচ্ছিল কলজে ছিঁড়ে যাবে। প্যাডকে পাক দেবার সময় দর্শকরা ওকে দেখে চিৎকার করে উঠল, 'পড়ে যাস না দেখিস, এই খোকা লাস্ট করে ওজন কমা ঘোড়াটার।' মন্তব্যগুলো যেন আর কানে ঢুকছিল না। জামাইবাবুর কথাও সে ভুলে গেল। মাথা নীচু করে ঘোড়ার পিঠে বসে সে অন্যদের সঙ্গে প্যাডক ছেড়ে স্টার্টিং পয়েন্টের দিকে যাওয়া শুরু করল। ঘোড়াটা শান্ত। আপন মনে ছয় নম্বরের পেছন পেছন চলেছে। বীরেন্দ্র ডান দিকে তাকিয়ে আবার ঘামতে শুরু করল: তিনটে গ্যালারিতে হাজার হাজার দর্শক বসে আছে। এদের সামনে দিয়ে তাকে ঘোড়া ছোটাতে হবে। প্রথম দৌড় বলে তাকে চাবুক দেওয়া হয় নি। পাঁচ পাঁচটা রেস জেতার পর একজন এ্যাপ্রেন্টিস জকি চাবুক ব্যবহার করার সুযোগ পায়। চাবুক না থাকলে প্রয়োজনের সময় ঘোড়ার গতিবেগ বাড়ানো যায় না।

বীরেন্দ্র যখন চৌদ্দশ' মিটার রেসের স্টার্টিং পয়েন্টে পেঁছলো তখন আকাশভরা রোদ্দুর। ফুরফুরে হিমেল হাওয়া বইছে। সামনেই একটা লম্বা খাঁচায় খোপ করা আছে। প্রতিটি ঘোড়া স্টার্টারের নির্দেশে ওখানে ঢুকবে এবং সংকেত পেলেই দৌড় শুরু করতে হবে। প্রতি দুশো মিটার অন্তর অন্তর পাহারাদার আছেন, টি ভি ক্যামেরা চলছে, কেউ কোন অন্যায় সুযোগ নিচ্ছে কিনা দেখার জন্যে, কেউ ঘোড়াকে টেনে রাখছে কিনা বোঝার জন্যে।

সময় হতেই বীরেন্দ্র ঘোড়াটাকে খাঁচায় ঢোকাল। পাঁচ কেজি বাড়তি ওজন কমে যাওয়ায় এখন ঘোড়ার পিঠে শুধু বীরেন্দ্রর ওজন রয়েছে। অন্য ঘোড়াগুলো সে তুলনায় অনেক বেশী ভার নিয়ে দৌড়াচ্ছে। সব ঘোড়া খাঁচায় ঢুকে গেলে স্টার্টার নির্দেশ দিল দৌড় শুরু করার। দুই হাঁটু দিয়ে আঘাত করতেই

বীরেন্দ্রর ঘোড়া তীরের মতো বেরিয়ে এল দল ছাড়িয়ে। লাগাম হাতে ধরা, বীরেন্দ্র সামান্য ঝুঁকে বসে কিছুক্ষণ বাদেই বুঝতে পারল ওর সামনে কেউ নেই। সে আরো জোরে ছোটাবার জন্যে যাবতীয় কৌশল ব্যবহার করতে লাগল। ঘোড়াটা এগুচ্ছে ফুরফুরে পায়ে। হাজার মিটার, আটশো মিটার, ছয়শো মিটার মার্কগুলো পেরিয়ে যেতেই দূরে হৈ হৈ আওয়াজ উঠল। গ্যালারির লোকগুলো বিস্ময়ে চিৎকার করে উঠেছে। বীরেন্দ্র ঘাড় ঘুরিয়ে দেখল পেছনের ঘোড়াগুলো অনেক দূরে, অন্তত কুড়ি লেংথের ব্যবধান। সামনেই বাঁক। বীরেন্দ্র হঠাৎ লক্ষ্য করল ঘোড়াটা রেলিং থেকে সরে যাচ্ছে ওপাশে। যত সরে যাবে তত দূরত্ব বেড়ে যাবে। এই অবস্থায় হঠাৎ লাগাম টেনে ধরলে ও দাঁড়িয়ে পড়তে পারে। কি করা যায় কিছুতেই মাথায় ঢুকল না বীরেন্দ্রর। ঘোড়াটা অন্তত কুড়ি বাইশ হাত এপাশে চলে এল সহসা। বীরেন্দ্র তাকে কিছুতেই সোজা করতে পারল না। তবু এখনও অন্য ঘোড়াগুলো তাকে ধরতে পারে নি। তাদের পায়ের আওয়াজ এবং জকিদের মুখের শব্দ কানে আসছে। প্রাণপণে ছোটাতে চেষ্টা করল বীরেন্দ্র কিন্তু হায়, ঘোড়াটা ততক্ষণে বেদম হয়ে গেছে। আর একটুও শক্তি নেই ওর। উইনিং পোস্ট এখনও দুশো মিটার দূরে। ঘোড়াটার গতি যত হ্রাস হচ্ছে তত বীরেন্দ্রর নিঃশ্বাস প্রবল হচ্ছে। একটু বাদেই অন্য ঘোড়াগুলো তাকে টপকে বেরিয়ে যেতে শুরু করল। তুমুল উল্লাসের মধ্যে এন্টনী রেসটা জিতছিল। তাকে ধরতে অন্য ঘোড়াগুলো যখন তেড়ে আসছিল তখন এন্টনী নিজেরটাকে জোরে ছোটায় নি। পাল্লা দিতে গিয়ে অন্য ঘোড়ার দমও ফুরিয়ে এসেছিল। বীরেন্দ্রকে টপকে তারা যখন হাঁপাচ্ছে তখন সঞ্চিত শক্তির পূর্ণ সদ্ব্যবহার করে এন্টনী সবার পেছন থেকে রেস জিতে গেল। নির্ধারিত দূরত্ব অতিক্রম করে ঘোড়ার বেগ কমাতে আরো খানিকটা গিয়ে ফিরে আসে জকিরা। দূর থেকে বীরেন্দ্র দেখল এন্টনীর ঘোড়ার লাগাম ধরেছে তার মালিক এবং ট্রেনার। ছবি তোলা হচ্ছে। ঘোড়া নিয়ে ফিরে এল সে। সহিস দাঁড়িয়েছিল। তার হাতে লাগাম বাড়িয়ে দিতেই ডিকসন এগিয়ে এল। বুক দুরু দুরু করছিল বীরেন্দ্রর। ডিকসন সাহেব হাসলো, 'গুড। প্রথম রেসে যে লাস্ট হওনি এই জন্যে তোমাকে অভিনন্দন। না, ভালই চালিয়েছ কিন্তু ঘোড়াটা অত ওয়াইড হয়ে গেল বাঁক ঘোরার সময় যদি কন্ট্রোলে রাখতে এতক্ষণে মাঠ অন্ধকার হয়ে যেত। একসময় আমিই ভেবে বসছিলাম তুমি উইনার হয়ে যাচ্ছ।'

মাটিতে দাঁড়াবার পর বীরেন্দ্রর মনে হল তার দুই হাঁটু কাঁপছে। ইস, জিততে জিততেও পারল না সে? ডিকসনের গলা হঠাৎ পাল্টে গেল এবার, 'কিন্তু তোমার বোকামিতে আমার ক্ষতি হল।'

বীরেন্দ্র চমকে উঠল কথাটা শুনে, 'কেন স্যার?'

'শর্ট ডিস্টেন্সে ঘোড়াটা আর দর পাবে না। তুমি ওর সব মেরিট আজ দর্শকদের বুঝিয়ে দিয়েছ। যদি কখনো মনে করো তুমি জিততে পারবে না তাহলে কখনো কোন ঘোড়াকে পুরোপুরি ব্যবহার করো না। মালিকরা অনেক টাকা ব্যয় করে ঘোড়া কেনে তাকে পোষে, রেসের সময় যদি তারা দর না পায় তাহলে কি লাভ তাদের। এটা আনঅফিসিয়াল কথা কিন্তু ভুলো না।' ডিকসন

সাহেব চলে গেল পরের রেসের তদারক করতে। ড্রেসিং রুমে গিয়ে পোশাক বদলাবার সময় অন্য জকিরা তাকে কনগ্রাচুলেশন জানাল। জীবনের প্রথম রেস নাকি সে খুব ভাল চালিয়েছে। একজন বলল, 'এন্টনীর সঙ্গে তোমার যে এই পরিকল্পনা করা ছিল তা আমরা বুঝতে পারি নি।'

হতবাক বীরেন্দ্র জিজ্ঞাসা করেছিল, 'মানে ?'

'মানে তো সহজ। তুমি আগে স্পেস করে আমাদের কাহিল করবে আর সেই সুযোগে এন্টনী রেস জিতবে। চমৎকার।'

সেদিন আর কিছু করার ছিল না। শেষ রেসের পর এন্টনীর সঙ্গে দেখা হল। সেই প্রথম বাজীর পর আর অবশ্য এন্টনী রেস জেতে নি। দেখা হতেই জড়িয়ে ধরল, 'গুড। শুধু অভিজ্ঞতার অভাবেই তুমি হেরে গেলে। যদি জানতে ওই সময় কি করে ঘোড়াটাকে কন্ট্রোলে রাখতে হয় তাহলে জীবনের প্রথম রেসেই তুমি উইনার হতে। অবশ্য তোমার ওই ভাবে চালানোর জন্যেই আমি বাজীটা পেলাম। ধন্যবাদ।'

সেদিন রাত্রে জামাইবাবু পর্যন্ত প্রশংসা করেছিলেন। সে কোন ইঙ্গিত না দেওয়ায় জামাইবাবু টাকা লাগায় নি। কিন্তু আগে আগে ওভাবে ছুটতে দেখে ওই মুহূর্তে তার বীরেন্দ্রের ওপর খুব রাগ হয়েছিল। পরে হেরে যাওয়ার পর শান্তি হয়েছিল। না, শালা তাকে ঠকায়নি। জামাইবাবুর বন্ধুবান্ধবরা সবাই জেনে গেছে বীরেন্দ্র ওর শালা। তারা অবশ্য কিছুতেই বিশ্বাস করছে না যে এন্টনীর জেতার জন্যে ওইভাবে ছোটার প্ল্যান বীরেন্দ্রর অজানা ছিল। বীরেন্দ্রর মনে হলো ওটা জামাইবাবুরও ধারণা, সে চেষ্টা করেও ওটা দূর করতে পারবে না।

শনিবারে রেস। বুধবার এণ্ট্রি বের হয়, বৃহস্পতিবারে এ্যাকসেপটেন্স শুক্রবারে ফাইন্যাল বই। বৃহস্পতিবার রাত্রেই যে সব ঘোড়া শনিবারে ছুটবে তার ট্রেনার মালিক জকিদের পছন্দ করে। মাঝারী থেকে অখ্যাত জকিরা ওই দিনটিতে উন্মুখ হয়ে থাকে তারা রাইড পাচ্ছে কিনা জানবার জন্যে। প্রতিটি রেসে ঘোড়া চালানোর জন্যে একটা ফি দেওয়া হয়। খুবই সামান্য টাকা। কিন্তু অনেকগুলো রেস করলে তা যোগ হয়ে বড় অঙ্কে পরিণত হয়। তাছাড়া রেস জিতলে প্রাইজমানির একটা অংশ কিংবা টিপস পাওয়া যায়। খুব সফল জকি এ ছাড়াও লক্ষ লক্ষ টাকা রোজগার করতে পারে নানান পথে। কিন্তু বীরেন্দ্রের মতো জকিরা বৃহস্পতিবার উন্মুক্ত হয়ে থাকে একটা রাইড পাওয়ার জন্যে। প্রথম সিজনে মোট চারবার রেস করেছে বীরেন্দ্র। কখনোই প্রথম চারজনের মধ্যে আসতে পারে নি। কখনোই কোন ট্রেনার তাকে জেতার জন্য নির্দেশ দেয় নি। তাছাড়া সেইসব ঘোড়াগুলোও জেতার মতো ছিল না। এর ফলে রোজগার প্রায় বন্ধ। সামান্য যা পাওয়া যেত তা দিদির হাতে দিয়ে দিত বীরেন্দ্র। বড় জকিরা কি মেজাজে থাকে, মেয়ে মানুষ নিয়ে ফুর্তি করে, মালিকরা তোয়াজ করে—এই সব দূরে থেকে দেখতে হতো ওকে। পরের বছর ডিকসন সাহেব হঠাৎ একদিন ওকে ডেকে পাঠালেন। ক্লাস থ্রি ঘোড়ার একটা এগারশ' মিটার রেস হবে। বড় জকি

চাপালে ঘোড়াটার দর থাকবে একটাকায় আশী পয়সা। ওতে মালিকের খরচ উঠবে না। ডিকসনের বিশ্বাস ঘোড়াটা জিততে পারে। তিনি বীরেন্দ্রকে সুযোগ দিচ্ছেন। বীরেন্দ্র চাপলে দর বাড়বে কারণ জকি হিসেবে সে এখন দর্শকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে নি এবং কখনোই জেতে নি। বীরেন্দ্র ঘোড়ায় চাপলে ঘোড়াটার বাড়তি পাঁচ কেজি ওজন কমে যাবে। ওকে যা করতে হবে তা হল প্রথম থেকেই এভারেস্টকে আগে রেখে ছুটিয়ে আনা যাতে কেউ নাগাল না পায়। আর এই তথ্যটি যেন পৃথিবীর কেউ টের না পায়। সে যে একটা রেস জিততে যাচ্ছে তা যেন কাউকে না জানায়। কারণ জানাজানি হয়ে গেলে বুকিরা দর কমিয়ে দেবে।

উত্তেজনায় সেদিন ছটফট করেছিল বীরেন্দ্র। প্যাডকে নয়, আগে ভাগে একথা তাকে জানিয়ে দিয়েছে ডিকসন সাহেব। এখন আর কেউ তাকে জিজ্ঞাসা করে না সে রেস জিতবে কিনা। এমনকি জামাইবাবুও না। সবাই ধরে নিয়েছে সে কখনো উইনিং পোস্টের মুখ দেখবে না।

জীবনের প্রথম রেস জিতল সে এভারেস্ট ঘোড়ার পিঠে চেপে। হু হু করে ছুটে চলল ঘোড়াটা। বাঁক ঘোরার সময় একটুও ওয়াইড হল না। অন্য ঘোড়াদের থেকে সাত লেংথ আগে সে উইনিং পোস্ট পেরিয়ে গেল। দর বাড়তে বাড়তে সাড়ে চারের দর হয়েছিল ঘোড়াটার। শেষ মুহূর্তে এসে ঘোড়ার মালিক দশ হাজার টাকা লাগিয়ে ওটাকে কমিয়ে দিয়েছিলেন। আঃ, জিততে কি আরাম লাগে। দর্শকদের অবস্থা তখন ছুঁচো গেলার মতো। কেউ কেউ বলল জকি নয়, ঘোড়াটাই রেস জিতিয়েছে। যারা তার যোগ্যতাকে সন্দেহ করে অন্য ঘোড়া খেলেছিল তারা দ্বিতীয়বার ভাবতে বসল.। ডিকসন সাহেব মালিককে নিয়ে তার এবং এভারেস্টের ছবি তুললেন। সেদিন পাঁচশো টাকা টিপস পেয়েছিল বীরেন্দ্র। আনন্দে উথাল-পাথাল হয়ে বাড়ি ফিরে টাকাটা দিদির হাতে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে খাওয়া-দাওয়া করছে এমন সময় জামাইবাবুর প্রবেশ। কি অকথ্য গালাগালি শুনতে হয়েছিল সেদিন। কেন তাকে চেপে গেছে বীরেন্দ্র খবরটা? কেন তাকে আগে বলে দেয় নি যে এভারেস্ট জিতছে। তার নিজের টাকায় অন্য ঘোড়া খেলে তো নষ্ট হলই উপরন্তু বন্ধুদের কাছে বেইজ্জত হতে হল তাকে। জামাইবাবুর শেষবার শাসালো, আর যেন এরকম প্রতারণা সে না করে। মুখ বুজে কথাগুলো শুনতে হয়েছিল সেদিন। সে কি করে বোঝাবে ডিকসন সাহেবের নির্দেশ অমান্য করা যায় না। কারণ ডিকসন ছাড়া অন্য কোন ট্রেনার তাকে এই সুযোগ দেয় নি। আশ্চর্য, সেই রাত্রে দিদি কিন্তু জামাইবাবুর কথার একটুও প্রতিবাদ করে নি।

দশটা জিতলে তবে পাঁচ কেজির বদলে সাড়ে তিন কেজি অ্যালাউন্স হবে। জকিদের মধ্যে একটা ঠাট্টা চালু ছিল এই রকম, পাঁচ কেজি মানে টাকার গাছ, ঘর সাজানোর কাজ ছাড়া অন্য কোন প্রয়োজনে লাগে না। সিনিয়ররা তো বটেই দর্শকরাও তাদের পাত্তা দেয় না। কলকাতায় পাঁচ থেকে আড়াই কেজিতে নামতে বীরেন্দ্রর তিন বছর কেটে গেল। তিনটে বছরে দশটা রেস সে জিতেছে। এর

মধ্যে ডিকসন সাহেব হংকং চলে গেছেন। অন্য ট্রেনাররা প্রয়োজনে তাকে ডাকে কিন্তু সংখ্যা খুবই কম। কানাঘুষা শুরু হয়ে গেছে বীরেন্দ্র বাঙালী। কে একজন একদিন হাঁক ছেড়েছিল, 'আরে বাঙালী, তুই বে জকি না হয়ে মুদি হয়ে যা মানাবে ভাল'। উচ্চারণ শুনে সে বুঝেছিল কথকও বাঙালী। ডিকসন সাহেব বলেছিলেন, বাঙালী ইমেজ জকির পক্ষে ক্ষতিকর। রেসকোর্সে এলে সে পারতপক্ষে বাংলা বলে না। রিপন লেনে থাকার কল্যাণে হিন্দী এবং ইংরেজীটা তার যে-কোন অবাঙালীর মতো স্বচ্ছন্দে আসে। তবু গুজব ছড়াচ্ছিল যে সে বাঙালী এবং বাঙালীরা ভেতো হয়। ব্যাপারটা অসহায়ের মতো সহ্য করা ছাড়া কোন উপায় ছিল না। এই কলকাতায় এখন ঘোড়ার ট্রেনার প্রায় পনের জন। তাদের মর্জি হলে সে রাইড করার সুযোগ পেয়েছে, না হলে পায় নি। আর কখন রেসে জিতবে তা সে নিজেও জানতো না। ধরা যাক, হঠাৎ খবর পেল সে সামনের শনিবার মিঃ কানিংকারের দুটো রেসে চড়ার সুযোগ পাচ্ছে। সংগে সংগে পরম আনন্দে ছুটে গেল সে কানিংকারের কাছে। ভদ্রলোক খুব সিরিয়াস গলায় বললেন, 'তোমাকে দিয়ে আমি রেস জেতাতে চাই। আমি তোমাকে লাইমলাইটে আনব। তুমি শুধু আমার নির্দেশ শুনে যাবে।' যে-কোন জকি এ্যাপ্রেণ্টিস অবস্থায় এই-রকম ব্যাকিং না পেলে উন্নতি করতে পারে না। ফলে বীরেন্দ্র পুলকিত হল।

কানিংকারের দুটো ঘোড়া দৌড়োচ্ছে দুটো রেসে। একটার নাম নাইস অন্যটার নাম বিউটি। নাইস বি-ক্লাসের ঘোড়া আর বিউটি ক্লাস ওয়ানের। আজ অবধি সে কখনো ক্লাস ওয়ান ঘোড়া চাপে নি। ফলে ভেতরে ভেতরে খুব পুলক অনুভব করছিল। সহিসদের মুখে মর্নিং স্পার্ট দিতে গিয়ে সে শুনেছে কানিংকার সাহেব মনে করেন নাইসের কোন চান্স নেই জেতার। আর বিউটি যে জিতবেই তা সবাই জানে। স্বয়ং কানিংকারকে জিজ্ঞাসা করার সাহস তার নেই। সে জকি, ঘোড়া চালাবে কিন্তু ফলাফল হবে অন্যের নির্দেশে। অদ্ভুত নিয়ম। কারণ ঘোড়াটার ক্ষমতা হিসেব করা আছে ট্রেনারের, জকির নয়।

ফলে টালা থেকে টালিগঞ্জ জেনে গেল জামাইবাবুর কল্যাণে বিউটি জিতছে। এমনটি বীরেন্দ্র চালাচ্ছে জানা সত্ত্বেও রেস বইয়ে একেই দিনের সেরা ঘোড়া বলে চিহ্নিত করা হল। জামাইবাবু সেদিন বোধহয় ধার-ধোর করে পাঁচ হাজার টাকা লাগিয়েছিলেন। বিউটি ঘোড়ার ওপর ইভন্ মানিতে।

রেসের দিন এণ্টনীর সঙ্গে এক গাড়িতে কোর্সে এসেছিল সে। সে বছর এণ্টনী খুব একটা ভাল ফল করতে পারে নি। চ্যাম্পিয়নশিপের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় যে তিনজন লড়ছে তারা ওর থেকে অনেক এগিয়ে। এণ্টনী বলেছিল, 'বীরেন, আমরা জকিরা সাধারণ মানুষের মতো। মানুষ তাদের জীবনটাকে নিজেদের মতো গড়তে চায় কিন্তু অদৃশ্যে থেকে আর একজন সেই জীবন নিয়ন্ত্রণ করেন। হাজার চেষ্টা করেও মানুষ তাঁকে অস্বীকার কিংবা অমান্য করতে পারে না। বুঝলে?'

কথাটা সেদিন হাড়ে হাড়ে বুঝেছিল বীরেন্দ্র। প্রথম রেসটাই ছিল বি-ক্লাসের। প্যাডকে জার্সি পরে আসতেই কানিংকার হেসে বলল, 'ওয়েল বীরেন্দ্র, রেস শুরু

হওয়া মাত্র তুমি ঘোড়াটাকে তিন নম্বরে নিয়ে আসবে। বাঁক ঘোরার পরই হাঁটু দিয়ে নাইসের পেটে দ্রুত আঘাত করবে। এবং কখনই চাবুক ব্যবহার করবে না। শুধু দু মুঠোয় লাগাম ধরে নাইসের কাঁধে প্রেসার দেবে। আমি তোমাকে উইনার দেখতে চাই। রিমেম্বার, কখনো নাইসকে চাবুক মেরো না।'

হতবাক হয়ে গেল বীরেন্দ্র। নাইসকে জেতাতে হবে? পরপর তিনটে রেস দৌড়ে তিনটেতেই থার্ড হয়ে আছে নাইস। রোজই লিড নিয়েছে এবং অন্য ঘোড়াগুলো তাকে তাড়া করলে জকি আরো দ্রুততর করার জন্যে ওকে চাবুক মেরেছে। কিন্তু দেখা গেছে সে আর গতি বাড়াতে পারে নি। ওই তিনটে রেসেই নাইসের দর খুব কম ছিল। কানিৎকার এই কারণেই কি জকিদের চাবুক সম্পর্কে সাবধান করে নি। বীরেন্দ্র দেখল আজ নাইসের দর সাত। আশ্চর্য, কানিৎকার যেমন বলেছিল ঠিক তেমনটি করায় নাইস পক্ষীরাজের মতো উড়ে রেস জিতে গেল। আনন্দিত বীরেন্দ্র তখন জামাইবাবুর মুখ ভাবছিল জেতা ঘোড়ার পিঠে বসে। জামাইবাবু ভাববে সে এই খবরটা তার কাছে চেপে গেছে। হায়।

কিন্তু ডিভিডেন্ড ঘোষণা করার আগেই সাইরেন বেজে উঠল। রেসের পর সাইরেন বাজে তিনটি কারণে। কোন জকি যদি অভিযোগ করে উইনার ঘোড়ার জকি অসৎ উপায় অবলম্বন করেছে কিংবা রেসের বিচারকরা যাদের স্টুয়ার্ড বলা হয়, সন্দেহ করেন রেসটিতে গোলমাল আছে অথবা কোন ঘোড়া যদি শেষ মুহূর্তে দৌড়তে অক্ষম হয়। এক্ষেত্রে স্টুয়ার্ডরাই মনে করছেন নাইসের দৌড়ের মধ্যে কারচুপি আছে। গত তিনটি দৌড়ে এর চেয়ে কম দূরত্বে এগিয়ে থেকেও নাইস যাদের কাছে হেরে গিয়েছিল আজ অনেক বেশী দূরত্বে দৌড়ে সে কি করে সহজে জিতে গেল? জিজ্ঞাসাবাদ করার জন্য বীরেন্দ্র এবং কানিৎকারকে স্টুয়ার্ডদের সামনে তখনই হাজির হতে হল। সাইরেন শুনে সমস্ত মাঠ অধীর হয়ে রায় শোনার জন্যে অপেক্ষা করেছে। বেশীর ভাগ লোক ফেবারিট ঘোড়া খেলেছে ওই রেসে, নাইস সম্পর্কে কেউ আশা করে নি।

স্টুয়ার্ডরা প্রথমে বীরেন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করল তাকে কি নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। সে কানিৎকারের নির্দেশটি জানাল। কানিৎকারও বলল, ঘোড়াটাকে চাবুক মারলে গতি বাড়ে না বলে সে কাঁধে আঘাত করতে বলেছিল। ফলে আজ উল্টো ফল হয়েছে। নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে স্টুয়ার্ডরা রায় দিলেন রেসের ফলাফল অপরিবর্তিত থাকবে। ট্রেনার এবং জকির কথা নথীভুক্ত করা হল।

বাইরে বেরিয়ে এসে কানিৎকার ওর পিঠ চাপড়ে বলেছিল, 'সাবাস, তুমি যে আমার ডিরেকশন মনে রেখে বলতে পেরেছ তাই ধন্যবাদ।'

রায় শুনে মাঠে একটু চিৎকার চেঁচামেচি হলেও একসময় থেমে গেল। তবে একটা কথা এখনও ওর কানে লেগে আছে। কেউ গলা ফাটিয়ে বলেছিল, 'শালা চোর।'

শেষের আগের বাজী ছিল ক্লাস ওয়ান ঘোড়ার দৌড় অত্যন্ত দামী ঘোড়া সব। প্রত্যেকেই বিশেষ গুণের। প্যাডকে নেমে বীরেন্দ্র দেখছিল কানিৎকার সাহেব হাসিমুখে বিউটির মালিকের সঙ্গে আলাপ করছেন। ভদ্রমহিলা চল্লিশ উত্তীর্ণা কিন্তু খুকী সেজে এসেছেন। একটু স্থূল ফর্সা শরীর বেঁটের দিকে।

সবাই ওঁর পিঠের দিকে তাকিয়ে আছে কারণ সেটি সম্পূর্ণ উন্মুক্ত। বীরেন্দ্র পাশে এসে দাঁড়াতে দাঁড়াতে শুনলো ভদ্রমহিলা কথা শেষ করছেন, 'তাহলে আমি দু নম্বরকে ব্যাক করব?'

মাথা নেড়ে দ্রুত সম্মতি দিয়ে কানিৎকার বীরেন্দ্রকে নিয়ে পড়লেন, 'লুক বীরেন্দ্র, তোমার ঘোড়া আজ ফেবারিট। প্রাইস হল হাফ মানি। এভরিবডি নোস দ্যাট বিউটি মাস্ট উইন দ্য রেস। ও কে।'

তারপর মালিকানের সঙ্গে নীচু গলায় কথা বলে উদাস চোখে অন্য ঘোড়াগুলোকে দেখতে লাগলেন। সামনের টোটালাইজার বোর্ডে ঘোড়ার দর উঠছে। বিউটির কাঁটা সবাইকে ছাপিয়ে গেছে। বীরেন্দ্র দু নম্বরটাকে দেখল। এখন চারের দর। বিউটির মালিকান কেন দু নম্বরকে ব্যাক করতে বলল? নিজের ঘোড়া যখন জিতছে তখন অন্যের ঘোড়ায় কেউ টাকা লাগায়? বীরেন্দ্রর সব গুলিয়ে যাচ্ছিল। সামনে সহিসরা ঘোড়াগুলোকে পাক খাওয়াচ্ছে। খুব ছটফট করছে বিউটি। বড় সুন্দর ঘোড়াটা। পরপর অনেকগুলো বাজী জিতে দর্শকদের ফেবারিট হয়ে গেছে ও। হঠাৎ কানিৎকারের গলা কানে এল, 'নাউ আই উইল টেল ইউ সামথিং। মনে রাখবে এটা অফ দ্য রেকর্ড কথাবার্তা। আমরা চাইছি না এই রেসে বিউটি জিতুক।'

ফ্যাকাসে হয়ে গেল বীরেন্দ্র। কি বলছে কানিৎকার? বিউটির মতো ঘোড়াকে সে হারাবে কি করে? একজন জকির কর্তব্য রেস জেতা। সে অবাক হয়ে তাকাল। কানিৎকার হাসল, 'ভাল ড্রাইভার যে সে শুধু সামনেই চালাতে জানে না পেছনেও ব্যাক করাতে পারে। একজন ভাল জকি শুধু রেস জিততেই জানবে না তাকে জানতে হবে কি করে কারো সন্দেহ উৎপাদন না করে জেতা ঘোড়াটাকে হারানো যায়। এই কাজটি তোমায় করতে হবে। রাইডিং ফি ছাড়া তুমি দু হাজার টাকা পাবে এই কাজটির জন্যে। তোমাকে যা করতে হবে তা হল স্টার্টারের নির্দেশ পাওয়া মাত্র তুমি ঘোড়াটাকে পুস ক্যাব বদলে সামনে ঝুঁকে পড়ে ওর লাগামটা ধরে টানবে। এটা এত দ্রুত করতে হবে যে কেউ যেন টের না পায়। ওটা করলেই ঘোড়াটা স্টার্ট নিতে দশ লেংথ লেফট্ হয়ে যাবে। ইটস্ এ ফাস্ট রেস। বিউটি দশ লেংথ লেফট্ হয়ে গেলে ও আর রেস জিততে পারবে না তুমি হাজার চেষ্টা করলেও। সেই সময় তুমি কিন্তু এমন চেষ্টা করবে যাতে সবাই বুঝতে পারে তুমি অনেষ্ট। বুঝলেও এই কথাগুলো অফ দ্য রেকর্ড। রাত্রে টাকাটা আমার বাড়ি থেকে নিয়ে যেও।'

এই সময় টার্ফ ক্লাবের একজন অফিসার এসে দাঁড়াতেই কানিৎকার গলা তুললেন, 'যা বললাম তা মনে রেখ। স্টার্টিং সিগন্যাল পাওয়া মাত্র বিউটিকে সেকেন্ড পজিশনে নিয়ে যাবে। বাঁক ঘোরামাত্র-চার্জ করতেই বিউটি রেস জিতে যাবে। ও কে।'

হ্যাঁ কি না বলবে বুঝতে পারল না বীরেন্দ্র।

অফিসার বললেন. 'গুড ইনস্ট্রাকশন। এই রেস আপনার।'

কানিৎকার হাসল। তারপর পরম যত্নে তাকে বিউটির পিঠে চাপিয়ে দিয়ে

বলল, 'মনে রেখ।'

প্যাডকে যখন সে পাক খাচ্ছে বিউটির পিঠে চেপে তখন সবাই তাকে সোৎসাহে অভিনন্দন জানাল অগ্রিম। মাথা তুলতে পারছিল না বীরেন্দ্র। হঠাৎ জামাইবাবুর মুখ মনে পড়ল তার। জামাইবাবু আজ কি করবেন? এই ভীড়ে কোথাও আছে নিশ্চয়ই। বুক ছিঁড়ে যাচ্ছিল। আজ তাকে হারাতে হবে জেতা ঘোড়ায় বসে। ঘামতে ঘামতে সে অন্য জকিদের সঙ্গে বিউটিকে নিয়ে রওনা হল স্টার্টিং পয়েন্টের দিকে। বাঁ দিকের টোটালাইজার বোর্ডে দেখা যাচ্ছে বিউটির কোন প্রুফ দর নেই। আর বিউটি এত ফেবারিট বলেই দু নম্বর ঘোড়ার দর বেশ বেশী। বীরেন্দ্র নিজেকে বোঝাচ্ছিল তাকে এখন অভিনয় করতে হবে। যদি না করতে পারে তাহলে কানিৎকার তাকে ছাড়বে না। একজন ট্রেনার ইচ্ছে করলে একজন জকিকে চিরকালের জন্যে ডুবিয়ে দিতে পারে। আচ্ছা, এমনও হতে পারে সে স্বাভাবিক ভাবেই বিউটিকে চালিয়ে চেষ্টা করল জিততে কিন্তু অন্য ঘোড়াগুলোর কেউ তাকে হারিয়ে দিল। তাহলে তো আর কোন দায় থাকে না। দু নম্বর ঘোড়ার জকি তার ঘোড়াটাকে দৌড় করিয়ে পাশে নিয়ে এল। তারপর আফসোসের গলায় বলল, 'এই ব্যাচের সবাইকে আমি হারাতে পারি শুধু তোমারটিকে ছাড়া।'

তাকাল না বীরেন্দ্র, জবাব দিল না কিছু।

স্টার্টার নির্দেশ দেওয়ামাত্র সমস্ত ঘোড়া তীব্র বেগে খাঁচা থেকে বের হল এবং বের হওয়া মাত্র বীরেন্দ্রর মনে হল সে লাগামটাকে যথাযথ টানতে পারে নি। ফলে বিউটি স্বাভাবিক ভঙ্গীতে এগিয়ে যাচ্ছে অন্য ঘোড়াগুলোকে টপকে। দুশো মিটার রেস হয়ে গেছে এরই মধ্যে সামনে দু'নম্বর ছাড়া কোন ঘোড়া নেই। বীরেন্দ্রর খুব ভয় করছিল যদি বিউটি দু'নম্বরকে টপকে যায়? এই ভঙ্গীতে চললে সেটা করতে বেশী বেগ পেতে হবে না। টিভিতে তাদের ছবি উঠছে, দূরবিনের চোখ এখন স্থির, বীরেন্দ্রকে রেস করার স্বাভাবিক ভঙ্গী বজায় রাখতে হচ্ছে। বিউটি জিতে গেলে কানিৎকার তাকে শেষ করে ফেলবে। সে দেখল সামনেই বাঁক এবং বিউটি দু'-নম্বরকে প্রায় ছুঁয়ে ফেলেছে। সে ধীরে ধীরে বাঁ দিকের লাগাম টানতে লাগল। স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিল বিউটি এতে খুব বিরক্ত হচ্ছে। ওর মনে রেস জেতার উন্মাদনা এসে গিয়েছে বোধহয়। তাই বীরেন্দ্র যখন ওকে প্রায় টেনে ওয়াইড করে অন্য রেলিংএ নিয়ে এল তখন দু'নম্বর ঘোড়া অনেক এগিয়ে গেছে। এইদিকের রেলিংএ এসেও বিউটি দৌড় ছাড়ছিল না। বীরেন্দ্র দেখল এখন আর জেতার কোন সম্ভাবনা নেই। সে এবার বিউটিকে সোৎসাহে চাবুক মারতে লাগল দ্রুততর হবার জন্যে। কিন্তু দু'নম্বরকে আর ধরা গেল না।

দর্শকদের ধিক্কার আর গালাগালি ততক্ষণে সোচ্চার হয়ে উঠেছে। কানিৎকার একটা এ্যাপ্রেন্টিস জকিকে বিউটির ওপর চাপালো যে রাইডিং জানে না। গতি কমিয়ে অন্য ঘোড়াদের সঙ্গে যখন বীরেন্দ্র মাঠ ছেড়ে ফিরে আসছে তখন দু'নম্বর ঘোড়ার জকির ছবি তোলা হচ্ছে।

ঘোড়া থেকে নামতেই কানিৎকার এগিয়ে এল। তারপর চাপা গলায় বলল, 'ইউ স্টুপিড, তখন এত করে বললাম ঘোড়াটাকে খাঁচার মধ্যেই লেফ্‌ট করিয়ে দেবে সেটা মনে ছিল না? শালা, বাঙালী কখনো জকি হয়!'

'আই ট্রাইড।' ফিস-ফিস করে বলতে চেষ্টা করল বীরেন্দ্র। কিন্তু কানিৎকার আর দাঁড়াল না। আর সঙ্গে সঙ্গে সাইরেন বেজে উঠল। স্টুয়ার্ডরা এই রেসে গোলমাল সন্দেহ করে তদন্ত করবেন বলে ঘোষণা করেছেন। ওই টানা কাঁপা কাঁপা শব্দ কানে যেতে বীরেন্দ্রর শরীর হিম হয়ে গেল।

এখনও সেই তদন্তের কথা মনে আছে বায়রণের। চোখের সামনে মিথ্যে কথা বলেছিল কানিৎকার। সে জানিয়েছিল বীরেন্দ্রকে সে বেস্ট ঘোড়ার পরই চার্জ করতে বলেছিল বিউটিকে। সে জানতো এরকম করলেই বিউটি জিতবে। তার কোন বাসনাই ছিল না কারচুপি করার।

স্টুয়ার্ডরা তাকে প্রশ্ন করলে বুক ঢিপ ঢিপ করতে লাগল। সে কি করে বলে কানিৎকারের নির্দেশ ছিল ঘোড়াটাকে হারানো। সে খাঁচার মধ্যে লেফট্‌ করাতে পারেনি বলে বাধ্য হয়ে ওরকম করেছে। সে মুখ নীচু করে বলল, 'বাঁক ঘোরার সময় আমি কণ্ট্রোল করতে পারি নি।'

সঙ্গে সঙ্গে টিভিতে ওই দৌড়ের ছবি দেখানো শুরু হল। স্পষ্ট দেখা গেল বাঁক ঘোরার আগেই বীরেন্দ্র ইতস্তত করছে। এবং বাঁক আসার আগেই সে লাগামটাকে টেনে ধরেছে যাতে বিউটি ওয়াইড হয়ে যায়। স্টুয়ার্ডরা এ ব্যাপারে প্রশ্ন করলে মাথা নীচু করে থাকল সে। কানিৎকার বারংবার বলতে লাগল সে এ ধরনের কোন নির্দেশ বীরেন্দ্রকে দেয় নি। এবং সে যা নির্দেশ দিয়েছে তা একজন টার্ফ ক্লাবের অফিসার শুনেছে। স্টুয়ার্ডরা রায় দিল, ইচ্ছাকৃত ভাবে ঘোড়াটাকে হারানোর অপরাধে জকি বীরেন্দ্রকে ছয় মাসের জন্য সাসপেণ্ড করা হল। এই ছয় মাসের মধ্যে সে রাইড করতে পারবে না। ট্রেনার কানিৎকারকে এবারের মতো অব্যাহতি দেওয়া হল।

মাথা নীচু করে বেরিয়ে এসে হাউ হাউ করে কেঁদে ফেলেছিল বীরেন্দ্র। এখন সে কি করবে? সে যদি বলতো কানিৎকার তাকে ওই নির্দেশ দিয়েছিল তবে সেটা তো প্রমাণ করা যেত না। আর একবার বললে জীবনের মতো রেস করা শেষ হয়ে যেত। কোন ট্রেনার তাকে বিশ্বাস করত না সে ওটা করলে। কেউ আর ভরসা করে ওকে রাইড দিত না। দোষটা তারই। সে যদি খাঁচার মধ্যেই বিউটিকে আটকে রাখতে পারত তাহলে এইসব ঘটনা ঘটতো না। কিন্তু কানিৎকার এটা কি করল। তাকে বাঁচাবার কোন চেষ্টাই না করে নিজে পাশ কাটলো? হঠাৎ একটা উম্মত্ততা ওর মাথায় এল। সে এখন কানিৎকারকে গিয়ে ধরবে।

পোশাক পাল্টে সে যখন বাইরে এল তখন অন্য জকিরা তাকে দেখে সমবেদনা জানালো। একজন বলল, এসবই রেসের অঙ্গ। টেক ইট ইজি। রেস শেষ হবার পর এণ্টনী এল ওর কাছে। তখনও ফোঁপানি জাগছে বীরেন্দ্রর বুকে। এণ্টনী ওর কাঁধে হাত রাখল, 'এত আপসেট হলে চলবে?'

'আমার কোন দোষ নেই।' বীরেন্দ্রর ঠোঁট কাঁপছিল।

'ছেড়ে দাও এসব কথা। ছ'টা মাস এমন কিছু বেশী সময় নয়।'

সেদিন এণ্টনীর সঙ্গে রেসকোর্স ছেড়ে বের হবার সময় দর্শকদের মুখে এত গালাগাল শুনতে হয়েছিল যে বীরেন্দ্রর মনে হয়েছিল এর চেয়ে মরে যাওয়া ভাল। এণ্টনী ওর হাত শক্ত করে চেপে ধরেছিল। ভিক্টোরিয়ার কাছে এসে জিজ্ঞাসা করেছিল, 'কানিৎকার তোমাকে কি দেখা করতে বলেছে ?'

মনে পড়ে গেল বীরেন্দ্রর। হ্যাঁ, কানিৎকার তাকে দু'হাজার টাকা রাত্রে ওর বাড়িতে গিয়ে নিয়ে আসতে বলেছিল। ওই সময় লোকটাকে ধরবে সে। এণ্টনীকে কিছু না বলে চুপ করে থাকল বীরেন্দ্র। প্রশ্নটা করে ওর দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়েছিল এণ্টনী। বীরেন্দ্রর মুখ দেখে বলল, 'এমন কিছু করো না যাতে তুমি বিপদে পড়বে। কানিৎকার কিছু দিতে চাইলে নিয়ে নিও।'

অথচ কানিৎকার তার সঙ্গে দেখাই করল না। সন্ধ্যে সাতটায় মিসেস কানিৎকার তাকে জানালেন যে ওর খুব মাথা ধরেছে, শুয়ে পড়েছেন। তাছাড়া বীরেন্দ্রর সঙ্গে তার কথা হলা উচিত নয়। পাঁচজনে কথা বলবে। এবং যেহেতু বীরেন্দ্র তার নির্দেশ মানে নি, তাকে লোকচক্ষে হেয় করেছে তাই কোন কিছু দেওয়া এই মুহূর্তে সম্ভব নয়। নিষ্ফল আক্রোশ বুকে নিয়ে সেদিন ফিরে আসতে হয়েছিল বীরেন্দ্রকে। পৃথিবীটা তখন শূন্য মনে হচ্ছিল। সে কি করবে ? মাত্র ষোল বছর বয়সেই জীবন শেষ হয়ে যাবে।

সে রাতে বাড়ি ফিরতেই জামাইবাবুর মুখোমুখি হয়েছিল সে। যার পরিণতিতে বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে আসতে হয়েছিল তাকে। সেই রাত্রে একদম নিঃস্ব অবস্থায় এণ্টনীর বাড়িতে উপস্থিত হয়েছিল বীরেন্দ্র। এণ্টনী সব শুনে ওর স্ত্রীর দিকে তাকিয়েছিল। স্ত্রী এগিয়ে এসে ওর হাত ধরেছিল, এত ভেঙে পড়ছ কেন ? তোমার বয়স অল্প। সারাটা জীবন এখন সামনে পড়ে আছে। তোমাকে নিজের পায়ে দাঁড়াতে হবে।'

আজ এই সকাল পেরোনো সময়টাতে ইলিয়ট রোডে ঢুকে বারংবার এইসব কথা মনে পড়ছিল বায়রণের। সেই রাত্রে এণ্টনী আশ্রয় না দিলে এবং পরদিন সেই চিঠিটা না লিখলে সে আজ কোথায় থাকত। আর হয়তো এটা আশ্চর্যের ব্যাপার, গত দশ বছরে এণ্টনীর সঙ্গে তার একদিনও সাক্ষাৎ হয় নি। কলকাতার জকিরা অনেকেই রেস করতে বোম্বে মাদ্রাজ যায়। এণ্টনী যেত না। কিংবা এত প্রসিদ্ধি ছিল না যে ওখানকার ট্রেনাররা ওকে ডেকে নিয়ে যাবে। কিন্তু চিঠিপত্রে যোগাযোগ ছিল। এই দশ বছরের শেষ দিকে সূত্রটা অবশ্য ঢিলে হয়ে এসেছিল। প্রথম থেকেই এণ্টনী চিঠি লিখতো আয়তনে ছোট এবং খুব নির্লিপ্ত ভঙ্গীতে। শেষ দিকে ব্যস্ততার মধ্যে খেয়াল থাকতো না বায়রণের। মনে পড়লে ক্ষমা চেয়ে লিখতো কিন্তু তার জন্যে কোন অভিমান করা তো দূরের কথা প্রত্যুত্তরে ওসব উল্লেখই করত না।

ইলিয়ট রোডের ট্রাম লাইনটা যেখানে বাঁক নিয়েছে সেখানে এসে বায়রণ দেখল দশবছরেও একটু বদলায় নি জায়গাটা। সেই নোংরা, সেই রিক্সার ঠুনঠুন

আওয়াজ, লপেটা ছেলেদের গল্পতানি সমানে চলিছে। বায়রণকে দেখে ওরা একটু অলস চোখে তাকাল কিন্তু কেউ তাকে চিনতে পারল না। বাঁ দিকের গলিতে ঢুকে একটু এগিয়ে গেলেই লোহার গেটটা চোখে পড়ল। আধখোলা, সেই দশবছর আগে যেমন থাকতো। পোর্টিকোতে ঢুকে কাউকে দেখতে পেল না সে। বারান্দায় উঠে বেল বাজালো বায়রণ। দরজাটা খুললো এন্টনী।

প্রথমে বিরক্তি, তারপর বিস্ময় এবং সবশেষে হাসি ফুটল এন্টনীর মুখে, 'হ্যালো!' এন্টনী দরজাটা পুরো খুলে দিয়ে ঘাড় নাড়ল, 'তোমাকে এখানে দেখতে পাব আশা করি নি। তোমার আজকে বের হওয়া উচিত ছিল না।'

বায়রণ অবাক হয়ে দেখছিল। এন্টনীর চেহারা কি বদলে গেছে! রোগা দড়ি পাকানো চেহারায় বয়স পাকা আসন পেতে বসেছে। শেষ কথাটা শুনে আহত হল সে। দরজায় দাঁড়িয়েই জিজ্ঞাসা করল, কেন?'

'কাল এবং পরশু দুটো বড় রেস করবে তুমি, এখন কোন রিস্ক নেওয়া উচিত নয়। তোমার ওপর অনেক মানুষ নির্ভর করছে।'

'রিস্ক? সে তো ঘোড়ায় চেপেও এ্যাকসিডেন্ট হতে পারে!'

'পারে। তবু সতর্কতা ভাল। ভেতরে এসো।'

ঘরটার সর্বাঙ্গে দারিদ্র্য। সোফাগুলোকে দশ বছরেও পাল্টানো না হওয়ায় আরো জীর্ণ দেখাচ্ছে। তার একটায় ওরা দুজনে বসল। বায়রণ বুঝতে পারছিল না সে আসায় এন্টনী খুশী হয়েছে কিনা। জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি কেমন আছেন?'

কাঁধ ঝাঁকালো এন্টনী। যার দু'রকম মানে হয়।

'কাল পরশু আপনি রাইড করছেন না?'

'করছি। পরশু বি-ক্লাসের একটা ঘোড়ায় চড়ব।'

'এরকম হল কেন? আপনি তো একসময় কলকাতার সেরা জকিদের মধ্যে ছিলেন!'

কপালে আঙুল ছোঁয়ালো এন্টনী, 'মানুষ এটাকে অস্বীকার করতে পারে না। তাছাড়া আমার বয়স হয়েছে।'

'এত কম রাইডিং পেলে আপনার সংসার চলবে কি করে?' প্রশ্নটা করতে দ্বিধা হচ্ছিল কিন্তু না করেও পারল না সে।

মুখ তুলল এন্টনী। সত্যি বৃদ্ধ দেখাচ্ছে এখন। দুটো চোখ কিছুক্ষণ বায়রণের মুখের ওপর রাখল। তারপর বলল, "পৃথিবীতে কোন কিছু কারো জন্যে অপেক্ষা করে না বীরেন। আজ নোবডি ওয়ান্টস মি। আমাকে এটা মানতে হবে। সারাজীবন কেউ উইনার ঘোড়া চালায় না। মাঝে মাঝে তাকে আউট অফ ফ্রেম ঘোড়াও চালাতে হয়। আমি মেনে নিয়েছি।'

'এসব কথা আমাকে জানান নি কেন?'

হেসে ফেলল এন্টনী, 'জানালে তুমি কি করতে? প্রত্যেক মানুষকেই তার ভাগ্যের মুখোমুখি হতে হয়। এর জন্যে আমার কোন আফসোস নেই বীরেন। এককালে তুমি ঘোড়ায় চড়লে লোকে আর সেটাকে পছন্দ করত না। এখন সেটা

আমার ক্ষেত্রে হয়েছে। তার মানে এই নয় যে আমি ভাল চালাই না, ট্রেনাররা মনে করেন আমাকে উইনার ঘোড়া দেবেন না তাই দেন না। দ্যাটস অল।' কথাটা শেষ করে এন্টনী উঠে দাঁড়াল। তারপর ইঙ্গিতে ওকে বসতে বলে ভেতরে চলে গেল।

কিছুক্ষণ হল ভেতর থেকে একটু উত্তেজিত কণ্ঠ ভেসে আসছিল ' এন্টনী সেটাকে থামিয়ে দেবার জন্যে উঠে গেল। মেয়েলি কণ্ঠ। মিসেস এন্টনীকে কোনদিন ওই ভঙ্গীতে চিৎকার করতে শোনে নি সে, পায়ের শব্দ হতেই দরজার দিকে তাকাল বায়রণ। মিসেস এন্টনী। বেশ মোটা হয়েছেন, স্কার্টের কাপড় বোধহয় কম হয়ে গেছে। মুখও স্ফীত, চুলে হেয়ারড্রেসারের কায়দা।

'ও মাই গড। সেই ছোট্ট বীরেন? ওফ্, তুমি কত বড়ো হয়ে গেছো। আমরা তোমার জন্যে খুব গর্বিত। সবাইকে বলি বাইরণ সেইন, আমার, আমার—কিন্তু কেউ আমাকে বিশ্বাস করে না।' মিসেস এন্টনীর শরীরটা নৃত্যের ছন্দে এগিয়ে এসে বায়রণের পাশে বসতেই সোফাটা আর্তনাদ করে উঠল। দু'হাতের থাবায় বায়রণের হাত ধরে বাচ্চা মেয়ের মতো হাসতে লাগলেন মহিলা। বায়রণ আদর-পর্বটি শেষ হতে দিয়ে বলল, 'আপনি কেমন আছেন?'

'ফাইন। দেখে বুঝতে পারছ না কি মোটা হয়ে গেছি। মিঃ বিয়ারের কীর্তি এইটে। তুমি ওর কথা শুনেছ তো?'

মাথা নাড়ল বায়রণ। কিন্তু মুখে কিছু বলল না।

'আমি ওকে বলি, আর কেন? এবার রেস ছেড়ে দাও। হয় ট্রেনার হও নয় কোন ব্যবসা করো। বয়স হয়েছে যখন তখন সেটাকে মানতে হবে তো। কিন্তু কে কার কথা শোনে। ওরা রাইড দিতে চায় না, উইনার দেয় না, তবু উনি ছাড়বেন না।' বিরক্তিতে মুখ বেঁকালেন মহিলা। তারপর চট করে আবার বায়রণের কব্জি ধরলেন উনি, 'তুমি তো ইনভিটেশন দৌড়োতে এসেছ। আমি এন্টনীকে বলেছিলাম, মানুষ বড়ো হলে পুরোন কথা ভুলে যায়। বীরেন আমাদের খোঁজ নেবে না। ও শুনে বলছিল, দেখি। তুমি এসেছো আর আমার কথা মিথ্যে হল। কিন্তু এত আনন্দ হচ্ছে যে কি বলব। এবার বলো, তুমি কোন্ ঘোড়াটাকে জেতাবে বলে মনে করছ?' শক্ত হয়ে গেল বায়রণ। এখানেও এই কথা। যে বাড়িতে এসে তার জকি হবার স্বপ্ন দেখা শুরু হয়েছিল সেই বাড়িতে এমন অনুরোধ শেষ পর্যন্ত শুনতে হল? এই সময় এন্টনী দু'কাপ কফি নিয়ে ঘরে ঢুকল। বোঝা যাচ্ছে ওটি এন্টনীরই বানানো। একটা কাপ বায়রণের হাতে ধরিয়ে দিয়ে নিজে অন্যটি নিয়ে উল্টোদিকের সোফায় বসল।

মিসেস এন্টনী ওর দিকে তাকিয়ে আছেন। বায়রণ নীচু গলায় বলল, 'আমি দুটো ঘোড়াকেই জেতাতে চেষ্টা করব।' এন্টনীর সামনে এইসব কথা বলতে ওর সংকোচ হচ্ছিল। মিসেস এন্টনী স্বামীর সামনে তার কাছে টিপ চাইছেন। ভাবা যায়? যে এন্টনীর কাছে এককালে গাদা গাদা মানুষ আসত টিপ চাইতে এবং ছোট্ট বীরেন মুগ্ধ হয়ে সেসব শুনতো, আজ কি করে ভূমিকা বদল করে। বায়রণ ঘাড় নাড়ল, 'এরকম অল-ইন্ডিয়া রেসে বলা যায় না কোন্ ঘোড়া জিতবে।'

মিসেস এণ্টনী যে কথাটা বিশ্বাস করলেন না সেটা বোঝা গেল। এক সময় পায়ের শব্দ পাওয়া গেল। বায়রণ দেখল দুটি মেয়ে অতি উগ্র সাজ নিয়ে বাইরে থেকে এল। দু'জনেরই পরণে জিনসের প্যাণ্ট সার্ট। হাতে বেশ বড়সড় কয়েকটা কাগজের প্যাকেট। ওরা ঘরে ঢুকে কোনদিকে তাকাল না। সোজা এসে মিসেস এণ্টনীর দু'গালে দুজন চুমু খেয়ে ভেতরে ঢুকে গেল। একরাশ পারফিউমের গন্ধ ঘরটায় এখন ঘুরছে। বায়রণ দশ বছর আগে কখনো দ্যাখে নি। সে একটু উৎসুক চোখে মিসেস এণ্টনীর দিকে তাকিয়েছিল। ভদ্রমহিলা হাসলেন, 'মাই গার্লস। সো সুইট। ওহো, তোমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেওয়া হল না।'

এণ্টনীর কফি খাওয়া হয়ে গিয়েছিল। সে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'ঠিক আছে। বীরেন, তুমি এখানে কতদিন থাকছ?'

ইঙ্গিতটা বুঝতে পেরে বায়রণ উঠে দাঁড়াল। বলল, 'পরশু সন্ধ্যের ফ্লাইটেই ফিরে যাব। আচ্ছা, আমি চলি আজকে।'

মিসেস এণ্টনী আঁতকে উঠলেন, 'সেকি! এত তাড়াতাড়ি চলে যাবে? না, না, তুমি আমাদের সঙ্গে লাঞ্চ সেরে যাও।'

বায়রণ দেখল এণ্টনী ধীরে ধীরে হেঁটে দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে তার জন্যে অপেক্ষা করছে। সে হাসল, 'দুঃখিত। আমাকে লাঞ্চের আগেই ফিরে যেতে হবে।'

মিসেস এণ্টনীর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বায়রণ এণ্টনীর সঙ্গে বাইরে এল। সে বুঝতে পারছিল কোথায় যেন সুর কেটে গেছে। চিঠিপত্রে যেটা বুঝতে পারে নি সাক্ষাতে সেটা টের পাওয়া যাচ্ছে। কিছুক্ষণ ধরে একটা চিন্তা তার মাথায় পাক খাচ্ছিল। কিন্তু এণ্টনীকে সেই কথাটা কিভাবে বলা যায়? সে ঠিক করল, ফিরে গিয়ে এণ্টনীর নামে একটা মোটা টাকার চেক পাঠিয়ে দেবে। গুরু দক্ষিণা নয়, অন্তত নিজের মনের ওপর আজ যে চাপ পড়ছে সেটা সরে যাবে। গেট অবধি এসে এণ্টনী বলল, 'বীরেন, তুমি এখন বিখ্যাত হয়েছ। কিন্তু ভুলে যেও না, একজন জকির খুব খ্যাতি অনিশ্চিত। তাই তোমার উচিত ভবিষ্যতের জন্যে সঞ্চয় করা।'

নীচু গলায় বায়রণ বলল, 'যদি কিছু মনে না করেন, কি—'

কথাটা শেষ করতে দিল না এণ্টনী। খপ করে বায়রণের হাত চেপে ধরে বলল, 'নো। যে শেষ হয়ে গেছে তাকে কোরামিন দিয়ে বাঁচাবার কোন মানে হয় না। তুমি তো মিসেস এণ্টনীকে দেখলে। আগে কখনো এরকম দেখেছ, সো ফর্মাল? কিন্তু ও আমাদের সংসার বাঁচিয়ে রেখেছে। যে মেয়ে দুটিকে দেখলে তারা ওর পেয়িং গেস্ট। দে আর কল গার্লস, মাঝে মাঝে মিসেস এণ্টনীর অনুমতি নিয়ে বাড়িতেও কাস্টমার নিয়ে আসে পছন্দ মতো। বুঝতেই পারছ আমি খুব ভাল আছি, অন্তত খাওয়া পরার অভাব নেই। নেক্সট মাসে এলে দেখবে হয়তো ছেঁড়া সোফাগুলো নতুন হয়ে গেছে। তাই, আমার জন্যে চিন্তা করো না। গুডবাই।'

কথা শেষ করে আর একটুও দাঁড়াল না এণ্টনী। হন-হন করে ভেতরে ফিরে

গেল। কয়েক মুহূর্ত স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল বায়রণ। এখন মাথার ওপর রোদ্দুর খানিকটা তেজ পেয়েছে। জীবনের রেস কি মাঠের রেস থেকে কম বিচিত্র? মোটেই নয়। কেউ তো পিছিয়ে পড়তে চায় না। কিন্তু এন্টনীকেও শেষে এই ব্যবস্থা মেনে নিতে হল? একজন জকির শেষ পর্যন্ত এ ছাড়া উপায় কি। বেতো মোটা ঘোড়ায় কি কেউ ইচ্ছে করে রাইড নেয়? জিততে পারবে না জেনেও তো সেই ঘোড়ায় রেস করতে হয়।

রেস্ট হাউসে ফিরে এলে ভারালু বলল, 'স্যার, আপনার খোঁজে আমি চারধারে লোক পাঠিয়েছি। বড়সাহেব খুব রাগ করেছেন।'

'কেন?' বিরক্তিতে ভ্রু কুঁচকে গেল বায়রণের।

'সাহেব আপনার সিকিউরিটির কথা ভাবছেন।'

'কেন?' ফিরে প্রশ্নটা রেখেই বায়রণ বলল, 'আমি তো দিব্যি ঘুরে ফিরে এলাম। কোন অসুবিধে হল না। সাহেবকে বলে দিও উনি অনর্থক ভয় পাচ্ছেন।'

কথা না বাড়িয়ে সে চলে আসছিল ভারালু প্রায় দৌড়ে এসে জানালো, 'স্যার, পলসাহেব টেলিফোন করেছিলেন। উনি এখন আসতে পারবেন না।'

একা একাই লাঞ্চ সেরে নিল বায়রণ। খাওয়াদাওয়ার ব্যাপারে সে খুব সতর্ক। মেদ না হয় এবং মশলাজাতীয় কোন খাদ্য সে সযত্নে পরিহার করে। খেতে খেতে ঘটনাগুলো ভেবে নিচ্ছিল সে। আসবে বলেও পল মত বদলালো কেন? লর্ড ক্লক্সার আহত হবার সঙ্গে এর কোন সম্পর্ক আছে কিনা কে জানে। না, আর কোন আদিখ্যেতা নয়। তার যেটুকু কাজ এখানে করার আছে করে সে ফিরে যাবে। আজ এন্টনীকে দেখার পরই মন ভীষণ ভার হয়ে আছে। মানুষটার পরিণতি এইরকম হবে কল্পনাতেও ছিল না। তার রেসিং লাইফের গুরু যদি ডিকসন সাহেব হন তো এন্টনীও তার কম কিছু নয়। অথচ আজ তার সামান্য সাহায্যও এন্টনী গ্রহণ করল না।

হঠাৎ বায়রণের মনে হল সে একা। এই পৃথিবীতে একটাও মানুষ নেই যে তার পাশে এসে দাঁড়াতে পারে। তার কোন বন্ধু নেই। এই বয়স অবধি এমন কোন মেয়েকে পেল না যাকে সে ভালবাসতে পারে। এবার কলকাতায় এসে সে আরো নিঃসঙ্গ হয়ে গেল। দশ বছর ধরে মাঝে মাঝে মনে হতো আর কেউ না থাক এন্টনী আছে, যাকে মনের সুখ কিংবা দুঃখের কথা বলা যায়। কলকাতায় এসে সেটুকু জায়গা আর খুঁজে পাওয়া গেল না। দিদি কিংবা জামাইবাবুর সঙ্গে যত তিক্ততাই হোক, দূরে থেকে থেকে কোন কোন সময় মনে হতো তার ধার কমে গেছে। হয়তো কাছে গিয়ে দাঁড়ালে সব সহজ হয়ে যাবে। কিন্তু আজ তো সে ভেতরে ঢুকতেই পারল না। তার মনের মধ্যে ওদের সম্পর্কে কোন নরম অনুভূতি পেল না দরজার সামনে দাঁড়িয়ে। একদম একা সে, একা একা দৌড়ে যাওয়া! সামনে জীবন, অনন্ত জীবন। ইন্টারকমের চাবি টিপল সে। ভারালুর গলা ভেসে আসতেই সে হুকুম করল একটা ড্রাই জিন পাঠিয়ে দিতে। এটি তার

নিয়মের ব্যতিক্রম। কিন্তু একা বসে থাকতে কেমন যেন ভয় করছিল, ভয়টা নিজের কাছেই।

মানুষটা তার দিকে এগিয়ে এসে থমকে দাঁড়াল। প্রথমে অস্পষ্ট, একটা আদল ছাড়া কিছুই বুঝতে পারছিল না। চোখ পরিষ্কার করার চেষ্টা করল বায়রণ। খুব চাপা একটা রাগত গলা কানে এল, 'কি হচ্ছে কি? সেই দুপুর থেকে মদ গিলছ বসে বসে। তোমার সম্পর্কে তো এরকম রিপোর্ট পাই নি।'

'হু দি হেল ইউ আর?' জড়ানো গলায় বিরক্তি প্রকাশ করল বায়রণ। তারপর একটু একটু করে লোকটার মুখ স্পষ্ট হল। হরি শর্মা হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তারপরই চর্বিবহুল মুখটায় একটু একটু করে হাসি ফুটল, 'সেইন, সেন্সে এসো। দিস ইজ শর্মা।'

খাড়া হয়ে বসতে চেষ্টা করছিল ততক্ষণে বায়রণ, 'ও ইয়েস।'

'তুমি ড্রিঙ্ক করছ কেন?'

'এমনি। একা একা আমার ভাল লাগছিল না।'

'কালকে যে মেয়েটাকে পাঠিয়েছিলাম তাকেও তো তোমার ভাল লাগে নি!'

'নো। সে আপনার ছেলের প্রেমিকা।'

'শাট্ আপ।' চিৎকারটা এত আকস্মিক এবং তীব্র যে মুহূর্তেই বায়রণ চেতনায় ফিরে এল। কিন্তু মুখের কথা বেরিয়ে এলে সে আর ফেরানো যায় না।

'কে তোমাকে এই কথা বলেছে? সেই মেয়েটা?'

মাথা নাড়ল বায়রণ, হ্যাঁ।

হঠাৎ ধপ করে সোফায় বসে পড়লেন হরি শর্মা। তারপর বিড়বিড় করে বললেন, 'ওফ্ ভগবান।'

বায়রণ তখন প্রায় চেতনায় ফিরে এসেছে, বলল, 'মিঃ শর্মা, টেক ইট ইজি। আমি আপনাকে আঘাত করতে কথাটা বলি নি। মেয়েটি সত্যিই আপনার ছেলেকে ভালবাসে। কিন্তু তাতে আপনার ভয় পাওয়ার কোন কারণ নেই। কারণ আপনার ছেলে ওকে শুধু ব্যবহার করছে। মেয়েটিকে সে কোনদিনই বিয়ে করবে না।'

হরি শর্মা সহজ হবার চেষ্টা করছিলেন, 'আমি জানি, কিন্তু তুমি এত কথা জানলে কি করে?'

'ওরা বলেছে।'

'ওরা আর কি বলেছে?'

'কেন?'

'টেল মি।'

'আমি সেসব কথা বলতে বাধ্য নই।'

'সেইন। আমি তোমাকে হায়ার করে এনেছি, তুমি ভুলে যাচ্ছ।'

'না। আপনি যা হুকুম করবেন তা আমি শুনতে বাধ্য। কিন্তু সেটা রাইডিং-এর মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে। দয়া করে ভুল বুঝবেন না।'

'ওরা তোমাকে রেস সম্পর্কে কিছু বলে নি?'

বায়রণ হরিশর্মার মুখ ভাল করে দেখল। খুব দ্রুত নেশা কেটে যাচ্ছে ওর। এই লোকটা তাহলে মোটেই নির্বোধ নয়। নীরবে মাথা নাড়ল সে।

হ্যাঁ।

'কি বলেছে?'

'এসব কথা কেন জিজ্ঞাসা করছেন? আমাকে যা করতে হবে তা বলুন।'

হরি শর্মা একটু নড়ে চড়ে বসলেন, 'আমি চাই ইনভিটেশন কাপ। তুমি আমাকে ওটা পাইয়ে দেবে বলে এখানে এসেছ। এটা নিশ্চয়ই তুমি করবে।'

'অবশ্যই।'

'কিন্তু—কিন্তু।'

'আপনি মিছিমিছি দুশ্চিন্তা করছেন।'

'বায়রণ, আমি হেল্পলেস। তুমি জানো না, আমি কাউকে বিশ্বাস করতে পারি না। আমার চারপাশে একটাও মানুষ নেই যার ওপর আমি নির্ভর করতে পারি। আমি বাঁচি কিংবা মরি যাই হোক কিন্তু এবারের ইনভিটেশন কাপ আমার চাই।'

'কেন? যদি কিছু মনে না করেন জিজ্ঞাসা করছি।'

'আমি বেশীদিন বাঁচবো না সেইন। অলরেডি আমার দুটো স্ট্রোক হয়ে গেছে। আমার স্ত্রী এবং ছেলে জানে আর একটা শক্ পেলেই হয়তো আমি শেষ হয়ে যাবো। তখন এই শর্মা ইন্ডাস্ট্রিসের লক্ষ লক্ষ টাকা ওদের হাতে চলে যাবে। আমি কাউকে বিশ্বাস করি না। তুমি আমাকে বিট্রে করো না সেইন।' হরি শর্মার গলা জড়িয়ে এল।

উঠে দাঁড়াতে গিয়ে পা টললো। একটু সামলে নিয়ে বায়রণ বলল, 'মিঃ শর্মা, আই উইল ট্রাই মাই বেস্ট। কিন্তু আপনি জানেন রেস জীবনের মতন আনসার্টেন ব্যাপার। তবু, আই প্রমিজ।'

একটু একটু করে হরি শর্মা নিজের চেহারায় ফিরে যাচ্ছিলেন। এবার উঠে দাঁড়ালেন তিনি, 'তুমি আর ড্রিঙ্ক করো না। আমি চলি।'

'কিন্তু আপনি কেন এসেছিলেন বললেন না।'

'ও! হ্যাঁ। শোন তুমি এরকম হুটহাট বাইরে বেরিয়ে যেও না। যে কেউ এখন তোমাকে দুদিন ইলোপ করে রাখতে পারে। ব্যাস, তাহলেই হয়ে গেল আমার। তুমি যদি একা থাকতে রাজী না হও তাহলে অন্য কাউকে পাঠিয়ে দিতে পারি। কিন্তু কখনো বাইরে একা যাবে না।'

'আপনি অনর্থক ভয় পাচ্ছেন।'

'না। আমার কাছে খবর আছে। লর্ড কৃষ্ণা দুর্ঘটনায় পড়ে নি, তাকে দুর্ঘটনায় ফেলা হয়েছে। যাক, আশা করি তুমি এই অনুরোধ রাখবে। কাউকে পাঠিয়ে দেব?'

'ধন্যবাদ। আমি একা থাকতে চাই এখন।'

'আর একটা কথা। তোমার সঙ্গে দেখা করতে আসতে পারে পল, শ্যাম অথবা লীনা।' শেষ নামটি উচ্চারণ করার সময় একটু দ্বিধাগ্রস্ত দেখালো শর্মাকে,

'ওদের সঙ্গে সবসময় কথা বলবে এই ঘরে বসে। মনে থাকে যেন।' হরি শর্মা আর কথা না বলে বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে। হঠাৎ লোকটাকে ঔরঙ্গজেবের মতো মনে হল বায়রণের। চারধারে ষড়যন্ত্র চলছে, বৃদ্ধ বয়সে সব বুঝেও উনি না বোঝার ভান করে আছেন। এবং সবশেষ কথায় বোঝা গেল উনি স্ত্রীর ভূমিকা সম্পর্কে সচেতন আছেন।

কিন্তু ওদের নিয়ে এই ঘরে বসতে বলে গেলেন মিঃ শর্মা। এই ঘরে কথা বললে তাঁর কি সুবিধে হবে? নেশা কেটে যাচ্ছিল কিন্তু ঝিমুনি আসছিল বায়রণের। অদ্ভুত অবসাদ এখন শরীরে। এই ঘরে কি কি আছে? চারপাশে তাকাতে লাগল বায়রণ। এখানে কি লুকোন কোন অস্ত্র আছে যা দিয়ে শর্মা সব কথা শুনতে পারেন। তাহলে তো গতরাত্রে ডলি নাজিরের কথাবার্তাও তার জানা হয়ে গেছে। নাকি ওটাকে আজ তার অনুপস্থিতিতে লাগানো হয়েছে। কিন্তু আর এ নিয়ে ভাবতে ইচ্ছে করছিল না। এখন একটু ঘুম দরকার। বায়রণ বিছানায় শুয়ে পড়ল। আঃ, কি আরাম: বালিসে মুখ গুঁজে সে ওই আরাম-টাকে সমস্ত শরীর দিয়ে গ্রহণ করছিল। একটু একটু করে একসময় ঘুমের গভীরে হারিয়ে গেল বায়রণ। ঠিক সেই সময় বিছানার পাশে কোকিল ডেকে উঠল। টেলিফোনটা একটানা বেজে যাচ্ছিল। বায়রণের হাতটা একবার কেঁপে উঠলেও সে এক ইঞ্চি নড়ল না। যে টেলিফোন করছিল তার ধৈর্য অবশ্য বেশীক্ষণ ছিল না।

বি-ক্লাসের দৌড়ে এন্টনী কিছু সুবিধে করতে পারল না। বায়রণ রেসের বইটা উল্টে দেখছিল, এই সিজনে ঘোড়াটা সাতবার দৌড়েছে কোনবারই ফ্রেমে আসেনি। পরপর দুদিনের রেসিং ফিক্সচার বেরিয়েছে। এন্টনীর মাত্র ওই একটি রাইডিং। টোটালাইজার বোর্ডে দর উঠেছে পঞ্চাশ টাকার। অর্থাৎ ঘোড়াটা তো বটেই জকি হিসেবে এন্টনীর কোন সুনাম নেই এখনকার পান্টার্সদের কাছে। একটু আগে এন্টনী যখন ঘোড়াটার পিঠে চড়ে স্টার্টিং পয়েন্টের দিকে গেল তখন ওকে খুব অসহায় দেখাচ্ছিল। দশ বছর আগেও ও যখন ঘোড়ায় চড়তো দেখে চোখ জুড়িয়ে যেত। মেম্বার্স এনক্লোজারের গ্যালারিতে বসে রেসটা দেখল বায়রণ। এন্টনী প্রাণপণে চেষ্টা করেও ফ্রেমে আসতে পারল না। বুক থেকে একটা ভারী বাতাস বেরিয়ে এল বায়রণের। মানুষের কপাল বোধহয় একেই বলে।

স্পিন্টার্স কাপ দিনের পঞ্চম বাজী। প্রচুর লোক হয়েছে আজ। রয়্যাল ক্যালকাটা টার্ফ ক্লাব আজ অনেক সুন্দর ব্যবস্থা করেছে যাতে তাদের সুনাম বাড়ে। হরি শর্মার য়ুনিফর্ম পরে বায়রণ প্যাডকে এসে দেখল জায়গাটা গমগম করছে। পল ওকে দেখে হাসল। পলের পাশে ক্লিওপেট্রা বিশাল রঙিন চশমায় মুখ ঢেকে দাঁড়িয়ে। শ্যাম নেই কিন্তু হরি শর্মা রুমাল দিয়ে মুখ মুছছেন। ওদিকে মার্টিন তার দলবল নিয়ে দাঁড়িয়ে। ডিক আর বার্ণিকে গম্ভীর মুখে শেষবার উপদেশ দিচ্ছে সে। আশেপাশে আরো অনেক ট্রেনার এবং জকির ভীড়! প্যাডকের ওপাশে দাঁড়িয়ে কয়েকহাজার লোক ভারতবর্ষের সেরা জকি এবং ট্রেনারদের

দেখছে। পল বলল, 'সিজার টিপটপ কণ্ডিশনে আছে। তবে কুমারমঙ্গলমের ঘোড়া এই রেসে ফেবারিট।'

বায়রণ জিজ্ঞাসা করল, 'সিজার ?'

'থার্ড ফেবারিট। তুমি প্রথমেই লিড নেবে এবং সিজার লেগ চেঞ্জ করার আগেই যদি দূরত্বটা পেরোতে পার তাহলে একটা চান্স আছে।' পল বলল।

'আপনি নিশ্চিত নন যে এই রেস সিজার জিতবে ?'

'নো। নট উইথ সিজার। আমি মিঃ শর্মাকে বলেছি জিতে যদি যায় তো কপাল বলতে হবে।'

মাথা নাড়ল বায়রণ। এর মধ্যে সহিসরা ঘোড়াগুলো নিয়ে এল প্যাডকে। দুবার ঘুরিয়ে জকিদের বসাতে লাগল একটার পর একটা। পল বায়রণকে সঙ্গে নিয়ে সিজারের পিঠে তুলে দিল। টগবগ করছে ঘোড়াটা। কিন্তু দর্শকদের চোখে তিন নম্বর ঘোড়াটাকেই দারুণ দেখাচ্ছে। ওটা ম্যাড্রাস থেকে কুমারমঙ্গলম নিয়ে এসেছে। সিজারের পিঠে চড়ে অন্যদের সঙ্গে বায়রণ যখন প্যাডকটা পাক খেল তখন দর্শকদের চিৎকারে গলা ভেসে এল, 'বায়রণ, বায়রণ !'

হাসল বায়রণ। কলকাতার মানুষ তাকে ভুলে গেছে। এককালে যে নামে সে এখানে পরিচিত ছিল সেটা কারো মনে নেই। এই মুহূর্তে স্বস্তি না কষ্ট হচ্ছে সে ঠিক বুঝতে পারল না। ক্রমশ এইসব চিন্তা থেকে বায়রণ মুক্ত হল। তার আশেপাশে আর যে ঘোড়াগুলো চলেছে স্টার্টিং পয়েন্টের দিকে তারা বিভিন্ন সেন্টারের সব চেয়ে দ্রুতগতির ঘোড়া। একসঙ্গে এতগুলো তেজী ঘোড়া ছুটছে এমন ঘটনা সচরাচর ঘটে না। বারো শ' মিটার মার্কের কাছে পেঁছে বায়রণ সিজারের পিন হাত বোলাতে লাগল। এদিকে মানুষজন নেই। চারধার ফাঁকা। শুধু দূরে তিনটে গ্যালারি জুড়ে কালো পিঁপড়ের মতো মানুষের মাথা দেখা যাচ্ছে। বার্ণি ওর পাশে চলে এল ঘোড়া নিয়ে, 'দারুণ মাঠ, তাই না ? মনে হয় এটাই ইণ্ডিয়ার বেস্ট রেসকোর্স।'

বায়ারণ মাথা নাড়ল। ওপাশে ডিক তার ঘোড়ার ওপর শরীর এলিয়ে বসে আছে। দেখলেই ভয় হয় এই বুঝি পড়ে যাবে। নেশা করে করে লোকটা সবসময় ঝিম মেরে থাকে। খাঁচায় ঢোকার আগে হঠাৎ শরীর শিরশির করে উঠল। শেষ দিন যখন এই মাঠে রেস করেছিল। মাথা গরম হয়ে উঠল বায়রণের। স্টার্টারের সংকেত পাওয়া মাত্র সিজারকে ছুটিয়ে দিল সে। বাঁ দিকে বার্ণি, সামনে কুমারমঙ্গলমের ঘোড়াটা তিন লেংথ এগিয়ে। বারোশ' মিটার পথ দেখতে দেখতে ফুরিয়ে যাবে। বায়রণ সিজারকে রেলিং-এর গায়ে রাখার চেষ্টা করছিল। কুমারমঙ্গলমের ঘোড়াটাকে আউটসাইড দিয়ে ডিঙিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলে বেশী জায়গা লাগবে। সেই ফাঁক কিছুতেই ভরাট করা যাবে না। বাঁক ঘোরার সময় বার্ণি এগিয়ে গিয়ে কুমারমঙ্গলমের ঘোড়াটাকে ছুঁয়ে ফেলল। এতক্ষণ একবারও চাবুক চালায় নি বায়রণ। চারশ' মিটার মার্কের কাছে এসে সে প্রথম ঘোড়াটার পিঠে হাত তুলল। তিনটে ঘোড়াই ঝড়ের মতো ছুটছে। হঠাৎ বুঝতে পারল সিজার অস্বস্তি বোধ করছে যেন। বোধহয় এবার লেগ-চেঞ্জ করবে। এবং তাকরলেই সর্বনাশ, সামনের

ঘোড়া দ্যুটো থেকে আরো পিছিয়ে যেতে হবে তাকে। প্রচণ্ড জোরে সিজারের পেটে লাথি মারল বায়রণ। তারপর ওর কাঁধের ওপর প্রায় শ্যুয়ে পড়ে বাঁ হাতে চাবুক চালাতে লাগল। ঘোড়াটা এবার তীরের মতো বের হচ্ছে। সামনে কিছ্যুতেই জায়গা ছাড়ছে না বার্ণি। অনেক চেষ্টা করেও রেসটাকে পেল না বায়রণ। মার্টিনের ঘোড়াকে বার্ণি জিতিয়ে দিল ওর হাফ লেংথ আগে। কুমারমঙ্গলমের ঘোড়া তৃতীয় হল। এতক্ষণ কানে একটাও শব্দ ঢোকেনি। কিন্তু এবার চিৎকারের ঢেউটা আছড়ে পড়ল যেন। কলকাতার মান্যুষ ম্যুগ্ধ চোখে এই রেস দেখেছে। তাদের কাছে জকিদের এইরকম প্রতিদ্বন্দ্বিতা দেখার স্যুযোগ অনেকদিন বাদে এল।

সিজারকে ঘ্যুরিয়ে নিয়ে যখন সে ফিরে এল তখন মার্টিন এসে বার্ণির ঘোড়ার লাগাম ধরেছে হাসিম্যুখে। খ্যুব ছবি তোলা হচ্ছে ওদের। বায়রণ দেখল পল একা দাঁড়িয়ে। সহিসের হাতে ঘোড়াটাকে ছেড়ে বায়রণ বলল, 'যখন রেসপন্স করল তখন আর কিছ্যুই করার ছিল না।'

পল খ্যুব হতাশ, একট্যু ভেঙে পড়া ভাব ম্যুখে, 'কিন্তু সিজার আজ লেগ-চেঞ্জ করে নি। ওকে প্রথমেই ফ্রন্টে নিয়ে এলে না কেন?'

বায়রণ বলল, 'চেষ্টা করেছিলাম কিন্তু স্পেস ধরতে পারে নি সিজার।'

ঠিক সেই সময় মাইকে ঘোষণা করা হল স্পিণ্টার্স কাপের দৌড়ের সময় রেকর্ড করা হয়েছে এক মিনিট তেরো সেকেণ্ড। সময়টা শ্যুনে পল হেসে ফেলল, 'ওয়েল ডান' সিজার যে এই সময়ের মধ্যে থাকবে তা ভাবতে পারে নি। ও কখনো চোদ্দর নীচে দৌড়াতে পারেনি।'

সেদিনের শেষ রেসটা ছিল সাধারণ বাজী। কি একটা প্লেট। ঘোড়াটার দর ছিল তিরিশ পয়সা। অবহেলায় জিতে গেল বায়রণ। দৌড়োবার সময় ব্যুঝে গেল সে, স্পিণ্টার্স কাপের দৌড় থেকে সে কলকাতার মান্যুষের কাছে হিরো হয়ে গেছে।

পল ওকে নামিয়ে দিয়ে গেল রেস্ট হাউসে। ঘরে ঢ্যুকতেই টেলিফোন বাজল। হরি শর্মা কথা বললেন, 'খ্যুব ভাল হয়েছে রেস। আমি বাজী পাই নি বটে তবে তুমি দারুণ রাইড করেছ। অবশ্য আমি স্পিণ্টার্স কাপ আশাও করিনি, রানার্স হলাম তোমার কল্যাণেই। যাই হোক, আই ওয়াণ্ট ইনভিটেশন কাপ।

'আই উইল ট্রাই।'

'বায়রণ!'

'বল্যুন!'

'প্লিজ তুমি হেরে যেওনা।'

বায়রণ কথা বলল না। সে কি বলতে পারে। প্যৃথিবীর কোন জকি বলতে পারে না যে সে জিতবেই। তাহলে?

'কিছ্যু বলছ না কেন?'

'আই উইল ট্রাই।

'ওয়েল, আজ রাত্রে কি করতে চাও ?'

'আমি ঘুমুতে চাই।'

'যদি কোন কিছুর দরকার হয় ভারালুকে বলবে।'

টেলিফোন ছেড়ে দিয়ে উঠে দাঁড়াতেই দরজায় শব্দ হল। কয়েক পা এগিয়ে সেটা টেনে ধরতেই শ্যাম শর্মাকে দেখতে পেল বায়রণ। বেশ সেজেগুজে এসেছে ও। একগাল হেসে বলল, 'নিশ্চয়ই বিরক্ত করছি না ?'

'না না, এসো।' আজকাল মনের বিরক্তি মনেই রাখতে শিখেছে বায়রণ। ঘরে ঢুকে সোফায় দুই পা ফাঁক করে বসল শ্যাম, 'টাকাটা তুমি এ্যাডভান্স চাও ?'

'কিসের ?'

'ওফ্, তুমি ছেলেমানুষ নও। জুপিটারকে রেসটা ছেড়ে দেবে তুমি। লর্ড কৃষ্ণা আউট হয়ে যাওয়ার পর মার্টিনের ঘোড়া দি সানের কোন চান্স নেই। ওই ডাইনী যতই বলুক সেকথা আমি বিশ্বাস করি না। আজ স্পিণ্টার্স কাপে তুমি যেভাবে সিজারকে নিয়ে এলে তা দেখে আরো নিশ্চিত হয়েছি যে জুপিটারের একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী প্রিন্স।' চকচকে মুখে তাকাল শ্যাম শর্মা।

হঠাৎ সেই কথাটা মনে পড়ে গেল। হরি শর্মা তাকে গেস্টদের সঙ্গে সব সময় এই ঘরে বসে কথা বলতে বলেছেন। এখানে কি কোন লুকোনো যন্ত্র আছে যাতে এইসব কথাবার্তা রেকর্ডেড হয়ে থাকবে। ব্যাপারটা একদম ভুলেই গিয়েছিল সে। খোঁজাখুঁজি করার কথা ভেবেছিল কিন্তু করা হয় নি। সে সতর্ক হল, 'শ্যামু, ইট্স নট গুড।'

'ওঃ, তুমি আমাকে উপদেশ দিতে এসো না।'

'আমাকে তুমি কি করতে বলছ ?'

'রেস শুরু হওয়া মাত্র জুপিটার লিড নেবে। ওই দূরত্ব সে স্টার্ট টু ফিনিস দৌড়েছে অনেকবার। তুমি প্রিন্সকে প্রথম থেকে সেকেণ্ডে রেখে জুপিটারকে বাড়তে দেবে। অর্থাৎ বাকী ব্যাচটাকে তুমি গার্ড দেবে এবং প্রতারিত করবে। ওরা যখন বুঝতে পারবে ব্যাপারটা তখন রেস উইল বি ওভার।'

'বাঃ, গুড্। কিন্তু আমি যদি তা না করি।'

'তুমি তোমার দুর্ভাগ্যকে ডেকে আনবে।'

'আমাকে ভয় দেখিও না শ্যামু।'

গলার স্বরে বোধহয় এমন একটা শীতল ভাব ছিল যে শ্যাম শর্মা কিছুক্ষণ ওর দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকল। তারপর হঠাৎ উঠে এসে পাশে বসল, 'আমি তোমার সব খবর জানি। কুমারমঙ্গলম ডিটেলস জেনে বলেছে। দশ বছর আগে যে জন্যে তুমি সাসপেণ্ডেড হও সেটা তো এই ধরনের কাজ ছিল। তখন তুমি জানতে না কি করে স্টুয়ার্ডদের চোখকে ফাঁকি দিয়ে ঘোড়া টানতে হয়। এখন তুমি সেটা জানো। বোকার মতো কথা বলো না। আমি তোমাকে দশ হাজার দেব। টাকাটা জুপিটারের ওপর লাগিয়ে দিচ্ছি। ওর দর এখন চার। জুপিটার জিতলে তুমি পঞ্চাশ হাজার পাবে। ঠিক আছে ?'

'অন্য ঘোড়াদুটোর প্রাইস কি ?'

'দি সান্-এর ইভ্ন মানি, প্রিন্স-এর দেড় আর অন্য ঘোড়াগুলোর হাই প্রাইস।'

'প্রিন্সকে হারিয়ে তোমার কি লাভ ?'

'ওঃ, দ্যাট ওল্ড কোয়েশ্চেন। আমি চাই না বুড়োটা ইনভিটেশন পাক!'

'কিন্তু জুপিটারকে জেতাতে চাইছ কেন ?'

'কারণ ওই ডাইনীটা চাইছে মার্টিন জিতুক।'

'প্রিন্স জিতলে তো মালিক হিসেবে তোমার খুশী হওয়া উচিত, তাই না ?'

'নো! আমি নামেই মালিক! দ্যাট বুড়ো শয়তান সব কণ্ট্রোল করছে। আই হেট্ দ্যাট ম্যান! এই বুড়ো বয়সে ও যাকে বিয়ে করে আনল তাকে ভোগ করার কোন ক্ষমতা নেই তা সে জানে। শুধু আমার সামনে ওরকম একটা জিনিসকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখাবে বলেই ওটা করেছে বুড়োটা। আর ডাইনীটা আমাকে নিয়ে খেলা করেছে অথচ আমি হাত বাড়ালেই বুড়োর ভয় দেখিয়েছে। বায়রণ, প্লিজ তুমি রাজী হয়ে যাও। আমি জানি ইনভিটেশন কাপ না পেলে বুড়ো মরে যাবে। গত বছর যখন প্রিন্সকে কেনা হয় তখন থেকেই জপের মালা ঘোরাচ্ছে বুড়ো।'

বায়রণ উঠে দাঁড়াল, 'শ্যামু, আমি তোমার কথা শুনলাম।'

শ্যাম শর্মা সন্দিগ্ধ চোখে তাকাল, 'তাহলে আমি তোমার হয়ে টাকাটা লাগিয়ে দিচ্ছি ওকে।'

মাথা নাড়ল বায়রণ, 'আমাকে একটু ভাবতে দাও।'

'নো। ভাববার কিছু নেই।'

'আছে। কারণ আমি এখান থেকে হেরে চলে যেতে চাই না।'

'হোয়াট!' শ্যাম শর্মা উঠে দাঁড়াল।

'শ্যাম! এই ঘরে তোমার পিতৃদেব টেপরেকর্ডারের মাউথপিস লুকিয়ে রেখেছেন। তুমি এতক্ষণ যেসব কথা বলেছ তার সবই রেকর্ডেড হয়ে গেছে। আমি তোমার জন্যে দুঃখিত।' বায়রণ সামান্য হাসল।

শ্যাম শর্মা মুহূর্তেই ফ্যাকাসে হয়ে গেল। স্পষ্ট দেখা গেল সে কাঁপছে। পরমুহূর্তেই নিজেকে সামলে সে গট-গট করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। মাথা ঝাঁকালো বায়রণ। সে কি করতে পারে? এদের পারিবারিক রেষারেষির সঙ্গে নিজেকে জড়াবার কোন প্রশ্নই ওঠে না। দশ বছর আগে ভাগ্যের হাতে শিকার হয়ে তাকে কলকাতা ছাড়তে হয়েছিল। আজ পৃথিবীর কোন কিছুর গুলোই সে তার বদলা নেওয়া থেকে বিরত হবে না। সে ফিরে যাবে এবার উইনার হয়ে। মাথা উঁচু করে। ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ বাজী তাকে জিততেই হবে। বায়রণ এবার ঘরের চারপাশে তাকাল। মাউথপিসটা কোথায় লুকোন আছে খুঁজে দেখা দরকার। এই ঘরে রয়েছি অথচ আমার কোন ব্যক্তিগত মুহূর্ত থাকবে না এমন হতে পারে না। হঠাৎ মনে হল সে যেন ক্রীতদাস। অনেকগুলো মানুষ তাকে বিভিন্নরকমে কিনে রেখে দিয়েছে।

কাঁধ ঝাঁকালো বায়রণ। তারপর তন্ন-তন্ন করে মাউথপিসটাকে খুঁজতে লাগল

ঘরে। মিনিট পনের কেটে গেল কিন্তু কোন হদিশ করতে পারল না সে। শেষ পর্যন্ত হাল ছেড়ে দিয়ে বাথরুমে ঢুকল বায়রণ। অত্যন্ত আধুনিক ব্যবস্থার এই স্নানঘর। এখানে নিশ্চয়ই ওটা লুকোন নেই। বাথরুমের দরজা বন্ধ করলে ঘর থেকে কোন শব্দই এখানে পেঁছাবে না।

স্নান করে তোয়ালে জড়িয়ে বাইরে বেরোতেই জমে গেল বায়রণ। বুকের ভেতর একশটা সমুদ্র যেন হঠাৎ ঢেউ-এর ছোবল তুলে স্থির হয়ে গেল। সম্বিত ফিরতেই বায়রণ এক পা পিছিয়ে গেল বাথরুমে ফিরে যেতে। সঙ্গে সঙ্গে সেই খসখসে গলাটা শিরশিরানি তুলল, 'লজ্জা পাওয়ার কোন কারণ নেই। আপনি স্বচ্ছন্দ হতে পারেন।'

কিন্তু ততক্ষণে আবার আড়ালে ফিরে গিয়েছে বায়রণ। সমস্ত শরীর কেমন ঝিম-ঝিম করছে। ক্লিওপেট্রা কখন নিঃশব্দে এই ঘরে এসেছে সে টের পায় নি। সোফায় হেলান দিয়ে যে ভঙ্গীতে ক্লিওপেট্রা তাকিয়ে ছিল সহ্য করা সহজ নয়। খুব দ্রুত পোশাক পরে নিল সে। যদিও এটি ময়লা নয় তবু ভেবেছিল একটা হালকা কিছু দূরে গিয়ে পরে নেবে, সেটা হল না।

দরজা খুলে সে প্রথম খুব সতর্ক ভঙ্গীতে ঠোঁটের ওপর আঙুল রাখল। ক্লিওপেট্রা কিছু বলতে যাচ্ছিল কিন্তু ওর এই সতর্ক ভঙ্গী দেখে বেশ অবাক হয়ে গেল। দ্রুতপায়ে টেবিলের দিকে এগিয়ে গেল বায়রণ। সেখানে পড়ে থাকা একটা প্যাডে লিখল, 'এই ঘরে মাউথপিস লুকনো আছে, সাবধানে কথা বলবেন।' লেখাটা ক্লিওপেট্রার সামনে তুলে ধরলে তার মুখের আলো নিভে গেল। কিন্তু খুব দ্রুত সেটা সামলে নিয়ে প্যাডেই লিখে দিল, 'কথা আছে জরুরী।' তারপর গলা তুলে জানালো, 'আপনার আজকের দৌড় অনবদ্য হয়েছে, টেলিফোনে পেলাম না এবং এদিক দিয়ে যাচ্ছিলাম বলে মনে হল অভিনন্দন জানিয়ে যাই।'

বায়রণ বলল, 'ধন্যবাদ।' কিন্তু ক্লিওপেট্রার পাঁচটা আঙুল যে সদ্য লেখা কাগজটাকে প্যাড থেকে ছিঁড়ে গোল্লা পাকিয়ে ফেলেছে তাও ওর নজর এড়াল না। ক্লিওপেট্রা জিজ্ঞাসা করল, 'আপনার এখানে কোন অসুবিধে হচ্ছে না তো মিঃ বায়রণ ? শর্মা এত ব্যস্ত থাকে যে সবসময় খেয়াল করতে পারে না—।'

'না, না, আমার কোন অসুবিধে হচ্ছে না। আমি খুব আরামে আছি, এ নিয়ে আপনারা মোটেই চিন্তা করবেন না।' কথাগুলো বলবার সময় একধরনের ঠান্ডা স্রোত বইছিল দুজনের মধ্যে। ওরা কেউ কাউকে এই সংলাপগুলো বলছে না। ঘরের ভেতরে লুকিয়ে রাখা মাউথপিসটার উদ্দেশ্যেই এগুলো বলা। কিন্তু এরকম কথা কতক্ষণ বলা যায় ?

বায়রণের কথা শেষ হওয়া মাত্র ক্লিওপেট্রা ঘর ছেড়ে চলে গেল। এই যাওয়াটা বেশ অদ্ভুত ধরনের। মুখের একটা রেখাও নড়ল না। চোখ এই রাতেও রঙিন কাঁচের আড়ালে, তাই সেখানে কি খেলা চলছে বোঝার উপায় নেই। কিন্তু যে অসাধারণ নিস্পৃহতায় ক্লিওপেট্রা ঘর ছেড়ে উঠে গেল তা আয়ত্ত করা সহজ নয়। এবং এর জন্যে বায়রণ প্রস্তুতও ছিল না।

সংবিত ফিরে আসতেই ও আয়নার দিকে তাকাল। চুল ভিজে এবং এখন

অবিন্যস্ত থাকায় ওর চেহারাটা অদ্ভুত দেখাচ্ছে। দ্রুত নিজেকে সাজিয়ে নিল বায়রণ। তারপর দরজা খুলে হলঘরে পা রাখল। সেখানে মৃদু আলো জ্বলছে। বাইরের বারান্দায় আসতেই ভারালুকে দেখতে পেল বায়রণ। ওকে দেখে দ্রুত এগিয়ে এসে নমস্কার করে ভারালু জানালো, 'স্যার, মেমসাহেব গাড়িতে আছেন।'

'ও।' বায়রণ একটু ইতস্তত করল, 'পল এলে—।'

'বলে দেব স্যার। আপনি তো আজ বড় সাহেবের বাড়িতে ডিনার করবেন।'

ভারালুর কথায় অবাক হয়ে গেল বায়রণ। একথা তো হরি শর্মা বলেন নি তাকে। ভারালু জানলো কি করে। কিন্তু নিজের বিস্ময় গোপন রেখে সে মাথা নেড়ে গাড়ির দিকে এগিয়ে গেল।

মার্সিডিজটা তখন সচল হয়েছে। ও কাছে আসতেই দরজা খুলে গেল। নীরবে ভেতরে ঢুকে ক্লিওপেট্রার পাশে বসতেই মোহিনী হাসিটি দেখতে পেল সে। মৃদুস্বরে বায়রণ জিজ্ঞাসা করল, 'অমন আচমকা ঘর ছেড়ে এলেন কেন?'

'ওভাবে কথা বলা যায় না।'

'কিন্তু আমি যে বাইরে আসবো তা আপনি জানলেন কি করে?'

'আমি জানি।'

কথাটা বলার সময়ে গলার স্বরে এমন মায়া জড়ানো যে বায়রণের মনে হল সে মরে যাবে। কোনরকমে সে বলল, 'আপনার জানা ভুল হতেও তো পারতো!'

ক্লিওপেট্রা মাথার চুলে বিলি কেটে বলল, 'হয় না।'

'শুনলাম মিঃ শর্মা আমাকে ডিনারে নেমন্তন্ন করেছেন।'

'এ-ছাড়া আপনাকে বের করার কোন উপায় ছিল না।'

'তার মানে—?'

'ভয় পাওয়ার কিছু নেই। মিঃ শর্মার হয়ে আমি আপনাকে নিমন্ত্রণ করছি। দয়া করে কি আপনি তা গ্রহণ করবেন?' কথা বলবার ভঙ্গীতে এমন একটা কৌতুক ছিল যে ওরা দুজনেই একসঙ্গে হেসে উঠল।

বাকি পথটা কেউ কথা বলল না। ক্লিওপেট্রা জানলায় চোখ রেখে উদাস ভঙ্গীতে বসে ছিল। বায়রণের মনে হচ্ছিল কোন একটা দুশ্চিন্তা ওকে বিব্রত করছে। সে কি কথা বলবে বুঝতে না পেরে নিজেকে গুটিয়ে নিল। কিন্তু তার চোখদুটোকে সে কিছুতেই সরাতে পারছিল না। সত্যি অপূর্ব সুন্দরী মহিলা। হরি শর্মার পছন্দ আছে। এখন এই অলস ভঙ্গীতে বসে থাকার সময়ে ওর ভারী বুকের মাখনরঙা ডিমদুটোকে কেমন মায়াময় দেখাচ্ছে। সরু কোমর, গভীর নাভি, দুটো উরু যেমনভাবে পরস্পরকে জড়িয়ে রেখেছে তা দেখে সমস্ত শরীরে জ্বলুনি শুরু হয়ে গেল বায়রণের। এই প্রথম কোন মহিলাকে দেখে তার ভেতরে ভেতরে এমন ভূমিকম্প হয়ে যাচ্ছে।

বিরাট একটা অ্যাপার্টমেণ্ট হাউসের সামনে এসে গাড়িটা থামল। বাড়িটার নাম সমুদ্র। মিঃ শর্মার মতো মানুষ যে আর পাঁচটা লোকের সঙ্গে এরকম একটা বাড়িতে থাকবেন আশা করে নি বায়রণ। যদিও যায়গাটা খুব সাহেবী অঞ্চল এবং অনুমানে বোঝা যাচ্ছে যে এইসব অ্যাপার্টমেণ্টের দাম প্রচুর তবু বায়রণ অন্যরকম

আশা করেছিল। গাড়ি থামতেই দুজন বেয়ারা দৌড়ে এল। সেলাম করে গাড়ির দরজা খুলে দাঁড়াল তারা। বায়রণের মনে এল এটা নিশ্চয় স্পেশ্যাল খাতির, সব বাসিন্দার জন্যে ওরা এরকম করে না।

ক্লিওপেট্রা কোনদিকে না তাকিয়ে সোজা বাড়িটার দিকে এগিয়ে গেল। এমনকি বায়রণকে পর্যন্ত সঙ্গে আসতে বলা প্রয়োজন মনে করল না। মনে ঈষৎ জ্বালা অনুভব করলেও বায়রণ ওকে অনুসরণ করল। ওখানে আর একটু বেশী দাঁড়িয়ে থাকাটা দৃষ্টিকটু হতো। মহিলার ওপর একটু একটু করে সে জ্বলছিল। তাকে নিয়ে যেন অতি অবহেলায় খেলা করে চলেছে ক্লিওপেট্রা। না, এরকমটা হতে দেওয়া আর উচিত নয়। কাছাকাছি হতেই ক্লিওপেট্রা বলল, 'আজ অবধি কোন জকিকে আপনার মতো স্মার্ট মনে হয় নি।'

কথাটার জন্যে প্রস্তুত ছিল না বায়রণ, বললো, 'হঠাৎ একথা?'

'জকিরা সাধারণত বেঁটে, শুটকো টাইপের হয়। আপনি আলাদা।'

'আমার উচ্চতা বেশী নয়।'

'কিন্তু মানানসই।'

'তাই?'

'হুঁ।'

লিফ্‌ট এসে গিয়েছিল। লিফ্‌টম্যান ক্লিওপেট্রাকে দেখামাত্র সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে সেলাম করল। পাঁচতলায় নামিয়ে দিয়ে লোকটা চলে যেতেই বায়রণ একটা লম্বা করিডোর দেখতে পেল। মোজায়েক মেঝের ওপর ঠুকঠুক শব্দ তুলে ক্লিওপেট্রা এগিয়ে গিয়ে একটা কলিংবেল টিপে ওর দিকে তাকাল। ঈষৎ মাথা নাড়ায় বোঝা গেল বায়রণকে এগোতে বলছে সে।

বিশাল চেহারার এক মহিলা দরজা খুলে সসঙ্কোচে সরে দাঁড়াল। বায়রণ দেখল ক্লিওপেট্রা তাকে আমল না দিয়ে হলঘরে ঢুকল। ঢুকেই ঘুরে দাঁড়াল, 'আপনি এখানে এসেছেন বলে আমার এবং আমার স্বামীর ধন্যবাদ গ্রহণ করুন।'

ঘাবড়ে গেল বায়রণ। এ কিরকম কথাবার্তা। সে একটু বোকার মতো হাসল। ক্লিওপেট্রা ততক্ষণে রমণীটির দিকে ঘুরে দাঁড়িয়েছে, 'সাহেব আমাদের সঙ্গে ডিনার করবেন। বড়সাহেব টেলিফোন করেছিলেন?'

'উনি এইমাত্র বেরিয়ে গেলেন।' অত বিশাল শরীর থেকে অত্যন্ত সরু একটি স্বর বের হল। কথা না বললে বায়রণ রমণীটিকে আফ্রিকান ছাড়া অন্যকিছু ভাবতে পারত না।

'শ্যাম?'

'ছোটোসাহেব ফেরেন নি।'

'একমাত্র বড়সাহেব ফিরলেই আমাকে খবর দেবে। অন্য কেউ এলে আমি দেখা করতে চাই না। এই সাহেবের সঙ্গে আমার জরুরী আলোচনা আছে। আসুন মিঃ সেইন।' বিনীত ভঙ্গীতে তাকে ডেকে ক্লিওপেট্রা বাঁ দিকে এগিয়ে চলল। বোঝা যাচ্ছে এই ফ্ল্যাটে অনেকগুলো ঘর। হয়তো দু'তিনটে ফ্ল্যাট একসঙ্গে কিনে নিয়ে আলাদা আলাদা মহল করে নিয়েছেন হরি শর্মা। ক্লিওপেট্রার মহলে ঢুকতেই

পেছনের দরজাটা আপনা থেকেই বন্ধ হয়ে গেল। বড় ঘরটায় এসে চোখ ধাঁধিয়ে গেল বায়রণের। যেন একটা কিওরিও শপে ঢুকেছে সে। ঘরের দেওয়ালে বিশাল একটা ঈগল উড়ে যাচ্ছে খরগোশকে পায়ে চেপে। সেই ঘরটি পেরিয়ে আর একটি ঘর। সেখানে দেওয়াল জুড়ে ক্লিওপেট্রার মুখ। এই মুখে রঙিন চশমা নেই, শিশুর মতো মিষ্টি চাহনি। ঘরে কোন চেয়ার বা সোফা নেই। দুই-তৃতীয়াংশ জুড়ে একটা বিরাট ডিভান। এটি নিশ্চয় ক্লিওপেট্রার শোওয়ার ঘর নয়। এক নিমেষে জুতো এবং ব্যাগ ছেড়ে ক্লিওপেট্রা ওর দিকে ঘুরে দাঁড়াল, 'কি খাবেন বলুন, এখন।'

'কিছু না।'

'রাগ করেছেন ?'

'বাঃ, রাগ করার মতো কোন কাজ কি আপনি করেছেন ?'

অপাঙ্গে ওকে দেখলো ক্লিওপেট্রা। তারপর ডিভানের দিকে হাত তুলে বলল, 'আপনি বিশ্রাম করুন, আমি একটু ফ্রেশ হয়ে আসি।'

ওপাশে যে একটা দরজা ছিল এতক্ষণ বোঝা যায় নি। ক্লিওপেট্রা গেলে সেটা টের পাওয়া গেল। এখন ঘরে সে একা। একটা তাকিয়া টেনে নিয়ে বায়রণ ডিভানে বসল। হঠাৎ তাকে ডেকে আনা হল কেন ? বোঝাই যাচ্ছে ডিনারের কোন পরিকল্পনা আগে থাকতে ছিল না। মিসেস শর্মা নিশ্চয়ই দুঃসাহস দেখাচ্ছেন। একজন সামান্য জকিকে এভাবে বাড়িতে আনা এ তো ধনীগৃহিণীর পক্ষে শোভা পায় না। হরি শর্মা কি এই কারণে কৈফিয়ৎ চাইবেন না ? কিন্তু ওর আসল উদ্দেশ্য কি ? কেন গিয়েছিলেন উনি রেস্ট হাউসে। বায়রণ ভেতরে ভেতরে ক্রমশ নার্ভাস হয়ে পড়ছিল। ডিভানে হেলান দিয়ে কখন যে তার চোখ বন্ধ হয়েছিল টের পায় নি, ছোট্ট একটা হাসির টোকায় চেতন এল।

'ক্লান্ত ?'

ক্লিওপেট্রা এখন সামনে দাঁড়িয়ে। এর মধ্যে পোশাক পাল্টানো হয়ে গেছে। হালকা নীল একটা ম্যাক্সী ওর পরনে। ওটাকে কি ঠিক ম্যাক্সী বলা যায় ? যদিও পায়ের পাতায় তার ঝালর ছুঁয়েছে কিন্তু কাঁধের ওপর দুটো সরু স্ট্র্যাপ ছাড়া কিছু নেই। দুটো শঙ্খের মতো সাদা নিটোল বাহু এবং কাঁধ পৃথিবীর সমস্ত চোখকে অন্ধ করে দিতে পারে। কোমরের ওপর পোশাকটি আঁটো হওয়ায় বুকের সমুদ্র ফুঁসে উঠেছে।

বায়রণ সোজা হয়ে বসল, 'না। আমি ভাবছিলাম।'

'কি ?'

'আমাকে হঠাৎ এভাবে ডেকে আনলেন কেন ?'

'ওখানে কথা বলা যেত না, তাই।'

'আপনার স্বামী এটা পছন্দ করবেন কি ?'

'সেটা আমার চিন্তা, তাই না ?'

ক্লিওপেট্রা পাশে এসে বসল এবার। সঙ্গে সঙ্গে দম বন্ধ হয়ে গেল যেন বায়রণের। অদ্ভুত একটা মিষ্টি গন্ধ নাকে এল, বুকের ডিমদুটো বুঝি উত্তাপেই

বিস্ফারিত। বায়রণ কোনরকমে উচ্চারণ করল, 'বলুন।'

'কালকের ইনভিটেশন কাপ যেন জুপিটার না জেতে।'

'জুপিটার! আমি—।'

'কুমারমঙ্গলমের ঘোড়াটা জিতলে আমি হেরে যাব শ্যামুর কাছে।'

'দেখুন, আমাকে মিঃ শর্মা এনেছেন। তার ঘোড়া জেতানোই আমার কাজ। অন্য কোন ঘোড়া যদি বেটার হয় আমি চেষ্টা করেও পারব না কিন্তু প্রিন্সকে জেতানো ছাড়া আমি অন্য কিছু ভাবছি না।'

একটা উত্তপ্ত নরম হাত বায়রণের বাজু স্পর্শ করতেই সে কেঁপে উঠল। খুব আদুরে গলায় উচ্চারণ হল, 'কিন্তু আমি যে মার্টিনকে সই করে দিয়েছি।'

'তার মানে?'

'ওঁর সমস্ত ঘোড়ার মালিকানাস্বত্ব হয় আমার নয় আমার এবং শ্যামের। আমার গুলোর দায়িত্ব সামনের সিজন থেকে আমি মার্টিনকে দিয়ে দিয়েছি।'

'কেন?'

'মার্টিন ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ হর্স-ট্রেনার।'

'তাতে কি হয়েছে?'

ক্লিওপেট্রার পাঁচ আঙুল তার ডানহাতের পাঁচটা আঙুলকে জড়িয়ে ধরল সাপের মতন। ফিসফিস গলায় কথা বলল ক্লিওপেট্রা, 'আমি ওকে বাঁচাতে চাই।

'কাকে?'

'আমার স্বামীকে। ওকে শ্যাম মেরে ফেলতে চায়। হাজার বোঝালেও হরি এই ঘোড়ার জগত থেকে সরে যাবে না। শ্যাম সেইটে চাইছে। হাঁটুর বয়সী ও, সম্পর্কে আমার ছেলে, কিন্তু আমার কাছ থেকে ও অন্যকিছু আশা করে। এত-দিন অনেক ভুলিয়ে চলেছি কিন্তু এখন আর মুখোমুখি না হয়ে উপায় নেই। আমি হরির সমস্ত ঘোড়া মার্টিনকে দিয়ে দিতে চাই। ও ব্যাঙ্গালোরে ঘোড়া-গুলোকে দৌড় করাক। মার্টিন ইচ্ছে করলে ভারতবর্ষের সব বাজি আমাদের এনে দিতে পারে। হরি যা চাইছে তাই হবে। তাহলে। শুধু শ্যাম সরে যাবে মঞ্চ থেকে। সেইন, তুমি হয়তো সেদিন আমাদের ঘোড়াগুলোকে চালাবে। তাই না?'

'আমি! একথা জানলেন কি করে?'

'আমি সব জানি। যেমন জানি এয়ারপোর্টে আমাকে দেখামাত্র তোমার চোখে কি দৃষ্টি এসেছিল। বল, জানি না?'

একটা বিরাট ঢেউ যেন আচমকা উঠে এসে ছোঁ মেরে তাকে তুলে নিয়ে গেল। নিজের পায়ের শিকড় এত দ্রুত আলগা হয়ে গেল যে সে কখন ক্লিওপেট্রার সরু কোমর দুহাতে জড়িয়ে ধরে বুকের পাঁজরে ওকে মিশিয়ে নিয়েছে তা টের পায় নি। উম্-ম্ শব্দে ক্লিওপেট্রার ঠোঁট থেকে নিঃশ্বাসটা বেরিয়ে আসতেই সেই ঢেউ ঝড় হয়ে গেল। দুটো ঠোঁটের সব স্বাদ আকণ্ঠ গ্রহণ করতে করতে সে সম্বিতে এল। ক্লিওপেট্রার দুই হাতের তীক্ষ্ন নখ ততক্ষণে ওর পিঠে অদ্ভুত যন্ত্রণা মেশানো

সুখ দিচ্ছে। শিরায় শিরায় রক্ত দুলছে। ক্লিওপেট্রার স্তন এখন স্ফীত হয়ে উপচে উঠেছে। বায়রণ মুখ নামাল। সঙ্গে সঙ্গে পিঠের ওপর বসে যাওয়া নখ শিথিল হয়ে গেল। কয়েক মুহূর্তমাত্র, হঠাৎ এক ঝটকায় নিজেকে সরিয়ে নিয়ে গেল ক্লিওপেট্রা। এরকম কাণ্ডের জন্য একটুও প্রস্তুত ছিল না বায়রণ। অবাক চোখে সে মুখ তুললো। ক্লিওপেট্রা ততক্ষণে পোশাক ঠিক করে নিয়েছে। বাঁ হাতে চুল গোছাতে গোছাতে বলল, 'তুমি ভীষণ দুষ্টু।'

কথাটা বলার মধ্যে এমন একটা মাদকতা ছিল যে বায়রণ আবার মাতাল হল। সে দুহাত বাড়িয়ে ডাকল ক্লিওপেট্রাকে। এক চুলও নড়ল না ক্লিওপেট্রা। তেমনি দাঁড়িয়ে ঈষৎ ঘাড় বেঁকিয়ে বলল, 'নুনা, তুমি আমাকে কথা দাও নি।'

'কি কথা?' নিজের গলার স্বর নিজের কাছেই অচেনা লাগছিল বায়রণের।

'মার্টিনের জন্যে আগামীকাল রেস করবে তুমি!'

সঙ্গে সঙ্গে অদ্ভুত শীতলতা সমস্ত শরীরে ছড়িয়ে পড়ল তার। এই মুহূর্তে ওই মহিলার অনুরোধ প্রত্যাখান করা মানে—। সে ধীরে ধীরে মাথা নাড়ল, 'ঠিক আছে, আমি মিঃ শর্মার সঙ্গে কথা বলে দেখি।'

'না। মিঃ শর্মা নয়। আমি যা বলছি তাই তুমি করবে!'

ধীরে ধীরে মাথা নাড়ল বায়রণ, তারপর দুটো হাত বাড়িয়ে কাছে ডাকল ক্লিওপেট্রাকে। মোহিনী হাসি ছড়াল সেই মুখে, 'আমি পুরুষজাতটাকে বিশ্বাস করি না।'

'কিন্তু আমাকে বিশ্বাস করো।

'করব। কাল রাত্রে। তুমি আমাকে নিশ্চিন্ত করো আগামীকাল বিকেলে আর আমি তোমাকে পূর্ণ করব কাল রাত্রে। কথা দিলাম। এসো।' কথাটা শেষ করেই ক্লিওপেট্রা ঘুরে দাঁড়াল। এবার নিজেকে ভীষণ খেলো মনে হতে লাগল বায়রণের। তার শরীরের সব উত্তেজনা এখন উধাও হয়ে অদ্ভুত বিষাদ এবং ক্লান্তি ছেয়ে যাচ্ছে। এই মহিলা তাকে ক্রীতদাসের মতো ব্যবহার করছেন এখন। ওর মহার্ঘ্য শরীরের জন্যে বায়রণ একটু আগেও পৃথিবীর স্বত্ব ছেড়ে দিতে পারত। কোন রমণী তাকে এমনভাবে মাতাল করতে পারে নি কখনো। কিন্তু এই মুহূর্তে মনে হচ্ছে তার অবস্থা শ্যামের মতনই। গন্ধ পেয়েছে কিন্ত স্বাদ নিতে দেয় নি ক্লিওপেট্রা। নিজের শরীরটাকে টেনে টেনে সে মহিলার পেছন পেছন বেরিয়ে আসছিল। শেষ দরজাটির সামনে দাঁড়িয়ে ক্লিওপেট্রা আবার হাসল, 'কালকের রাতটা তাহলে আমাদের রাত হোক।' তারপরই দরজা খুলে হলঘরে পা বাড়াল সে।

সেই বিশাল দীর্ঘাঙ্গী রমণীটি তখনও দাঁড়িয়ে। ওপাশের দেওয়াল ঘড়িতে জলতরঙ্গ বাজলো, রাত নটা। ক্লিওপেট্রা জিজ্ঞাসা করল, 'সাহেব আসে নি?'

নীরবে মাথা নাড়ল রমণী।

ক্লিওপেট্রা বলল, 'ডিনার রেডি?'

ঘাড় নাড়ল রমণী, হ্যাঁ। তারপর চলে গেল ভেতরে।

'আর রাত করে লাভ নেই, এসো আমরা ডিনার টেবিলে বসি।'

দাসীটির কথা ভাবছিল বায়রণ। মেমসাহেব সম্পূর্ণ অপরিচিত একজন পুরুষের সঙ্গে নিজের মহলে এতক্ষণ দরজা বন্ধ করে কাটালেন কিন্তু এর কোন প্রতিক্রিয়া ওর চোখমুখ বা ব্যবহারে নেই। আশ্চর্য! ওঁক এরকম দেখতে অভ্যস্ত।

খাওয়ার ইচ্ছে ছিল না। তবু ক্লিওপেট্রার পেছন পেছন সে ডিনার টেবিলে পৌঁছে গেল। না, এই বাড়িতে আরো লোক আছে। দুজন উর্দি-পরা বাবুর্চি প্রস্তুত হয়ে দাঁড়িয়ে। ওরা চেয়ারে বসতেই বাইরে কোথাও শব্দ হল। ক্লিওপেট্রার ভুরু ডানা মেলল। একটু ভেবে উঠে দাঁড়াল সে, 'জাস্ট এ মিনিট।' তারপর দ্রুত পায়ে চলে গেল হলঘরের দিকে।

বাবুর্চি দুটো দুপাশে পুতুলের মতো দাঁড়িয়ে আছে। মেমসাহেবের হুকুম না হলে ডিনার পরিবেশন করা হবে না। বায়রণ চারপাশের বিত্তের ওপর চোখ বোলাচ্ছিল। মিনিট তিনেক পরে শিথিল পায়ে দরজায় এসে দাঁড়াল ক্লিওপেট্রা! 'সেইন!'

বায়রণ তাকাল। বেশ বিচলিত দেখাচ্ছে যেন ক্লিওপেট্রাকে।

'উনি তোমার সঙ্গে কথা বলতে চাইছেন।'

'কে?'

'আমার স্বামী!'

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল বায়রণ। হরি শর্মা তাহলে ফিরে এসেছেন।

হঠাৎ কেমন একটা শিরশিরানি অনুভব করল সে। তাকে এখানে নিয়ে আসার ব্যাপারে কি কৈফিয়ৎ দিয়েছে ক্লিওপেট্রা?

গম্ভীর মুখে বায়রণ ক্লিওপেট্রাকে অনুসরণ করল। এটা আর একটা মহল। ড্রইংরুমে ঢুকতেই হরি শর্মা নজরে এলেন। ঢাউস একটা সোফায় পিঠ এলিয়ে নিঃসাড়ে পড়ে আছেন। চোখ বন্ধ।

ক্লিওপেট্রা দ্রুত তাঁর মাথার কাছে এগিয়ে গিয়ে কপালে হাত রাখল, 'মিঃ বায়রণ, সেইন এসেছেন।'

খুব ধীরে চোখের পাতা মেললেন হরি শর্মা। ভীষণ বিধ্বস্ত দেখাচ্ছে ওঁকে। যেন সোজা হয়ে বসবার ক্ষমতাটুকুও ওঁর নেই। ক্লান্ত গলায় কথা বললেন, 'সিট ডাউন সেইন।'

সামনের সোফায় বসল বায়রণ, সে কোন কিছুর হদিশ করতে পারছিল না। হরি শর্মা জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি রেস্ট হাউস থেকে কখন বেরিয়েছ?' চকিতে ক্লিওপেট্রার দিকে তাকাল বায়রণ। কি বলতে চাইছেন মিঃ শর্মা? সে কি এখানে সত্যি কথাই বলবে? না বলার কোন কারণ নেই। বায়রণ সময়টা জানালো। ডান হাত তুলে স্ত্রীর বাজু স্পর্শ করলেন হরি, 'ঈশ্বর তোমাকে দিয়ে একটা উপকার করিয়েছেন। তুমি যদি ওকে রেস্ট হাউস থেকে তখনই না নিয়ে আসতে তাহলে এতক্ষণ সেইনের সৎকারের আয়োজন করতে হতো লীন।'

'তার মানে?' প্রশ্নটা একই সঙ্গে দু'জনের মুখ থেকে বেরিয়ে এল।

'কয়েকজন লোক গোপনে রেস্ট হাউসে ঢুকে সমস্ত কিছু তছনছ করছে। বায়রণ যে ঘরে আছে সেটিকে প্রায় ধ্বংস করে ফেলেছে। ভারালু আহত হয়ে

এখন হাসপাতালে শুয়ে রয়েছে।-আমার-দারোয়ানরা কাউকেই ধরতে পারে নি। পুলিশ এনকোয়েরি করছে।' কথাটা শেষ করার সময় মুখ বিকৃত করলেন মিঃ শর্মা।

'কে এ কাজ করবে?' বায়রণ সোজা হয়ে বসল।

'জানি না।'

সঙ্গে সঙ্গে সন্ধ্যেবেলায় দেখা শ্যাম শর্মার মুখ মনে পড়ে গেল বায়রণের। শ্যাম তাকে শাসিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু ব্যাপারটা যে সত্যি এতদূরে গড়াবে সে চিন্তাও করে নি। ক্লিওপেট্রা বলল, 'যারা লর্ড কৃষ্ণাকে আহত করিয়েছে তারাই রেস্ট হাউসে এসেছিল।'

'আমরা শুধু অনুমানই করতে পারি, তাই না?' হরি শর্মা বললেন।

'হ্যাঁ। কিন্তু জুপিটারকে কিছুতেই রেস জিততে দেব না।'

'জুপিটার!' শব্দটা উচ্চারণ করার সময় অসহায় ভাবে হাত নাড়লেন শর্মা। তারপর বললেন, 'সেইন, তোমার জিনিসপত্র আমি হোটেল হিন্দুস্থানে পাঠিয়ে দিয়েছি। সমস্ত সিকিউরিটির ব্যবস্থা করেছি। তুমি এখান থেকে হোটেলে ফিরে যাবে।'

মাথা নাড়ল বায়রণ। তারপর উঠে দাঁড়াল।

হরি শর্মা হাত তুললেন, 'যেও না, না খেয়ে চলে যাবেই বা কেন? তাছাড়া তোমার সঙ্গে আমার জরুরী কথা আছে।'

বায়রণ আবার বসল। হরি শর্মাকে সত্যিই বিধ্বস্ত দেখাচ্ছে। মনে হচ্ছে তীব্র ঝড় বয়ে গেছে ওঁর ওপর দিয়ে। একবার স্ত্রীর দিকে তাকালেন তিনি। ক্লিওপেট্রার মুখ পাথরের মতন স্থির।

হরি শর্মা বললেন, 'আমি তোমাকে বাধ্য হয়ে একটা হুকুম করতে চাই। তুমি নিশ্চয়ই বুঝবে এটা করতে আমার বুক ফেটে যাচ্ছে। কিন্তু তা না করে আমার উপায় নেই। কাল ইনভিটেশন কাপে প্রিন্স জিতুক এখন আমি আর চাই না।'

ঘরে বাজ পড়লেও এতখানি চমকে উঠত না। বায়রণ হাঁ হয়ে গেল। একি কথা শুনেছে সে! এত উৎসাহ দেখিয়ে তাকে যে ঘোড়া জেতাতে নিয়ে আসা হল, প্রতি মুহূর্তে হরি শর্মা যার জেতার সঙ্গে নিজের স্বপ্নকে জড়িয়েছেন সেই ঘোড়াকেই না জেতাতে বলছেন তিনি। শ্যাম শর্মা কিংবা ক্লিওপেট্রা যা চাইছে তার সঙ্গে হাত মেলালেন ভদ্রলোক। বায়রণের ইচ্ছে করছিল চিৎকার করে প্রতিবাদ করে। কিন্তু হরি শর্মা কথা বললেন, 'আমি জানি তুমি আমার মতনই আপসেট হবে। আমি পলকেও এই সিদ্ধান্তের কথা জানাই নি। তোমাকে আনবার ব্যাপারে পলের উপদেশ ছিল। তোমার অতীত ঘেঁটে পল বলেছিল কোন কিছুর মূল্যেই তুমি ইনভিটেশন জেতার সম্মান হারাবে না। আমরা তোমাকে বিশ্বাস করেছিলাম। কিন্তু সেই আমি এখন তোমাকে বলছি, এবার ভুলে যাও সেইন। সামনের বার আমার ঘোড়া ইনভিটেশন জিতবে এবং আই প্রমিস, তুমি সেই ঘোড়া চালাবে।'

'সামনের বছর ?' ফ্যাসফেসে গলায় বলল বায়রণ।

'হ্যাঁ। মার্টিনের স্টেবলে।'

'আমি কিছুই বুঝতে পারছি না মিঃ শর্মা। আপনি কি বলছেন ?'

'সত্যি কথাটা হল দিস ইয়ার আই এ্যাম নট গোয়িং ফর দি ইন-ভিটেশন।'

'কেন ?'

'বায়রণ, আমার চারপাশে ষড়যন্ত্র। সবাই আমার কাছ থেকে কেড়ে নিতে চায়। আজ বিকেলে মার্টিন বলল সে সন্দেহ করছে লর্ড কৃষ্ণার আহত হবার পেছনে অন্তর্ঘাত আছে। এবং সে মরীয়া, এখান থেকে সম্মান নিয়েই সে ফিরবে। সোজাসুজি আমার সাহায্য চাইল মার্টিন। বলল, লর্ড কৃষ্ণা থাকলে তার কোন চিন্তাই ছিল না। সে সামনের বছর আমার সব ঘোড়ার দায়িত্ব নিয়ে অল-ইন্ডিয়া রেসিং-এ আমাকে চ্যাম্পিয়ন করে দিতে পারে একটা সর্তেই এবং সেটা হল ওর ঘোড়া যদি সানকে জিততে সাহায্য করে তবে। না হলে ওর পক্ষে আমার ঘোড়া নেওয়া সম্ভব নয়। আমি জানি মার্টিন আমাকে ব্ল্যাকমেইল করছে। প্রথমে আমি রাজী হই নি। কিন্তু রেস্ট হাউসের খবরটা শোনার পর আমার মনে হল মার্টিনের সঙ্গে শত্রুতা করে লাভ নেই। এবছর ওকে ছেড়ে দিলে সামনের বছর আমি দশগুণ ফিরে পাব।'

'আপনি পাবেন এমন নিশ্চিত হচ্ছেন কি করে ? রেস তো অনিশ্চিত।'

'জানি। তুমি কি নিশ্চিত করে বলতে পারো প্রিন্স জিতবেই।'

ঘাড় নাড়ল বায়রণ, 'না, পারি না।'

'তাহলে। পলকে আমি সিদ্ধান্তের কথা জানাই নি কিন্তু ও জানবেই। মার্টিনকে কথা দেওয়া মাত্র প্রিন্সের দর বাড়ছে।'

ঠিক সেই সময় টেলিফোন বেজে উঠল। মিসেস শর্মা ধরলেন, 'ইয়েস।'

তারপরই রিসিভারে হাত চাপা দিয়ে বললেন, 'পল।'

'ওকে বলে দাও আমি অসুস্থ। আর ডিসিসন ইজ কারেক্ট।'

মিসেস শর্মা হাত সরালেন, 'ইয়েস। আপনি ঠিকই শুনেছেন। না, ওঁর সঙ্গে কথা বলা যাবে না, উনি খুব অসুস্থ। হ্যাঁ, ভাল থাকলে মাঠে যাবেন। না, না, বায়রণ কোথায় আছে আমরা জানবো কি করে। গুড নাইট।'

রিসিভার নামিয়ে মিসেস শর্মা বললেন, 'পল খুব নার্ভাস হয়ে পড়েছে। বলছে বাজারে জোর খবর প্রিন্স ট্রাই হবে না। এমনকি বাকিরাও দর বাড়িয়ে দিচ্ছে।'

হরি শর্মা বললেন, 'প্রিন্সের ট্রেনার হিসেবে পলের উদ্বেগ স্বাভাবিক। কিন্তু সে তো জানে সামনের বছর আমি মার্টিনের কাছে ঘোড়া পাঠাবো তবু কেন।' কথাটা শেষ করলেন না উনি।

মিসেস শর্মা এগিয়ে এলেন, 'তুমি এবার ওঠো. এখন তোমার বিশ্রামের প্রয়োজন।'

বড় বড় চোখে তাকালেন হরি শর্মা. 'হ্যাঁ, বিশ্রাম, বিশ্রাম করতে হবে।' স্ত্রীর

সাহায্য ছাড়াই উঠলেন হরি শর্মা। থপ থপ করে ভেতরের দরজার দিকে কয়েক পা এগিয়ে আবার ঘুরে দাঁড়ালেন, 'জানো সেইন, আজ দুপুরেও মনে হচ্ছিল এবার যদি ইনভিটেশন কাপ না পাই তাহলে মরে যাব। ভেতরে ভেতরে ভীষণ নার্ভাস হয়ে পড়েছিলাম। জানি আমার মৃত্যু কেউ কেউ চায়। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে আর একটা বছর বাঁচতে হবে আমাকে, সামনের বছর ইনভিটেশন কাপ অবধি অপেক্ষা করতে হবে। ম্লান হাসি ওঁর মুখে ছড়ানো। ধীরে ধীরে ভিতরে চলে যেতে যেতে বললেন, 'লীন তুমি সেইনের ব্যবস্থা করো, আমি ঠিক আছি।'

এখন দুজন এই ঘরে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে। বায়রণ লক্ষ্য করছিল ক্লিওপেট্রার অদ্ভুত পরিবর্তন হয়ে গেছে এর মধ্যে। এতক্ষণ হরি শর্মার কথামতো যা যা করেছে সবই যন্ত্রচালিত পুতুলের মতো। বায়রণ এর কারণটা বুঝতে পারছিল না। হরি শর্মার এরকম সিদ্ধান্ত নেওয়াতে ক্লিওপেট্রার তো খুশী হওয়ার কথা। স্বামীকে দলে পেলেন উনি। অথচ ওর মুখ এত থমথমে কেন ?

বায়রণ বলল, 'আমি এবার চলি!'

ক্লিওপেট্রা কথা বলল, 'কি সিদ্ধান্ত নিলেন ?'

বায়রণ হাসবার চেষ্টা করল, 'উনি তো আপনাকেই সমর্থন করলেন।'

'আপনি ?'

'আমি আজ্ঞাবহ মাত্র। তাহলে আগামীকাল রাত্রে দেখা হচ্ছে না কি বলেন ?' ভুরু কুঁচকে গেল ক্লিওপেট্রার। অদ্ভুত একটা মায়াবী হাসি ফুটলো ঠোঁটে, 'হ্যাঁ, আপনার তো কিছুই করার থাকছে না, নিতান্তই আজ্ঞাবহ মাত্র।'

বায়রণ বেরিয়ে এল। লিফটে নীচে নামতেই একটা লোক ওকে সেলাম করে এগিয়ে গিয়ে মার্সিডিজের দরজা খুলে দাঁড়াল। অর্থাৎ ওপর থেকে ইতিমধ্যেই খবর নেমে এসেছে। মার্সিডিজের নরম গদিতে খুব অস্বস্তি নিয়ে বসল বায়রণ। কি করবে সে এখন ?

হোটেল হিন্দুস্থানে সব ব্যবস্থাই করা ছিল। নিজের ঘরে ঢোকার সময় সে কোন গার্ড দেখতে পেল না। মিঃ শর্মা নাকি সিকিউরিটির ব্যবস্থা করেছেন, তারা কোথায় ? শরীরে খুব অস্বস্তি হচ্ছিল। স্নান করল সে আবার। তারপর ঘরে খাবার আনিয়ে অল্প কিছু খেয়ে নিল। আগামীকাল তাকে রেস করতে হবে। প্রিন্সকে হারাতে হবে। মার্টিনের 'দি সানকে' জেতাবার ব্যবস্থা করতে হবে তাকে। নিশ্চয়ই মাঠসুদ্ধ লোক কালকে জেনে যাবে বায়রণ মোটেই জেতার জন্যে ছুটছে না। ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠকাপে সে কলকাতার মাঠে ছুটবে একজন ইত্যাদির মতো। অথচ এমন ভঙ্গী করতে হবে যাতে স্টুয়ার্ডরা কোন সন্দেহ না করতে পারে। এ্যাপ্রেণ্টিস থাকার সময়ে দশবছর আগে শেষ যে ভুলটা সে করেছিল কালকেও সেটার অভিনয় করতে হবে।

টিপে টিপে যন্ত্রণা শুরু হয়ে গেল মাথায়। এই ঘরে ক্রমশ অস্বস্তি বেড়ে যাচ্ছে। একটু খোলা হাওয়ায় যেতে পারলে ভাল হতো। নীচের লনে গেলে কি সিকিউরিটি আপত্তি করবে ? এখন তার সিকিউরিটির কি দরকার। শর্মার

সিদ্ধান্তের কথা জেনে গেছে যখন সবাই তখন সে আর লক্ষ্যের কেন্দ্র হতে পারে না। বায়রণ বাইরে বেরিয়ে এল। লিফটে না ঢুকে সিঁড়ি দিয়ে নীচে নামতে লাগল সে। রিসেপশনের সামনে এসেও কাউকে দেখতে পেল না বায়রণ। না, স্রেফ ভাঁওতা দিয়েছেন হরি শর্মা। যাকে দিয়ে ঘোড়া জেতাতে হবে না তার কি প্রয়োজন আছে এখন ?

সার্কুলার রোডে আসতেই একজন লোক ছিনে জোঁকের মতো পেছনে লাগল। পৃথিবীর সব সুন্দরী মেয়েরা নাকি তার ঠিকানায় আছে। দু-মিনিটের রাস্তা, সাহেব যদি অপছন্দ করেন একটা পয়সাও লাগবে না। কোনরকমে লোকটাকে এড়িয়ে একটা ট্যাক্সী নিল বায়রণ। বলল, 'খোলা মাঠে কয়েক পাক ঘুরবে।' রাতের ট্যাক্সীওয়ালারা বোধহয় এরকম খেয়ালী মানুষের অপেক্ষায় থাকে। গুন গুন করতে করতে সে রেড রোডের দিকে ট্যাক্সীটাকে নিয়ে যাচ্ছিল। রেসকোর্সটা চোখে পড়তেই শক্ত হয়ে গেল বায়রণ। আগামীকাল তাকে এখানে চোরের মতো ছুটতে হবে। ঈশ্বর !

আচ্ছা প্রিন্স কি জিততে পারত চেষ্টা করলে। সিজারকে গ্যালপ করার সময়ও তো তার মনে হয়েছিল স্প্রিনটার্স কাপ হাতের মুঠোয়। কিন্তু মাঠে নেমে তো সেটা হল না। ব্যাপারটা ভাবতে ভাবতে সে কিছুটা হালকা হল। হরি শর্মা বললেই যে সে জিতে যেত এমন তো নয়। বরং তখন জেতার জন্য মরীয়া হতে হতো। হারলে শর্মার কি হতো বলা যায় না। ট্যাক্সীটা তখন খিদিরপুরের দিকে বাঁক নিয়েছে। হঠাৎ মনে হতেই সে ড্রাইভারকে হেস্টিংসের স্টেবলের দিকে যেতে বলল। প্রিন্সকে একবার দেখতে খুব ইচ্ছে করছে তার।

ট্যাক্সীটাকে অপেক্ষা করতে বলল বায়রণ। এখন মধ্য রাত। চারপাশ নিস্তব্ধ। এই সময়ে স্টেবলে ঢোকা আইন-বিরুদ্ধ। কয়েক পা এগোতে প্রহরীদের মুখোমুখী হল সে। ওরা সবাই বায়রণকে চেনে। দেখতে পেয়ে অবাক তারা। বায়রণ কামালের খোঁজ করল। ওরা গিয়ে ঘুম ভাঙিয়ে কামালকে ডেকে আনতেই সে একেবারে হকচকিয়ে বলল, 'আপনি এখানে ছোটেসাব ?'

একটু আলাদা সরে গিয়ে বায়রণ বলল, 'আমাকে একটু প্রিন্সের কাছে নিয়ে যেতে পারো কামাল ? আমি ওকে দেখতে চাই।'

'প্রিন্স ! পল সাহেব অর্ডার দিয়েছেন কেউ যেন ওর কাছে না যায়।'

'আমি কাল ওকে রাইড করব। পলকে যা বলার আমি বলব।'

'একটু দাঁড়ান ছোটেসাব।'

বায়রণ জানে না কামাল কার কাছে অনুমতি নিতে গেল। প্রহরীরা তাকে দেখছে। মিনিট পাঁচেক বাদে কামাল এসে তাকে ভেতরে নিয়ে চলল। যেতে যেতে বলল, 'কাজটা বেআইনী, কিন্তু ছোটেসাব, আপনার কথা আমি না মানি কি করে! লোক বলছে কাল নাকি আপনি ট্রাই করবেন না। কিন্তু আমি ওকথা বিশ্বাস করি না। দশ বছর আগের আপনি আর এখনকার আপনি তো এক নন। আমি রেস খেলি না ছোটেসাব, কিন্তু আপনার জন্যে আমি প্রিন্সের ওপর পঞ্চাশ টাকা লাগিয়েছি।'

ম্লান হাসলো বায়রণ, 'কিন্তু যদি আমি হেরে যাই।

'লড়ে হারলে কোন আফসোস নেই।'

বায়রণ একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলল। বেচারা।

প্রিন্স দাঁড়িয়েছিল। স্টেবলের অন্য ঘোড়াদের কাছ থেকে আলাদা সরে রাজার মতো দাঁড়িয়ে আছে ও। মৃদু একটা আলো জ্বলছে এখানে। ওদের দেখা মাত্রই প্রিন্স কানখাড়া করে সোজা হয়ে দাঁড়াল। পায়ে পায়ে এগিয়ে গেল বায়রণ। কাছাকাছি যেতেই ঘোড়াটা অস্বস্তি নিয়ে দুপা সরে লেজ নাড়ল শব্দ করে। বায়রণ চাপা গলায় ডাকল, 'প্রিন্স!' তারপর ওর গলায় হাত রাখল সে। এবার বোধহয় চিনতে পারল প্রিন্স তাকে। ধীরে ধীরে মুখ ঘুরিয়ে ওকে দেখল সে। তারপর মাথা তুলে আদর খেতে লাগল চোখ বুজে। প্রিন্সের গায়ের স্পর্শ এবং গন্ধ অনুভবে আসামাত্র অদ্ভুত এক শিহরণ এল বায়রণের। ও স্থানকাল ভুলে গিয়ে ফিসফিসিয়ে বলল, 'আমাদের জিততে হবে প্রিন্স। আমাদের বদলা নিতে হবে।'

প্রিন্স কি বুঝল কে জানে। বায়রণের মুখের চাপ তার গলায় নিয়ে সে কান নাড়ল শব্দ করে।

গত রাত্রে কখন হোটেলে ফিরেছিল ঘড়ি দ্যাখে নি বায়রণ। আজ অনেক বেলায় ঘুম ভাঙল। ভাঙতেই মনে পড়ল কয়েক ঘণ্টা বাদেই ইনভিটেশন কাপ। তার মালিক চাইছে না যে ঘোড়াটা জিতুক। এরকম কাণ্ড এখনো এখানেই ঘটে। কোন হিসেব এখানে খাটে না। আগামীকাল কি হবে আজ বিকেলে তা বলা যাবে না।

বিছানায় শুয়েই সে টেলিফোনটাকে বাজতে শুনল। হাত বাড়িয়ে রিসিভার তুলতেই পলের গলা কানে এল, 'গুডমর্নিং সেইন।'

'মর্নিং।'

'কাল রাত থেকে তোমায় খুঁজছি। কোথায় ছিলে?'

'কেন?'

'শুনলাম রেস্ট হাউসে তোমার ওপর আক্রমণ করার চেষ্টা হয়েছিল। তারপর থেকে তুমি উধাও। একটু আগে খবর পেলাম তুমি মাঝ রাতে স্টেবলে গিয়েছিলে। এটা অন্যায় করেছ। অন্য কেউ হলে আমি কামালকে সাসপেণ্ড করতাম।'

'সরি।'

'তোমার সঙ্গে আমার দেখা হওয়া দরকার।'

'কখন?'

'এখনই।'

'আমি বড় ক্লান্ত, পল।'

'তুমি কি জানো শর্মা চাইছে রেসটা ছেড়ে দিতে।'

'জানি।'

'ও। কিন্তু আমি চাই না।'

'প্যাডকে যা বলার বলো।'

'কিন্তু ট্রেনারের নির্দেশ তুমি মানতে বাধ্য।'

'অবশ্যই, তবে ঘোড়ার লাগাম আমার হাতে থাকবে। আর তুমি তো জানোই ঘোড়া যন্ত্র নয়। আর যে চটপট সমস্ত অঙ্কের সমাধান করতে পারে সে ইচ্ছে করে ভুল করলে কেউ তা ধরতে পারবে না।'

'সেইন!' চিৎকার করে উঠল পল।

'আমি জানি প্রিন্সের দুর্বলতা কোথায়। গুডবাই পল, প্যাডকে দেখা হবে।' রিসিভার নামিয়ে রেখে পলের জন্য অদ্ভুত মায়া হল বায়রণের। কলকাতার চ্যাম্পিয়ন ট্রেনার ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ বাজি জেতার সম্মান হারাতে কেন রাজী হবে। সত্যিই তো! হরি শর্মার উচিত ওর সঙ্গে ফয়সালা করা। ওকে বুঝিয়ে ক্ষতি-পূরণের ব্যবস্থা করা। টেলিফোনটার দিকে তাকাল বায়রণ। শর্মার সঙ্গে একবার কথা বলবে নাকি?

রিসিভার তুলে ডায়াল ঘোরাতেই ওপাশে শব্দ হল। ভাগ্যিস এই ঘরে ডাইরেক্ট টেলিফোন আছে নইলে অপারেটার সব কথা শুনতো। বোধহয় সেই রমণীটি সাড়া দিল। বায়রণ নিজের পরিচয় জানিয়ে শর্মাকে চাইল। কয়েক মুহূর্ত, সেই খসখসে অথচ পেলব গলা কানে এল, 'হেলো।'

'বায়রণ বলছি।'

'ও বায়রণ! সকাল থেকে তোমায় ভাবছিলাম।'

অন্যসময় হলে এতেই উত্তেজনা বোধ করত বায়রণ, এখন কোন বোধ হল না। সে জিজ্ঞাসা করল, 'শর্মাসাহেব কোথায়?'

'ঘুমুচ্ছে। শোন, তোমার সঙ্গে আমার জরুরী দরকার আছে।'

'বলুন।'

'টেলিফোনে বলা যাবে না।'

'হোটেলে আসুন।'

'না, সেখানেও যাওয়া যাবে না।'

'তাহলে?'

'তুমি কি আজ রাতে আসতে চাও?'

'মানে?'

'তাহলে প্রিন্সকে জেতাতে হবে। দিস ইজ মাই কন্ডিশন। গুডবাই।'

টেলিফোনটা কেটে যেতেই হতভম্ব হয়ে গেল বায়রণ। একি কথা শুনছে সে? মার্টিনকে সমস্ত স্বত্ব দিয়ে নিজের ঘোড়াকে জেতাবার চেষ্টা করবেন না বলে এতক্ষণ মহিলা স্থির করেছিলেন। এমন কি কাণ্ড ঘটতে পারে যাতে এক মুহূর্তেই মতটা বদলে গেল! নাকি মার্টিনের কাছে তিনি নিজে মাথা নোওয়াতে পারেন কিন্তু হরি শর্মার আত্মসমর্পণ সহ্য করা তার পক্ষে অসম্ভব। অথবা এও হতে পারে, মিসেস শর্মার একমাত্র উদ্দেশ্য যে কোন উপায়ে স্বামীর বিরুদ্ধাচরণ করা। ঈশ্বর! এখন কি করা যায়?

পকেটে সামান্য টাকা নিয়ে ভিক্টোরিয়াতে পেঁছেছিল বীরেন সেন। এর আগে সে কখনও কলকাতার বাইরে যায় নি। ট্রেনে দীর্ঘযাত্রাপথে তেমন কিছু খাওয়া দাওয়া হয় নি ফলে শরীর বেশ দুর্বল ছিল। তাছাড়া হাজার চিন্তা করেও কোন কূলকিনারা পায় নি। এ্যাপ্রেন্টিস জকি হিসেবে কলকাতায় সাসপেন্ড হয়ে বসে থেকে কোন লাভ নেই। নির্দিষ্ট সময়ের পর তার ভাগ্য যে ফিরবেই একথা কেউ বলতে পারে না। বরং ট্রেনারকে বিপদে ফেলেছে সে স্টুয়ার্ডদের সামনে এরকম একটা অপপ্রচার চালাচ্ছে ক্যানিংকার। এর ওপর দিদি জামাইবাবুর আশ্রয়টুকু ঘুচে গেছে সেই একই রাত্রে। এন্টনী সেদিন তাকে একটা দামী উপদেশ দিয়েছিল। বলেছিল, 'বীরেন, কলকাতা ছেড়ে চলে যাও। ভারতবর্ষে আরো অনেক রেসিং সেন্টার আছে। সেখানে অনেক বড় জকি দৌড়োয়। অনেক বড় ট্রেনার আছেন। কোথাও না কোথাও তোমার একটা জায়গা হয়ে যাবে। আর পরিশ্রম যদি করতে পারো তাহলে অবশ্যই একদিন সাফল্য পাবে।' দুটো চিঠি দিয়ে দিয়েছিল এন্টনী। আগে যখন সে কলকাতার ট্রেনারদের হয়ে বোম্বে ব্যাঙ্গালোরে রাইড করতে যেত তখন অনেকের সঙ্গেই পরিচিত হয়েছিল। এই পরিচয়পত্র দুটি এখন বীরেন সেনের একমাত্র ভরসা।

সেই প্রথম রাতটা বীরেন সেন স্টেশনেই কাটিয়েছিল। পরদিন ভোরে জিজ্ঞাসা করে এন্টনীর দেওয়া চিঠিটি প্রথম ব্যক্তির হাতে তুলে দিয়েছিল সে।

ভদ্রলোক বেশ নামী ট্রেনার। চিঠিটা পড়ে ভুরুর তলায় তাকিয়েছিলেন তিনি। তারপর ধীরে ধীরে মাথা নাড়লেন, 'নো, আই অ্যাম সরি। কোন সাসপেন্ডেড্ জকিকে আমি প্রটেকশন দেবার কথা ভাবতে পারি না। তাছাড়া যে একবার ট্রেনারের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে তাকে বিশ্বাস করা শক্ত।' বলতে গেলে মুখের ওপর দরজা বন্ধ করে দিয়েছিলেন ভদ্রলোক। একটি স্যুটকেস নিয়ে সারাদিন বোম্বের এ মাথা সে মাথা করে বেড়াতে হয়েছিল সেদিন দ্বিতীয় ভদ্রলোককে ধরতে। ফ্ল্যাটে গিয়ে শুনল উনি রেসকোর্সে আছেন। রেসকোর্সে সেদিন রেস ছিল না। ফলে বিনা অনুমতিতে ঢোকা অসম্ভব। অনেক বলেও কিছু লাভ হল না। গেটে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে করতে বেলা গড়ালো। ভদ্রলোককে সে চেনে না। অনেক গাড়ি যাওয়া আসা করছে তার একটাতে যদি ভদ্রলোক থাকেন তো হয়ে গেল। শেষ পর্যন্ত আবার বীরেন ওর ফ্ল্যাটের সামনে ফিরে এল। ওঁর স্টেবল কোথায় তাও জানা নেই কিন্তু এ কথা তো ঠিক উনি একবার বাড়িতে ফিরবেনই। সময়টা এখনও স্পষ্ট মনে আছে। সন্ধ্যে সবে হয়েছে। ফ্ল্যাট বাড়িটার মুখে স্যুটকেস রেখে দাঁড়িয়েছিল বীরেন। গেটের দারোয়ানকে সে বারংবার বলে রেখেছিল স্মিথ সাহেব এলেই যেন ওকে চিনিয়ে দেয়। সন্ধ্যে সাতটা নাগাদ গাড়িটা ঢুকতেই দারোয়ান তাকে ইসারা করল। যে লোকটা গাড়ি থেকে নামল তাকে কখনই ট্রেনার বলে ভুল হবে না। যে ঘোড়াকে ট্রেইন্ড করবে তাকে তো ঘোড়ায় চড়তেই হবে। এই মানুষটি ওই শরীর নিয়ে কখনোই ঘোড়ায় ওঠে নি। অবিশ্বাসে দারোয়ানটার দিকে তাকাতেই সে আবার মাথা নাড়ল। বিশাল ভুঁড়ি চওড়া বেল্টের বেড়িতে আটকানো, মাথা ছোট, দুটো পা সরু হয়ে

নীচে নেমে গেছে, মিঃ স্মিথ গাড়ি থেকে নেমে একটু টলে গেলেন। কাছে যেতে সাহস পাচ্ছিল না বীরেন। মাতাল কিনা ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। দারোয়ানটাই উদ্ধার করল তাকে, 'সাব।'

'ইয়েস।' হ্যাঁ, মদ্যপানের প্রতিক্রিয়া এখন স্পষ্ট।

'ইয়ে আদমী সুবেসে আতা হ্যায়। আউর যাতা হ্যায়। আপসে মোলাকাৎ করনে মাংতা হ্যায়।'

দারোয়ানের কথাটা শেষ হওয়ামাত্র স্মিথ সাহেব ঘুরে ওকে দেখলেন। মুখ লাল টকটকে, চোখ মাংসের বাহুল্যে প্রায় ঢাকা, জড়ানো গলায় জিজ্ঞাসা করলেন, 'কৌন হ্যায় তুম্?'

চটপট পকেট থেকে চিঠিটা বের করে সে এগিয়ে ধরল, 'হেয়ার ইজ এ লেটার ফর ইউ।' ছোঁ মেরে চিঠিটা হাত থেকে নিয়ে খুললেন স্মিথসাহেব, পড়ার চেষ্টা করে পকেট হাতড়াতে লাগলেন, 'আমার চশমা, চশমাটা কোথায়! ড্যাম ইট! কে লিখেছে?'

'এণ্টনী ফ্রম ক্যালকাটা।'

'এণ্টনী! ও, দ্যাট ওল্ড ফেলা। য়ু আর কামিং ফ্রম ক্যালকাটা?'

'ইয়েস স্যার।'

'হোয়াই।'

'মিঃ এণ্টনী আপনাকে সব লিখেছেন স্যার।'

'লিখেছেন কিন্তু সেটা না পড়লে, আমি জানবো কি করে? যত্ত ঝামেলা! কাম উইদ মি, আমার ঘরে এসো। ওই টিমিড্ লোকটা যখন এতদিন পরে আমাকে চিঠি দিল তখন সেটা ভাল করে পড়া উচিত।'

স্যুটকেস হাতে ফাঁসীর আসামীর মতো দাঁড়িয়েছিল বীরেন সেন। টেবিল-ল্যাম্প জেলে নাকের ডগায় চশমা ঝুলিয়ে এণ্টনীর চিঠিটা পড়ছিল স্মিথ। পড়া শেষ হলে জিজ্ঞাসা করলেন, 'এণ্টনী এখন কেমন চালাচ্ছে?'

এই প্রশ্নটা মোটেই আশা করে নি বীরেন। বলল, 'খুব ভাল।'

'ভাল! কলকাতায় রাইড করে আর কি ভাল হবে।' কথাটা যেন নিজের সঙ্গেই বলা। তারপর আচমকা প্রশ্ন করলেন, 'তোমার বয়স কত?'

সঠিক বয়স বলল সে।

'কি করে ঘোড়া টানতে হয় জানো না?'

'ঠিক সময়ে পারি নি।' মাথা নীচু করে জানালো সে।

'আগে তোমাকে খারাপটা জানতে হবে তাহলে মাঝে মাঝে ভাল করতে পারবে বুঝলে। তুমি একটা ইডিয়ট। এণ্টনী এই খবরটা তোমায় বলে নি?'

কি খবর? সে যে একটা ইডিয়ট, এইটে? কি উত্তর দেওয়া যায় বুঝতে পারল না বীরেন। অথচ স্মিথ সাহেব তার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছেন। সে মাথা নামালো। স্মিথ সাহেব একটা চেয়ার টেনে বসলেন, 'নাউ টেল মি, ঘটনাটা কি ঘটেছিল?'

আশ্চর্য! এতখানি ট্রেন যাত্রা, সারাদিনের পরিশ্রম ওই মুহূর্তে উধাও হয়ে

গিয়েছিল। বীরেন সেন ধীরে ধীরে সমস্ত কথা খুলে বলেছিল স্মিথ সাহেবকে। স্মিথ শোনার পর কিছুক্ষণ গুম হয়ে বসে রইলেন। তারপর জিজ্ঞাসা করলেন, 'হোয়াটস্ ইওর নেম ?'

'বীরেন সেন।'

চটপট এণ্টনীর চিঠিটা খুলে নাকের সামনে ধরলেন তিনি, 'না, এণ্টনী লিখেছে বায়রণ সেইন।'

'না, না, ওর উচ্চারণ হবে বীরেন সেন। আমি অবশ্য বীরেন্দ্র নামে ওখানে রাইড করতাম।'

'বীরেন সেন ? নো, নো, য়ু আর বায়রণ সেইন ! তোমার ইন্ডিয়ান নাম আজ থেকে বাতিল হয়ে যাক। বোম্বে-ব্যাঙ্গালোরের প্যান্টাররা তোমাকে জানবে বায়রণ সেইন বলে। তুমি জানো, স্বাধীনতার এত বছর পরেও ইন্ডিয়ানরা ইংরেজী নামের ওপর বেশী আস্থা রাখে। তুমি এখন থেকে তাই বায়রণ সেইন, আন্ডারস্ট্যান্ড ?'

শিহরিত হল সে। তাহলে কি স্মিথ সাহেব তাকে গ্রহণ করেছেন এ্যাপ্রেণ্টিস হিসেবে ? আনন্দে চোখে জল এসে যাচ্ছিল ওর। স্মিথ সেটা লক্ষ্য করলেন, দয়া করে কোন বোকামী করে বসো না। চোখের জল পুরুষ মানুষের জন্যে নয়। তুমি ভেবো না আমি তোমার চেহারা দেখে মজে গেছি। যেহেতু এণ্টনী চিঠি দিয়েছে তাই তোমাকে ঘরে আসতে বলেছি ! যেহেতু কানিৎকারের মতো পয়লা নম্বরের জোচ্চর তোমাকে ফাঁসিয়েছে তাই। কিন্তু তোমাকে পরীক্ষা দিতে হবে। আমি তোমার রাইডিং দেখব। এতদিন যা শিখেছ সব ভুলে যাও। যতদিন তুমি সাসপেন্ডেড হয়ে আছ ততদিন আমার ঘোড়াগুলোকে গ্যালপ করাবে। আমি যা বলব সেই মতো যদি নিজেকে গড়তে পারো তাহলে আমি তোমাকে এ্যাকসেপ্ট করব। আন্ডারস্ট্যান্ড ?'

নীরবে ঘাড় নাড়ল বীরেন সেন।

'নাউ গেট আউট। কাল সকালে স্টেবলে দেখা করো।'

স্যুটকেস তুলে নিয়ে আনন্দিত হয়ে সে যখন বেরিয়ে যাচ্ছে তখন পেছন থেকে ডাক এল, 'ওয়েট। তোমার হাতে স্যুটকেস কেন ?'

'এতে আমার জিনিসপত্র আছে।'

'ওতে তাই থাকে একথা সবাই জানে। কিন্তু ওটা সঙ্গে নিয়ে ঘুরছ কেন ? তুমি এখানে কোথায় উঠেছ ?'

'এখনও উঠি নি কোথাও।'

'সেকি ! স্টেশন থেকে বেরিয়ে তুমি আমার জন্যে দাঁড়িয়ে আছ নাকি ? স্ট্রেঞ্জ। এখন কোথায় যাবে ?'

'দেখি।'

'ইডিয়ট ! পকেটে টাকা আছে ?'

নীরবে মাথা নাড়ল সে। বোঝা যাচ্ছে স্মিথ সাহেব বেশ অবাক হয়ে গেছেন। সে যখন দরজার বাইরে পা রাখছে তখন আবার গর্জন হল, 'হেই ম্যান, তোমার নামটা মনে আছে তো।'

হকচকিয়ে গেল সে। তারপরেই সামলে নিয়ে বলল, 'বায়রণ সেইন।'

সে রাতে একটা মাঝারী হোটেলে শুয়ে ছিল বায়রণ সেইন। চল্লিশটি টাকা চব্বিশঘণ্টার জন্যে দক্ষিণা, পকেটে বেশী রেস্ত না থাকলেও সে রাতে গায়ে লাগে নি। জাহাজ ডুবির পর ভাসতে ভাসতে হঠাৎ যদি পায়ের তলায় মাটি পাওয়া যায় তাহলে মানুষের মনে অন্য চিন্তা কাজ করে না। কিছুতেই ঘুম আসছিল না তার। অতিরিক্ত ক্লান্তিতে না উত্তেজনায় কে জানে। এন্টনীর জন্যেই সে এই জায়গাটুকু পেল। মানুষটার কাছে আপাদ-মস্তক কৃতজ্ঞ সে। ঈশ্বর পৃথিবীতে দু'রকমের মানুষ ছড়িয়ে রেখেছেন। একদল বিষিয়ে দেয় বলেই এক দলের কাছে অমৃত পাওয়া যায়।

স্মিথ সাহেবের স্টেবল্ খুব বড় নয়। মাত্র সাতাশটা ঘোড়া তার। দুবছর বয়সের নবীন আছে চারটি। অন্য ঘোড়াগুলোও খুব দামী নয়। সারাদিনের রেসকার্ডে তাঁর এনট্রি তিন থেকে চারটে বাজীতে থাকে। খুব ভেবে চিন্তে ঘোড়া এনট্রি করেন ভদ্রলোক। যখন ভাল ঘোড়াগুলো হ্যান্ডিকাপে তার ঘোড়ার সমান থাকে তখন এনট্রি করেন না। সেগুলো জিতে বেশী হ্যান্ডিকাপ্ড হয়ে গেলে কম ওজনের সুযোগ নিয়ে ঘোড়া এনট্রি করে বাজী জেতান। ফলে তাঁর ঘোড়ার মালিকরা প্রায় প্রত্যেকেই জয়ের মুখ দ্যাখে এবং বেশী দর পায়। স্মিথ সাহেবের বক্তব্য, মালিকরা ঘোড়া কিনে তাকে দিয়েছে মুখ দেখার জন্যে নয়। তারা টাকা খরচ করেছে এবং ট্রেনারের কর্তব্য তাদের টাকা পাইয়ে দেওয়া। কোন্ ঘোড়া জিততে পারে পারে সেই খবরটা পাব্লিককে দেওয়ার জন্যে রেস নয়। ফলে ছোট স্টেবল হওয়া সত্ত্বেও স্মিথসাহেবের বেশ সম্মান আছে এখানকার ঘোড়ার মালিকদের কাছে।

ওর ঘোড়াগুলোকে প্রত্যেক দিন সকালে গ্যালপ করাতে গিয়ে বায়রণ লোকটি সম্পর্কে আরো শ্রদ্ধাশীল হল। প্রতিটি ঘোড়ার সব তথ্য ওঁর জানা। নিজে রাইড করতে সক্ষম না হলেও একজন জকিকে স্মিথ অনায়াসে তৈরী করতে পারেন। মুখ বুজে পরিশ্রম করে যেত বায়রণ। স্মিথ সাহেবের একটা চালাকী ছিল, স্পার্টের সময় কখনও ঘোড়ার টাইমিংস নোট করতেন না। বিভিন্ন স্পেসে ঘোড়াকে এক্সারসাইজ করাতে বলতেন জকিদের। প্রথম দিনেই যে উপকারটি করেছিলেন সেটি হল বায়রণকে স্টেবলের কাছাকাছি একটা ঘরের ব্যবস্থা করে দেওয়া। খুব সাধারণ ঘর কিন্তু বেঁচে গিয়েছিল বায়রণ। স্মিথ সাহেব ওর সারাদিনের রুটিন করে দিয়েছিলেন! কখন কি খাবে, কতটুকু ঘুমুবে থেকে শুরু করে রেসের ওপর নানান বিদেশী বইপত্র পড়তে দিতেন তিনি। একজন জকির সবচেয়ে বেশী ওজন হওয়া উচিত আটচল্লিশ কেজি। এই ওজনটা যে-কোনো ঘোড়ার পক্ষে বইতে কোনো অসুবিধে হবার নয়। শরীরে মেদ যাতে না বাড়ে তার দিকে কড়া দৃষ্টি রাখতে বলতেন স্মিথ সাহেব।

এইরকম পরিশ্রম করে শাস্তির সময়টা পার হয়ে এল বায়রণ। সেটা ছিল বোম্বের ভরা সিজন। ক্লাস ফোরে স্মিথ সাহেব একটা ঘোড়া এনট্রি করেছেন ডিমোশন নেওয়ার জন্যে। ঘোড়াটা ওই ক্লাসে বাজী জিততে পারছিল না। এক

ক্লাস নামার জন্যে ওই দৌড়টা দরকার ছিল। সাধারণত স্বল্প পাল্লায় ছুটতো ঘোড়াটা। স্মিথ একে দূর পাল্লায় এন্ট্রি করে স্পষ্ট বুঝিয়ে দিলেন যে তিনি ওটার ডিমোশন চান। ঘোড়াটা যদি প্রথম তিন ঘোড়ার মধ্যে না আসতে পারে তাহলে ওকে নীচের ক্লাসে নামিয়ে দেওয়া হবে। এই ঘোড়াটাকে চালাবার জন্যে উনি বায়রণকে প্রথম নির্বাচন করলেন। সারা দিনে ওই একটি মাত্র বাজীতে চালাবে সে এবং এই ঘোড়া যে বাজী জেতার জন্যে চেষ্টা করবে না তা স্পষ্ট, ফলে বায়রণ খুশী ছিল না। কিন্তু বোম্বেতে প্রথম রাইড করছে বলে এক ধরনের উত্তেজনা ছিল। সম্পূর্ণ নতুন মাঠ, নতুন দর্শক এবং দীর্ঘকাল সাসপেন্ডেড হয়ে থাকার পর নতুন করে জীবন শুরু করার উত্তেজনা।

প্যাডকে সে যখন স্মিথ সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে এল নতুন জার্সি পরে তখন তিনি সেই ঘোড়ার মালিকের সঙ্গে কথা বলছেন। বায়রণকে দেখে ইশারায় কাছে ডাকলেন, 'শোন, ঘোড়াটা যেহেতু এই ক্লাসে জিতছে না তাই ডিমোট না করিয়ে উপায় নেই। কিন্তু ডিমোটেড হলেই ঘোড়াটা দর পাবে না। উইকার কম্পানীতে কোনো বুকি ওর প্রাইজ দেবে না। ভাবছি একটা কাজ করলে কেমন হয়? এই দূর পাল্লার দৌড় দৌড়বার মতো দম ওর নেই। তবু তুমি চেষ্টা কর। সেকেন্ড থার্ড হলে তো একটা স্টেকম্যানি পাওয়া যাবে। এবার ডিমোটেড না করলেও পরের বার করবেই। মাঝখান থেকে স্টেক মানি পেলে ক্ষতি কি?'

প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় এবং কখনো কখনো চতুর্থ হওয়া ঘোড়ার জন্যে টার্ফ ক্লাব আর্থিক পুরস্কার দেন। সেটাকেই স্টেক মানি বলে। বায়রণকে স্মিথ কোনো বিশেষ নির্দেশ দিলেন না। দর্শকদের সামনে দিয়ে সে যখন অন্য জকিদের সঙ্গে ঘোড়া নিয়ে স্টার্টিং পয়েন্টের দিকে যাচ্ছে তখন উল্লাসধ্বনি শুনতে পেল। তারা অন্য একটি ঘোড়ার জকিকে অগ্রিম অভিনন্দন জানাচ্ছে। যেতে যেতে বায়রণের মাথায় একটা ভাবনা এল। সে শুনেছে ওই ঘোড়াটা স্বল্প-পাল্লার দৌড়ে সক্ষম। তার মানে খুব স্পীডি। তাই যদি হবে অন্য ঘোড়াগুলি থেকে প্রথমেই পূর্ণ গতিতে ও এগিয়ে যেতে পারে। পরে দম ফুরিয়ে অন্যদের কাছে হেরে যাওয়ার সময় কোনরকমে তৃতীয় হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। রেস শুরু হলে সে তাই করল। যেন হাজার মিটার দৌড়চ্ছে এমন গতিতে দু'হাজার মিটার দৌড় শুরু করল। দূর পাল্লার দৌড়ে প্রথম দিকে সবাই জোরে ছোটে না দমের কারণে, তাই এক্ষেত্রে বায়রণ ত্রিশ লেংথের ব্যবধান করে ফেলল। আট ন'শ মিটার যাওয়ার পরই ঘোড়াটার গতি হ্রাস পেতে লাগল। অন্য ঘোড়াগুলো বেগ বাড়াচ্ছে। কিন্তু ত্রিশ লেংথ কমতে কমতে দশ লেংথে যখন এসেছে তখন আর পঞ্চাশ মিটার বাকী। ঘোড়াটা যেন আর ছুটতেই চাইছে না বেদম হয়ে। কাছের ঘোড়াটা প্রায় পাঁচ লেংথের মধ্যে এসে গেছে। কিন্তু কি আশ্চর্য, হাফ লেংথ এগিয়ে বায়রণের ঘোড়া রেস জিতে গেল। স্মিথ সাহেব খুব হেসেছিলেন সেদিন। বোম্বেতে প্রথম দিনেই সে রেসটা জিতেছিল বলে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন। সত্যি কথা বলতে কি শেষ পঞ্চাশ মিটার দৌড় বলে মনে হয় নি। বায়রণের ঘোড়া তীব্রবেগে ছোটার পর এমন হাঁপিয়ে গিয়েছিল যে ওর ভয় হচ্ছিল যে-কোনো

মুহূর্তে পা মুড়ে না বসে পড়ে। দু হাতে কোনোরকমে ঘোড়াটাকে খাড়া রাখতে চেষ্টা করেছিল। প্রথমেই বিরাট ফারাক হয়ে যাওয়ায় সেই ফাঁকটা ভরাট করা সম্ভব হয় নি প্রতিপক্ষের। স্মিথ সাহেব স্বীকার করেছিলেন ওই বাজী পাওয়ার কোনো কথাই ছিল না, স্রেফ বায়রণের উপস্থিত বুদ্ধির জয় হয়েছে।

পরদিনই বোম্বের ইংরেজী কাগজের খেলার পাতায় হেডলাইন বের হল, 'মৃত ঘোড়াকে জকি বয়ে এনে জিতিয়ে দিল।' সেই শুরু। প্রথম চারবছর স্মিথ সাহেবের ছাড়া আর কারো ঘোড়া চালায় নি সে। কিন্তু দেড় বছরেই সে এ্যাপ্রেণ্টিস থেকে পূর্ণ জকির মর্যাদা পেয়েছিল চল্লিশটি বাজী জেতার কল্যাণে। সচরাচর এমন ঘটে না বলেই বায়রণের নাম মুখে মুখে ফিরতে লাগল।

এখন বোম্বে, ব্যাঙ্গালোর এবং মাদ্রাজে বায়রণ সেইন যে ঘোড়ায় চড়বে সেটি জেতার জন্য অবশ্যই চেষ্টা করবে বলে লোকে ধরে নেয়। শুধু ঘোড়া ভাল হলেই রেস জেতা যায় না, জকির উপস্থিত বুদ্ধি, সাহস এবং কৌশল সেই সঙ্গে সমান দরকার। বায়রণ সেইন এগুলো অর্জন করেছে বলে ট্রেনাররাও মনে করেন। স্মিথ সাহেব রেস থেকে বিশ্রাম নেওয়ার পর এতদিন সে বিশেষ কোন ট্রেনারের সঙ্গে যুক্ত ছিল না। সামনের বছর মার্টিনের স্টেবলে সে যাচ্ছে। প্রতি বছর বিদেশ থেকে জকি আনায় মার্টিন। এবার সে মন পাল্টেছে।

দশ বছরে কলকাতায় আসার সুযোগ পায় নি সে। কলকাতার কোনো ট্রেনার তাকে না ডাকলে অথবা বাইরের কোনো ট্রেনার যদি এখানে ঘোড়া ছোটাতে আসে এবং তাকে কনট্রাক্ট করে তবেই সে আসতে পারে। তেমনটা কখনো হয় নি। বছর চারেক আগে কলকাতায় যখন শেষবার ইনভিটেশন কাপ হয়েছিল তখনও তার ডাক পড়ে নি। যেসব ট্রেনার সেই বাজীতে ঘোড়া রাখার আমন্ত্রণ পেয়েছিলেন তাঁদের প্রত্যেকেরই নিজস্ব জকি ছিল।

এবছর সেই ডাক এসেছে। পল এবং হরি শর্মা তার সঙ্গে যোগাযোগ করার পর থেকেই ভেতরে ভেতরে উত্তেজনা শুরু হয়েছিল বায়রণের। শেষ পর্যন্ত সুযোগ এল প্রতিশোধ নেবার। এখন তার কোনো অভাব নেই। মোটা ব্যাংক ব্যালেন্স, বোম্বে ব্যাঙ্গালোরে বিশাল ফ্ল্যাট নিয়ে সে রীতিমত বড়লোক। কিন্তু প্রায়ই মাঝরাতে ঘুম ভেঙে যায়। চোখ বন্ধ করে সে দেখতে পায় সাসপেন্ডেড বীরেন্দ্র মাথা নীচু করে স্টুয়ার্ডদের ঘর থেকে বেরিয়ে আসছে। স্বার্থপর কুচক্রী মানুষগুলো একটার পর একটা দরজা মুখের ওপর বন্ধ করে দিয়েছিল সেদিন। শুধু এন্টনী ছিল বলেই আজ সে বায়রণ সেইন হতে পেরেছে।

অথচ আজ তাকে আর এক খেলার শিকার হতে হচ্ছে। যে তাকে টাকা দিয়ে এনেছে সে যদি না চায় তার ঘোড়া জিতুক জকি হিসেবে বায়রণ কি করতে পারে। কিন্তু কলকাতা থেকে তো বিনা চেষ্টায় পরাজিত হয়ে ফিরে যেতে আসে নি। বারোটা নাগাদ রেসকোর্সে আসার জন্যে তৈরী হচ্ছিল বায়রণ অস্থিরতার মধ্যে।

ইনভিটেশন কাপ উপলক্ষে আজ রেসকোর্সে রেকর্ড ছাড়িয়ে গেছে দর্শকদের। তিনটে গেটেই বিরাট লাইন পড়ে গেছে ঢোকার জন্যে। মেম্বার্স এনক্লোজারে সুবেশ মহিলা পুরুষের কাঁধছোঁয়া ভীড়। দিনের পঞ্চম বাজী ইনভিটেশন কাপ।

ভারতবর্ষের সবকটা রেসিং সেণ্টারের ডার্বি জেতা অথবা দ্বিতীয় হওয় ঘোড়াগুলো এই কাপে আমন্ত্রিত হয়। মার্টিনের দুটো ঘোড়াই সেই সুবাদে আমন্ত্রিত হয়েছিল। কিন্তু লর্ড কৃষ্ণা আহত হয়ে পড়ায় ওই সেরা বাজী থেকে একটা ঘোড়া কমে গেছে। চারপাশে চাপা গুঞ্জন। জুপিটার রেস জিতছে। কুমার-মঙ্গলমের ঘোড়া মার্টিনের 'দি সান'কে সহজেই হারিয়ে দিতে পারে।

প্রথম চারটে বাজীতে কিছু করার নেই। বক্সে বসে রেস দেখল বায়রণ। সত্যি কলকাতার মাঠের তুলনা হয় না। এই বিশাল সবুজের স্থিরচিত্রটি ভারতবর্ষের কোনো সেণ্টারে পাওয়া যায় না। ওপাশে ভিক্টোরিয়ার সাদা শরীর রোদে ঝকমক করছে। তিনটে গ্যালারি উপচে পড়ছে মানুষের ভীড়ে, সামনের মাঠে গিজগিজ করছে কালো মাথা। এণ্টনীর খোঁজ করতে লাগল সে। আজকের রেসিং কার্ডে এণ্টনীর নাম নেই। অর্থাৎ এত বড় একটা দিনে কোনো ট্রেনার ওকে নেওয়ার কথা ভাবেই নি। এক ধরনের অপরাধবোধ এল বায়রণের। গুরু বলতে যদি তার কেউ থাকে তবে সেই লোক এণ্টনী। সে কি কিছুই করতে পারে না এণ্টনীর জন্যে! পর পর চারটে রেস হয়ে গেল আধঘণ্টা বিরতি দিয়ে।

দশ বছর পর প্রথম নার্ভাস হল বায়রণ। এবার ইনভিটেশন কাপ। তার স্বপ্ন। অথচ। দুটো হাঁটুতে যেন একটুও শক্তি নেই, সে কোনরকমে জার্সি পরে প্যাডকের দিকে হাঁটতে লাগল। মার্টিনের ঘোড়া 'দি সান'কে চালাচ্ছে ডিক্, বার্ণি নয়। এরকমটা হবে সে জানতো। ডিক্ যতই নেশা করুক মার্টিন জানে ওর মতো বুদ্ধিমান জকি হয় না। বার্ণি থাকলে বেশী চিন্তা করতে হতো না কিন্তু ডিক্ কি করবে সেটা আগে থেকে অনুমান করা যায় না। ব্যাপারটা ভাবতেই হাসি পেল বায়রণের। অন্যদের নিয়ে চিন্তা করে কি লাভ, তাকে তো জিততে নিষেধ করা হয়েছে। কোথায় যেন পড়েছিল সে, জকি হল ট্রেনারের হাতের পুতুল। তাহলে পল কি বলে শোনা যাক্।

প্যাডকের চারপাশে মানুষ উপচে পড়েছে। বিভিন্ন সেণ্টারের ঘোড়ার মালিক ট্রেনাররা জকিদের সঙ্গে ছোট-ছোট গ্রুপ করে আলোচনা করছে। বুকের ভেতর স্থির হয়ে গেল বায়রণের। ক্লিওপেট্রা, শ্যাম শর্মা এবং পল পাশাপাশি দাঁড়িয়ে। শ্যামকে অনেকক্ষণ বাদে দেখতে পেল সে। মুখ বেশ হাসিখুশী। হরি শর্মা ওখানে নেই। যেহেতু তিনি কাগজপত্রে মালিক নন তাই ওখানে আসাটা তাঁর পক্ষে শোভনীয় নয়। কাছে গিয়ে অভিনন্দন জানাতেই শ্যাম শর্মা বলল, 'বাবা নিশ্চয়ই আপনাকে বলেছে তিনি কি চান!'

নীরবে মাথা নাড়ল বায়রণ।

'দ্যাটস অল রাইট।' কথা শেষ করে একটু ব্যস্ততার ভান করে শ্যাম কুমার-মঙ্গলমের দলটার দিকে দিকে এগিয়ে গেল। ক্লিওপেট্রা রোদ চশমা পরে চুপচাপ দাঁড়িয়ে। বায়রণের মনে হল ওর ঠোঁটের কোণে একটু ভাঁজ পড়ল! খুশী কিসের, কৌতুকের? সে মাথা ঘুরিয়ে চারপাশে তাকাতে লাগল। ট্রেনাররা জকিদের শেষবার উপদেশ দিয়ে দিচ্ছে। অথচ পল একদম চুপচাপ।

সহিসরা ঘোড়াগুলোকে একের পর এক নিয়ে এল প্যাডকে। প্রত্যেকটাই

টগবগ করছে। জুপিটার দেখতে চমৎকার, চারপায়ে এমন নাচছে যেন সংকেত পেলেই সে ছুটে যাবে। 'দি সান' খুব ফিট, কোমর সরু। সে তুলনায় প্রিন্সের হাবভাবে কোনো চঞ্চলতা নেই। নির্দেশ আসামাত্র ট্রেনাররা জকিদের নিয়ে ঘোড়াগুলোর দিকে এগিয়ে গেল। পা বাড়াতেই বায়রণ খসখসে গলাটা শুনতে পেল, 'আজ রাত্রে আমি তোমার জন্যে অপেক্ষা করব।'

শীতল হল বায়রণ। মহিলা এখনো চাইছেন সে প্রিন্সকে জিতিয়ে দেয়, বিনিময়ে একটা মজার রাত তিনি উপহার দেবেন বায়রণকে। সে কিছু বলার আগেই পল তাকে ডাকল। প্রিন্সের লাগাম ধরে আছে পল। কাছে গিয়ে প্রিন্সের পিঠে ওঠার আগে সে জিজ্ঞাসা করল, 'পল, কি করব ?'

'যা তোমার বিবেক করতে বলবে, দ্যাটস অল।'

লাফ দিয়ে পিঠে উঠতেই প্রিন্স নেচে উঠল। বায়রণ ঝুঁকে পড়ে ওর গলায় হাত বোলাতে লাগল। ঘোড়াটা দুবার মুখ তুলল, ওর চোখ যেন বায়রণকে আর একবার পরখ করে নিয়ে হাঁটা শুরু করল। প্যাডকে অন্য ঘোড়াদের সঙ্গে যখন সে ঘুরছে তখন চিৎকারটা কানে এল, 'হেই বায়রণ, য়ু আর নট ট্রায়িং ?' দর্শকদের সঙ্গে কথা বলা আইনবিরুদ্ধ কাজ। সে মাথা নীচু করতে গিয়েই সচেতন হল। সোজা হয়ে বসল সে। হায়, কে কবে শুনেছে যে ইনভিটেশন কাপে ঘোড়া ট্রাই করা হচ্ছে না !

অজস্র মানুষের চিৎকারের মধ্যে ওরা মাঠে এল। চারধার পতাকায় সাজানো। টোটালাইজার বোর্ডে দেখল জুপিটার আর দি সান সমান ফেবারিট। প্রিন্সের দর এখন দুই। হঠাৎ বায়রণের মনে হল, এই মানুষের ভীড়ে কি জামাইবাবু আছেন ? থাকলে তিনি কি ভাবছেন এখন। ঝুঁকে পড়ে আর একবার প্রিন্সকে আদর করল সে এবং সেই সময় মুখ থেকে বেরিয়ে এল, 'আমাদের জিততেই হবে প্রিন্স। উই মাস্ট উইন।' সঙ্গে সঙ্গে প্রিন্সের দুটো কান খাড়া হয়ে গেল। বায়রণের মনে হল ঘোড়াটা যেন ওর কথা বুঝতে পেরেছে। আর সেই মুহূর্তেই ডিক-এর গলা কানে এল, 'হেই সেইন, তুমি তো আমার জন্য স্পেস করছ, তাই না ?'

'দি সান' এখন প্রিন্সের পাশে। স্টার্টিং পয়েন্টে যাওয়ার সময় ওরা এখন পাশাপাশি। বায়রণ বলল, 'কে বলল ?'

'মার্টিন। তুমি আগে ছুটে অন্য ঘোড়াদের টায়ার্ড করবে আমি পেছন থেকে এসে রেস জিতবো। ডান্ !' ঘোড়ার পিঠে ডিকের বসে থাকার স্টাইলটা একটু বিদঘুটে। শরীরকে ঘোড়ার একপাশে ঝুলিয়ে দিয়ে একটু কাৎ হয়ে চালায় ও। ডিকের কথাটা শুনে নীরবে মাথা নাড়ল বায়রণ। আলাপ-আলোচনা তাহলে অনেক দূর পর্যন্ত গড়িয়েছে।

পাশাপাশি ঘোড়াগুলো খাঁচায় ঢুকে গেলে স্টার্টার সংকেত দিলেন। ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ বাজী দি ইনভিটেশন কাপ শুরু হল। গ্যালারির মাইকগুলোতে রেসের ধারাবিবরণী বাজছে। কয়েকটা টেলিভিসন ক্যামেরা এক সঙ্গে কাজ করছে। ওপাশে একটা গাড়িতে কয়েকজন মানুষ সতর্কচোখে লক্ষ্য

রাখছেন যেন কোন অসৎ কাজ না হয়। যেতে হবে দীর্ঘপথ। বায়রণ দেখল মাদ্রাজের আর একটা ঘোড়া প্রথমেই লিড নিল। তৃতীয় জুপিটার, চতুর্থ প্রিন্স। ঘাড় ঘুরিয়ে দেখল 'দি সান' সবশেষে। ঘোড়াগুলো বারোশ' মিটার মোটামুটি এই অবস্থায় পেরিয়ে আসার পর জুপিটার দ্বিতীয় স্থানে উঠে এল। সামনের ঘোড়াগুলোর দিকে তাকিয়ে অস্বস্তিটা আরো বেড়ে গেল বায়রণের। বুকের ভেতর বীরেন্দ্রনাথ সেন একটু একটু করে মাথা তুলছে। সুযোগ হারাচ্ছ বায়রণ, এর পর মাথা খুঁড়লেও তুমি পারবে না বদলা নিতে। তোমার ট্রেনার বলেছে বিবেক যা বলবে তাই করো। চেষ্টা করো, চেষ্টা করো। সমস্ত কলকাতার মানুষ দেখবে তুমি ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ সওয়ার।

শিরায় শিরায় যেন ঢেউ উঠল। এদিকে সেই বাঁক এসে যাচ্ছে। সামনে অন্তত তিনটে ঘোড়া পথ জুড়ে ছুটছে। চাবুক মারতে গিয়ে হাত গুটিয়ে নিল বায়রণ। প্র্যাকটিসের সময় পল তাকে জিজ্ঞাসা করেছিল সে চার্জ করেছে কিনা! ওটাই যদি অস্ত্র হয় তাহলে শেষ মুহূর্তে ব্যবহার করাই ভাল।

কিন্তু কিছুতেই প্রিন্স এগোতে পারছে না। জুপিটার অন্তত তিন লেংথ এগিয়ে। প্রিন্স তৃতীয় হয়েই ছুটছে। হঠাৎ পাশ থেকে সোঁ একটা শব্দ হল। জিভ দিয়ে শব্দ করে ডিক 'দি সান'কে নিয়ে তীব্রগতিতে বেরুচ্ছে একদম আউটসাইড দিয়ে। টপকে যাচ্ছে একটার পর একটা ঘোড়াকে। আর মাত্র তিনশো মিটার বাকী। 'দি সান' আর জুপিটার এখন গায়ে গায়ে ছুটছে। বাঁ দিকের গ্যালারিতে উল্লসিত চিৎকার। কে জিতবে বোঝা যাচ্ছে না। ওরা অন্তত প্রিন্সের চেয়ে চার লেংথ এগিয়ে।

হঠাৎ বায়রণ যেন পাগল হয়ে গেল। বাঁ হাতে চাবুক মারছে আর মুখে সমানে বলে যাচ্ছে, 'প্রিন্স আমাকে জিততেই হবে, প্রিন্স আই হ্যাভ টু উইন!' ওরই মধ্যে বায়রণের মনে হল ঘোড়াটার দুটো কান খাড়া হল, সমস্ত শরীর এখন কাঁপছে। আর মাত্র পঞ্চাশ গজ এবং জেতার কোনো সুযোগ নেই। কিন্তু তখন যে ঘটনাটা ঘটল তার জন্যে বায়রণ প্রস্তুত ছিল না।

দর্শকরা যখন জুপিটার এবং দি সানকে আলাদা করতে পারছে না তখন প্রিন্সের শরীরে বিদ্যুতের ছোঁয়া লাগল। হঠাৎই সে তীরের চেয়ে দ্রুত বেগে ছুটে গেল সামনে। বায়রণ কোনো রকমে ওকে আঁকড়ে ধরে রইল। যেন এক লাফে জুপিটার আর দি সানকে ডিঙ্গিয়ে ঘোড়াটা উইনিং পোস্ট পেরিয়ে গেল। আর তারপরেই গোড়া-কাটা গাছের মতো লুটিয়ে পড়ল মাটিতে। দৃশ্যটা অনেকের চোখের কাছেই অবিশ্বাস্য। শেষ পঞ্চাশ মিটার পৃথিবীর সমস্ত রেকর্ড ম্লান করে ছুটেছে প্রিন্স। মাটিতে পড়ার সময় কোনো রকমে নিজেকে বাঁচাল বায়রণ। পেছনের ঘোড়াগুলো তাদের এড়িয়ে ছুটে গেল আরো কিছুটা বেগ সামলাতে। প্রতিটি জকির চোখে বিস্ময়।

থরথর করে কাঁপছিল বায়রণ। কোনোরকমে উঠে দাঁড়াতেই জনতার চিৎকার মাঠময় ছড়িয়ে পড়ছে শুনতে পেল। সে জিতেছে, সেরা বাজী জিতেছে। কিন্তু, নীচে ঘাসের ওপর স্থির হয়ে শুয়ে আছে প্রিন্স, দি প্রিন্স।

চোখ খোলা, মুখ দিয়ে রক্ত বেরিয়েছে। মাথার টুপি খুলে ফেলল বায়রণ। তারপর ঘোড়াটার পাশে বসে হাউহাউ করে কেঁদে ফেলল। কোনো মানুষ যা বোঝে নি এই জন্তুটি তার সেই কথা বুঝেছিল। আর বুঝেছিল বলেই নিজের জীবন দিয়ে শেষ দৌড় দৌড়ে তাকে জিতিয়ে গেল। টার্ফ ক্লাবের গাড়িগুলো ছুটে আসছে। ভেটারিনারী সার্জেন থেকে শুরু করে বড় বড় হোমরা-চোমরারা দৌড়ে আসছে এদিকে। এবং হঠাৎ সমস্ত মাঠ চুপ করে গেছে। হাজার হাজার মানুষ প্রিন্স-এর দিকে নির্বাক হয়ে তাকিয়ে এখন। কাঁধে হাতের স্পর্শ পেয়ে চোখ তুলল বায়রণ। থরথর করে কাঁপছে পল। দৌড়ে আসার জন্য জোরে নিঃশ্বাস ফেলছে।

'কি হল, এমন কেন হল ?'

মাথা নাড়ল বায়রণ। চেষ্টা করেও মুখ থেকে শব্দ বের হল না। পল ততক্ষণে হাঁটু গেড়ে বসে গেছে ঘোড়াটার পাশে। ভেটারিনারী সার্জেনের ততক্ষণ দেখা হয়ে গিয়েছিল। এবার পল কান্নায় ভেঙে পড়ল। এই ঘোড়াটাকে সে নিতান্ত শিশু অবস্থায় পেয়ে তিল তিল করে খেটে বড় করেছিল। যোগ্য করেছিল।

ওরই মধ্যে দু-একজন অফিসিয়াল ওদের অভিনন্দন জানিয়ে দিল। পল নিজেকে সামলে উঠে দাঁড়াল, 'ধন্যবাদ। প্রিন্সের মৃতদেহ সামনে রেখে আমাকে ধন্যবাদ বলতে হচ্ছে। হায় ঈশ্বর।'

ততক্ষণে টার্ফ ক্লাবের বিরাট লরিটা এসে গেছে। সেখান থেকে কর্মচারীরা নেমে এসে ত্রিপল দিয়ে ঘিরে ফেলল প্রিন্সকে। পল বায়রণের হাত ধরল, 'লেটস গো।'

সমস্ত শরীর এখন অসাড়। বায়রণের চোখ আর একবার প্রিন্সের শরীরের দিকে ফিরে গেল। একটু আগেও ঘোড়াটা জীবিত ছিল। এখন স্থির একটা পাথরের মতো পড়ে আছে ত্রিপলের আড়ালে। বাইরে থেকে আদলটাই শুধু বোঝা যাচ্ছে। হঠাৎ পল ওর হাত জড়িয়ে ধরল, 'আমার অভিনন্দন। তুমি আমাকে বাঁচালে সেইন।' মাথা নীচু করে হাঁটতে হাঁটতে বায়রণ বলল, 'না পল। রেসটা আমি জিতি নি। যে জিতেছে সে শুয়ে রয়েছে ওখানে।'

বায়রণের গলা রুদ্ধ হয়ে এল। ওরা যখন ক্লাব হাউসের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল তখন আবার হাততালি শুরু হল। সমস্ত মাঠ এবার অভিনন্দন জানাচ্ছে জকি এবং ট্রেনারকে। গেটের মুখটায় বেশ ভীড়। সবাই বায়রণের সঙ্গে হাত মেলাতে চায়। বায়রণ উদ্‌গ্রীব হয়ে সেই চেনা মুখটিকে খুঁজছিল। এন্টনী কোথায় ? এই মুহূর্তে এন্টনীকে দেখতে চাইছিল সে প্রবলভাবে। অথচ সামনে কিংবা ওই গ্যালারিতে কোথাও এন্টনীকে দেখতে পেল না সে। হঠাৎ সে পলের দিকে ঘুরে দাঁড়াল, 'পল, আমি খুব অসুস্থ বোধ করছি।' পলের মন ভারাক্রান্ত তবু কথাটা শুনে উদ্বিগ্ন হল, 'সেকি! কি হয়েছে ?'

'জানি না, এই মৃত্যু আমি স্ট্যান্ড করতে পারছি না।'

'তুমি কি ড্রেসিং রুম অবধি যেতে পারবে ?'

'হ্যা পারব। কিন্তু আমি আজ আর রাইড করতে চাই না।'

এক মুহূর্ত চিন্তা করল পল, 'অল রাইট। আমি এখনই তোমার কথা অফিসারদের বলছি। ওই ঘোড়াটা অবশ্য সিওর উইনার ছিল। বুকিরা ওর কোনো প্রাইস দিচ্ছে না। সবাই জানে ও যাবে এবং জিতে আসবে!'

'তাহলে আমাকে ছেড়ে দাও।'

'ওয়েল, আমি অন্য কাউকে রাইড করতে বলছি।'

'তাহলে আমার একটা ছোট্ট অনুরোধ আছে।'

'বল।'

'তুমি এণ্টনীকে ওই উইনার ঘোড়াটাকে চালাতে দাও।'

'এণ্টনী!' পল অবাক হল, 'ও এখন এত বাজে চালায় এবং বয়সের জন্য এমন দুর্বল যে আমরা ওর ওপর ভরসা করতে পারি না।'

'জানি। কিন্তু এটা আমার অনুরোধ।'

পলকে আর কথা বলতে না দিয়ে বায়রণ ড্রেসিং রুমের দিকে চলে এল। মাঝ রাস্তায় কামাল দাঁড়িয়ে। ওকে দেখে কপালে হাত ছোঁয়ালো, 'ছোটেসাব, আজ সব পুরা হো গয়া।'

বায়রণ থমকে দাঁড়াল, 'আরে ভাই কামাল, এণ্টনী সাহেবকে দেখেছ?'

'একদফে দেখা থা।'

বায়রণ নিশ্চিন্ত হল, যাক, এণ্টনী তাহলে রেসকোর্সে এসেছে। ড্রেসিং রুমে ঢোকার সময় সাইরেন বেজে উঠল। অবজেকসন। প্রিন্সের জেতা বিধি-সম্মত হয় নি বলে অভিযোগ করেছে জুপিটারের জকি। ঠোঁট কামড়ালো বায়রণ। এই মুহূর্তে সে ভেবেই পাচ্ছে না কখন নিয়ম লঙ্ঘন করেছে সে। কারো গায়ে সামান্য স্পর্শ করা তো দূরের কথা কাউকে আড়াল করে নি প্রিন্স।

পোশাক পাল্টানোর সময় জকিদের অভিনন্দন নিতে নিতে ক্লান্ত হয়ে পড়ল বায়রণ। এই সময় পল ছুটে এল। আড়ালে ডেকে নিয়ে বলল, 'ওরা অভিনব অভিযোগ তুলেছে। বলছে, পঞ্চাশ গজ আগেই যদি প্রিন্স হার্টফেল করে থাকে তাহলে তার মৃতদেহ রেস জিতেছে। সেক্ষেত্রে তাকে উইনার ঘোষণা করা অন্যায়।'

বিচারকরা নানান প্রশ্ন করলেন বায়রণকে। একটা কথা সবাই মানতে বাধ্য হলেন, উইনিং পোস্ট পেরিয়ে যাওয়ার পর বায়রণ বুঝতে পেরেছিল যে প্রিন্স অসুস্থ। অতএব তার এই মহান দৌড়ের প্রতি সম্মান জানিয়ে অভিযোগ বাতিল করে দেওয়া হল।

মাইকে সেই কথা ঘোষণা মাত্র আবার উল্লাস ছড়িয়ে পড়ল চারধারে। ঘরের বাইরে এসে দাঁড়ানো মাত্র বায়রণ ওঁকে দেখতে পেল। বিশাল মুখে শিশুর আনন্দ, দু'হাত বাড়িয়ে এগিয়ে আসছেন তার দিকে। কাছাকাছি হতেই লোকটা ওর হাত জড়িয়ে ধরল, 'কাল সারারাত ঘুমুতে পারি নি সেইন। আজ ঠিক করেছিলাম রেসকোর্সে আসবই না। নিজের হাতে নিজেকে হত্যা করা

দেখতে পারতাম না। এখানে না এলে কিন্তু আমি বাঁচতে পারতাম না সেইন। প্রিন্সকে জিতিয়ে দিয়ে তুমি আমার প্রাণ ফিরিয়ে দিয়েছ। আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি মার্টিনের কাছে আর ঘোড়া পাঠাবো না। পলই দেখবে। এই কলকাতাই আমার ভাল।'

'কিন্তু মিসেস শর্মা তো ওকে সব রাইট লিখে দিয়েছেন !'

'জানি তাই আমাকে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। দেব। শুধু তোমার কাছে আমার অনুরোধ এখানে চলে এস পাকাপাকিভাবে।'

বায়রণ বৃদ্ধের মুখের দিকে তাকিয়ে হাসল, কিছু বলল না।

'ওঃ আমার কি আনন্দ হচ্ছে। আজ রাত্রে আমি বিরাট ডিনার দিচ্ছি। কিন্তু সেইন, তুমি কিছু চাও আমার কাছ থেকে, এনিথিং !'

'আমার কিছু চাইবার নেই মিঃ শর্মা।'

'নো নো। তুমি আমাকে রাজা করেছ। আমি তোমাকে দিতে চাই প্রাণ খুলে। তোমার যা ইচ্ছে তাই বলো।' বায়রণের হাত ঝাঁকালো হরি শর্মা।

ঠিক সেই সময়ে মাইকে ঘোষণা করা হল, 'মিঃ এণ্টনী, আপনাকে অবিলম্বে ড্রেসিং রুমে রিপোর্ট করতে বলা হচ্ছে।'

মাথা নাড়ল বায়রণ। তারপর বলল, 'আমি আজ সন্ধ্যের ফ্লাইট ধরতে চাই মিঃ শর্মা। আপনি সেইটে ব্যবস্থা করে দিন।'

'সেকি। তুমি আজকেই চলে যাবে কেন ?'

'আমার পক্ষে এখানে থাকা সম্ভব নয়।'

'কেন ?'

'সেটা আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার।'

'আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।'

বায়রণ হাসলো, 'আমার ট্রেনার আমাকে বিবেকের নির্দেশ মানতে বলেছিলেন। আমি তাই করছি।'

'আমি শুনেছি। কিন্তু সেটা তো রেস করার সময়।'

'মিঃ শর্মা, রেস কি কখনও শেষ হয় ?'

ধাক্কা খেলেন হরি শর্মা। শেষ পর্যন্ত নীরবে মাথা নাড়লেন। এই সময় টার্ফ ক্লাবের লোকজন ওদের ডেকে নিয়ে এল প্যাডকে। পুরস্কার দেওয়া হচ্ছে। প্যাডকের চারদিকে প্রচণ্ড ভীড়। শ্যাম শর্মা কাছেপিঠে নেই। রাজ্যপাল নিজে পুরস্কার হাতে তুলে দেবেন বিজয়ীদের। পল ওকে নিয়ে প্যাডকে ঢুকতেই ক্লিওপেট্রার মুখে হাসি ফুটলো। তিনি আগেই ওখানে অপেক্ষা করছিলেন। কাছাকাছি হতেই ডান হাত বাড়িয়ে বললেন, 'অভিনন্দন।' খসখসে গলা শুনতেই বায়রণের রক্তের চাপ বাড়লো। সে কোনোরকমে বলল, 'ধন্যবাদ, অজস্র ধন্যবাদ।' পল তখন এগিয়ে গিয়েছে।

ক্লিওপেট্রার চোখ দেখা যাচ্ছে না কিন্তু শরীর টানটান হল। নিঃশ্বাস ফেলল বায়রণ। অদ্ভুত আনন্দ হচ্ছে এই মুহূর্তে। সত্যি কথা, যে ছেড়ে দিতে জানে তার কোনো অভাব হয় না।

ক্লিওপেট্রা বলল, 'আজ রাত্রে তুমি আমার কাছে থাকবে। তুমি হোটেলে থেকো আমি টেলিফোন করব। এখন তুমি উপযুক্ত হয়েছ।'

বায়রণ কেঁপে উঠল। চারপাশে অজস্র মানুষ কিন্তু ক্লিওপেট্রার কথা তারা কেউ শুনতে পাচ্ছে না। সে বলল, 'ধন্যবাদ। কিন্তু আমি আপনার কথা বুঝতে পারছি না।'

'ঢং করো না। এয়ারপোর্টে তোমার চোখ দেখেই জেনেছিলাম তুমি কি চাও। আমি আজ তোমাকে সব দেব।'

'ধন্যবাদ! কিন্তু আমি একটু বাদেই ফিরে যাচ্ছি।'

'মানে?' ক্লিওপেট্রা হতভম্ব হয়ে গেল।

'আমি কারো দয়ার দান গ্রহণ করি না।'

ঠিক সেই মুহূর্তে মাইকে ঘোষণা করা হল, 'দিনের শেষ রেসের কিছু পরিবর্তন হয়েছে। হর্স নম্বর ওয়ানের জকি বায়রণ অসুস্থ হওয়ায় ওই ঘোড়াটি চালাবেন জকি এন্টনী।'

চারধারে একটা হতাশার স্বর উঠলো। লোকে এন্টনীকে যেন কল্পনাও করে নি। ক্লিওপেট্রাকে এই প্রথম মাথা নীচু করতে দেখল বায়রণ।

মাইকে নাম ডাকা হচ্ছিল। মিসেস শর্মা প্রিন্সের মালিক হিসেবে ওনার কাপটি গ্রহণ করলেন হাসিমুখে। পল এগিয়ে গেল ট্রেনারের পদকটি নিতে কিঞ্চিৎ নার্ভাস হয়ে পড়ল। এবার মাইকে ঘোষণা করা হয়, 'বিজয়ী জকি বায়রণ সেইন।'

ধীরে ধীরে এগিয়ে গেল বায়রণ। হাত মেলালো। চারপাশের হাততালির শব্দে মনে হচ্ছে লক্ষ পায়রা উড়ছে। পদকটি নেবার আগে মৃদু গলায় সে বলল, 'যদি অনুমতি দেওয়া হয় তাহলে একটা কথা বলতে চাই।'

চারপাঁচটা কণ্ঠ একসঙ্গে উচ্চারণ করল, 'ইয়েস!'

'আমার নামের উচ্চারণ ঠিক হয় নি।'

'সেকি! আপনার নাম বায়রণ সেইন নয়?'

উজ্জ্বল হেসে ঘাড় নাড়ল সে, 'না, ওটা বাংলা শব্দ। ঠিক উচ্চারণ হল বীরেন সেন।'

লোকগুলো হতভম্ব হয়ে গেল প্রথমে। সমস্ত প্যাডক চুপ। সেক্রেটারী কাগজটার দিকে ভাল করে তাকালেন। তারপর গলা ঝেড়ে মাইকে বললেন, 'আমি দুঃখিত। ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ বাজী দি ইর্নাভিটেশন কাপ বিজয়ীর সম্মান গ্রহণ করছেন জকি বীরেন সেন।'

অজস্র হাততালির মধ্যে নত হয়ে পুরস্কার নিল বীরেন্দ্রনাথ সেন। কলকাতার মানুষ খবরটা জেনে উত্তাল এখন।

ব্যবস্থা হয়ে গেছে ফিরে যাওয়ার। প্রত্যেকের অভিনন্দন নিয়ে সে যখন এন্টনীর সঙ্গে কথা বলতে গেল তখন এন্টনী ঘোড়ায় বসে। সার দিয়ে ঘোড়া-

গ্নলো বেরিয়ে যাচ্ছে মাঠের উদ্দেশ্যে। এণ্টনীকে এখন আরো বৃদ্ধ দেখাচ্ছে। টগবগে ঘোড়ায় পিঠে বড্ড বেমানান। কোনোদিকে তাকাচ্ছে না।

আর দেরী করলে প্লেন ধরা যাবে না। যাওয়ার সময় হোটেল থেকে স্যাট-কেস নিয়ে যেতে হবে। বীরেন সেন চুপচাপ বেরিয়ে এল শর্মার লোকের সঙ্গে। গাড়ি প্রস্তুত।

রেসকোর্সের বাইরে এসে অজস্র গাড়ি দেখতে পেল সে। শেষ রেস হয়ে গেলে জায়গাটায় চলা যাবে না। ড্রাইভারকে দ্রুত বেরিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দিয়ে সে পেছনের সিটে গা এলিয়ে দিল। আশ্চর্য, তার আজকে তেমন আনন্দ হচ্ছে না কেন ? দশ বছর জমে থাকা প্রতিশোধ নেবার আকাঙ্ক্ষা মিটে যাওয়ার পরও এমন নিঃস্ব মনে হচ্ছে কেন ?

হঠাৎ সে ড্রাইভারকে বাঁ দিকে গাড়িটাকে দাঁড় করাতে বলল। তারপর দরজা খ্নলে ছ্নটে গেল মাঠের রেলিং-এর দিকে। এখান থেকে উইনিং পোস্ট অনেক দ্নর। সেই বিখ্যাত বাঁকটি দেখা যায়। কিছ্ন দরিদ্র মান্নষ রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে তাকিয়ে আছে মাঠের দিকে। ভেতরে ঢোকার পয়সা ওদের নেই। বীরেন ওদের পাশে গিয়ে দাঁড়াল। একট্ন আগে ওই মাঠের নায়ক যে এখন সাধারণ পোশাকে ওদের সঙ্গে রেস দেখছে এ খেয়াল কারো নেই। সবার চোখ মাঠের দিকে। সেখানে রেস শ্নর্ন হয়েছে। বীরেন উদ্বিগ্ন চোখে এণ্টনীকে খ্নঁজছিল। চার নম্বর পজিশনে আছে এণ্টনী। খ্নব অলস ভঙ্গী। কিন্তু বয়স হয়েছে বলে মনেই হচ্ছে না। বাঁকের ম্নখে এসে গেল ওরা। এই ঘোড়াটা তার নিজের জেতানোর কথা ছিল। এই ম্নহ্নর্তে বীরেন সেন মনে মনে বলছিল, 'তোমাকে জিততেই হবে এণ্টনী। আউট সাইড দিয়ে বের করে আনো ঘোড়াটাকে। চার্জ করো, চার্জ করো।'

এখান থেকে উইনিং পোস্ট দেখা যায় না। বীরেন সেন নিজের সমস্ত ইচ্ছে জড়ো করে এণ্টনীকে ঠেলে দিচ্ছিল যেন।

ওরা রেস করছে। প্রত্যেকেই আগে যাওয়ার চেষ্টায় মগ্ন। হঠাৎ ঝাঁকুনি খেল যেন বীরেন সেন। স্খলিত পায়ে সে ফিরে আসছিল গাড়ির দিকে। আমরা কি জীবনের রেসের শেষটা কি জানতে পারি ? কি হবে দাঁড়িয়ে থেকে ? এণ্টনী জিত্নক কিংবা হার্নক তাতে আর কি এসে যায় ? কিন্ত্ন এণ্টনী যে এই রেসটা জেতার জন্যে চেষ্টা করছে এট্নকুই তো অনেক লাভ।

হঠাৎ তার মনে হল তার গ্নর্নদক্ষিণা দেওয়া হল না। এণ্টনী নিশ্চয় জানে বীরেন এই রেসটা ওকে পাইয়ে দিয়েছে। জেতার জন্যে তার এই চেষ্টা শ্নধ্ন বীরেনকে খ্নশী করতেই।

কোনো কোনো মান্নষের জীবনে এক একটা সময় আসে যখন তাকে দৌড়ে যেতে হয় অন্যকে খ্নশী করতে। নিজের জন্যে হারজিতে কোনো ভাবনাই তার থাকে না। এণ্টনী এখন সেই অবস্থায় পেঁৗছে গেছে।

ছুটন্ত গাড়ির সিটে হেলানো মুখ, গাল বেয়ে জলের ধারা গড়িয়ে এল। ওপাশে, বহুদূরে রেস শেষ হওয়া মাত্র দর্শকদের উল্লাসধ্বনি উঠল। গাড়ি যত দূরে এগোচ্ছে তত সেটা মিলিয়ে আসছে। বীরেন সেন বুঝতে পারছিল, যে মানুষ উত্তেজনাকে ছেঁটে বাদ দিয়ে দৌড়ে যেতে পারে তার চেয়ে বড় সওয়ার আর কেউ নেই। শেষবার এণ্টনী সেইটেই তাকে শিখিয়ে দিল।



টাকা পয়সা

উৎসর্গ

শ্রীযুক্ত শঙ্করীপ্রসাদ বসু
শ্রদ্ধাভাজনেষু

প্রথমবার টেলিফোনটা শব্দ করে উঠতেই ঘুম ভেঙেছিল রঙ্গনের। কিছুটা বিরক্তি নিয়ে গড়িয়ে বিছানার ধারে এসে হাত বাড়িয়ে রিসিভারটা তুলতে গিয়েও থেমে গেল সে। কার ফোন? তিন জন লোক তাকে এই সাত সকালে টেলিফোন করতে পারে। একজন চোপরা। রঙ্গনের মালিক। খুব খেপে আছে বুড়ো, এ মাসে কিস্যু বিজনেস দিতে পারে নি সে। বুড়োর কচি খুকী বউ আর এক কাঠি ওপরে। অফিসে থাকলেই টিকটিক করবে। মিসেস চোপরা মনে করে রঙ্গনকে মাইনেটা না দিয়ে জলে ফেলে দিলে তার মন ভালো থাকত। খেঁকুরে নেড়ি কুত্তা যাকে বলে! দুই, বাড়িওয়ালা। আজ মাসের পনের। সাত তারিখের মধ্যে ভাড়া না দিলে বুড়োর রাত্রের ঘুম চলে যায়। একটাই সুবিধে বুড়োর পক্ষে চার তলায় ওঠা সম্ভব নয়। কিন্তু টেলিফোন ধরলেই বুড়ো এমন গ্যাঁক গ্যাঁক করে উঠবে যে বাপের নাম খগেন হয়ে যায়। তিন, সুব্রত। মাত্র গত রাত্রেই ওকে টেলিফোন নম্বরটা দিয়েছে রঙ্গন। আজ দশটায় আলিপুর রোডের অ্যাপয়েণ্টমেণ্টটা ওর মারফত হয়েছে। সুব্রত বলেছিল কোনো কারণে যদি অ্যাপয়েণ্টমেণ্ট ক্যানসেলড্ হয় তাহলে সেটা সে টেলিফোনে জানাবে। এই ফোনটা মোটেই চায় না রঙ্গন। যদি আজ আলিপুর রোডে সে সফল হয় তাহলে ওই খেঁকি মিসেস চোপরাকে বছরখানেকের জন্যে ঠাণ্ডা করে দেবে।

টেলিফোনটায় এমন ধমকানির আওয়াজ! শেষ পর্যন্ত রিসিভার না তুলে পারলো না রঙ্গন। নরম গলায় বললো, 'হ্যালো।'

'এখনও ঘুমুচ্ছ!' নীপার কণ্ঠে দাঁড়কাকের স্বর, 'মাঝরাত অবধি মাল টানলে ঘুম ভাঙবে কি করে! কি দুর্মতি হয়েছিল আমার তাই মাঝে মাঝে ভাবি। কি, শুনতে পাচ্ছ?'

রঙ্গন চোখ বন্ধ করলো, উঃ! এই চার নম্বরটার কথা মাথায় আসে নি কেন? কিন্তু সে গলা নরম রাখলো, 'পাচ্ছি।'

'যখনই বলি, তখনই শোনাও টাকা নেই অথচ মাল খাবার সময় তো অভাব হয় না। তোমার কোনো কথাই বিশ্বাস করি না আমি। পুরুষ জাতটাই শয়তান, মিথ্যুক। শুনতে পাচ্ছ?'

রঙ্গন বললো, 'এক মিনিট দাঁড়াও।'

'কেন? আবার কি রাজকার্য আছে তোমার?'

'কান কট্‌কট্‌ করছে, রিসিভারটা অন্য কানে নিয়ে যাব।' সঙ্গে সঙ্গে বোধহয় ওপাশে আছাড় খেল রিসিভার কারণ লাইনটা কেটে গেল আর্তনাদ করে। হো হো করে হেসে উঠলো রঙ্গন বাঁচা গেল যে, এত সহজে যে যাবে তা ভাবতে পারে নি। বিছানায় চিৎ হয়ে শুয়ে টেবিল-ক্লকটার দিকে তাকাল সে, আটটা বাজে। আলিপুরে ঠিক সময়ে পৌঁছাতে হলে নটায় বের হতেই হবে। দাড়ি কামানো, স্নান সারা এবং ব্রেক ফাস্ট তৈরী করার জন্যে এক ঘণ্টা প্রচুর সময়। খুব খেপেছে নীপা। এটা ওর জীবনের শ্রেষ্ঠ আহাম্মকি। এক বছরের প্রেম এবং রেজেস্ট্রি বিয়ে। মেয়ে হিসেবে নীপা ভালো, তার মতো হাজার টাকার

মাইনের চাকুরে অমন মেয়ে পেতে পারে না। কিন্তু নীপাকে বিয়ে করতে গেলে তিরিশ দিন পকেট-ভর্তি টাকা চাই। এই এক কামরার ফ্ল্যাটে বিয়ের আগে দুপুর কাটানো যায় কিন্তু বউ হিসেবে বাস করতে গেলে তিন কামরার ফ্ল্যাট চাই। ফ্রিজ টি ভি আর কমসে কম একটা হাতফেরতা স্ট্যান্ডার্ড। রঙ্গন বোঝাতে চেয়েছে এই সব হাজার টাকায় কিছুতেই সম্ভব নয়। ভালো ফ্ল্যাটের ভাড়া মেটাতে মাইনে শেষ হয়ে যাবে। এই সব শর্ত না মিটলে নীপার পক্ষে তার ঘরে আসা সম্ভব নয় এবং দুবেলা জুতোয় ওঠা পেরেকের মতো খুঁচিয়ে যাচ্ছে রোজগার বাড়াও রোজগার বাড়াও। এত লোকে কত আয় করে তুমি কেন পার না ?

ইদানিং রঙ্গনও নিজেকে সেকথা বলছে। রোজগার বাড়াতেই হবে। চোপরার সঙ্গে ওর শর্ত, কোটা পূর্ণ হবার পর যা অর্ডার আসবে তার ওপর একটা কমিশন পাবে সে। এখন তো কোটাই পূর্ণ হয় না তা কমিশন। অথচ খরচ বাড়ছে। মাসে চারদিন নীপাকে নিয়ে চাইনিজ খেতে হয়, দেশে নিদেন-পক্ষে দুশো টাকা না দিলে নয়, টেলিফোনের বিল, বাড়িভাড়া ছাড়াও দুবেলা পেটে কিছু দেওয়া দরকার। এসব পেরে ওঠা মুশকিল। কোন্ মুর্খ এর পর বিয়ে করে ?

আয়নায় নিজের মুখ দেখল রঙ্গন। ফরসা নয় কিন্তু নাক মুখ চোখের গড়নে এমন একটা শ্রী আছে যে মেয়েমানুষগুলো দেখলেই পটে যায়। পৃথিবীতে কেন যে ব্যাটাছেলেগুলো বড় বড় পোস্টে রয়েছে। বছরখানেক ধরে নীপার সঙ্গে তার এমন প্রেম চলছিল যে বাস্তববুদ্ধি অসাড় হয়ে গিয়েছিল। দুপুরবেলায় এই খাটটাকে তখন নীপার বৃন্দাবন বলে মনে হতো। মাস দুয়েক আগে এমন ভান করল যেন আর উপায় নেই, কর্মফল অনিবার্য। বাধ্য হয়ে রেজেস্ট্রি করতে হলো রঙ্গনকে। নীপার মা খবরটা শুনে কুরুক্ষেত্র করে-ছিলেন। তারপর মুখের ওপর বলে দিয়েছিলেন যে, ভালো ফ্ল্যাট না নিলে তিনি নীপাকে যেতে দেবেন না। তারপর থেকে সমানে পেছনে লেগে আছে নীপা। কিন্তু গত শনিবারেও রঙ্গন লক্ষ্য করেছে নীপার কোনো শারীরিক পরিবর্তন বোঝা যাচ্ছে না। ফিনফিনে শাড়ির তলায় ওর পেটে সামান্য ঢেউ পর্যন্ত নেই। প্রথম প্রথম ভয়ে জিজ্ঞাসা করত না, কে যেচে সমস্যার মধ্যে মাথা গলায়। কিন্তু এখন রঙ্গনের সন্দেহ হচ্ছে, পুরো ব্যাপারটাই হয়তো বানানো। নীপা হলো সেই জাতের মেয়ে যারা শরীরের বাগানটাকে বিবাহের দেওয়াল দিয়ে ঘিরে রেখে তারপর সব কিছুতেই সায় দিতে পারে।

গাড়ি বাড়ি ফ্রীজের বাসনা তার নিজের যে নেই তা নয়। তাছাড়া অন্তত একশ টাকা দিনে খরচ করার সঙ্গতি না থাকলে আজকাল খুব খারাপ লাগে। এই তো গতকাল সুব্রতর সঙ্গে পিটার ক্যাটে গিয়ে নব্বইটা টাকা খরচ হলো। মাল আর খাবার। না গেলে আজকের অ্যাপয়েন্টমেন্টটা হতো না। বুড়ো চোপরা তো একটা পয়সাও এ বাবদ দেবে না। এরকম টেনেটুনে আর চলছে না।

বেরোবার জন্যে তৈরী হতে বেশী সময় লাগল না। সাদা প্যাণ্টের সঙ্গে হাল্‌কা নীল টি-সার্টটা পরবে কিনা যখন সে ভাবছে তখনই দরজায় নক হলো। রঙ্গন এগিয়ে গিয়ে কি-হোলে চোখ রাখতেই সোজা হয়ে দাঁড়াল। নীপা এসেছে। তার মানে এখনই টাইফুন উঠবে। এতো তাড়াতাড়ি নীপা কি করে ট্যাক্সি পেয়ে যায় কে জানে! আক্রমণ কি করে সামলাবে ঠাহর করতে পারছিল না সে। এবার দ্বিতীয়বার শব্দ হলো, বেশ জোরে।

দরজা খুলতেই কিন্তু ঝড়ের মতন ঢুকলো না নীপা। সেখানে দাঁড়িয়ে ভ্রূ কুঁচকে রঙ্গনকে দেখলো। আধা-গবেটের মতো রঙ্গন বলতে পারলো, 'কি ব্যাপার—'

এবার ঘরে ঢুকলো নীপা, পাশ কাটিয়ে সোজা বিছানায় গিয়ে বসলো। দরজা বন্ধ করে রঙ্গন হাসবার চেষ্টা করলো, 'রেগে গেছ?'

থমথমে মুখে নীপা কথা বললো, 'তুমি কি আমাকে আর চাইছ না? আমি স্পষ্ট শুনতে চাই।'

'কি আশ্চর্য! চাইব না কেন?'

'আমি টেলিফোনে কথা বললে যখন তোমার কানে ব্যথা হয়।'

'উঃ! তুমি ঠাট্টাও বোঝ না!' ঝড়টা তেমন জোরালো নয় মনে করে রঙ্গন ধীরে ধীরে বিছানায় গিয়ে বসলো। নীপার সামান্য তফাতে কিন্তু স্পর্শের মধ্যে।

'সরে বসো।'

'কেন?'

'আমি তোমার ওসব মতলব জানি। কাল রাত্রে কি করেছ?'

'কাল? কিছু না।'

হঠাৎ খেপে গেল নীপা, 'লজ্জা করে না? নিজের বউকে ঘরে তুলতে পার না, অথচ বারে গিয়ে মদ গেলো। ভাগ্যিস বাপি দেখেছিলেন নইলে তোমার ভাঁওতায় আমি বিশ্বাস করতাম।'

রঙ্গন কিছুতেই মনে করতে পারল না পিটার ক্যাটে নীপার বাবাকে দেখেছে কিনা, 'তোমার বাপি নিশ্চয়ই উপোস করে ছিল না!'

'তাঁর পয়সা আছে তিনি খাবেন। তোমার মতো ভিখিরির ওইসব সাধ মানায় না। তাহলে বলো তুমি ব্লাফ দিয়েছ আমাকে। ইচ্ছে করে ফ্ল্যাট নিচ্ছ না।' রাগী চোখে তাকাল নীপা।

রঙ্গন বোঝাতে চাইল, 'শোন, আমি সুব্রতর সঙ্গে ওখানে গিয়েছিলাম। সুব্রত আমাকে খুব বড় কাজ পাইয়ে দিচ্ছে।'

'তাতে কত টাকা তুমি পাবে?'

'ঠিক বলা যাচ্ছে না।'

'কোনোদিনও বলতে পারবে না। শোন, তোমার ওসব ভনিতা আমি আর শুনতে চাই না। তুমি আজ দুপুরে একটায় ফ্লুরিতে আসবে।'

'ফ্লুরি!' রেস্টুরেন্টের নাম শুনে হতভম্ব হয়ে গেল রঙ্গন। ছ' কাপ চা

খেলেই দশটা টাকা চলে যাবে।

'হ্যাঁ। বাপির এক বন্ধু আর মা ওখানে থাকবেন। মায়ের অনুরোধে উনি রাজী হয়েছেন তোমাকে স্কোপ দিতে।'

'কিসের স্কোপ ?'

'ওপরতলায় ওঠার। যেখানেই যাও একটার মধ্যে ওখানে চলে আসবে। সূর্য আঙ্কল সময় রাখতে ভালবাসেন।'

আলিপুরে এই অঞ্চলটায় কখনও আসে নি রঙ্গন। কতটা রেস্ত থাকলে এতখানি বাগানওয়ালা বাড়ির মালিক হওয়া যায় তা সে ভাবতে পারছে না। দু' মিনিট আগে গেটের সামনে পৌঁছাবে বলে সে উল্টো ফুটপাথে দাঁড়িয়েছিল। নীপাকে একটু আগে ধর্মতলায় ছেড়েছে সে। ফালতু ছটা টাকা ট্যাক্সির পেছনে গেল। এই সূর্য-আঙ্কলটি কে, কে জানে ? তিনি যদি তাকে স্বর্গের সিঁড়ির সন্ধান দেন তো মন্দ কি! তবে কথা হলো শ্বশুরবাড়ির সোর্সে ইনকাম— ! তা হোক। টাকার গায়ে তো গভর্ণর ছাড়া আর কারো সই থাকে না।

গেটের সামনে এসে সে সুন্দর বাগানটাকে স্পষ্ট দেখল। প্রচুর ফুল ফুটেছে। গেট খুলতে না খুলতেই উর্দি পরা দরোয়ান ছুটে এসে হিন্দীতে প্রশ্ন করল, 'কাকে চাই ?'

'গুপ্তা সাহেব, আমার দেখা করার কথা আছে।'

'কি নাম আপনার ?'

রঙ্গন নাম বললো এবং সেই সঙ্গে সুব্রতর প্রসঙ্গ।

লোকটা তাকে দাঁড়াতে বলে গেটের পাশে ছোট্ট একটা ঘরে ঢুকে পড়ল। এইবার রঙ্গন দেখল সেখানে খাকী পোশাক পরা একটি নেপালী বন্দুক হাতে দাঁড়িয়ে তাকে লক্ষ্য করছে। সাবাস। পার্টি তাহলে সত্যিই শাঁসালো। সুব্রত ব্লাফ দেয় নি। রেসের মাঠে নাকি ওর সঙ্গে এই গুপ্তা সাহেবের আলাপ হয়েছিল।

দরোয়ান ফিরে এসে গেট খুলে বললো, 'সোজা চলে যান। ডান দিকের সিঁড়ি।'

রঙ্গন ফুলের বাগানে ঢুকল। একটা গাড়ি যেতে পারে এমন বাঁধানো প্যাসেজ দিয়ে হেঁটে এলো দুধের মত সাদা দোতলা বাড়িটার সামনে। কোনো মানুষ নেই এখানে। গাড়ি বারান্দার নীচে দাঁড়িয়ে সে চারপাশে তাকাল। 'ডান দিকের সিঁড়িটা' কোথায় ? বারান্দায় উঠে রঙ্গন ডান দিকে তাকাল ; শ্বেতপাথরের ঝকঝকে সিঁড়িতে পা ফেলতে সঙ্কোচ হচ্ছিল তার। জুতোটা রং করালেও আজকাল ম্যাটমেটে দেখায়। দোতলায় পৌঁছাতেই যেন মেঘ ডাকল। ডাকটা এমন আচমকা যে রঙ্গনের শিরদাঁড়ায় কাঁপুনি ধরল যেন। বাঘের মতো বিশাল একটা কুকুর সামান্য না নড়ে শুধু মুখ তুলেছে। চোখের দৃষ্টি এমন যে, আর এক পা এগোলেই সে টুঁটি ছিঁড়ে ফেলবে। আর তখনই সেই গলাটা

কানে এল, 'সুইটি !'

তৎক্ষণাৎ জন্তুটার দৃষ্টিতে পরিবর্তন এল। মুখ নামিয়ে থাবার ওপর রেখে সে রঙ্গনের দিকে চেয়ে রইল।

'কাম ইন।' সামান্য থমথমে গলার স্বর কিন্তু কর্তৃত্বপূর্ণ।

কপালে ঘাম জমেছিল এরই মধ্যে, রুমালে সেটাকে মুছে রঙ্গন আর একটু এগোতেই তাঁকে দেখতে পেল। দোতলার সাদা বারান্দায় সাজিয়ে রাখা সাদা বেতের চেয়ারে তিনি বসে আছেন। পরনে লাল টকটকে জিনস আর স্লিভলেস আন্দির জামা। মাথার চুল চুড়ো করে বাঁধা। চোখে নীলচে রোদচশমা। রঙ্গন বয়স আন্দাজ করতে পারল না। তবে পঁয়ত্রিশের আশে পাশে তো বটেই।

এর মধ্যে গলা শুকিয়ে এসেছিল। নিজের কাছেই কণ্ঠস্বর বেশ অপরিচিত ঠেকল তার। 'মিস্টার গুপ্তা আছেন ? আমার নাম রঙ্গন।'

চোখ দেখতে পাচ্ছে না কিন্তু মুখেরও কোনো ভাবান্তর নেই। শুধু একটা হাত ইঙ্গিতে তাকে বোঝাল ওই চেয়ারটায় বসতে হবে। শব্দ না করে রঙ্গন বসল। তারপর ওপক্ষকে নীরব দেখে আবার বললো, 'আমি রঙ্গন সেন।'

'রঙ্গন সেন ?' এক চিলতে হাসি ঠোঁট ছুঁল কি না ছুঁল।

'হ্যাঁ।' রঙ্গন যেন এতক্ষণে ঠাঁই পেল। 'মিস্টার গুপ্তা।'

'মিস্টার গুপ্তা বাড়িতে নেই।'

যেন আচমকা বরফজলে ডুবিয়ে দেওয়া হলো তাকে। রঙ্গন এতটা হতভম্ব হয়ে পড়েছিল মুখে কোনো কথা এলো না। সুব্রত বলেছিল মিস্টার গুপ্তা না থাকলে সে টেলিফোনে ডাকবে। তাহলে কি ও কানেকশন পায় নি ? এই অ্যাপয়েন্টমেন্টের ওপর খুব বেশী নির্ভর করেছিল সে। এমনকি চোপরাকেও কিছু জানায় নি যাতে পরে চমকে দেওয়া যায়। অনেকগুলো সমস্যা চোখের সামনে কিলবিলিয়ে উঠল। রঙ্গন মহিলার দিকে তাকিয়ে প্রার্থনা করার গলায় বললো, 'কিন্তু আমি জানতাম উনি থাকবেন।'

'তাই কথা ছিল। কিন্তু উনি শেষ পর্যন্ত থাকতে পারলেন না।' গলার সুর নির্লিপ্ত। কি করবে ঠিক করে নিল সে। রাগারাগি করলে চলবে না। প্রয়োজনটা যখন তার তখন এখানে আবার আসতে হবে। মোলায়েম স্বরে বললো, 'কখন দেখা হতে পারে ?'

'প্রয়োজনটা আমায় বলতে পারেন। আমি মিসেস গুপ্তা।' মুখ রঙ্গনের দিকে কিন্তু দৃষ্টিটা রঙীন কাচের আড়ালে অস্পষ্ট।

একটু সাহসী হলো রঙ্গন, 'সুব্রত নিশ্চয়ই মিস্টার গুপ্তাকে বলেছে।'

'কে সুব্রত ?'

'রেসকোর্সে ওঁদের আলাপ।'

'আই সি। না, আমি কিছুই জানি না।'

'আমি চোপরা এণ্ড চোপরা থেকে আসছি। আমার বন্ধু সুব্রত মিস্টার গুপ্তাকে বলেছিল এবং তিনি ইন্টারেস্টেড হয়েছিলেন। তাই—।'

একটু দ্বিধা করল রঙ্গন, কতটা এঁকে বলা উচিত বুঝতে পারছিল না।

'চোপরা এণ্ড চোপরার ব্যবসাটা কি ?'

'ইনকামট্যাক্স অ্যাডভাইসার।'

'আই সি। কিন্তু আমাদের নিজস্ব অডিটার এণ্ড অ্যাডভোকেট আছেন যাঁরা এসব ব্যাপার দেখে থাকেন। সুতরাং—।' ঠোঁট ওল্টালেন সুন্দরী।

'আমি জানি। কিন্তু আমরা এমন সব ব্যাপারে স্পেশালিস্ট যা বিখ্যাত আইনজ্ঞরা সমাধান করতে পারেন না।' নিঃশ্বাস চেপে কথাটা বলে ফেলল রঙ্গন। না, আজ কোনোভাবেই সে বিফল হয়ে ফিরতে চায় না। সুন্দরী এবার ধীরে ধীরে রোদচশমা সরিয়ে নিয়ে স্পষ্ট চোখে তাকালেন। রঙ্গনের শরীর হঠাৎ ভারী হয়ে গেল। এত নীল চোখ কখনও দেখে নি সে। এই দৃষ্টি যেন তার শরীরের অনেক ভেতরে ছড়িয়ে যাচ্ছে, কিছুই লুকোনো থাকছে না। মিসেস গুপ্তার ঠোঁট একটু নড়লো, 'কেমন ?'

'ওয়েল !' নিজেকে স্মার্ট করার চেষ্টা করলো রঙ্গন, 'বিষয় সম্পত্তি এবং উপার্জন সব সময় আইন মেনে চলে না। হয়তো অনিচ্ছাসত্ত্বেও এসব এমন ফাঁদে আটকে গেল যা আইনের আশ্রয়ে ছাড়ানো যাচ্ছে না। অথবা কোনো বিষয়ের দুরকম অর্থ করা যায়, সরকার যদি বিপক্ষে রায় দেয় তাহলে আইন তাকে রক্ষা করতে পারে না। চোপরা এণ্ড চোপরা ওইসব বিষয় নিয়ে ডিল করে।

'ক্যান ইউ মেক হোয়াইট মানি ?' প্রশ্নটা সরাসরি তবু রঙ্গন একটু নার্ভাস হয়ে গেল, 'বলুন ?'

'কালো টাকা সাদা করে দিতে পারেন ?'

এবার রঙ্গন সচকিত হলো। এটা একটা পরিষ্কার ট্র্যাপ হতে পারে। সে যদি হ্যাঁ বলে এবং তা রেকর্ডেড হয় তাহলে শ্রীঘরে যাওয়া থেকে কেউ রক্ষা করতে পারবে না। চোপরার স্পষ্ট নির্দেশ আছে, পার্টি আনো কিন্তু তাকে আকাশকুসুম স্বপ্ন দেখিও না। তুমি যদি কোনো ঝামেলায় পড়ো আমি তোমাকে বাঁচাতে যাবো না। মাঝে মাঝে ব্যাপারটাকে সোনার পাথরবাটি বলে মনে হয় রঙ্গনের। যারা দুনম্বর নিয়ে কারবার করে না তারা এতো লোক থাকতে চোপরা এণ্ড চোপরার কাছে কেন আসবে ? অথচ তাকে পার্টি ধরে আনতে হবে, কাগজপত্র তৈরী করতে হবে এবং চোপরা গিয়ে মাখনটুকু খাবে।

রঙ্গন বললো, 'আমি ঠিক বুঝতে পারছি না।'

মিসেস গুপ্তা শিষ দিলেন। সঙ্গে বিদ্যুতের মতো সুইটি ওঁর পাশে এসে থাবা মুড়ে বসলো। ব্যাপারটা এত চকিতে ঘটল যে রঙ্গনের হাত পা ঠান্ডা, কুকুরটার শরীর যেন তার গায়ে বাতাস ছড়িয়ে গেল। মিসেস গুপ্তা সুইটির মাথায় হাত রাখলেন, 'মিস্টার সেন, আমি ন্যাকামি পছন্দ করি না। কথাবার্তা সোজাসুজি বলতে ভালোবাসি।'

ঠিক তখনই পেছনের দেওয়ালে ঝোলানো টেলিফোনটা বেজে উঠল। কপালে ভাঁজ পড়ল মিসেস গুপ্তার। বাঁ হাতে রিসিভার তুলে বললেন,

হেলো।'

তারপর ওটাকে যথাস্থানে রেখে বললেন, 'মিস্টার গুপ্তা এসেছেন। হোয়াটস ইওর টেলিফোন নাম্বার?'

রঞ্জন কাঁপা গলায় নম্বরটা বললো। মিসেস গুপ্তা উঠলেন, 'কখন পাওয়া যাবে এই নাম্বার।'

'সকালে নটা পর্যন্ত আর রাত্রে দশটার পর।'

'আমি যে নাম্বারটি নিয়েছি তা কেউ যেন জানতে না পারে।' কথা শেষ করেই সিঁড়ির দিকে পা বাড়ালেন তিনি। পকেট থেকে রুমাল বের করে মুখ মুছতে গিয়ে থমকে গেল রঞ্জন। সুইটি একদৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে আছে। এক পাশের বিশাল দাঁতের ফাঁক গলে জিভ ঝুলছে। রঞ্জনের মনে হলো হাত নাড়ালেই কুকুরটা ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে। সেই সময় হেঁড়ে গলায় কেউ বলে উঠল, 'ডারলিং, সেই লোকটা কি এসেছে?'

মিসেস গুপ্তা বললেন, 'ও হানি! তোমার অফিসের ব্যাপার বাড়িতে টেনে এনো না। ইটস বোরিং। ইয়েস, সামবডি হ্যাজ কাম।' তারপর চলে যেতে যেতে ডাকলেন, 'সুইটি!' তৎক্ষণাৎ বিশাল কুকুরটা রবারের মতো লাফিয়ে সুন্দরীকে অনুসরণ করল।

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে রঞ্জন দেখল মিসেস গুপ্তা বাঁ দিকের একটা ঘরে ঢুকে গেলেন। এবং সিঁড়ির মুখে বেশ মোটা একটি মানুষ দাঁড়িয়ে। মাথায় চকচকে টাক, নিভাঁজ স্টিল রঙের স্যুট, টাই এবং হাতে একটা ছড়ি। পঞ্চাশ অতিক্রান্ত দেখলেই বোঝা যায়।

রঞ্জন হাত জোড় করল, 'নমস্কার। আমি রঞ্জন সেন।'

না হেসে লোকটি মাথা নাড়ল সম্মতির। তার চোখ দুটো যেন রঞ্জনকে সার্চ করছিল। তারপর ধীরে ধীরে এগিয়ে এসে তৃতীয় চেয়ারটিতে বসলো, 'সুব্রত তোমাকে পাঠিয়েছে?'

'হ্যাঁ।'

'চোপরা এন্ড চোপরা?'

'হ্যাঁ।'

'কতদিন কাজ করছ ওর কাছে?'

'পাঁচ বছর।'

'কত মাইনে পাও?'

এবার হোঁচট খেল রঞ্জন। আজ অবধি কোনো খদ্দের তাকে মাইনের কথা জিজ্ঞাসা করে নি। লোকটার ঔদ্ধত্য মারাত্মক। সে বললো, 'এটা একটি গোপনীয় তথ্য।'

'কিন্তু এইমাত্র আমি জানলাম। হাজার টাকা। ভুল বলছি?' এবার চমকাবার পালা রঞ্জনের। সে মনে করতে চেষ্টা করল সুব্রতকে মাইনের কথা বলেছিল কিনা। মিস্টার গুপ্তা হাসলেন, 'আমি যার সঙ্গে কাজ করি তার সম্পর্কে পুরো খোঁজ খবর নিয়ে থাকি। তোমার আপসেট হবার কোনো কারণ

নেই। তোমাকে আমার অপছন্দ হয় নি। কিন্তু একটা শর্ত আছে, ওই মিসেস চোপরার সঙ্গে তোমার একটা আণ্ডারস্ট্যাণ্ডিং-এ আসতে হবে।'

মিসেস চোপরা! চকিতে সেই শুঁটকি মাছের মতো চেহারাটা ভেসে উঠল। স্বয়ং ঈশ্বরও বোঝাপড়া করতে পারবে না ওর সঙ্গে সে তো কোন্ ছার। কিন্তু এখনই সেকথাটা বলা যে বুদ্ধিমানের কাজ হবে না তা জানে রঙ্গন। সুতরাং সে এমন মুখ করল যেন ব্যাপারটা বোঝার চেষ্টা করছে। মিস্টার গুপ্তা বললেন, 'আমার ইণ্ডাস্ট্রিতে লটস অব প্রব্লেম। সুব্রত বলেছে তোমরা নাকি নির্ভরযোগ্য।'

এবার সাহস করে রঙ্গন বললো, 'আপনি যদি ইচ্ছে করেন তাহলে আমি মিস্টার চোপরাকে এখানে নিয়ে আসতে পারি।'

'নো নো নেভার।' হাত নাড়লেন মিস্টার গুপ্তা, আমি চোপরাকে চিনতে চাই না। একটা দালালের সঙ্গে আমার সম্পর্ক আছে আমি তা কাউকে জানাতে চাই না। তোমার ফার্ম তো টেন পার্সেণ্ট দেয়?'

'হ্যাঁ, স্যার।'

'ওয়েল, আমি নাইন পার্সেন্ট দেব আর এক পার্সেণ্ট তোমাকে।'

রঙ্গন উত্তেজিত হলো। বাঃ চমৎকার! বুড়ো চোপরা মাইনে ছাড়া তাকে হাফ পার্সেণ্ট দেয়। এক্ষেত্রে তার পোয়াবারো। কিন্তু কেসটা কি?

সে বাধ্য ছেলের মতো ঘাড় নাড়ল।

'শোন, আমি একটা জমি কিনেছি। মাল্টিস্টোরিড বাড়ি বানাবো। কিন্তু এ্যাডভান্স দেওয়ার পর জানতে পারলাম ওই জমি রেজেস্ট্রি করা যাবে না। ল্যাণ্ডলর্ডের বারো লাখ টাকা ট্যাক্স আউটস্ট্যাণ্ডিং আছে। ক্লিয়ারেন্স পাবে না ওটা না মেটালে, যেহেতু আমি অলরেডি ঢুকে গেছি তাই দায়টা আমার। ল্যাণ্ডলর্ড চাইছে ট্যাক্সটা আমি দিয়ে দিই। তাহলে জমির দাম আরো বারো লাখ বেড়ে গেল। তোমার ফার্ম ওই টাকাটা বাঁচাতে পারবে?'

'কি করে?' রঙ্গন হাঁ হয়ে গেল।

'সেটা তোমরা জানো। আমার উকিলরা কোনো ফাঁক পাচ্ছে না। ওই টাকা ল্যাণ্ডলর্ডের কাছে সরকারের প্রায় পাঁচ বছরের ওপর পাওনা। আমি তোমাকে একমাস সময় দিলাম। বারো লাখ যদি মকুব করিয়ে দিতে পারো তাহলে এক লাখ কুড়ি হাজার তোমরা পাবে। ডান?' মিস্টার গুপ্তা এবার ঘড়ি দেখলেন।

পকেট থেকে রুমাল বের করে মুখ মুছল রঙ্গন। এত টাকা একসঙ্গে সে জীবনে দেখে নি। শুকনো গলায় জিজ্ঞাসা করল, 'কিন্তু মিসেস চোপরার সঙ্গে আণ্ডারস্ট্যাণ্ডিং করতে হবে কেন?'

'কারণ কেস হয়ে যাওয়ামাত্র সমস্ত ফাইলপত্র আমার ফেরত চাই। চোপরার কাছে এক টুকরো কাগজও যেন পড়ে না থাকে। ক্লিয়ার?'

রঙ্গনের মুখ থেকে কথা সরল না কয়েক মুহূর্ত! এই লোকটি মারাত্মক। যেসব ক্লায়েণ্টদের কাজ মিস্টার চোপরা করে থাকেন তাদের কাগজপত্র আর

কেউ হাত দিতে পারে না। কেস মিটে যাওয়ার পর ওগুলো মিসেস চোপরার হেফাজতে থাকে। রঙ্গন কানাঘুষোয় শুনেছে হাতে পয়সা না থাকলে মিস্টার চোপরা নাকি ওইসব ক্লায়েন্টদের চাপ দিয়ে মাঝে মধ্যে আদায় করে থাকেন। মিস্টার গুপ্তা সেই খবরও নিশ্চয়ই রাখেন। কিন্তু মিসেস চোপরার সঙ্গে ভাব করা মানে শকুনির গালে চুমু খেতে চাওয়া।

মিস্টার গুপ্তা উঠে দাঁড়ালেন, 'ওয়েল, তুমি চোপরার সঙ্গে আলোচনা কর। যদি ও রাজী হয় তাহলে আমাকে এই নম্বরে টেলিফোন করবে। আমার অফিসে এসব কথা তোমার সঙ্গে বলতে চাই না। আর হ্যাঁ, এই কেস যদি চোপরা করে তাহলে সে জানাবে ল্যান্ডলর্ডকেই, আমি এর মধ্যে আছি তা যেন না জানে। এইজন্যেই তোমাকে এক পার্সেন্ট দেওয়া হবে, মনে থাকবে?' একটা সাদা চকচকে কার্ড দিয়ে দিলেন তিনি। ঘাড় নাড়ল রঙ্গন। মিঃ গুপ্তা এমন ভাবে হাত নাড়লেন যেন ব্যাক হ্যান্ডে চাপ মারছেন। রঙ্গন ইঙ্গিতটা বুঝতে পেরে বারান্দা পেরিয়ে নিচে নেমে এল। কোথাও সুইটি কিংবা তার মালিকানের অস্তিত্ব নেই। নিচে নাম মাত্র সেই দারোয়ানটাকে দেখতে পেল! নিঃশব্দে প্যাসেজ দিয়ে ওর আগে আগে হেঁটে গেট খুলে নিঃশব্দে সরে দাঁড়াল লোকটা। বাইরে বেরিয়ে রঙ্গনের মনে হলো অনেকক্ষণ বাদে সে সহজভাবে নিঃশ্বাস ফেলতে পারল।

বাস স্ট্যান্ডের দিকে যেতে যেতে রঙ্গন পুরো ব্যাপারটা মনে মনে খতিয়ে নিল। বারো লাখ টাকার নাইন পার্সেন্ট, চোপরা রাজী হবেই। আধাআধি খরচ করলেও পঞ্চাশ-ষাট হাজার নেট প্রফিট। কিন্তু তাকে কি আর পাঁচ হাজার দেবে? আধা পার্সেন্ট হিসেব করতে বুড়োর বুক ভেঙে যাবে। কিন্তু এদিকে মিঃ গুপ্তা এক পার্সেন্ট দেবেন বলে কথা দিয়েছেন। তার মানে বারো হাজার টাকা। এরকম কেস যদি বছরে বারোটা পাওয়া যায় তো নীপার মাকে। উত্তেজনায় ট্যাক্সি থামিয়ে ফেলল রঙ্গন। যার পকেটে আজ বাদে কাল এত টাকা আসছে সে সামান্য ট্যাক্সিতে চড়বে না!

ট্যাক্সিতে বসে রঙ্গন কেসের কথা ভাবল। সাদা চোখে কোনো রাস্তা খোলা নেই। যদি কোনো লোক ট্যাক্স না দিয়ে থাকে তাহলে সেটা না মেটানো পর্যন্ত কোনো সম্পত্তি বিক্রি করতে পারবে না। চোপরা যদিও বলে থাকে, 'পচা গন্ধ বের হচ্ছে এমন সব কেস আমার কাছে নিয়ে এসো। যত পচা তত পয়সা। বিদ্যে দিয়ে যে কেস করতে হয় তা করবে অন্য উকিলরা, তিন চারশো ফি পেতে যাদের কালঘাম ছুটে যায়।' কথাটা বলে আর খিকখিকিয়ে হাসে চোপরা।

আলিপুর থেকে বালিগঞ্জ বাড়ি আসতে ট্যাক্সির মিটারটা যেন চরকির মতো ঘুরে গেল। এখন প্রায় বারোটা। খুব ধীরে সুস্থে ট্যাক্সি থেকে নেমে ভাড়া মিটিয়ে মিইয়ে গেল রঙ্গন। পকেটে আর গোটা দশেকও নেই। তারপরেই সে নিজেকে বোঝাল যার মাসখানেকের মধ্যে সতের হাজার উড়ে আসছে তার এসব

ভাবনা মোটেই মানায় না।

দোতলায় উঠেই কানে এল টাইপ রাইটারের খটাং খটাং শব্দ। বুড়ো দাসবাবু ঝুঁকে পড়ে টাইপ করেন। ভাঙা টাইপ রাইটারটা পাল্টানোর প্রয়োজন মনে করে না চোপরা। ওই শব্দটাই বিরক্তির। নিজের টেবিলে পৌঁছে রঙ্গন দেখে নিল চোপরার ঘরের দরজাটা ভেজানো। তার মানে বুড়ো বেরিয়েছে। কিংবা হয়তো ওপর থেকে নামে নি এখনও। তিনতলায় চোপরার ফ্ল্যাট। চেয়ারে বসে বেল টিপল রঙ্গন। শব্দটা হতেই দাসবাবু ঘাড় ঘোরালেন 'আপনি এসে গেছেন! সাহেব ক্ষেপে লাল।'

'কোথায় গিয়েছে?'

ইঙ্গিতে দাসবাবু বোঝালেন ওপরেই আছে। রঙ্গন কাঁধ নাচাল। আজ সে কিছুতেই চাকরের মতো আচরণ করবে না। টাইপ থামিয়ে দাসবাবু প্রায় মিনতি করলেন 'ওটা আজ দেবেন?'

'আজ নয় কাল।' টেবিলে পা তুলে দিল রঙ্গন। তিরিশটা টাকা ধার নিয়েছিল সে দাসবাবুর কাছে, দেব দেব করে দেওয়া হয় নি। হঠাৎ সে সুর বদলে জিজ্ঞাসা করল, 'আচ্ছা দাসবাবু, যদি আপনাকে তিরিশের বদলে ষাট দিই তো কেমন লাগবে?'

কথাটা যেন বোধগম্য হলো না. দাসবাবু হাঁ হয়ে গেলেন, কেন দেবেন. আপনি তো তিরিশই নিয়েছেন।'

'দেব, আমার ইচ্ছে হলে তাই দেব। তবে সেটা পেতে হলে আপনাকে আর একটা মাস অপেক্ষা করতে হবে। ভেবে দেখুন।' পা দোলালো।

একটু একটু করে মুখের চেহারা পাল্টালো দাসবাবুর। মোটা কাঁচের চশমাটা খুলে ধুতির খুঁটে মুছতে মুছতে বললেন, 'ঠাট্টা করছেন না তো?'

'না।'

'বেশ তাই দেবেন। যদিও এখনি খুব দরকার ছিল'তবু তিরিশের বদলে ষাট—ভাবা যায় না।' বলাশেষ করেই ইলেকট্রিক শক্ খাওয়ার মতো মেশিনের দিকে ঘুরে বসে হাত চালালেন দাসবাবু, খটাখট শব্দ হতে লাগল টাইপের। রঙ্গন মুখ ঘুরিয়ে দেখল পিছনের দরজায় মিসেস চোপরা কোমরে দুই হাত রেখে জ্বলন্ত দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে আছেন।

'এটা কি অফিস না শয়তানের আড্ডা?' ছুঁচলো স্বর কানের পর্দা ফুটো করে দেবার পক্ষে যথেষ্ট। রঙ্গন আজ একটুও বিচলিত হলো না। খুব বিনীত হয়ে বললো, আপনি যা বলবেন তাই।

কটমট করে তাকালেন মিসেস চোপরা। রঙ্গনের এই ধরনের আচরণের সঙ্গে তিনি অভ্যস্ত নন। ক্রোধ তাই দ্বিগুণ হলো, 'পা নামান, পা নামান বলছি।' যেন অন্যায় হয়ে গিয়েছে এমন ভঙ্গিতে পা নামিয়ে রঙ্গন বললো, 'সরি।' সিঁড়ির দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে মিসেস চোপরা চেঁচালেন, 'আমি বার বার বলছি এই বোঝাটাকে কাঁধ থেকে নামাও। ও যা কাজ করে একটা পিয়ন তার ডবল করত। বারোটার সময় হেলতে দুলতে এসে টেবিলে পা তুলে শুয়ে

আছেন।'

কথাগুলো অবশ্যই মিঃ চোপরার উদ্দেশ্যে ছুঁড়ে দেওয়া। কিন্তু রঙ্গন ভাবছিল এই চিজটির সঙ্গে তাকে আণ্ডারস্ট্যাণ্ডিং-এ আসতে হবে। অসম্ভব! কিন্তু উপায় নেই, ওই শব্দটা নাকি শুধু মূর্খদের অভিধানেই লেখা থাকে। নিজেকে মূর্খ ভাবতে সে কিছুতেই রাজী নয়।

এই সময় শিবলাল ঘরে এল। এই অফিস এবং চোপরার একমাত্র কাজের লোক। রঙ্গন খুব মোলায়েম গলায় বললো, 'শিবলাল, গোটা চারেক চিকেন রোল নিয়ে এসো তো! আমার লাঞ্চ হয় নি। মেমসাহেবকে বলো পয়সা দিতে।'

গট গট করে রঙ্গনের টেবিলের সামনে এগিয়ে এলেন মিসেস চোপরা। 'কি ব্যাপার? সাপের পাঁচ পা দেখেছো? গেট আউট, গেট আউট ফ্রম দিস অফিস।'

রঙ্গন হাসল, 'আচ্ছা, আপনি একটু বন্ধুর মতো আচরণ করতে কখনও পারেন না? মানুষের তো মাঝে মাঝে ভুলও হয়।'

'কি ব্যাপার?' বুড়ো চোপরার সরু গলা শোনা গেল।

'স্যাক হিম, একে এই মুহূর্তে তাড়িয়ে দাও। বারোটার সময় অফিসে এসে টেবিলে পা তুলে আমাকে হুকুম করছে চিকেন রোল খাওয়াতে। এতবড় আস্পদ্দা!'

সঙ্গে সঙ্গে ক্রোধ ফুটে উঠল চোপরার মুখে। নিজের ঘরে ঢুকে চিৎকার করে ডাকলেন, 'সেই ইন!'

রঙ্গন উঠল। তারপর হেলতে দুলতে চোপরার ঘরে ঢুকে চেয়ার টেনে বসল। চোপরা বলল, 'লুক! তোমাকে দিয়ে আমার কাজ হচ্ছে না। অতএব চলে যাও। এ মাসের মাইনেটা এক তারিখে এসে নিয়ে যেও। দ্যাটিস্ অল।'

রঙ্গন ঠোঁট কামড়ালো, 'কিন্তু আমার দোষ?'

'আমি তোমার কাছে কৈফিয়ৎ দেব না। তোমাকে যে টাকা দেওয়া হয় তার রিটার্ন তুমি দিচ্ছ না এটাই যথেষ্ট।'

মিসেস চোপরা পেছন পেছন ঢুকেছিলেন. 'ওঃ, বাঁচা গেল।'

রঙ্গন সামনে পড়ে থাকা পিন-কুশনটা নাড়তে নাড়তে বললো, 'আমি চলে গেলে আপনারা আফসোস করবেন।'

মিসেস চোপরা খিক খিক শব্দ করলেন, 'আফসোস! হাজার টাকা বেঁচে যাবে।'

রঙ্গন ঘাড় নাড়ল, 'ঠিক। কিন্তু একশ আট হাজার টাকা তো আসবে না।'

চোপরার কপালে ভাঁজ পড়লো, 'মানে?'

রঙ্গন বললো, 'মিস্টার চোপরা, আজ বারোটা অবধি আমি কি করেছি আপনি তা জানতে চান নি। এক লাখ আট হাজার টাকা ফি পাওয়া যাবে এমন একটা কেস তাই আপনি হারালেন। অলরাইট।' উঠে দাঁড়াল রঙ্গন।

'এক লাখ আট হাজার! মাই গড! কি কেস?'

'সেটা এখন আর আপনাকে বলতে আমি বাধ্য নই। গুড নাইট।'

প্রায় এক লাফে জায়গাটা অতিক্রম করলেন চোপরা, 'ওঃ সেইন, বাপ ছেলের মধ্যেও মান অভিমান হয়, বলো বলো।'

এবার মিসেস চোপরা চেঁচিয়ে উঠলেন, 'এটা একটা ফন্দী, বিশ্বাস করো না।'

চোপরা মাথা নাড়লেন, 'নো রীতা, সেইন আজ অবধি কখনও লাখ টাকার গল্প শোনায় নি। টেল মি সেইন, বসো বসো।'

জোর করেই রঞ্জনকে চেয়ারে বসিয়ে দিয়ে নিজের চেয়ারে ফিরে গেলেন চোপরা, 'কোথায় গিয়েছিলে তুমি ?'

'আলিপুর রোডে !'

'খুলে বল, খুলে বল।'

'শুনুন। একটা লোক তার জমি বিক্রী করবে। কিন্তু তার বারো লাখ টাকা ট্যাক্স আউটস্ট্যাণ্ডিং রয়েছে। এই টাকাটা না দিলে সরকার ক্লিয়ারেন্স দেবে না। আপনি যদি ম্যানেজ করতে পারেন তাহলে ক্লায়েণ্ট এক লাখ আট হাজার আপনাকে দেবে।' কথাটা শেষ করে রঞ্জন চোপরার মুখের দিকে তাকাল। প্রায় কপালে চোখ উঠে গেছে চোপরার। ঠোঁট চেটে নিয়ে বলল, 'তুমি ঠাট্টা করছ না তো ?'

'না।'

'এক লাখ আট হাজার। মাই গড। ক্লায়েণ্টের নাম কি ?'

'রাজী হলে জানতে পারবেন।'

'ওঃ !' চোখ বন্ধ করে চিন্তা করলেন চোপরা, 'কিন্তু টেন পার্সেণ্ট তো এক লাখ কুড়ি হয়। ইউ নো দি রেট !'

'নাইন পার্সেণ্ট এক লাখ আট। রাজী কি না বলুন ?'

'ওকে ওকে, নাইন। কিন্তু কেসের ডিটেলস্ চাই। এভাবে বললে কিছু বোঝা যায় না। আউটস্ট্যাণ্ডিং ট্যাক্স কোন্ খাতে ? পেনাল্টি কি ? কোন্ জুরিসডিকশনে কেস ? এসব তো জানতে হবে।'

'সব জানতে পারবেন।'

'ওয়েল ওয়েল, ইণ্টারেস্টেড কে ? ল্যাণ্ডলর্ড না বায়ার ?'

'দুজনেই।'

মাথা নাড়লেন চোপরা, 'এসব কেসে বায়ারবাই বেশী ইণ্টারেস্টেড হয়। ঠিক আছে, আমি একটু ঘুরে আসছি। এসে ফাইন্যাল বলব।' ঘড়ি দেখল রঞ্জন, 'কিন্তু আর আধঘণ্টার মধ্যে আমাকে বের হতে হবে। আপনি রাত্রে আমাকে জানাবেন।'

চোপরা এবার বিরক্ত হলো, 'এই এলে আর এখনই বেরুবে ? তোমার টেবিলে পেণ্ডিং কিছু নেই ?'

'আছে। কিন্তু আর একজন ক্লায়েণ্ট আমার জন্যে অপেক্ষা করবে।'

'ওহো বেশ বেশ। আমি তোমাকে টেলিফোনে জানাবো। দেখো রীতা, সেইন

সুন্দর কি কাজ করেছে। আমি সব সময় বলি ওর মধ্যে পার্টস্ আছে। আচ্ছা তুমি কি ? বেচারার খিদে পেয়েছে এখনও চিকেন রোল আনলে না ?' চোপরা উঠলেন।

মিসেস চোপরার গলা শুনতে পেল রঙ্গন, 'শুধু চিকেন রোলে কি পেট ভরবে ? আমি ওপর থেকে পায়েস পাঠিয়ে দিচ্ছি বরং।'

'আহা, যাহোক কিছু করো। ছেলেটার খিদে পেয়েছে! ঠিক আছে সেইন, আমি আসছি।' হন্তদন্ত হয়ে বেরিয়ে গেলেন চোপরা।

রঙ্গন ঘুরে বসল, 'তাহলে মিসেস চোপরা, আমাকে চলে যেতে হবে না ?'

কচি খুকীর মতো মুখ করলেন মিসেস চোপরা। 'ওঃ, হাউ নটি ইউ আর। রাগলে আমার মাথার ঠিক থাকে না, তাই বলে আমি কি সত্যি তাই মিন করেছি। তুমি বরং আমার সঙ্গে ওপরে এসো।'

'কেন ?'

'আঃ, বোঝ না কেন ? অফিস ডিসিপ্লিন বলে একটা কথা আছে তো! দাসবাবু জেলাস হবেন। খেয়ে নেবে এসো।' শিবলালকে ডেকে কিছু হুকুম দিয়ে চোপরাগিন্নী ওপরে চলে গেলে রঙ্গন হাসিতে ভেঙে পড়ল। ফার্স্ট রাউন্ডে সে জিতে গেছে। কিন্তু একটা বাজতে আর বেশী দেরী নেই। অথচ মিসেস চোপরার সঙ্গে আন্ডারস্ট্যান্ডিং করতেই হবে। সে ঠিক করল, দশ মিনিটের মধ্যে খাওয়া সারতে হবে।

জীবনে এই প্রথম ওপরে উঠল রঙ্গন। জব্বর সাজানো কিন্তু রুচিতে মোটা দাগ বোলানো। শোওয়ার ঘরে তাকে নিয়ে গেলেন মিসেস চোপরা। রঙ্গন দেখল রোগা লিকলিকে শরীরে কেমন যেন দুলুনি। পায়েসে চামচ রেখে সে বলল, 'এটা আপনার শোওয়ার ঘর ?'

'হ্যাঁ। আমি ওর সঙ্গে শুতে পারি না। ভীষণ নাক ডাকে ওর।'

পায়েস মুখে দিয়ে রঙ্গন হাসল, 'মিস্টার চোপরার সঙ্গে আপনার বোধ হয় বয়সের অনেক পার্থক্য, তাই না ?'

'পঁচিশ বছর।'

'অথচ আপনি এখনও সুন্দর।'

পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দরী মেয়েও এর চেয়ে সুন্দর ব্লাশ করতে পারত না। রীতা চোপরার শুকনো মুখে আলো ফেলল, 'কিন্তু ওবলে আমি খুব রোগা।'

'মোটেই না। বেঢপ মোটা আমার পছন্দ হয় না। আপনাকে স্লিম বলতে হবে।' পায়েস খেয়ে উঠে দাঁড়াল রঙ্গন।

'ওমা এতো তাড়াতাড়ি উঠবে কি ?' রীতা চোপরা আপত্তি জানালেন।

'আমি হয়তো আপনাকে বিরক্ত করছি—।'

'মোটেই না। তোমার মতো হ্যান্ডসাম ইয়ং ম্যান, আমার ভাবতে খারাপ লাগছে যে, আমি তোমার সঙ্গে অনেক কটু ব্যবহার করেছি।'

'ও কিছু না, মিস্টার চোপরা বলেছেন বাপ ছেলের মধ্যে—।'

বাধা দিয়ে রীতা চোপরা বললেন, 'মোটেই না, আমি নিজেকে তোমার

মা হিসেবে কখনই ভাবতে পারব না। তুমি পারবে?'

'কখনো না।' হেসে ফেলল রঙ্গন। এর চেয়ে বেশী আর কিসে আণ্ডার-স্ট্যাণ্ডিং হয়? রীতা চোপ্রাকে কথা দিয়ে আসতে হলো নতুন কোনো খাবার রান্না হলেই রঙ্গনকে ওপরে এসে খেয়ে যেতে হবে।

পার্ক স্ট্রীটে বাস থেকে নেমে জোর পায়ে হাঁটছিল রঙ্গন। একটা বেজে এক মিনিট। যদিও আর কিছুদিনের জন্যে তার নতুন কোনো ধান্দা করার কোনো মানে হয় না তবু নীপার জন্যেই তাকে যেতে হচ্ছে। যদি চোপরার কাজটা করে ফেলতে পারে তাহলে সতের হাজার টাকা পকেটে চলে আসবে। কিন্তু নীপা কি সতের হাজারে সন্তুষ্ট হবে? ওর বাপির বন্ধু স্বর্গের সিঁড়ির খরচ দেবে! খুব সোজা ব্যাপার যেন।

এয়ার কণ্ডিশনড্ রেস্টুরেণ্টের দরজা ঠেলা মাত্র মুখে ঠাণ্ডা আমেজ লাগল। আঃ চমৎকার। বেশ ছায়া ছায়া ভেতরটা। সুদর্শন নারী-পুরুষ ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসে আছে। উর্দিপরা বেয়ারারা ঘুরছে। রঙ্গন দেখতে পেল ওদের। কোণের টেবিলে জাঁকিয়ে বসেছে ওরা। রঙ্গন এগোতেই তিন জোড়া চোখ ওকে বিদ্ধ করল। নীপা এর মধ্যে শাড়ি পাল্টালো কখন? নীপার মায়ের একই পোশাক। সেই চার ইঞ্চি জামা, কোমরের তলায় শাড়ির গিট। মাখনরঙা চর্বিঠাসা চামড়া উপচে পড়ছে ঊর্ধ্বাঙ্গে। আঠারো বছরের মেয়ের মতো ঝুঁটি বাধা চুল। আর ওদের মধ্যে যে লোকটি বসে আছে তার চেহারা বিশাল। য়ুল বার্ণারের মতো পরিষ্কার কামানো মাথা, যেন মোটাসোটা শকুনের মতো দেখাচ্ছে। ইনিই তাহলে সূর্য আঙ্কল! নীপার ঠোঁট খুললো, 'ওঃ, আজও তুমি লেট।'

সূর্য আঙ্কল হাত তুললেন, 'বেটার লেট দ্যান নেভার। এসো ইয়ং ম্যান, তোমার আশায় আমরা বসে আছি।'

চতুর্থ চেয়ারটায় সাবধানে বসল রঙ্গন। ভদ্রলোকের কথাটা শোনা মাত্র মাথায় দ্রিমি দ্রিমি শুরু হয়েছিল! চেনাশোনা নেই, দুম করে লোকটা তাকে তুমি বলে সম্বোধন করল! সূর্য আঙ্কল বললেন, 'কিছু মনে করলে না তো, তুমি নীপার স্বামী, সেই সুবাদে তোমাকে তুমি বলতেই পারি।'

সঙ্গে সঙ্গে খিলখিলিয়ে হেসে উঠলেননীপার মা, 'তুমি এত মজা কর সূর্য, ও কিছু মনে করতে যাবে কেন?'

সূর্য আঙ্কল কাঁধ নাচিয়ে চোখ টিপলেন। রঙ্গনের মনে হলো বোধহয় লোকটা খারাপ নয়। বেশ হাসিখুশী জমাটি মানুষ। পঞ্চাশের ওপর যদি বয়স হয় তাহলে বলতে হবে শরীরটা ফিট রেখেছেন। নীপার বাপির মতো বুড়িয়ে যায় নি।

সূর্য আঙ্কল বললেন, 'এরা ভাই অদ্ভুত লোক, আমাদের পরিচয় করিয়ে দিল না যখন নিজেরাই সেটা সেরে ফেলি। আমার নাম সূর্য মিত্র। বছর খানেক হলো জার্মানী থেকে ফিরেছি। নীপাকে যখন শেষবার দেখেছি তখন ও

এইকুন ছিল। আর তুমি রঙ্গন সেন। ওকে?'

বলার ধরনে রঙ্গন হেসে ফেলল। নীপার মা মুখ ভার করে বললেন, 'জানো সূর্য, নীপার জন্যে আমার রাত্রে ঘুম হয় না। ও যে চট করে এমন একটা কাজ করে ফেলবে ভাবতে পারি নি।'

সূর্য আঙ্কল বললেন, 'প্রেমের জয় সর্বত্র। একজন রাজা সিংহাসন থেকে নেমে এলেন প্রেমিকার জন্যে। কি বলো নীপা! হুঁ? তা তুমিও কি জীবনে প্রেমকে অস্বীকার করতে পার সুধা?'

রঙ্গন দেখল নীপা একটুও প্রতিবাদ করল না। লাজুক মেয়ের মতো মুখ নামিয়ে রেখেছে। নীপার মা বললেন, 'আঃ, তুমি আর ধুনোর গন্ধ দিও না। যা বলছিলাম, রঙ্গন ছেলে হিসেবে মন্দ নয়। কিন্তু ওকে তো রোজগার করতে হবে। যা মাইনে পায় তাতে নীপাকে নিয়ে একটা ভালো ফ্ল্যাটে যে থাকবে তার উপায় নেই!'

সূর্য আঙ্কল তুড়ি মেরে বেয়ারাকে ডেকে খাবারের অর্ডার দিয়ে, রঙ্গনের দিকে তাকালেন, 'তা তুমি ভালো রোজগার করতে চাও?'

রঙ্গন হাসল, 'শুনলেন তো!'

'সে তো ওঁর কথা, তুমি কি বলো?'

নীপা এবার ঝাঁঝিয়ে উঠল, 'তুমি নিজে রোজগার করতে চাও কিনা তা সূর্য আঙ্কেলকে বলতে পারছো না? আশ্চর্য!'

রঙ্গন বললো, 'কি আশ্চর্য! রোজগার করতে কে না চায়? আমি নিশ্চয়ই তার ব্যতিক্রম নই। বেশী টাকা পকেটে এলে বেশী আরাম পাওয়া যায় যখন—তখন আমি টাকা রোজগার করতে চাইব না?'

'সাবাস! এবার তোমার সঙ্গে কথা হতে পারে। আমি শুনেছি তুমি ট্যাক্স কনসালটেণ্ট অফিসে আছ এবং তোমার কাজ হচ্ছে অনেক মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ করা। তাই কি?' সূর্য আঙ্কল বাঁ পকেট থেকে একটা হাতির দাঁতের কাজ করা বাক্স বের করে সেখান থেকে চুরুট বেছে নিলেন। তারপর বন্ধ করতে গিয়ে বাক্সটা এগিয়ে ধরলেন রঙ্গনের সামনে। রঙ্গন হেসে ঘাড় নাড়ল, সে খাবে না।

অদ্ভুত একটা মিষ্টি গন্ধ বের হলো চুরুট থেকে। নীপার মা নাক টেনে বললেন, 'আঃ ফাইন!'

সূর্য আঙ্কল বললেন, 'আজই আনিয়েছি। হ্যাঁ, বলো?'

প্রশ্নটা রঙ্গনকে। রঙ্গন মাথা নাড়ল, 'হ্যাঁ।'

বিশাল হাতের মুঠো খুললেন, সূর্য আঙ্কল, 'ব্যাস। তুমি পারবে। শুধু একটু উদ্যোগী হতে হবে, তাহলেই পৃথিবীটা তোমার পকেটে চলে আসবে। আমি বুঝতে পারি না বাঙালী ছেলেরা কেন পড়ে পড়ে মার খাচ্ছে। অথচ জার্মানীতে অন্য চেহারা।'

এই সময় চা এবং খাবার এল। রঙ্গন দেখল ভদ্রলোকের পছন্দ আছে। এইসব খাবার ইংরেজী ছবিতেই সে দেখেছে। এখানেও যে পাওয়া যায় তা

জানা ছিল না। এই খাবার সূর্য আঙ্কলের পোশাকের সঙ্গে চমৎকার মানায়। ব্রাউন রঙের কর্ডের জ্যাকেট পরেছেন সূর্য আঙ্কল। ওটা যে বিদেশে তৈরী, বুঝতে অসুবিধে হচ্ছে না। হাতের ঘড়িটায় নানান রকম কাজ। এই ভদ্রলোক যদি বাংলায় কথা না বলতেন তাহলে বিদেশী বলে স্বচ্ছন্দে চালানো যেত। মাথা কামানো বলে এমন একটা স্মার্টনেস এসেছে যা বাঙালীর নেই। নীপার মা খাবার পরিবেশন করছিলেন, সূর্য আঙ্কল বললেন, 'নো, আমি ক্রিম খাবো না। শুধু চা।'

নীপার মা যেন আঁতকে উঠলেন, 'সেকি! এত খাবার বললে কার জন্যে? প্লিজ, না বলো না।'

সূর্য আঙ্কল বললেন, 'তোমাদের সঙ্গে বিদেশিনীদের পার্থক্য এখানেই। ওরা কখনও জোর করে না।'

নীপার মা কপট গলায় বললেন, 'কখনো না?'

'না।'

'অসম্ভব। তাহলে বিয়েগুলো হচ্ছে কি করে?'

'কারণ তারা দুজনেই চাইছে বলে। ছেলেটি এড়াতে চাইলে কোনো মেয়ে জোর করে তাকে ধরে রাখবে না, এটা তার অপমান।'

সূর্য আঙ্কলকে ভালো লাগছিল রঙ্গনের। বেশ স্পষ্ট কথা বলেন। দীর্ঘকাল বিদেশে থেকে ওঁর দৃষ্টিভঙ্গী আলাদা। খাওয়া দাওয়া হয়ে গেলে সূর্য আঙ্কল বললেন, 'নাউ রঙ্গন, তুমি কি এখন ব্যস্ত? তাহলে আমরা কাজের কথা বলতে পারি।'

রঙ্গন কিছু বলার আগেই ডান পায়ে প্রচণ্ড চাপ অনুভব করল। কোনো দিকে না তাকিয়েও রঙ্গন বুঝতে পারল এটা কার সংকেত। সে দ্রুত মাথা নাড়ল, ঠিক আছে। সঙ্গে সঙ্গে নীপার দিকে তাকাতে একটা তৃপ্ত মুখ দেখতে পেল। হাত নেড়ে বেয়ারাকে ডাকলেন সূর্য আঙ্কল, 'বিল!'

হঠাৎ বাঁ পায়ে চাপ লাগতে রঙ্গন অবাক হয়ে শাশুড়ির দিকে তাকাল। নীপার মা চোখ ইঙ্গিত করছেন কিছু! প্রথমে ধরতে পারে নি রঙ্গন। সেটা বুঝতে পেরে মহিলা একটু ঝুঁকে এলেন। রঙ্গন বাধ্য হলো কান এগিয়ে দিতে, চাপা স্বরে নির্দেশ শুনলো: 'তোমার কি ভদ্রতা বোধও নেই। সূর্য আমাদের গেস্ট, বিলটা পে করো!'

সূর্য আঙ্কল বললেন, 'কি হল?'

নীপার মা চকিতে সোজা হয়ে বললেন, 'রঙ্গনকে বলছিলাম আর তোমার চিন্তা নেই, এবার ফ্ল্যাট দেখো।'

কিন্তু ততক্ষণে পাথর হয়ে গিয়েছে রঙ্গন। শাশুড়ি ঠাকরুন কি কথা শোনালেন? তার পকেটে পাঁচটা টাকাও নেই অথচ বিল হবে কতো কে জানে? সে মেটাবে কি করে? এই দামী রেস্টুরেন্টে এত ভালো খাবার নিশ্চয়ই পাঁচ টাকার মধ্যে পাওয়া যাবে না। মেরুদণ্ডে কনকনানি শুরু হয়ে গেল তার। ওই না-দেখা বিলটাকে তার মিসেস গুপ্তার কুকুর সুইটির মতো মনে হলো।

তার গলার টঁুটি ছিঁড়বার জন্যে যেন ওৎ পেতে রয়েছে।

শাশুড়ি ঠাকুরুন এখন এক দৃষ্টিতে চেয়ে তার প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করছেন। সে যদি ওর অবাধ্য হয় তাহলে কয়েকদিন ধরে মুণ্ডুপাত চলবে। রঙ্গন ঘাড় ঘুরিয়ে ক্যাস কাউণ্টারটার দিকে তাকাল। বিল আসার আগে ওখানে গিয়ে অনুরোধ করলে কেমন হয়। পরে এসে দিয়ে যাবে সে। কিন্তু ওরা কী রাজী হবে? আর তখনই বেয়ারা ট্রে নিয়ে ফিরে এল। টেবিলে সেটা রাখতেই রঙ্গনের পেটে মোচড় দিয়ে উঠল, নিরানব্বুই টাকা বাষট্টি পয়সা। সে দেখল সূর্য আঙ্কল পার্স খুলে একটা একশ টাকার নোট অবহেলায় ট্রেতে ফেলে দিলেন। মুখ ফেরাতে শাশুড়ির জ্বলন্ত দৃষ্টি তাকে পুড়িয়ে দিল। অত্যন্ত সাহসে রঙ্গন সরু গলায় চেঁচিয়ে উঠলো, 'কি আশ্চর্য, আপনি দিচ্ছেন কেন? এ ভারী অন্যায়।' কথাগুলো বলার সময় তার একটা হাত হিপ পকেটের ওপর চলে গেল। সূর্য আঙ্কল বেয়ারাকে চলে যেতে ইঙ্গিত করে উঠে দাঁড়ালেন, 'চল। আমরা হোটেলে যাই।'

রঙ্গনের মনে হচ্ছিল ওর শরীরের প্রতিটি কোষ যেন কবর থেকে ফিরে এল প্রাণ পেয়ে। সে নীপার মায়ের দিকে তাকিয়ে ক্যাবলার মতো হাসল, 'কোনো মানে হয়।' নীপার মায়ের মুখ এখন গম্ভীর। কিন্তু রঙ্গন লক্ষ্য করেছিল সূর্য আঙ্কল ব্যালেন্সটা ফেরত নিলেন না। বেয়ারাটা যা পেল রঙ্গনের পকেটে তাও নেই।

সূর্য আঙ্কল আর নীপার মা এগিয়ে যাচ্ছিলেন। নীপা চট করে সরে এল রঙ্গনের কাছে, 'এই শোন, সূর্য আঙ্কল যা বলছেন তাই শুনবে। আমি আর পারছি না, এই কথাটা মনে রেখো।'

বাধ্য ছেলের মতো মাথা নাড়ল রঙ্গন, 'ঠিক আছে।'

'আমি তোমার সঙ্গে যাব না। ওটা খারাপ দেখায়। আমাকে একটা ট্যাকসি ডেকে দাও বরং। আর কি হলো ফোনে জানিও।' নীপার গলার স্বর মোলায়েম। ফুটপাত ধরে কিছুটা এগিয়ে সূর্য আঙ্কল ফিরে দাঁড়ালেন ওদের জন্যে। হঠাৎ নীপা বললো, 'এই পঞ্চাশটা টাকা দাও তো।'

'প-প পঞ্চাশ?'

'হ্যাঁ। যাওয়ার সময় একটা জিনিস কিনে নিয়ে যাব।'

গলা শুকিয়ে গেল রঙ্গনের, 'এত টাকা আমার কাছে নেই।'

'আবার মিথ্যে কথা? তোমার কি একটুও লজ্জা হয় না? একশ টাকার বিল দিতে চাইছিলে আর পঞ্চাশ টাকা নেই বলছ?' গনগনে গলার স্যাঁকা খেল রঙ্গন। আর তখনই তার চোখে একটা খালি ট্যাকসি পড়ল। হাত বাড়িয়ে সেটাকে থামিয়ে সে ডাকল, 'এসো।'

ওপাশ থেকে নীপার মা চেঁচিয়ে উঠলেন, 'ওমা, তুই কোথায় চললি? হোটেলে যাবি না?'

ততক্ষণে গটগট করে নীপা ট্যাকসিতে উঠে শব্দ করে দরজা বন্ধ করেছে। কোনো কথা না বলে ওর গাড়িটা চলে গেলে রঙ্গন এগিয়ে এল। নীপার মা

খুব অবাক গলায় জিজ্ঞাসা করলেন, 'কি হয়েছে? খুকী ওভাবে চলে গেল কেন?'

রঙ্গন একটু ইতস্তত করে বললো, 'শরীরটা বোধহয় ঠিক নেই।'

'শরীর ঠিক নেই? কখন খারাপ হলো? কি হয়েছে?'

'মানে—আমি।' তোতলালো রঙ্গন।

'চমৎকার! শরীর খারাপ দেখেও তুমি ছেড়ে দিলে?'

'না, মানে তেমন শরীর খারাপ নয়। মেয়েদের ব্যাপার তো!' রঙ্গন চোখ কান বুজেই কথাটা বলে ফেলল।

সংগে সংগে হো হো করে হেসে উঠলেন সূর্য আঙ্কল। নীপার মা যেন একটু দমে গেছেন, কোনো রকমে, বললেন, 'ও তোমাকে বলে গেল? সত্যি, আজ-কালকার মেয়েদের আমরা বুঝতে পারি না সূর্য!'

সূর্য আঙ্কল বললেন, 'আরে বাবা, স্বামীকে বলবে না তো কাকে বলবে।'

রঙ্গনের বুক থেকে হঠাৎ একটা তৃপ্তির নিঃশ্বাস বেরিয়ে এল। নীপার ব্যাপারে তার সন্দেহটাই তাহলে ঠিক। না হলে তার মিথ্যে কথাটা শুনে ওর মা চমকে উঠতেন। নীপার শরীরে সন্তান এলে তা এতদিনে নীপার মায়ের কাছে চাপা থাকবে না। তাহলে ওই মেয়েলি শরীর খারাপের খবরটাকে এত স্বাভাবিকভাবে মেনে নিতেন না উনি। ভারমুক্ত ঘোড়ার মতো পার্ক স্ট্রীটটা পেরিয়ে এল রঙ্গন।

আজ সকাল থেকে একটার পর একটা কাণ্ড ঘটছে। পার্ক হোটেলের সাজানো ঘরে বসে রঙ্গনের মনে হলো, ভাগ্যদেবী তাকে বড়লোক না করে ছাড়বেন না। না হলে মিস্টার গুপ্তার মতো পার্টির কাছে পৌঁছানো তার কল্পনার বাইরে ছিল। মিসেস গুপ্তা একটা অদ্ভুত রহস্যের মধ্যে তাকে রেখেছেন। ওঁর কাছ থেকে কি প্রস্তাব আসবে কে জানে! বড়লোকের গিন্নী যখন তখন খালি হাতে যে ফিরতে হবে না তা বুঝতে পারছে। এদিকে আজ থেকে মিসেস চোপরার ব্যবহারও পাল্টে গেল! কল্পনা করা যায়? তারা এখন নামী হোটেলের দামী স্যুটে বসে সে বিয়ার খাচ্ছে। কপালটা যেন আচমকা খুলে গেল।

বরফ ঠাণ্ডা বিয়ারটা খেতে মন্দ লাগছে না। উল্টোদিকের সোফায় শরীর এলিয়ে বসে আছে সূর্য আঙ্কল। বিয়ার খাওয়ার জন্যে উনি গ্লাস ব্যবহার করেন না। বাঁ হাতে বোতলটা ধরে ঢক ঢক করে গলায় ঢালছেন। নীপার মা একটু ভারমুখ নিয়ে চুপচাপ বসে আছেন ডানদিকের সোফায়। ঘরে ঢুকে সূর্য আঙ্কলই বিয়ারের প্রস্তাব দিয়েছিলেন। সঙ্কোচটা এক ফুঁয়ে উড়িয়ে দিয়েছিলেন ভদ্রলোক। আর কি কি আশ্চর্য; নীপার মা হঠাৎ উদার হয়ে বললেন, 'লজ্জা করছ কেন, তুমি তো আর খাও না এমন নয়! ছেলেমেয়েরা সাবালক হলে এসব সঙ্কোচ করার কোনো মানে হয় না।'

তারপরেই দেড় গ্লাস বিয়ার পেটে গেছে রঙ্গনের। মেজাজটা এখন

চমৎকার। এবার নড়েচড়ে বসলেন সূর্য আঙ্কল, 'তুমি আমার সম্পর্কে বোধহয় কিছুই জানো না। সুতরাং প্রথমে আমার ব্যাকগ্রাউন্ডটা তোমার জানা দরকার। আমি বিদেশে আছি পঁচিশ বছর। প্রচণ্ড পরিশ্রম করে তিলে তিলে আমার ব্যবসাকে ছড়িয়ে দিয়েছি বার্লিন থেকে জুরিখ, রোম, লণ্ডন এবং ন্যুয়র্ক। ওদেশের আটটা শহরে এখন আমার ব্যবসা, মোট এক হাজার লোক আমার কাছে কাজ করে। তুমি হয়তো জানো না। টাকার কোনো অভাব নেই ওখানে। হঠাৎ কিছুদিন থেকে মনে হচ্ছিল হাজার হোক আমি বাঙালি কিন্তু দেশের জন্যে কিছুই করি নি আমি। যত চিন্তা করতে লাগলাম তত এক ধরনের অপরাধবোধ আমায় আচ্ছন্ন করল। আমার এত টাকা কিন্তু আমার দেশের জন্যে কিছুই করলাম না। কিছুদিন আগে ব্যবসার কাজে আমায় টোকিও আসতে হয়। সেখান থেকে চট করে চলে এলাম এখানে। ঘুরে ঘুরে দেখলাম প্রচুর সুযোগ আছে কাজ করার। সরকারের কাছ থেকে যে কোনো সাহায্য পাওয়া যাবে না তা টের পেলাম। অবশ্য আমার সাহায্যের দরকারও নেই। তিন-চারটে আইডিয়াও খেলে গেলে মাথায়।'

বিয়ারের বোতলটা শেষ করে হাতের উল্টোপিঠ দিয়ে মুখ মুছলেন সূর্য আঙ্কল। মুগ্ধ হয়ে শুনছিল রঙ্গন। কৃতি পুরুষ বোধহয় একেই বলা হয়। একজন বঙ্গসন্তান য়ুরোপ-আমেরিকায় সাম্রাজ্যস্থাপন করেছেন। সূর্য আঙ্কল বললেন, 'ফিরে গিয়ে এমন ব্যবস্থা করলাম যাতে বছর খানেক আমি না থাকলে ওখানকার ব্যবসার কোনো ক্ষতি না হয়। তাছাড়া ইসাবেলা আমাকে খুব সাহায্য করেছে। ও চমৎকার বোঝে ব্যবসাটা। ইসাবেলা আমার স্ত্রী।' কথাটা শেষ করে য়ুল বার্ণারের মতো নীপার মায়ের দিকে তাকিয়ে কাঁধ নাচালেন সূর্য আঙ্কল, 'তুমি আবার জেলাস হয়ো না, প্লিজ!'

এইটে অবশ্য খুব খারাপ লাগল রঙ্গনের। ওঁর স্ত্রী ভালো ব্যবসা বুঝলে নীপার মা কেন জেলাস হতে যাবেন? তারপরেই মনে হলো বিদেশীরা অবশ্য এসব ব্যাপার ঠাট্টার সঙ্গেই বলে থাকে। এবং এক্ষেত্রে সূর্য আঙ্কল বিদেশী ছাড়া আর কি!

'হ্যাঁ, এবার আমি চলে এলাম ভারতবর্ষে। আমার প্রথম উদ্দেশ্য ভারতবর্ষের সাধারণ মানুষের আর্থিক সমৃদ্ধির চেষ্টা করা। সেটা কি করে সম্ভব? এমন একটা ব্যবসা করব যাতে সাধারণ মানুষ নিশ্চিন্তে অংশগ্রহণ করতে পারবে। আমি সমস্ত কাগজপত্র রেডি করে ফেলেছি। দিন তিনেকের মধ্যে কাজ শুরু করব।' কথাগুলো বলতে বলতে মেঝে থেকে একটা দামী ব্রিফকেস তুলে কোণে রেখে ডালা খুলেছিলেন সূর্য আঙ্কল। তারপর একটা সুন্দর ছাপানো ফর্ম বের করে সেটাকে নামিয়ে রাখলেন। রঙ্গন বুঝতে পারছিল না এইসব পরিকল্পনার মধ্যে সে কি করে আসছে।

সূর্য আঙ্কল বললেন, 'আমি দেখেছি এদেশে বিদেশীরা এলে বড় বড় শহরগুলো ছাড়া কোথাও যেতে পারে না। থিস্টার হোটেলও সব জায়গায় নেই। ওরা প্রচুর ডলার পাউন্ড পকেটে নিয়ে আসে কিন্তু বদলে খুব স্বাভাবিক

ভাবেই আরাম চাইবে। ভারতবর্ষের হিমালয়ের কোলে এমন অনেক সুন্দর জায়গা রয়েছে যা পৃথিবীর অন্য কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে না। সেইরকম একটি জায়গা বেছেছি। থিস্টার হোটেল যদি খোলা যায় তাহলে বিদেশীরা প্রাকৃতিক দৃশ্যের জন্যে সেখানে হামলে পড়বে। বরফে ঘেরা ওই জায়গায় কাঞ্চনজঙ্ঘা যেন হাতের মুঠোয়। কিন্তু কোনো গাড়ির রাস্তা তৈরী হয় নি। আমি সেটাকেই কাজে লাগাবো। হেলিকপ্টারে করে ট্যুরিস্টদের নিয়ে যাব আমার হোটেলে। ওরা ওখানে সবরকম আরাম পাবে। ভারতবর্ষে এইরকম হোটেল দ্বিতীয়টি নেই। লক্ষ লক্ষ ডলার আসবে হাতে।' আর একটা বিয়ারের বোতল তুলে নিয়ে সূর্য আঙ্কল বললেন, 'কিরকম লাগছে ?'

'অদ্ভুত।'

মাথা দোলালেন সূর্য আঙ্কল। আমার টোটাল বাজেট এক কোটি তিন লক্ষ টাকা। ছয়মাসের মধ্যে হোটেল চালু হবে। পঞ্চাশ জন ট্যুরিস্টের থাকার সুন্দর ব্যবস্থা! প্রতিদিনের জন্যে হেলিকপ্টার সার্ভিস নিয়ে একশ ডলার নেব। ওদের কাছে এটা খুব সস্তা। এতে বছরের শেষে লাভ হবে দেড় কোটি টাকা। সমস্ত খরচ বাদ দিয়ে। এই প্রজেক্টের জন্যে দেড় কোটি টাকা আমি সুইস ব্যাংকে রেখেছি। সবকিছু ফাইন্যাল করার পর মনে হলো প্রতিবছর দেড় কোটি টাকা লাভ হবে তা নিয়ে আমি কি করব ? এত টাকার আর দরকার নেই আমার। যেটাতেই হাত দিই সেটা থেকেই টাকা আসে। রিয়েলি, আমি টাকা পেতে পেতে ক্লান্ত। কি হবে এই নতুন ভেঞ্চার করে। কার জন্যে রাখব ? আমার তো সন্তান নেই। বরং ওই টাকা বোঝার মতো বাড়বে। ঠিক তখনই আমার মাথায় ক্লিক করল। আমি সাধারণ মানুষকে ইনভলভ করব এই প্রজেক্টে। পঞ্চাশ লাখ টাকার শেয়ার বিক্রী করব পাবলিকের কাছে। মিনিমাম শেয়ার পাঁচ হাজার। বাকী তিপান্ন লাখ টাকা আমার ইনভেস্টমেন্ট। শতকরা আটচল্লিশ টাকা ডিভিডেণ্ট হিসেবে পাবে সবাই প্রত্যেক বছরে। আমার সুইস ব্যাংক ওই টাকার গ্যারাণ্টি দেবে। কেনা শেয়ার বিক্রী করতে হবে আমাকেই। সেটা একমাসের নোটিসেই করা যাবে। পাবলিকের কোনো-রকম রিস্ক নেই। এই প্রজেক্ট থেকে যে বিরাট প্রফিট আসছে তা এই ভাবে সাধারণ মানুষের মধ্যে বিতরণ করা যাবে।' লম্বা বক্তৃতা দিয়ে নেভা চুরুট আবার ধরালেন সূর্য আঙ্কল।

এতক্ষণ পরে নীপার মা প্রায় চেঁচিয়ে উঠলেন, 'ও ভগবান! এত লাভ তো ব্যাংকে রাখলেও হয় না। ব্যাংক দেয় এগার পার্সেণ্ট ষাট মাস টাকাটা রাখলে। তুমি দিচ্ছ আটচল্লিশ! ভাবা যায় না। দারুণ বিজনেস। কোনো ঝুঁকি নেই, খাটুনি নেই, শ্রমিক বিক্ষোভ নেই, বসে বসে আটচল্লিশ পার্সেণ্ট প্রফিট কর। আচ্ছা, আমি, যদি পঞ্চাশ হাজার টাকার শেয়ার কিনি তাহলে কত পাব বছরে ? চব্বিশ হাজার, না ? উঃ, দারুণ। কি..ু এ.. দেবে কি করে তুমি ?'

সূর্য, আঙ্কল মাথা নাড়লেন, 'পরিষ্কার হিসেব। এক কোটি নিয়োগ

করে যদি দেড়কোটি টাকা লাভ হয় তাহলে পাবলিকের পঞ্চাশ লাখে হবে পঁচাত্তর লাখ। ক্যাপিটাল পঞ্চাশ লাখ যে-কোনো মুহূর্তে ফেরত দিতে হতে পারে তাই ওটা সরিয়ে রাখব আলাদা। তাহলে পঁচিশ লাখ। আমাকে শতকরা আটচল্লিশ হারে দিতে হচ্ছে চব্বিশ লাখ। কোনো অসুবিধে নেই। বাকী এক লাখ এস্টাব্লিশমেণ্ট খরচ। কি বুঝতে অসুবিধে হচ্ছে?'

রঙ্গন বললো, 'চমৎকার। কিন্তু কোনো কারণে যদি প্রজেক্টটা ফেল করে।'

সূর্য আঙ্কল হাসলেন, 'আজ অবধি আমি কখনও ব্যর্থতার মুখ দেখি নি। আর যদি করে তাহলে আমার পাহাড় থেকে দুতিনটি পাথর গড়াবে। দেড়-কোটি টাকা সুইস ব্যাঙ্কে রেখেছি তো সেইজন্যেই।'

টেবিলে রাখা ফর্ম তুলে নিলেন তিনি. 'এই হলো শেয়ার কেনার ফর্ম। টাকা পাওয়া মাত্র আমরা সার্টিফিকেট ইস্যু করব। আমি চেয়েছিলাম শেয়ার সার্টিফিকেটে স্পষ্ট লিখে দেব যে, আমরা বছরে শতকরা আটচল্লিশ টাকা ডিভিডেণ্ড দেব। কিন্তু সরকার আপত্তি করছে। ওটা লিখলে নাকি পাবলিক ব্যাঙ্কে টাকা জমাবে না। ফলে সার্টিফিকেটে ব্যাঙ্ক রেটটাই লিখতে হচ্ছে। আমি ইতিমধ্যে লিণ্ডসে স্ট্রিটে একটা অফিস খুলেছি। বারোজন স্টাফ রেখেছি যারা এইসব টাকা পয়সার হিসেব রাখবে। শেয়ার হোল্ডাররা যদি মান্থলি ডিভিডেণ্ড চায় তাহলে প্রতি মাসের এক তারিখে তাদের কাছে টাকাটা পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা করা হবে।

রঙ্গনের খুব আফসোস হচ্ছিল। তার যদি মাত্র পঞ্চাশ হাজার টাকা থাকত তাহলে মাসে দুহাজার টাকা ডিভিডেণ্ড পাওয়া যেত। পায়ের ওপর পা তুলে কাটিয়ে যেতো জীবনটা। কিন্তু এই বিরাট রাজসূয় যজ্ঞে তার ভূমিকা কি? কাঠবিড়াল হবার যোগ্যতাও তো তার নেই।

হাসলেন সূর্য আঙ্কল। যেন রঙ্গনের মনের কথাটা বুঝতে পেরেছিলেন। বললেন, 'আমি তোমাকে দুটো প্রস্তাব দিচ্ছি। এখানে আমার খুব বিশ্বাসী কয়েকজন লোক দরকার যারা বিশ্বাসঘাতকতা করবে না। আমি তাদের সুখে রাখব। তোমাকে তাদের একজন হিসেবে বেছে নিতে পারি। তুমি যদি চাও তাহলে ওই হোটেলের ম্যানেজার হিসেবে কাজ করতে পার। বছরে একমাস ছুটি আর পাঁচ হাজার ডলার মাইনে। ঠাণ্ডায় হয়তে কষ্ট হবে, একা থাকতে হবে কিন্তু টাকাটা কম নয়। বছরে পঁয়তাল্লিশ হাজার টাকা। দ্বিতীয় প্রস্তাব হলো, আমি এখানে এইসব শেয়ার বিক্রীর দায়িত্ব দুজন এজেণ্টের ওপর দিতে চাই। প্রতিটি এজেণ্টকে পঁচিশ লাখ টাকার বিজনেস দিতে হবে। ব্যাপারটা কিছু নয়। পাবলিক জানতে পারলে নিজেরাই ছুটে আসবে শেয়ার কিনতে। যে এক লাখ টাকা এস্টাব্লিশমেণ্ট চার্জ হিসেবে রেখেছি তা এই দুজন এজেণ্টের মধ্যে ভাগ করে দেব। আর অফিসের স্টাফদের মাইনে, ঘর ভাড়া দেওয়া হবে হোটেলের গ্রস ইনকাম থেকে। তার মানে তুমি যদি আমার একজন এজেণ্ট হও তাহলে বছরে পঞ্চাশ হাজার পাবে। তুমি নীপার স্বামী, তোমাকে আমি প্রথমে সুযোগ দিতে চাই।' সূর্য আঙ্কলের কামানো মাথার বড় বড়

চোখ সার্চলাইটের মতো জ্বলছিল। রঙ্গনের শরীরে যেন এক ফোঁটা জল নেই। মধ্যাহ্নের মরুভূমিতে বয়ে যাওয়া হা হা বাতাসের মতো হয়ে গেছে বুকটা। এত টাকা? বছরে পঞ্চাশ হাজার! তার মানে মাসে চার হাজারের ওপর। মাথাটা ঘুরে উঠল রঙ্গনের। এক হাজার টাকার ফ্ল্যাট, গাড়ি, টি. ভি, ফ্রিজ— এসব কিছুই আর হাতের বাইরে থাকবে না! চোরের মতো মদ খেতে হবে না এবং নীপা তার বশ মানবে।

কোনো রকমে গলা পরিষ্কার করল রঙ্গন, 'আমাকে কি করতে হবে?'

'কোনটে পছন্দ হল?'

নীপার মা উঠে এলেন সূর্য আঙ্কলের পাশে। উত্তেজনায় ওঁর হাতের গ্লাস কাঁপছে। বোধহয় চুমুক দেওয়ার কথাও ভুলে গেছেন। বললেন, 'এজেন্ট, এজেন্ট করে নাও রঙ্গনকে। হোটেলের ম্যানেজার হতে হবে না ওকে।'

সূর্য আঙ্কল বললেন, 'কেন?'

'না বাবা, নির্জন পাহাড়ে একগাদা সাহেবমেমের সঙ্গে থাকতে হবে, কোত্থেকে কি হয়ে যায় তার ঠিক কি! পুরুষ মানুষের মতিগতির ঠিক নেই। তাছাড়া আমার মেয়ে ওখানে সারা বছর পড়ে থাকতে পারবে না।' শিশুর মতো মুখ করলেন নীপার মা।

প্রশ্রয়ের হাসি হাসলেন সূর্য আঙ্কল, 'অলরাইট। তুমি তাহলে এই প্রজেক্টের এজেন্ট হয়ে থাকতে চাইছ?'

'হ্যাঁ। কিন্তু কি করতে হবে যদি বলে দেন!'

'সে তো বলবই। কিন্তু তুমি আছ কোথায় এখন?'

ঠিকানাটা বললো রঙ্গন।

'সঙ্গে আর কেউ আছে?'

'না। আমি ফ্ল্যাট খুঁজছি।'

'বাঃ, চমৎকার। আমার লিন্ডসে স্ট্রীটের অফিসে কুলোচ্ছে না। মিশন রোডে একটা রেসিডেন্সিয়াল ফ্ল্যাট পেয়েছি। চারটে রুম, ফার্নিচার সমেত। ভাড়া চারশো কিন্তু সেলামি চাইছে দেড় লাখ। তুমি চলে এস ওখানে। বাইরের বড় ঘরটায় অফিস করা যাবে আর ভেতরের তিনটে ঘর তোমরা ব্যবহার করবে।'

নীপার মা সূর্য আঙ্কলকে প্রায় জড়িয়ে ধরলেন, 'ও সূর্য, হাউ সুইট ইউ আর। আমার নীপার ভাগ্য তোমার জন্যে খুলে গেল।'

রঙ্গন বাধা দেবার চেষ্টা করলো, 'অত টাকা সেলামি।'

'সেটা তোমাকে চিন্তা করতে হবে না। মনে রেখ পৃথিবীতে টাকার দাম সুযোগ সুবিধে এবং সময়ের দামের চেয়ে কখনও বেশী নয়।' সূর্য আঙ্কল হাসলেন, 'দুশো টাকায় দিল্লী ট্রেনে ঘুরে আসবে এবং তার জন্যে তিনদিন ব্যয় হবে। দু হাজার টাকায় প্লেনে একদিনে সে কাজ সেরে এলে তুমি দুদিন এগিয়ে থাকলে, এখন সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিতে হবে। আমার কোম্পানি ওই ফ্ল্যাটের দায়িত্ব নিচ্ছে। তোমার কোনো চিন্তা নেই।'

ওই দিনটির কথা সারাজীবন মনে রাখবে রঙ্গন। রাত্রে নিজের বিছানায় শোয়ার সময় মনে হচ্ছিল প্রত্যেক মানুষের জীবনে বোধহয় এরকম দিন একবার আসেই। যে সুযোগ কাজে লাগাতে পারল সে সিঁড়ি বেয়ে উঠে গেল, যে পারল না সে ওই দাসবাবুর মতো ঠুক ঠুক করে অন্যের লেখা টাইপ করে গেল সারাজীবন।

সূর্য আঙ্কল সারাটা সন্ধ্যে তাকে পাখীপড়া করে বুঝিয়ে দিয়েছেন। ভেবে দেখেছে রঙ্গন। এই সার্টিফিকেট প্রত্যেক শেয়ার হোল্ডারকে নিশ্চিত রাখবে। কোন রকম ঝুঁকি নেই। যার কাছে সে প্রস্তাব করবে সে-ই এক কথায় রাজী হয়ে যাবে। চোপরার কাছে কাজ করে একটা সুবিধে হয়েছে যে অনেক টাকাওয়ালা লোকের সান্নিধ্য পেয়েছে। সূর্য আঙ্কল এও বলেছেন, শেয়ার হোল্ডাররা নিশ্চিন্ত থাকবে যে তাদের নিয়োগ করা টাকার কথা কেউ জানতে পারবে না। সেক্ষেত্রে দু'নম্বর টাকার মালিকরা বেশী উৎসাহিত হবে। এটা অবশ্য পছন্দ করছেন না সূর্য আঙ্কল, তিনি চান সাধারণ মধ্যবিত্ত মানুষ বেশী এগিয়ে আসুক। মনে মনে একটা লিস্ট তৈরী করছিল রঙ্গন যাদের কাছে সে প্রস্তাব করবে। পঁচিশ লাখ তোলা এমন কিছু ব্যাপারই নয়। আর এই কাজ করেও সে চোপরাদের চাকরিটা চালিয়ে যেতে পারে। তাহলে মাসে পাঁচ হাজার টাকা রোজগার হয়ে যাবে। উত্তেজনায় ঘুম আসছিল না রঙ্গনের। আর ঠিক তখনই টেলিফোনটা বেজে উঠল। হাত বাড়িয়ে রিসিভারটা কানের কাছে নিয়ে আসতেই নীপা কথা বললো, 'মায়ের মুখে সব শুনলাম।' একটুও জ্বালা কিংবা ক্রোধ নেই গলায়। এ যেন অন্য নীপা।

'হ্যাঁ। আমি তোমাকে দু'বার ফোন করেছিলাম, লাইন পাই নি।'

'কি জানি! আমি ভাবলাম হয়তো ভুলে গেলে।'

'যাঃ। এই নীপা, তুমি খুশী?'

'খু-উ-ব। এ্যাদ্দিনে তোমাকে ঠিক মানাবে। আমি কিন্তু আর একটা দিনও এখানে থাকতে পারবো না। ফ্ল্যাটের পোজিশন তুমি কবে নিচ্ছ?'

'কবে নেব বল?'

'কাল। আমি সূর্য আঙ্কলকে হোটেলে ফোন করছি।'

'বেশ। আমি আর ভাবতে পারছি না। কাল রাত থেকে শুধু তুমি আর আমি, ওঃ।' রঙ্গন আন্তরিক গলায় কথাগুলো বললো।

'যাও। এ্যাদ্দিন ঝুলিয়ে রেখে এখন আদিখ্যেতা হচ্ছে। ঠিক আছে, এখন রাখছি, কাল সকালে টেলিফোনে এ্যাপয়েণ্টমেণ্ট করে নেব। বাই।'

রঙ্গনের কানে যেন মধু বর্ষণ করল নীপা। এখন আর কোনো দ্বিধা নেই, নীপা যে স্রেফ ভয় দেখিয়ে বিয়েটা সেরে নিয়েছে তা মনে রাখার কোনো মানে হয় না। চিত হয়ে শুতে না শুতেই টেলিফোন বাজল।

'কে সেইন? কি ব্যাপার? এতক্ষণ বাড়িতে ছিলে না নাকি? শোন, আমি ওই কেস নেব। ইয়েস! মোটামুটি কথাবার্তা হয়ে গেছে। তুমি কালই ক্লায়েণ্টকে আসতে বলো। ঘোষ সাহেব রিটায়ার করছে সামনের মাসে। তার

আগেই ব্যাপারটা চুকিয়ে ফেল। ডোণ্ট ওরি গুড বয়, তুমি তোমার টাকা ঠিকই পাবে। তবে ওটা তাড়াতাড়ি হলেই ভালো, তাই না? তা কাল কখন আসছ?'

চোপরা সাহেবের নিঃশ্বাস নেবার সময় হলে রঙ্গন গম্ভীর গলায়, বলল, 'আপনাকে আমি কাল জানাবো। গুড নাইট।'

চোপরা সাহেব বোধহয় স্বপ্নেও কল্পনা করেন নি রঙ্গন তার সঙ্গে এভাবে কথা বলবে। দিন তো বদল হয়, রঙ্গন মনে মনে বললো, ওঁর বোঝা উচিত কম কথায় বেশী কাজ হয়। এই সময় রঙ্গনের খেয়াল হলো মিঃ গুপ্তাকে জানানো দরকার চোপরা তাঁর শর্তে কাজ করতে রাজী হয়েছে। মিঃ গুপ্তা তাঁর বাড়িতে টেলিফোন করতে বলেছিলেন। কিন্তু এখন এসবের আর কি দরকার আছে? পঞ্চাশ হাজার। না, মাথা নাড়ল রঙ্গন। টাকাকে কখনও অবজ্ঞা করতে নেই। চাকরিটা রেখে দিলে মাসিক আয় দাঁড়াবে পাঁচ হাজারেরও বেশী। অংকটা মনে হওয়ামাত্র এই ঘরটাকে খুব ছোট লাগল রঙ্গনের। নীপার পক্ষে সত্যি খুব কষ্টকর হতো এখানে থাকতে।

বিছানায় উঠে বসলো রঙ্গন। খুব রাত হয়েছে কি? এখন মিঃ গুপ্তাকে টেলিফোন করা শোভন হবে? অত বড় ধনী মানুষের মন মেজাজ কখন কি রকম থাকে কে জানে! যদি তাঁর টেলিফোন ঘুম ভাঙায় তাহলে রেগে গিয়ে নাকচই হয়তো করে দেবেন। খানিকক্ষণ ইতস্ততঃ করলো রঙ্গন। তারপর মনে হলো, টেলিফোন তো চাকর বাকররাও করতে পারে। যদি তেমন বোঝে পরিচয় না দিয়ে লাইন কেটে দেবে।

ডায়াল ঘোরাল সে। প্রথমেই এনগেজড-শব্দ। তিনবারের বার রিং শুরু হলো। দুবার-তিনবার-চারবার এবং তারপরেই রিসিভার উঠল ওপাশে, 'হেলো!'

শব্দটা কানে আসতেই শরীর অবশ হয়ে গেল রঙ্গনের। অত্যন্ত কড়া মাদকদ্রব্যে যেন অক্ষরগুলো চুবিয়ে ছুঁড়ে দেওয়া হলো শব্দের আকারে তার কানে। রঙ্গন প্রাণপণে গলার স্বর সহজ করার চেষ্টা করলো, 'হ্যালো! মিঃ গুপ্তা বাড়িতে আছেন?'

'কার সঙ্গে কথা বলছি?' জানতে হয় তাই যেন জানতে চাওয়া।

'আমি রঙ্গন, রঙ্গন সেন। আজ সকালে!'

'ওহো, হেয়ার ইউ আর।' চাপা হাসি যেন চলকে এল, 'তোমার বাড়িতে আর কেউ নেই যে রিসিভার ওঠায়?'

'না। আমি একাই থাকি।'

'ইজ ইট? আর ইউ নট ম্যারেড?'

ঢোঁক গিলল রঙ্গন। এ প্রশ্ন কেন? মহিলা তাকে ফোন করেছিলেন। কিন্তু কেন? ওই ধনী মহিলার কি প্রয়োজন তার মতন সামান্য মানুষকে ফোন করবেন! তখন টেলিফোন নাম্বার উনি খুব নাটকীয়ভাবে নিয়েছিলেন। সারাদিন এই ব্যাপারটা মাথায় ঢোকে নি। এখন মনে হচ্ছে মহিলা যে রকম ভঙ্গিতে উঠে গিয়েছিলেন তাতে টেলিফোন নাম্বারটা নেওয়ার কথা উনি মিঃ

গুপ্তাকে জানাতে চান নি। এই লুকোচুরি কেন ?

'হেলো ?'

রঞ্জন একটু ইতস্ততঃ করে বললো, 'নো। বিয়ে করি নি।'

'আই সি!' একটা শিষ বাজল যেন শেষ শব্দটির রেশে।

এই রকম একটা মিথ্যে কেন জিভ থেকে বের হলো এই মুহূর্তে রঞ্জন নিজেই বুঝতে পারছিল না। নীপার মুখ চোখের সামনে আসতেই ও আরো সংকুচিত হলো। কিন্তু সে বুঝতে পারছিল বিয়ে করে নি শুনে মহিলা খুশী হয়েছেন। নিজেকে বোঝাল রঞ্জন, এই ছোট্ট মিথ্যেটা তার জীবনে কোনো পরিবর্তন আনবে না। অতএব এটা যে সে বলেছে তা ভুলে যাওয়াই ভালো।

রঞ্জন বললো, 'মিঃ গুপ্তা আছেন ?'

'নো! কিন্তু তিনি বলে গেছেন যদি তুমি টেলিফোনে সম্মতি দাও তাহলে আগামীকাল সকাল সাতটায় এখানে তিনি অপেক্ষা করবেন।'

হাঁপ ছেড়ে বাঁচল রঞ্জন, 'ধন্যবাদ। আমি সকালে ঠিক সময়ে আপনাদের বাড়িতে পৌঁছাবো। ঠিক আছে ?'

'না ঠিক নেই। মিঃ গুপ্তা বলছিলেন, তুমি নাকি মাত্র এক হাজার টাকা মাইনে পাও, মাত্র এক হাজার ?'

'হ্যাঁ।' নীপা লক্ষবার বললেও যা হয় নি এই মুহূর্তে রঞ্জন যেন কেঁচো হয়ে গেল। 'সত্যি, টাকাটা এত সামান্য !

'স্ট্রেঞ্জ! আমার তো ওর চেয়ে বেশী কসমেটিকসে খরচ হয়। গুপ্তা তোমাকে কত দেবে বলেছে ?'

'বারো হাজার।'

'গুড। কিন্তু আমি তোমাকে আরও বেশী দিতে পারি।'

'আপনি ?'

'হ্যাঁ। বাট ইউ স্যাড ওবে মি! আমার তোমাকে প্রয়োজন তাই তোমাকে টাকা দিতে আমার কোনো আপত্তি নেই! স্পেশালি তোমার মতো একজন হ্যাণ্ডসাম ব্যাচেলারকে।' হাসির ঢেউ যেন এক জায়গাতেই পাক খেল।

হতভম্ব হয়ে গেল রঞ্জন। ওর মাথা ঝিমঝিমিয়ে উঠল।

'কি, কথা বলছ না কেন ?'

'আমি, আমি ঠিক বুঝতে পারছি না।'

'এটা না বোঝার কিছু নেই। তুমি কি টাকা চাও না ?'

'হ্যাঁ, চাই, চাই।'

'দেন, কাল সকাল সাতটায় এখানে এসো না।'

'আসব না ?' আঁতকে উঠল রঞ্জন। অতবড় ক্লায়েণ্ট যেতে বলেছেন আর সে যাবে না ? মাথা খারাপ নাকি !

'হ্যাঁ। তুমি কাল সকালে অত্যন্ত ব্যস্ত। বেলা এগারটার আগে কিছুতেই ফ্রি হতে পারছো না। আগে থেকে জানলে তুমি নিশ্চয়ই এই সময়টা খালি রাখতে। অতএব তুমি ঠিক এগারটায় আমাদের এখানে আসছ। ওকে ?'

'আমি কিছুই বুঝতে পারছি না !'

'বোঝার তো কোনো দরকার নেই। আমি যা বলছি তুমি তাই করবে। ঠিক এগারটার সময় এখানে আসবে। সকালে যদি কোনো টেলিফোন তোমার ওখানে আসে তুমি ধরবে না। মিঃ গুপ্তা দুপুর বারোটা পর্যন্ত প্রচণ্ড ব্যস্ত থাকবেন কাল। অতএব তার সঙ্গে দেখা করতে হলে তোমাকে এক ঘণ্টা অপেক্ষা করতেই হবে। ওই এক ঘণ্টা আমার খুব দরকার। ক্লিয়ার ?'

একটু একটু করে বোধগম্য হলো রঙ্গনের। মহিলা তার সঙ্গে আলাদা কথা বলতে চান। সে হাসল, 'মিঃ গুপ্তা কি এটা পছন্দ করবেন ?'

'কোন্‌টা ?'

'আপনার পরিকল্পনার কথা বলছি।'

'এটা আমার পরিকল্পনা নয়, তোমার সমস্যার সমাধান। আমি অবাধ্যতা পছন্দ করি না মনে রেখ, আমার সঙ্গে সুস্থ সম্পর্ক রাখলে লাভ হবে তোমার। আমাকে বিপদে ফেলার চেষ্টা করলে—।'

'আপনি আমাকে ভুল বলছেন।' তাড়াতাড়ি বলে উঠল রঙ্গন। যে কোনো রকম শাসানি তার খুব খারাপ লাগে।

'গুড। কি বলছিলে যেন, ও এটা পছন্দ করবে কিনা ? জেনে রেখ, যে-কোনো পুরুষই স্ত্রীর সব জিনিস পছন্দ করে যতক্ষণ সেই স্ত্রী তার সেবাদাসী হয়ে থাকে। তুমি কি সত্যিই বিবাহিত নও ?' হঠাৎ গলার স্বর পাল্টে গেল মিসেস গুপ্তার।

হ্যাঁ শব্দটা মরীয়া হয়ে উচ্চারণ করতে গিয়েও রঙ্গন দেখল যে 'না' বলে ফেলেছে। আর তৎক্ষণাৎ লাইনটা কট করে কেটে গেল।

সওয়া দশটায় এসপ্লানেড থেকে রঙ্গন টেলিফোন করল। নীপা যে উদগ্রীব হয়েছিল তা ওর গলায় বোঝা গেল, 'কি ব্যাপার, আটটা থেকে তোমায় ফোন করে যাচ্ছি শুধু এনগেজড্ আর এন্‌গেজড্। কোত্থেকে কথা বলছো ?'

'এসপ্লানেড। আমার টেলিফোনটা আজই গেছে।' মিথ্যে কথাটা খুব সহজে বলে ফেলল। গতরাত থেকে যে রিসিভারটা নামিয়ে রেখেছিল এটা বলা যায় না।

'শোন, সূর্য আঙ্কলের সঙ্গে আমার কথা হয়ে গেছে। উনি আজ বিকেলের ফ্লাইটে দিল্লী যাচ্ছেন। তবে তার আগে আমাদের ফ্ল্যাটটা খুলে দিয়ে যাবেন। তুমি আমাদের এখানে চলে এসো।'

'তোমাদের ওখানে ?'

'হ্যাঁ। আর তো কোনো প্রবলেম নেই।'

'কিন্তু আমার যে একটা এ্যাপয়েণ্টমেণ্ট আছে।'

'উঃ, কাজ দেখিও না তো আমাকে !'

'না, না। এটা ওই প্রজেক্টের ব্যাপারেই।' আর একটা মিথ্যে এসে গেল জিভে। সঙ্গে সঙ্গে নরম হলো নীপা, 'সত্যি ? এত তাড়াতাড়ি কাজ আরম্ভ

করেছ তুমি ! সূর্য আঙ্কল শুনলে খুব খুশী হবেন। তাহলে একটা নাগাদ পার্ক হোটেলে চলে এসো। আমি থাকব।'

ট্যাকসি নিয়ে আলিপুরে চলে এলো রঙ্গন। বাড়িতে যা ছিল তা কুড়িয়ে বাড়িয়ে এখন পালাল। আর কটা দিন তার পরেই পৃথিবী পকেটে চলে আসবে। রঙ্গন যখন মিস্টার গুপ্তার বাড়িতে উপস্থিত হলো তখন কাঁটায় কাঁটায় এগারোটা। আজ দরোয়ান ওকে দেখামাত্র সেলাম করে গেট খুলে দিল। বন্দুক হাতে লোকটার মুখে কোনো ভাবান্তর নেই। রঙ্গন কিছু বলার আগে দরোয়ান বললে, 'মেমসাব আছেন।'

সাদা সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠতেই পুতুলের মতো দাঁড়িয়ে পড়ল সে। সেই কনকনে ঠাণ্ডাটা মেরুদণ্ডে, সুইটি গুঁড়ি মেরে এগোচ্ছে, দুটো লাল চোখ স্থির তার দিকে। আর তখনই ডাকটা ভেসে এলো, 'সুইটি।' সঙ্গে সঙ্গে কুকুরটা পাল্টে গেল। বিশাল শরীরটা শিথিল হয়ে মুখ ফেরালো। যেন ভঙ্গিটা এই রকম, যাও এ-যাত্রায় ছেড়ে দিলাম।

'হেলো !'

রঙ্গন দেখল মিসেস গুপ্তা সামনে দাঁড়িয়ে হালকা লাল সিল্কের ঘাঘরা কোমর থেকে চাপা হয়ে নিচে লুটোচ্ছে। হাত-খোলা সাদা গেঞ্জি ওপরের স্বাস্থ্যকে কোনোমতে আটকে রেখেছে। ঠোঁটে যে হাসি তার অর্থ বোধহয় স্বয়ং ঈশ্বরও জানেন না। 'স্বাগতম।' তারপর ঘুরে হনহন করে চলে গেলেন করিডোর পেরিয়ে অপরপ্রান্তে। যাওয়ার আগে মুখের যে ইঙ্গিত তাতে রঙ্গন বুঝতে পারলো ওঁকে অনুসরণ করতে হবে।

এই ঘর শীততাপ নিয়ন্ত্রিত। দেওয়ালে সুন্দর কাজ, পায়ের তলায় দামী কার্পেট, লুকোনো কোণ থেকে বিচ্ছুরিত হচ্ছে আলো। হালকা, নীলাভ। মিসেস গুপ্তা একটি আরাম কেদারায় আলতো ভঙ্গিতে শরীর এলিয়ে দিয়ে রঙ্গনকে ইঙ্গিত করলেন বসতে। রঙ্গন দেখলো ঘরে আর যে চারটি বসার জায়গা রয়েছে তাদের পায়া খুব নীচু, আরামদায়ক কিন্তু হাঁটু প্রায় ভাঁজ হয়ে আসে। রঙ্গন বসল। এবং তখনই তার মনে হলো মহিলার আসন বেশ উঁচু হওয়ায় নিজেকে অনুগত প্রজার মতো মনে হচ্ছে। সে মুখ তুলে ওপরের দিকে তাকাতেই হৃদপিণ্ডের শব্দ শুনতে পেল। নিঃশ্বাস স্বাভাবিক করতে প্রাণপণে চেষ্টা করলো কিন্তু দুই চোখ এমনভাবে শত্রুতা করছে যে সে হার মানছিল।

মিসেস গুপ্তা বসেছেন একটু পাশ ফিরিয়ে, এক পায়ের ওপর আর এক পায়ের ওজন রেখে। কিন্তু সেটা করতে গিয়ে নিটোল হাঁটুর ওপর দু'ইঞ্চটাক সিল্ক চামড়ায় ওই নীলাভ আলো ঠিকরে পড়ছে যেহেতু তাঁর ঘাঘরার একটা পাশ অনেকখানি দক্ষতার সঙ্গে কাটা। রঙ্গনের মনে হচ্ছিল সে অনন্তকাল এই অরূপাকে দেখে যেতে পারে। যেহেতু তার আসন নীচু তা দেখার আরামটাও বেশী।

'ওয়েল ! লুক এ্যাট মাই ফেস। উঁ।'

শেষ শব্দটিতে সোজা হয়ে বসার চেষ্টা করলো রঙ্গন। তারপর মিসেস

গুপ্তার মুখের দিকে তাকাল। অন্তত ছয়ফুট তফাতেও ওই মুখে অদ্ভুত নিস্পৃহতা লুকিয়ে রাখেন নি।

'ইয়েস। তোমরা তাহলে গুপ্তার কাজ করতে রাজী হয়েছ?'

'হ্যাঁ।'

'এটা বেআইনী নয়।'

'আমরা আইনসম্মত করে দেবো।'

'তার মানে তোমরা ব্ল্যাককে হোয়াইট করতে সাহায্য কর?'

'আমরা ক্লায়েন্টদের উপকার করে থাকি।'

কথাটা যেন ভালো লাগল এমন ভঙ্গিতে মাথা নাড়লেন মিসেস গুপ্তা। তারপর বসার ভঙ্গি পরিবর্তন করলেন। ওই সেকেন্ডের সামান্যতম ভগ্নাংশে রঙ্গনের মনে হলো তার দম বন্ধ হয়ে যাবে। দুই ইঞ্চি চার ইঞ্চি হয়েই যথাস্থানে ফিরে এল।

'ওয়েল, আমার কাছে দশ লাখ ক্যাশ আছে, তুমি এটাকে আইনসম্মত করে দিতে পারবে?'

'দশ লাখ ক্যাশ?' নার্ভাস-গলায় বললো রঙ্গন।

'ইটস নাথিং। গুপ্তার কাছে কিছুই না। কিন্তু আমি টাকাটাকে আলাদা রাখতে চাই।' দুটো ঠোঁট ছুঁচলো করলেন মহিলা।

'মিস্টার গুপ্তা জানেন?'

বিরক্তির ছাপ পড়লো মুখে, 'এর সঙ্গে ওঁর কোনো সম্পর্ক নেই। আমি এইমাত্র বললাম টাকাটা আলাদা রাখতে চাই।'

এক মুহূর্ত ভাবল রঙ্গন, 'আপনার ট্যাক্স-ফাইল আছে?'

'নিশ্চয়ই। গুপ্তা এব্যাপারে খুব সতর্ক।'

'তাহলে যে-কোনো হেডে ইনকাম বাড়িয়ে—'

'তুমি স্মার্ট বলেই এতক্ষণ ধারণা হচ্ছিল! আমার ট্যাক্স-ফাইল গুপ্তাই ডিল্ করে। টাকাটার কথা ওঁকে জানাতে চাইছি না।'

'ও।' এইবার মিইয়ে গেল রঙ্গন। ট্যাক্স-ফাইলে প্রতিফলিত হবে না। অথচ ব্ল্যাককে হোয়াইট করতে হবে, এই কায়দা স্বয়ং চোপরাও জানে না।

'আমি ব্যাপারটা ভেবে দেখব।' রঙ্গন তল পাচ্ছিল না।

'হোক বা না হোক এটা যেন পৃথিবীর কেউ জানে না।' মিসেস গুপ্তা ঝুঁকে বসলেন, 'আমি তোমাকে বিশ্বাস করতে পারি।'

রঙ্গনের চোখ জুড়ে এখন জোড়া সোনার তাল একবৃন্তে কোনোমতে আটকে। গেঞ্জিটারই যেন প্রচন্ড কষ্ট হচ্ছে। সে নিঃসাড়ে মাথা নাড়ল। সোজা হয়ে বসলেন মিসেস গুপ্তা, 'গুড বয়। আসলে কি জানো বাড়িতে টাকা রাখা খুব অস্বস্তিকর। গুপ্তা ভয় পায় যে-কোনো দিন সরকার রেড করতে পারে। তাছাড়া টাকাগুলো ব্যাংকেও রাখতে পারছি না, দিনের পর দিন যে টাকা এক পয়সাও বাড়ছে না। যে টাকা বাড়ে না সেটা বড় বোঝা।'

আর তখনই মাথার ভেতর বিদ্যুৎ চমকে উঠলো। উত্তেজনায় সে উঠে

দাঁড়ালো। দারুণ আইডিয়া। এক ঢিলে দুই পাখি। রঞ্জনের মুখের চেহারা এবং ভঙ্গিতে প্রচণ্ড অবাক হয়ে গিয়েছিলেন মিসেস গুপ্তা। বিস্ময় ওঁর কণ্ঠে স্পষ্ট, 'তুমি কি কিছু বলবে ?'

'হ্যাঁ। আমার মাথায় দারুণ আইডিয়া এসেছে। আপনি একটা বিরাট প্রজেক্টের শেয়ার কিনতে পারেন ওই টাকায়। কোম্পানি আপনাকে ফর্‌টিএইট পার্সেণ্ট ডিভিডেণ্ড দেবে প্রতি বছরে। আপনার টাকা দু'বছরেই ফেরত আসবে ডাবল হয়ে। কিন্তু কোম্পানি কখনই আপনার নাম কাউকে জানাবে না।'

'ফরটি এইট পার্সেণ্ট ?'

'হ্যাঁ। টাকাটা যে মার যাবে না তার জন্য ব্যাংক গ্যারাণ্টি থাকবে। ও ব্যাপারে আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।'

'কিন্তু তাতে টাকাটা হোয়াইট হবে কি করে ?'

'খুব সোজা। যখনই আপনার টাকাটা ডাবল হয়ে গেল তখনই আপনি পুরো টাকাটা ডিসক্লোজ করতে পারেন। বিশ লাখ টাকায় ট্যাক্স পেনাল্টি দিয়েও লাখ পাঁচেক হোয়াইট হয়ে যাবে। তাছাড়া আরও অনেক রাস্তা আছে। আমি মিস্টার চোপরার সঙ্গে কথা বলে আপনাকে জানাতে পারি।' রঞ্জন উত্তেজিত।

'প্রোজেক্টটা কি ?' মিসেস গুপ্তা সরু চোখে তাকালেন।

রঞ্জন ওঁকে যেটুকু জেনেছে বুঝিয়ে দিয়ে বললো' 'এই কোম্পানির হয়ে সুইস ব্যাংক শেয়ার হোল্ডারদের গ্যারাণ্টি দিচ্ছে।'

'সুইস-ব্যাংক ? কেন ?'

'কোম্পানির ওখানে এ্যাকাউণ্ট আছে।'

'সুইস ব্যাংক।' মিসেস গুপ্তার চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠলো এবার, 'আমি এসব কথা বিশ্বাস করব কি করে, তুমি এতো কথা জানলে কোত্থেকে ?' এইবার হাসল রঞ্জন। এই প্রথম মহিলার সামনে সে যেন আত্মপ্রত্যয় খুঁজে পেল, 'এই কোম্পানিতে আমি আজ থেকে জয়েন করছি এজেণ্ট হিসেবে। কোম্পানির চেয়ারম্যান এখন কলকাতায়। আপনি যদি ইণ্টারেস্টেড হন তাহলে জানাবেন। কারণ মাত্র পঞ্চাশ লক্ষ টাকার শেয়ার বাজারে ছাড়া হচ্ছে। এত সুবিধে এবং নিরাপত্তার জন্যে মুহূর্তেই ওটা শেষ হয়ে যাবে। বিশ্বাসের কথা বলছেন ? আপনাকে আমি সমস্ত কাগজপত্র দেব। তাছাড়া আপনি হোটেলে ভিজিট করতে পারেন, শেয়ার-হোল্ডার হিসেবে আপনি সেটা করতেই পারেন। তাছাড়া সুইস ব্যাংকে ইচ্ছে করলে ভেরিফাই করতে পারেন।'

'সুইস ব্যাংক।' মিসেস গুপ্তাকে অন্যমনস্ক দেখাচ্ছিল, 'ওই সুইস ব্যাংকে আমার ডিভিডেণ্ড ট্র্যান্সফার করে দেওয়া সম্ভব ?'

বিব্রত হলো রঞ্জন। এই প্রস্তাবটা গ্রহণ করা যায় কিনা তা সে জানে না। সূর্য আঙ্কলকে না জিজ্ঞাসা করে কিছু বলা যাচ্ছে না। সে মাথা নাড়ল, 'এটা আমাকে জেনে বলতে হবে।'

মিসেস গুপ্তা শালিকের মতো হেঁটে এলেন রঞ্জনের সামনে। তারপর ডান

হাতের তর্জনী রঙ্গনের বাঁ বুকে স্পর্শ করে বললেন, 'সেইন, ইউ আর রিয়েল গুড বয়। কিন্তু তুমি খোঁজ নাও যাতে আমি সুইস ব্যাংকের সুযোগ পেতে পারি। তাহলে এখানকার ট্যাক্স নিয়ে তোমাকে মাথা ঘামাতে হবে না।'

রঙ্গন আঙুলের স্পর্শেই বোধহয় মাথায় কিছু রাখতে পারছিল না। সেটা বুঝতে পেরে মিসেস গুপ্তা ঠোঁট দুমড়ে আঙুল সরিয়ে নিলেন, 'এইসব কথা গুপ্তা জানছে না, তাই তো।'

মাথা নাড়ল রঙ্গন, না, কেউ জানছে না।

'রিয়েল গুডি ওয়ান।' রঙ্গনের মুখের কাছে মুখ তুলে আনলেন মহিলা। রঙ্গন কসমেটিকসের ঘ্রাণ পাচ্ছিল। নীপা, নীপা তাকে এভাবে কখনও কাঁপায় নি। সে ঘোলা চোখে দেখল মাত্র ইঞ্চি চারেক তফাতে মিসেস গুপ্তার মুখ। লাল ঠোঁট সামান্য ফাঁক হলো, 'হ্যান্ডসাম ব্যাচেলার কি নেবে বল?'

'যা দেবেন।' গলা শুকিয়ে কাঠ তবু বলতে পারল সে। এখন এই মহিলা চাইলে গোটা পৃথিবীটাকেই গ্রহণ করা যায়। দুটো উত্তপ্ত কিন্তু অবশ হাত ধীরে ধীরে সাহস কুড়োচ্ছিল।

'টু পার্সেন্ট। বিশ হাজার। গুপ্তার চেয়ে অনেক বেশী, তাই না? কিন্তু ওই একটা শর্ত, সুইস ব্যাংকে ডিভিডেন্ড আমার নামে ডিপোজিট করতে হবে।' চট করে সরে গেলেন মহিলা। এবং কিছুই ঘটে নি এমন ভঙ্গিতে পায়চারি করতে করতে ডাকলেন, 'সুইটি।'

হঠাৎ বরফ জলে তলিয়ে গেল রঙ্গন। চেতনা শুদ্ধ হতে যেটুকু সময় তার মধ্যেই সুইটি দরজায় দাঁড়িয়ে। মিসেস গুপ্তা বললেন, 'আপ্!'

সঙ্গে সঙ্গে বাঘা যুবকের মতো বিশাল লম্বা শরীরের ভার পেছনের পায়ে রেখে খাড়া হয়ে গেল সুইটি। মিসেস গুপ্তার দুই কাঁধে নখ লুকোনো থাবা রেখে স্থির হয়ে দাঁড়াল। মিসেস গুপ্তার দুটো চোখে প্রশান্তি, 'কিস মি সুইটি।'

প্রায় শরীরের সঙ্গে লেপ্টে গিয়ে সুইটি মিসেস গুপ্তার গালে ঠোঁট ছুঁইয়ে নেমে এল মাটিতে। এবং নেমেই রঙ্গনের দিকে এমন একটা দৃষ্টিপাত করলো যা দেখে খিলখিলিয়ে হেসে উঠলো মিসেস গুপ্তা, 'লুক! কি হিংসুটে, খুব গর্ব না?' চড় মারার ভান করে মিসেস গুপ্তা বললেন, 'আমার মনে হয় এবার আপনার বাইরে গিয়ে মিস্টার গুপ্তার জন্যে অপেক্ষা করা উচিত, তাই না? সুইটি ওঁকে যেতে দাও।'

বাইরে বেরিয়ে আসা ছাড়া কোনো বিকল্প ছিল না। দরজা পেরিয়ে সে যখন সামান্য বাইরে তখন মিসেস গুপ্তা বললেন, 'আমি কবে জানতে পারছি?'

এতক্ষণে স্পষ্ট গলায় রঙ্গন বলতে পারলো, 'সেটা আমি নিজের আগ্রহেই জানাবো। যত তাড়াতাড়ি পারি।'

'আগ্রহ।'

'নিশ্চয়ই, বিশ হাজার টাকা কম নয়।' কথাটা শেষ করে রঙ্গন নির্জন

করিডোর পেরিয়ে সকালের জায়গাটায় এসে দাঁড়াতেই দেওয়াল টেলিফোন বেজে উঠলো। দুবার শব্দ হয়ে সেটা থেমে যেতে রঞ্জন সোফায় গা এলিয়ে দিল। না মন খারাপ হওয়ার কোনো কারণ নেই। বিরাট শিকার হলো আজ। সূর্য আঙ্কল নিশ্চয়ই খুব খুশী হবেন। প্রথম দিনেই দশ লাখ টাকার কেস দিচ্ছে সে—ভাবা যায়। কোম্পানি থেকে পাওয়া কমিশন বাদ দিয়েও তার বিশ হাজার রোজগার হচ্ছে। এই বিশ হাজারে একটা সেকেণ্ড হ্যাণ্ড গাড়ি কেনা দরকার। চেষ্টা চরিত্র করলে পনের-ষোলর মধ্যে পাওয়া যেতে পারে। ফ্ল্যাট, গাড়ি, ফ্রিজ, টি ভি এবং প্রতিটি সন্ধ্যায় যে-কোনো বড় ক্লাবে আড্ডা মারা—উপভোগ করা আর কাকে বলে।

নিজের চিন্তায় বুঁদ হয়েছিল রঞ্জন। বিশ হাজারের উপায় নিশ্চয়তায় মিসেস গুপ্তার ব্যবহারও খুব কটু লাগছিল না এখন। চোখ বন্ধ ছিল, খুব কাছ থেকে মিস্টার গুপ্তা কথা বলতেই সে হুড়মুড়িয়ে উঠে বসলো। মিস্টার গুপ্তা কখন যে ফিরে এই বারান্দায় উঠে এসেছেন কে জানে।

'কতক্ষণ এসেছ ?'

'অ-অনেকক্ষণ !'

'কেন, তোমাকে কেউ বলেনি যে আমি বারোটার আগে ফিরব না ? ?'

'মানে'—ঢোক গিললো রঞ্জন, মিসেস গুপ্তার কথা কিছুতেই বলা চলবে না। বিশ হাজার তাহলে হাওয়ায় উড়ে যাবে। 'মানে আমার এখন হাতে কোনো কাজ ছিল না, তাই ভাবলাম অপেক্ষা করি।'

'কেউ তোমাকে এ্যাটেণ্ড করেছে ?'

ধীরে ধীরে মাথা নাড়ল রঞ্জন, না। বাঁ হাতের বুড়ো আঙুলে মিস্টার গুপ্তা দেওয়ালে বোতাম চেপে উল্টোদিকের সোফায় বসলেন, 'অলরাইট। এবার কাজের কথা বলো। হোয়াট এ্যাবাউট মাই প্রব্লেম ?'

'হয়ে যাবে।' মাথা নাড়লো রঞ্জন, 'মিস্টার চোপরা বলেছেন ওটা করতে কোনো ঝামেলা হবে না। ইন ফ্যাক্ট, উনি ইতিমধ্যে কথাবার্তা শুরু করে দিয়েছেন।'

'কিন্তু তুমি নিশ্চয়ই ওর কাছে আমার পরিচয় গোপন রেখেছ ?'

'নিশ্চয়ই নাহলে আপনি আমাকে টাকা দেবেন কেন ? কিন্তু স্যার, যিনি জমিটা বিক্রী করছেন তার ফাইল তো চোপরাকে জানাতে হবে।'

'জানবে। নইলে কাজ করাব কি করে ?'

'তখনই তো চোপরা টের পেয়ে যাবে জমি কে কিনছে।'

'জানবে। ওহো, তুমি মনে করছ জমি আমার নামে কেনা হচ্ছে, নো, নেভার। তোমার চোপরা আমার হদিশ পাবে না। এখন বলো, আমার কি কর্তব্য ? আমি খুব কুইক ডিসপোজাল চাই।'

'তাহলে স্যার আমাকে কাগজ-পত্র দিন, ল্যাণ্ডলর্ডের ফাইল নাম্বার, যে ট্যাক্সটা বাকি রয়েছে তার জন্যে কোনো দরখাস্ত করা থাকলে তার কপি, আপিলের কাগজ-পত্র, ওকালত-নামা আপাতত এই। আপনার ল্যাণ্ডলর্ডকে

জানিয়ে দিন যেন আমাদের সঙ্গে সহযোগিতা করে।'

'কি রকম ?'

'প্রায় কাগজ-পত্রে ওর সই দরকার হবে।'

'সেটা তুমি আমার কাছে আনবে। আমি সই করিয়ে দেব। এবার এসো আসল কথায়, টাকা পয়সা কি ভাবে নেবে ?'

'যেমন যেমন খরচা হবে।'

'নো। আমি টার্মস ডিক্টেট করি, ওবে করি না। এখন পঁচিশ পার্সেন্ট দেব। অর্ডার বের হবার আগের দিন ফরটিফাইভ পার্সেন্ট, অর্ডার হাতে পেলে ব্যালেন্সটা।' এই সময় উর্দী-পরা একটি লোক ট্রলিতে দুই গ্লাস শরবৎ নিয়ে এল। দৃশ্যটায় খুব চমক ছিল। অত সুন্দর ট্রলিতে মাত্র দুটো হলদেটে পানীয়। মিস্টার গুপ্তা হাতের ইশারায় রঞ্জনকে গ্রহণ করতে বললে ও হাত জোড় করল, 'না, আমার শরীর ঠিক নেই।'

বিনা বাক্যব্যয়ে লোকটিকে ফেরত নিয়ে যেতে ইশারা করে মিস্টার গুপ্তা উঠে দাঁড়ালেন, 'ওকে। কাল সকাল সাতটায় এসে কাগজ-পত্র কালেক্ট করে নিয়ে যেও। আর শোন, আমার সঙ্গে কেউ বিশ্বাসঘাতকতা করলে তাকে বড় বেশী দাম দিতে হয়। গুডবাই।'

রঞ্জন চুপচাপ নেমে এল। আজ মিস্টার গুপ্তার মুখ চোখ যেন কেমন ছিল। উনি কি সন্দেহ করেছেন? মিসেস গুপ্তা যে তার সঙ্গে আলাদা যোগাযোগ করেছেন এটা টের পেয়ে গেছেন। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে যে বনিবনা নেই তা বোঝা যাচ্ছে। কিন্তু তার কি দোষ? যদি মিসেস গুপ্তা তাকে আলাদা কাজ দেয় তা করার অধিকার রঞ্জনের আছে? অত ডাঁট নিয়ে কথা বলার কি আছে? গুপ্তার কালো টাকার অভাব নেই, এরকম পার্টিকে দশ বিশ লাখ টাকার শেয়ার বিক্রী করা খুব কঠিন হতো না। কিন্তু তখন বলি বলি করেও বলতে পারে নি রঞ্জন। যদি গুপ্তা এর মধ্যে মিসেস গুপ্তার গন্ধ পেয়ে যায়। গাছের পাখি থেকে হাতের পাখি অনেক বেশী ভালো। কিন্তু মিসেস গুপ্তা কম চালু নয়। উনি আবার মাল সুইস ব্যাঙ্কে সরাতে চাইছেন। যে এখানে ট্যাক্সমানি চাইছিল সে মত পাল্টে সুইস ব্যাঙ্কে গেল কেন? হঠাৎ রঞ্জনের শরীরে কাঁটা ফুটল। মিসেস গুপ্তা এদেশ থেকে হাওয়া হয়ে যাওয়ার মতলবে নেই তো? এই সুযোগে টাকা পয়সা বিদেশে সরিয়ে রাখতে চাইছেন হয়তো। দারুণ খেলোয়াড় মহিলা। হাতে নানান ধরনের বল আছে। বাম্পার গুগলি, পেস। ইচ্ছে মতন ব্যবহার করেন। মিস্টার গুপ্তাও দুঁদে 'ব্যাটসম্যান' কিন্তু এটা তো ঠিক ওই মহিলার পায়ের নখের যোগ্যও নন ওই বুড়ো। আফসোস হলো রঞ্জনের, ঈশ্বর চিরকালই অবিচার করে থাকেন।

নীপা বললো, 'এবার ছাড়ো আর পারি না, সারা দুপুর চটকেছো।'

রঞ্জনের গলায় তখন আরাম। তার ডান হাত নীপার নগ্ন শরীরটাকে আঁকড়ে রেখেছিল। ছাড়বার কোনো লক্ষণ দেখা গেল না। রঞ্জন বললো, 'কথা

বলো না। এরকম স্বপ্ন যে জীবনে সত্যি হয়ে আসবে কখনও ভাবি নি।'

নীপা শব্দ করে হাসল, 'তোমার ওপর নির্ভর করলে কোনোদিনই সত্যি হতো না। গাড়ির কি হলো ?'

'দাঁড়াও, টাকা পয়সাগুলো হাতে পাই।' কথাটা বলতে বলতে হাত সরিয়ে নিল রঞ্জন। সুযোগ পেলেই খোঁচা না দিয়ে ছাড়বে না নীপা। আজকের সব উন্নতির মূলে যেন রঞ্জনের কোনো চেষ্টা নেই। ওর কথা শুনলেই নিজেকে ঘরজামাই বলে মনে হয়।

ছাড়া পেয়ে তড়াক করে বিছানা ছেড়ে উঠল নীপা। আর তখনই টেলিফোনটা বাজলো। দ্রুত ম্যাক্সি গলিয়ে নিয়ে নীপা রিভলভিং চেয়ারে শরীর দুলিয়ে রিসিভার তুলল, 'কে ? ও, মা ! বল। হ্যাঁ ফাইন। মা। দেখো না এতো করে একটা গাড়ির কথা বলছি কিন্তু, কানেই তুলছে না। কয়লা ধুলে কি আর ময়লা যায় ? ওরার্থলেস। আমাকেই সব করতে হবে। বলছে হাতে নাকি টাকা পায় নি। এটা কোনো লজিক হলো ? কি বললে ? তাই নাকি ! ওমা, কবে ? দাঁড়াও।' রিসিভারে হাত চাপা দিয়ে নীপা ঘুরে বসল, 'এই, মা সূর্য আঙ্কেলের হোটেল দেখতে যাচ্ছে।'

রঞ্জন উত্তর দিল না। বিছানায় চিৎ হয়ে শুলো।

'তুমি দিল্লীতে গিয়ে মিট করবে ? কখন যাচ্ছ ? ওঃ, ইউ আর লাকি ? বাপী যাচ্ছে না ? ওই তো, বললেই কাজের দোহাই দেবে। পুরুষ মানুষগুলো জানো সবাই এক ছাঁচের, না না না, সূর্য আঙ্কল ব্যতিক্রম। কি বললে ? আমার কপালে কি যাওয়া হবে, যে লোকের হাতে পড়েছি ! দেখি। আমি তোমাকে ফোন করব। তুমি আসছ ? গুড।'

রিসিভার নামিয়ে বিছানার কাছে চলে এলো নীপা, 'মা আসছে।'

'কেন ?' অন্যমনস্ক গলায় বললো রঞ্জন।

'স্ট্রেঞ্জ ! মা কেন আসছে তুমি তাই জিজ্ঞাসা করছ ?'

হুঁস এলো রঞ্জনের। তারপর পাজামায় শরীর গলাতে গলাতে বললো, 'দূর ! আমি জানতে চাইলাম কোনো ঝামেলা হয়েছে কিনা ? এই সময় আসছেন।'

বাথরুমের দরজায় দাঁড়িয়ে নীপা বললো, 'অনেক হয়েছে। এখন তুমি স্ট্যাটাস পেয়েছ, কথাবার্তা ভদ্রভাবে বলতে শেখ।' তারপরেই বাথরুমের দরজা বন্ধ হয়ে গেল।

বিছানায় বসে হতভম্বের মতো তাকাল রঞ্জন। একটা কেনর এতগুলো প্রতিক্রিয়া হয় ?

মাটিতে পা রাখতে গিয়ে ওর খেয়াল হলো এখানে মাটি নেই। পায়ের তলায় নরম কার্পেট, দেয়ালের সঙ্গে ম্যাচ করে কেনা। এই ফ্ল্যাটে যে-সব ফার্নিচার আছে তা চোপরার চাকরি করলে জীবনেও কিনতে পারতো না সে। আর তখনই মনে পড়ল আজ বিকেলে চোপরার সঙ্গে দেখা করার কথা। মিস্টার গুপ্তার কেসের লেটেস্ট খবর নিয়ে যথাস্থানে জানাতে হবে। দু'এক দিনের মধ্যে রায় বের হবে বলে আশা করা যাচ্ছে। খুব দ্রুত কাজ করছে চোপরা। এর

মধ্যে শর্তমাফিক পেমেণ্টস দিয়েছে গুপ্তা। কিন্তু তার ভাগ পায়নি রঙ্গন। শেষ ইনস্টলমেণ্ট থেকেই রঙ্গনের প্রাপ্য মিটিয়ে দেওয়া হবে বলে জানিয়েছে। চোপরা।

দিন দশেক হয়ে গেল এই ফ্ল্যাটে। রাজার মতো থাকা যায় এখানে, দুটো স্নানঘরে পৃথিবীর সব আরাম। সূর্য আঙ্কল দিল্লী যাওয়ার আগে মিসেস গুপ্তার খবর দিয়েছিল রঙ্গন। শুনে ঘাড় নেড়েছিলেন সূর্য আঙ্কল, 'তাহলে বোঝা যাচ্ছে আমার পছন্দ নির্ভুল। আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, তুমি আরও উন্নতি করবে রঙ্গন। হ্যাঁ, সুইস ব্যাঙ্ক টাকা রাখা খুব সহজ নয়। সোজাপথে সরকার কিছুতেই অনুমতি দেবেন না। মুশকিল হলো, ক্লায়েণ্টদের অদ্ভুত অদ্ভুত অনুরোধ আমাদের ফেস করতে হবে। অল রাইট, আমি চেষ্টা করব ওঁর অনুরোধ রাখতে।'

রঙ্গন বলেছিল, 'উনি নিশ্চিত না হয়ে টাকা দেবেন না।'

সূর্য আঙ্কল বলেছিলেন, 'রাইট। তুমি জিনিসটা না পেলে দাম দেবে কেন ? আমি খোঁজ-খবর নিয়ে তোমাকে কয়েকদিনের মধ্যেই জানাব।'

গতরাত্রে দিল্লী থেকে ট্রাংক কলে সূর্য আঙ্কল সংক্ষেপে জানিয়েছিলেন, 'এভরিথিং এ্যারেঞ্জড। গো এ্যাহেড।' স্পট ঘুরে ওরা চারদিন বাদে কলকাতায় ফিরছেন। তখনই কাজ শুরু করা যেতে পারে। কয়েকবার চেষ্টা করে ফোনে মিসেস গুপ্তাকে পেয়ে খবরটা জানিয়ে দিয়েছিল রঙ্গন।

এক কাপ কফি পেলে ভালো হতো! রঙ্গন বাথরুমের দরজার দিকে তাকাল। ঝরনায় শব্দ হচ্ছে এখনও। কাজের লোক জোটে নি নীপার। অবশ্য এ বিষয়ে ও খুব উৎসাহীও নয়। দুটো প্রধান খাওয়া তো হোটেলেই হচ্ছে। চা বা কফি নীপা কিংবা রঙ্গন নিজেই করে। একটা কালো মেমসাহেব ঝি এসে ঘরদোর পরিষ্কার করে দেয়। এরকম সংসার নাকি আজকাল স্বস্তির। রঙ্গনের ব্যাপারটা মাথায় ঢোকে না।

দ্বিতীয় বাথরুম থেকে পরিষ্কার হয়ে বেরিয়ে এসে রঙ্গন দেখল নীপা আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে স্প্রে করছে। চকচকে চামড়ায় কাছে এগিয়ে যেতে নীপা ভ্রূকুটি করলো, 'ডোণ্ট টাচ মি ?'

'কেন ?'

'স্নান করে এসেছি, নোংরা করে দিও না।'

হতভম্ব হয়ে গেল রঙ্গন, 'আমি স্পর্শ করলে তুমি নোংরা হবে ?'

ঠোঁট বেঁকিয়ে নীপা বললো, 'তোমাদের ওই গঙ্গাজল-মার্কা আইডিয়াগুলো ছাড়ো তো। এখন আমাকে একটু পবিত্র থাকতে দাও। মেয়েদের শরীর দেখলে তোমরা অন্য কিছু ভাবতে পার না, না ?'

কদিন ধরে এই হচ্ছে। নীপার মর্জিমতন তাকে রমণ করতে হবে, নীপার ইচ্ছেমতন তাকে বেড়াতে যেতে হবে, নীপা ওর খাবারের মেনু পর্যন্ত এখন পছন্দ করে দিচ্ছে। শালা! রঙ্গন মনে মনে গালাগালি দিল। আমি একটি ক্রীতদাস। রাগের মাথায় সামনে যা পড়েছিল তাতেই লাথি বসাল রঙ্গন।

ঘুরে দাঁড়ায় নীপা চেঁচিয়ে উঠলো, 'ওকি! তুমি একটু সোবার হতে পার না?'

রঞ্গন একটা কথা বলতে গিয়ে চেপে গেল। নীপা নিজের মনে গরগর করছিল, 'বাঙালীদের অভ্যেস এতো খারাপ হয়ে গেছে!'

জামা প্যাণ্ট পরে রঞ্গন বললো, 'আমি বের হচ্ছি।'

'বের হচ্ছ, মানে?' ড্রেসিং টেবিলের আয়নায় নীপার মুখ।

'চোপরার ওখানে যেতে হবে।'

'আশ্চর্য, তুমি শুনলে মা আসছে তবু তুমি বের হচ্ছে?'

'কিন্তু কাজটা খুব জরুরী। মিস্টার গুপ্তার ব্যাপার।'

'উঃ, তুমি এই শ্লেভ মেণ্টালিটি ছাড়তে পারবে না, না?' এখন তোমার চাকরির কি দরকার? চোপরার বউ টানছে না তো?'

রঞ্গন কিছু জবাব দেবার আগে বেল বাজল। নীপা বললো, 'খুলে দাও।'

দরজা খুলতেই নাক জুড়ে চার্লি। খিলখিলিয়ে হাসলেন নীপার মা, 'ওমা, তুমি আছ বুঝি?'

রঞ্গন বোকার মতো বললো, 'মানে?'

নীপার মা বললেন, 'কাজকর্ম সব শিকেয় উঠেছে ফ্ল্যাট পেয়ে তা বুঝতেই পারছি। নীপা কোথায়?'

ভেতরে ঢুকেই নীপার মা বললেন, 'হ্যাঁরে, কি ঠিক করলি?'

নীপার প্রসাধন চলছিল, 'আমার না মরলে কোথাও যাওয়া হবে না।'

'সে কি!'

'দ্যাখো না, তখন শুনল যাওয়ার কথা হচ্ছে কিন্তু মুখ ফুটে কিছু বলছে না।'

নীপার মা ঘুরে দাঁড়ালেন, 'সে কি? তুমি চাও না ও বেড়াতে যাক?'

নীপা বললো, 'অত যদি আপত্তি থাকে তো ও সঙ্গে চলুক!'

নীপার মা মাথা নাড়লেন, 'না না, সূর্যের গেণ্ট হয়ে এতো লোক যাওয়া—।'

রঞ্গন এবার কথা বললো, 'আমার এখন প্রচুর কাজ, কলকাতা ছেড়ে যাওয়ার কোনো প্রশ্নই ওঠে না। নীপা যদি চায় ঘুরে আসুক।'

নীপার মা তৎক্ষণাৎ উল্লসিত, 'দ্যাটস্ লাইক এ গুড বয়। আমরা কালই রওনা হচ্ছি। তুই গোছগাছ করে রাখিস। আমি যাওয়ার পথে তোকে তুলে নেব। ওঃ, সূর্য খুব খুশী হবে তোকে দেখলে।'

নীপা চোখের কোণে তাকাল, 'টিকিট?'

'ও হ্যাঁ! রঞ্গন, তুমি দুটো টিকিট নিয়ে এসো।'

রঙ্গন সঙ্গে সঙ্গে ঝিমিয়ে গেল। এখন তার পকেটে শ' দুয়েকের বেশী নেই। এ টাকাটাও মাইনে থেকে ধার নেওয়া। অন্য সময় হলে চোপরা এ্যাডভান্স দিত না। টাকাটা পেয়ে বাড়িওয়ালাকে ভাড়া মিটিয়ে এখানে আসতে হয়েছে। তার ওপর দুবেলা হোটেলের খাওয়ার খরচ মেটাতে পকেট হাল্কা হয়ে যাচ্ছে। গুপ্তার অর্ডারের দিকে হা-পিত্যেস করে তাকিয়ে আছে সে। এই সময় যদি

টিকিট কাটতে হয় ; রঞ্জন দিল্লীর ভাড়া কত হিসাব করছিল। কোনোরকমে বললো, 'কোন্ ট্রেন ?'

'ট্রেন ? ও গড ! ট্রেনে চব্বিশ ঘণ্টা ধরে বসে থাকলে আমরা সূর্যকে ধরতে পারব ? ও রঞ্জন, রোমে যখন আছ রোমানদের মতো ব্যবহার কর। পাঁচ জনে বলবে কি ? কাল ভোরের ফ্লাইটের টিকিট কেটো। আরে বাবা ! একবার সূর্যের কাছে গিয়ে পড়লে তো তোমার কোনো খরচ হবে না। এরকম চান্স জীবনে নীপা পাবে ?' বিরক্তি ফুটে উঠলো নীপার মায়ের গলায়।

'প্লেনের টিকিট !' রঞ্জন অসাড় চোখে নীপার দিকে তাকাল।

নীপার মা সেটা লক্ষ্য করে বললেন, 'কি ব্যাপার ? তোমার কাছে টাকা নেই নাকি ?

'নীপা বলে উঠলো, 'টাকা থাকবে না কেন ? তুমি বসো তো।'

মিনিট তিনেক বাদে রঞ্জন যখন বের হচ্ছে নীপা চট করে তার কাছে চলে এল, 'তোমার কাছে টাকা নেই ?'

'না। তুমি জানো এখনও রোজগার শুরু হয় নি।'

'হয় নি কিন্তু হবে।'

'না হওয়া অবধি খরচ করব কোত্থেকে ?'

'আঃ, আস্তে কথা বলো, মা শুনতে পাবে। তুমি জানো টাকা আসছে, তাহলে এতো দ্বিধা করছো কেন ?'

'মানে ?'

'বড়লোকদের পকেটে সব সময় পয়সা থাকে না। তারাও ম্যানেজ করে। তুমি আপাতত করে নাও। চোপরাকে বলো, তোমার পাওনা টাকা থেকে এ্যাডভান্স করতে। ওরকম মেনিমুখো হয়ে থেকো না তো ! আমার সম্মান রাখা তোমার কর্তব্য।' নীপা চলে গেল মায়ের কাছে।

রাস্তায় নেমে রঞ্জন নিজেকে গালাগাল দিচ্ছিল। এরকম দামী ফ্ল্যাটে যে থাকে তার পকেট খালি—কেউ বিশ্বাস করবে ! এখন কোত্থেকে টাকাটা ম্যানেজ করবে সে ? চোপরা যে এখন এক পয়সা দেবে না সেটা জলের মতো সোজা। তাহলে ? পরিচিত একটা মুখও মনে পড়ল না রঞ্জনের। একটু এগিয়ে উড়োজাহাজের অফিসে পৌঁছে ভাড়াটা জেনে নিয়ে সে কিছুক্ষণ ফুটপাতে দাঁড়িয়ে রইল। শুধু টিকিট কাটলেই চলবে না, নীপার হাতে কিছু দিতেও হবে। তার মানে তিন হাজার টাকা চাই। গুপ্তাকে ফোন করবে ?

একটা পাবলিক বুথ থেকে গুপ্তার বাড়িতে টেলিফোন করলো রঞ্জন। কিছুক্ষণ বাদে, বোধহয় দরোয়ানটাই ফোন ধরলো, 'সাহেব নেই, মেমসাহেবও বেরিয়ে গেছেন।'

রিসিভার নামিয়েই ঠোঁট কামড়াল সে, মেমসাহেবের কথাটা জিজ্ঞাসা করাটা ভুল হয়ে গেল। লোকটা যদি টো টো রিপোর্ট করে তাহলে গুপ্তার সন্দেহ হতে পারে। যা হয় হবে, এখন তার তিন হাজার টাকা চাই। চোখ তুলে তাকালো রঞ্জন। সামনের চওড়া রাস্তা দিয়ে অজস্র গাড়ি ছুটে যাচ্ছে, এতো মানুষ কিন্তু

কেউ তাকে তিন হাজার দেবে না। অথচ খালি হাতে ফিরলে নীপা এবং নীপার মা ঠোঁট বেঁকিয়ে যে শব্দটা উচ্চারণ করবে তার একটাই মানে, অপদার্থ।

বড়লোক হতে হলে বড়লোকের মেজাজ চাই। সামান্য তিন হাজারের জন্যে চিন্তা করছ তুমি? নিজেকেই ধিক্কার দিল রঙ্গন। আর কেউ না দিক চোপরাকে দিতে বলো। দরকার হলে চোখ রাঙাও। ইতিমধ্যে তোমার জন্যে অনেক কামিয়েছে লোকটা। চাকরের মতো ব্যবহার করলে কেউ তোমার সামনে হাত উপুড় করবে না।

টাইপরাইটার মেসিনের ওপর ঝুঁকে পড়ে দাসবাবু এখনও কাজ করে যাচ্ছে! রঙ্গন ঢুকে জিজ্ঞাসা করলো, 'সাহেব আছে?'

কথাটা বলেই তার খেয়াল হলো। সেই স্লেভ মেণ্টালিটি। আগে মালিককে সাহেব বলতো এখনও তা জিভে এসে যাচ্ছে। দাসবাবু চোখ তুললো। কয়েকদিনের মধ্যে লোকটার ব্যবহার পাল্টে গিয়েছে। মনিবের পেয়ারের লোক হওয়ায় রঙ্গনের সঙ্গে যেন দূরত্ব বেড়ে গিয়েছে ওর। কথা না বলে মাথা নাড়ল সে। 'না।'

'যাচ্চলে। কোনো খবর দিয়েছে?'

'না।' তারপর একটু দ্বিধা নিয়ে বললো, 'আপনি চাকরি ছেড়ে দিচ্ছেন? মানে--সেইরকম শুনছিলাম।'

'হ্যাঁ। একটা প্রোজেক্টে যাচ্ছি আমি।'

'অনেক মাইনে না? আমার আর কিছু হলো না। কি করে যে সংসার চালাচ্ছি তা ঈশ্বরই জানেন!' দাসবাবু বললেন।

'আপনি আর্ন করতে চান? হঠাৎ ঘুরে দাঁড়াল রঙ্গন। এই একটু উপকার করা যাক, 'আমাদের প্রজেক্টের শেয়ার কিনতে পারেন। খুব কম করে পাঁচ হাজার। বছরে ফরটি এইট পার্সেণ্ট ডিভিডেণ্ট পাবেন। ফুল সিকিউরিটি। কোনো ব্যাঙ্ক এতো সুবিধা দেবে না।'

'সত্যি?' দুটো চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠলো দাসবাবুর, 'ফরটি এইট?'

'ভেবে দেখুন। বড় পার্টি ছাড়া আমি কেস নিচ্ছি না কিন্তু আপনার কথা আলাদা।' রঙ্গন আর কথা বাড়াতে চাইছিল না। সময় চলে যাচ্ছে। চোপরা সাহেব কোথায় গেলেন? ওঁকে ধরতেই হবে। সে সোজা দোতলায় উঠে এলো। চাকরটাকেও দেখা যাচ্ছে না, রঙ্গন বন্ধ দরজায় হাত দিতেই খুলে গেল। সে ভেতরের ঘরে ঢুকে এক সেকেণ্ড চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকল। এই সময় মিসেস চোপরার কণ্ঠস্বর শোনা গেল, চাকরকে ধমকাচ্ছেন এখনও সে দোকানে যায় নি কেন? তার মুখ ম্লান হয়ে গেল আর এখনও সে বাইরের ঘরে কি খুট খুট করছে। যাওয়ার সময় যেন দরজাটা ভালোভাবে চেপে দিয়ে যায় যাতে গা-তালা আপনি বন্ধ হয়ে যায়। রঙ্গন হাসলো, মানুষ কতো অন্ধভাবে পরস্পরের ওপর নির্ভর করে! চাকরটা দরজা বন্ধ করেছে অসতর্ক হাতে, দেখেও যায় নি। পিছু হটে সে চাপ দিতেই দরজাটা শব্দ করে বন্ধ হয়ে গেল।

সেই সময় মিসেস চোপরার গুনগুনানি শুরু হলো। স্নান সেরে বেরিয়ে এসেছেন তিনি। এঘরে দাঁড়িয়ে রঙ্গন ওকে দেখতে পাচ্ছিল না। সে ধীরে ধীরে এগিয়ে ভেতরের দরজায় দাঁড়িয়ে থতমত হয়ে গেল। সদ্য স্নানসারা মিসেস চোপরা সর্বাঙ্গ তোয়ালেতে ঢেকে আয়নার সামনে দাঁড়িয়েছেন। মেয়েদের এই একা-থাকা মুহূর্তে উপস্থিত হওয়া অশোভন। কিন্তু ততক্ষণ যা হবার তা হয়ে গিয়েছে। আয়নায় প্রতিফলন দেখে চমকে উঠে মুখে হাত চাপা দিয়ে আর্তনাদ করে ঘুরে দাঁড়িয়েছেন মিসেস চোপরা। আর রঙ্গন তখনই ধরণী দ্বিধা হও গোছের ভঙ্গিতে হাত জোড় করল। নিঃশ্বাস ফিরে পেতে সময় লাগল, মিসেস চোপরা চীৎকার করলেন, 'তুমি! তুমি কোত্থেকে এলে?'

তোতলালো রঙ্গন, 'মাপ করবেন, আমি বুঝতে পারি নি দরজা ভেজানো ছিল, ভেতরে আসতেই শুনলাম বন্ধ করে দিতে বলছেন। আপনি আমায় ক্ষমা করবেন, আমি জানতাম না—।'

'কি জানতে না?'

'আপনি একা আছেন।'

'কেন? একা থাকলে কি আসতে নেই?' ধীরে ধীরে ঠোঁটে হাসি ফুটছিল মিসেস চোপরার। চিরুনিটা টেবিলের উপর ছুঁড়ে হঠাৎ মুখ ফেরালেন, 'আমি ঠিক করেছিলাম তোমার সঙ্গে কথা বলব না।'

এই মুহূর্তে মিসেস চোপরাকে কিশোরী বলে মনে হচ্ছে। ছোট্ট রোগা শরীর এবং মুখ বয়স লুকিয়ে ফেলেছে, হাঁটু অবধি তোয়ালে যা নেমে এসেছে বুকের সম্পদ ঢেকে। দুটো পা সত্যি কিশোরী। রঙ্গন সাহস সঞ্চয় করছিল, 'আমার অপরাধ?'

আয়নায় চোখ রেখে মিসেস চোপরা তীব্র গলায় প্রশ্ন করলেন, 'তুমি চলে যাচ্ছো?'

'কে বললো?'

'তুমি যাচ্ছ না! খুব বড় চাকরি পেয়েছ তাই চোপরার কাছে থাকবে না, এসব কি মিথ্যে?' ঘুরে দাঁড়ালেন মিসেস চোপরা, 'এসব শোনার পর থেকেই আমার বুকের ভেতরটা, আমি তোমার মতো হ্যান্ডসাম ছেলেকে হারাতে চাই না, তুমি বলো এসব মিথ্যে, প্লিজ; তুমি থাক এখানে—।'

ওই মুখের দিকে তাকিয়ে রঙ্গন শেষ পর্যন্ত হাসল, 'যাচ্ছি না।' এবং এর পরের ঘটনার জন্যে প্রস্তুত ছিল না রঙ্গন। প্রায় পাখির মতন উড়ে এলেন মিসেস চোপরা। রঙ্গনের দুই হাত ধরে যেন নেচে উঠলেন, 'রিয়েলি! ওঃ, হাউ সুইট ইউ আর! তারপর আচমকা স্থির হয়ে রঙ্গনের চোখে চোখ রেখে অদ্ভুত গলায় বললেন, 'ইউ লাইক মি. তাই না?'

ধীরে ধীরে মাথা দোলালো রঙ্গন। সঙ্গে সঙ্গে বুড়ো আঙুলের ওপর ভর দিয়ে মিসেস চোপরার শরীর কয়েক ইঞ্চি উঠে এল, দুটো সাদা সাপের মতো হাত রঙ্গনের গলা জড়িয়ে ধরল এবং দুটো বন্ধ চোখের পাতা রঙ্গনের মুখের নীচে চলে এল, 'কিস মি, আই অ্যাম ডাইং ফর ইউ।'

দুপুরের ক্লান্তি এখনও রঙ্গনের শরীরে কিন্তু তবু ওর মুখ নত হলো। এবং ওই উত্তপ্ত লাল ঠোঁটে ঠোঁট রেখে সে আবিষ্কার করল চুম্বনের একটা আলাদা স্বাদ আছে। ঠোঁটের ছলাকলার সঙ্গে জিভের সূক্ষ্ম কারুকার্য যে রক্তের সমস্ত কণাগুলোকে ফুটিয়ে তুলতে পারে এর আগে সে কখনও টের পায় নি। ও কিছু বলতে গেলে মিসেস চোপরা বাধা দিলেন, 'কোনো কথা বলবে না।'

মিনিট দশেক বাদে মিসেস চোপরা কিন্তু নিজেই কথা বললেন, 'তুমি সুন্দর।'

রঙ্গন বিস্ময়ে তাকিয়েছিল। মিসেস চোপরার শরীর আবার তোয়ালেতে ঢাকা। কনুই-এর ওপর ভার দিয়ে হাতের চেটোয় গাল রেখে ওব দিকে তাকিয়ে আছেন, 'আমি তোমাকে যত গালিগালাজ করতাম তত চাইতাম কাছে পেতে। তুমি ছেড়ে যাবে না তো ?'

নিঃশব্দে মাথা নাড়ল রঙ্গন। ওই ছোট্ট শরীরটায় এত জাদু লুকোনো ছিল তা কে জানতো। সে হাত বাড়াতে মিসেস চোপরা ওর বুকে ঠোঁট ছুঁইয়ে সোজা হয়ে উঠে বসলেন, 'না, আজ আর নয় ? চোপরাকে সন্দেহ করতে দেওয়া উচিত হবে না। বাট আই নিড ইউ।' বিছানা থেকে নেমে হাঁসের পায়ে আবার বাথরুমে চলে গেলেন মিসেস চোপরা। আর তখনই রঙ্গনের মনে হলো সে পাপ করলো। একেই কি পাপ বলে ? নীপার সঙ্গে কি সে বিশ্বাসঘাতকতা করলো না ? কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সে মাথা নাড়ল। না। নীপা শুধুই স্ত্রী হবার অধিকারে তার ওপর অপার ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারে না। প্রতিটি মুহূর্তে নীপা তাকে আহত করছে, তার অসহায়তার কথা ঘুণাক্ষরেও চিন্তা করছে না। এখন সে নীপার প্রয়োজনের হাতিয়ার। অতএব সে কোনো পাপ করে নি। বরং তার শরীর যে তৃপ্তি পেল তা দেবার ক্ষমতা নীপার ছিল না। দুটো বিপরীত চিন্তার মধ্যে সে পোশাক পরে নিতেই মিসেস চোপরা বেরিয়ে এলেন। এখন ওঁর অঙ্গে পা-ঢাকা ম্যাক্সি। ঠিক পুতুলের মতো দেখাচ্ছে। এসেই জিজ্ঞাসা করলেন, 'কি ভাবছ ?'

'কিছু না।'

'নো। তুমি লুকোচ্ছ। আর ইউ নট হ্যাপি ?'

'মোর দ্যান দ্যাট।'

'তবে ?'

'কি তবে ?'

'তোমাকে চিন্তিত দেখাচ্ছে।'

রঙ্গন ঠোঁট কামড়ালো, 'চোপরা সাহেব কখন ফিরবে ?'

'জানি না। তোমার অর্ডার আনতে গিয়েছে বোধহয়। কেন, কি দরকার ?'

রঙ্গন এক মুহূর্ত চিন্তা করলো। তারপর শান্ত গলায় বললো, 'ওঁকে আমি একটা প্রস্তাব দিতাম।'

'কি প্রস্তাব ?'

'আমি যে কোম্পানির হয়ে কাজ করছি তারা শেয়ার বিক্রী করছে। বছরে ফর্টি এইট পার্সেন্ট ডিভিডেন্ড। ডিপোজিট সিকিওরড্। কোনো ভাবেই টাকা

মার যাওয়ার চান্স নেই। আমি নিজে দুটো শেয়ার কিনতে চাই। কিন্তু আমার তিন হাজার কম হয়ে যাচ্ছে। চোপরা সাহেব যদি আপাতত লোন দেন তাহলে আমার কমিশনের সঙ্গে এ্যাডজাস্ট করা যেতে পারে। টাকাটা আমার আজকেই চাই।'

'ফর্‌টি এইট পার্সেন্ট ?'

'হ্যাঁ, প্রচুর টাকা।'

হঠাৎ হাসলেন মিসেস চোপরা, 'আমি তোমাকে তিন হাজার দিতে পারি। কমিশন পেলে ফিরিয়ে দিও। কিন্তু আমারও দুটো শেয়ার চাই। পার শেয়ার কত ?'

'পাঁচ হাজার।'

'তার মানে বছরে চার হাজার আটশ পাব। মাসে চারশো। গুড। তুমি বলছো, টাকাটা মার যাওয়ার কোনো সুযোগ নেই ?'

'না। সুইস ব্যাঙ্কে পুরো টাকাটা জমা আছে। এই তো, মিসেস্ গুপ্তা দশ লাখ টাকা জমা রাখছেন।' রঙ্গন কথাটা বলেই জিভ কামড়ালো। কথাটা অত্যন্ত গোপন আর সে নিজেই প্রকাশ করে ফেললো ?

'মিসেস গুপ্তা ? হু ইজ শী ? ও, যার হাজব্যান্ডের কেস চোপরা করছে ? এত টাকা ? তুমি নিশ্চয়ই কিনিয়ে দিচ্ছ ?'

'হ্যাঁ। কিন্তু, প্লিজ, আমার একথাটা কাউকে বলবেন না।'

'কেন ?'

'এটা গোপন ব্যাপার।'

'ওর হাজব্যান্ড জানে না ?' আড়চোখে তাকালো মিসেস চোপরা।

'জানে।'

মিথ্যে কথাটা চটপট বললো রঙ্গন, 'কিন্তু আর কাউকে জানাতে চায় না। বুঝতেই পারছেন।' খুব আফসোস হচ্ছিল রঙ্গনের।

'তোমার সঙ্গে ওর কোনো রিলেশন নেই তো ?'

'আমার সঙ্গে ? দুর !'

হাত বাড়িয়ে দিলেন মিসেস চোপরা, 'প্রমিস।'

স্পর্শ করল রঙ্গন, 'বিশ্বাস করুন।'

'নো, টেল মি প্রমিস।'

'প্রমিস।'

পকেটে তেত্র হাজার টাকা নিয়ে যখন রঙ্গন নামছে তখনই দেখা হয়ে গেল চোপরা সাহেবের সঙ্গে। শিস দিতে দিতে উঠছে বুড়ো। মুখোমুখি হতেই, চেঁচিয়ে উঠলেন, 'হ্যালো, রঙ্গন, তুমি কি আমাকে ছেড়ে চলে যাচ্ছ ?'

'না।' হাসল রঙ্গন কিন্তু চোপরাকে দেখামাত্র সেই অপরাধবোধটা ফিরে আসছিল।

চোপরা বললো, 'গুড। আমি খবরটা পেয়ে অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। কেউ

ওপরে উঠলে আমি বাধা দেব না কিন্তু ভাবছিলুম, তুমি অন্তত আমাকে জানাতে পারতে। যাক। তোমার কেস হয়ে গিয়েছে। অর্ডার পেয়ে যাবে কাল সকালে। হাজার টাকা টোকেন পেনাল্টি। ও কিছু নয়। কিন্তু তোমার ক্লায়েন্টের পাত্তা পেলাম না।'

'মানে আপনি গিয়েছিলেন নাকি ?'

'হ্যাঁ। ভাবলাম সুখবরটা জানিয়ে আসি। ল্যান্ডলর্ডের যে ঠিকানা সেখানে কেউ থাকে না। কি ব্যাপার ?'

'কিন্তু কথা ছিল যে আপনি যোগাযোগ করবেন না। পার্টি ওই একটাই শর্ত দিয়েছিল। তাই না ?'

'আরে কেউ টের পাবে না আমি ওখানে গিয়েছিলাম। যার জন্য এত করছি তার সঙ্গে আলাপ করার ইচ্ছে হয় না ? ঠিক আছে, আমি আর যাচ্ছি না। কিন্তু আগামীকাল অর্ডারটা যখন পাচ্ছ তখন কালকেই পেমেন্টের ব্যবস্থা করে ফেল।' মিস্টার চোপরা হাসলেন।

'আমার কমিশন কালকেই পাচ্ছি ?'

'ও সিওর।'

'ঠিক আছে।'

চোপরা সাহেব রঙ্গনের হাত ধরলেন, 'এরকম কেস আরো নিয়ে এসো, আরো, আরো। সো দ্যাট উই টু মেক মানি। বুঝলে ?'

রাস্তায় নেমে রঙ্গন দুপাশে তাকাল। পকেটে এত টাকা নিয়ে সে কখনও বের হয় নি। মিস্টার গুপ্তা যে দুটো ইনস্টলমেন্ট দিয়েছেন তা নিয়ে এসেছিল ওর দরোয়ান। চোপরার অফিসে পৌঁছে দিয়ে সে ফিরে গেছে। অতএব এতো টাকা। হাসল রঙ্গন। টাকা আসা তো সবে শুরু হলো। এর পর দশ লক্ষ আনতে হবে। দশ কোটি হতে কতদিন লাগবে ? চাঁদির পাহাড়ের চূড়োয় না ওঠা পর্যন্ত আর শান্তি নেই। এতদিন বোকার মতো বসে মার খেয়েছে সে। সত্যি, কলকাতার হাওয়ায় টাকা ভেসে বেড়ায়। একটু উদ্যোগী হলে এবং কায়দা জানলে সেগুলোকে পকেটে পোরা যায়।

ট্যাক্সির সন্ধানে আর খানিকটা এগোতেই পেছনে কারও গলা শুনতে পেল রঙ্গন। ঘাড় ঘুরিয়ে দেখলো দাসবাবু ছুটে আসছেন। আবার কি ফ্যাসাদ বাধালো চোপরা ? হাঁপাতে হাঁপাতে কাছে এসে দাসবাবু বললেন, 'ওঃ, অনেক কষ্টে আপনাকে ধরেছি। তখন সাহেবের সামনে কিছু বলতে পারছিলাম না।'

'কি ব্যাপার ?'

'পাঁচ হাজার টাকার শেয়ার কিনলে মাসে দুশো টাকা পাওয়া যাবে ? মাসে মাসে ? তাহলে আমার বড় উপকার হয়।' দাসবাবুর বলায় কাতরতা। চটপট হিসেব করলো রঙ্গন, 'হ্যাঁ। তাই। তবে মাসে মাসে পাবেন কিনা বলতে পারছি না। আমি চেষ্টা করতে পারি।'

'একটু দেখুন স্যার। আমি গরীব মানুষ, বড় উপকার হয়।' দুটো হাত জোড় করলেন দাসবাবু। রঙ্গন খুব অবাক হয়ে গিয়েছিল, লোকটা তাকে স্যার

বললো। কি কাণ্ড। কিন্তু সে দ্রুত নিজেকে সংযত করলো। এখন থেকে তার স্ট্যাটাস অনেক ওপরে অতএব স্যার সম্বোধন তার প্রাপ্য।

সে মাথা নাড়ল, 'দেখি, আপনাকে জানাব।'

ছুটে আসা ট্যাক্সিটাকে হাতের ইংগিতে দাঁড় করিয়ে দরজা খুলল রঞ্জন। দাসবাবুর দিকে আর তাকানো উচিত নয়। সে গম্ভীর গলায় বললো, 'এয়ার-লাইন্স।'

কলকাতার গরমে ভদ্রসন্তান বাস করতে পারে না। দুপুর একটায় ফ্ল্যাট-এর সামনে গাড়ি থেকে নামতে নামতে রঞ্জন নিজের মনে বললো। অথচ এখন তার বাইরে যাওয়ার কোনো উপায় নেই। কাজের চাপ বেড়েছে, প্রতিমাসে পাই-পয়সা হিসেব করে সার্টিফিকেট হোল্ডারদের মিটিয়ে দিতে হচ্ছে। আর এ ব্যাপারে ওর সবচেয়ে সুবিধে হলো ওদের ফ্ল্যাটের যে ঘরটার বাইরে থেকেও ঢোকা যায় সেই ঘরে সূর্য আঙ্কল একটা মিনি অফিস করেছে। হোটেল ছাড়াও আরও কয়েকটা বিজনেস-এ হাত দিয়েছেন সূর্য আঙ্কল। ফরটি এইট পার্সেন্ট ডিভিডেন্ড, কমিশন ইত্যাদি মিটিয়ে তাতে ভালো লাভ থাকবে। অতএব তার শেয়ার বিক্রি চলছে। সূর্য আঙ্কেলের আর একজন এজেন্টের চেয়ে বেশি কাজ দেবার তাগিদেই খাটুনি বেড়েছে রঞ্জনের।

লিফ্ট-এ চেপে ওপরে উঠে এলো রঞ্জন। জুতোর টো থেকে মাথার চুল পর্যন্ত স্বচ্ছলতার ছাপ। নিজের এবং নীপার নাম লেখা দরজার বোতামে চাপ দিতে গিয়েও ও হাত সরাল। ডান দিকের অফিস ঘরের পর্দা নড়ছে। ওই লোকটা কে? যে দরজার দিকে পেছন ফিরে টেবিলে তেরছা হয়ে বসে? নিঃশব্দে সে অফিসঘরের পর্দা সরাল, সাবাস্। এ আবার কবে এলো। রঞ্জন জিজ্ঞাসা করলো, 'আপনার নাম জানতে পারি?'

চমকে পেছন ফিরে তাকিয়ে মেয়েটি সোজা হয়ে দাঁড়াল। যাকে সে লোক ভেবেছিল জিনস্-এর প্যান্ট এবং সার্ট-এর জন্যে সে যে একটি আস্ত মেয়ে তা দরজায় না দাঁড়ালে বোঝা যেতো না। মেয়েটি ততক্ষণে স্বাভাবিক, 'সেটা জানার অধিকার আপনার আছে কি?'

'অবশ্যই। কারণ, এই ফ্ল্যাটটিতে আমি থাকি।'

'সস্ত্রীক?'

প্রশ্নটা শুনে একটু হতভম্ব হলো রঞ্জন। তারপরে নিঃশব্দে হ্যাঁ বললো।

'গ্ল্যাড টু মিট য়ু। রঞ্জন সেন? আমি আত্রেয়ী রায়। আজ থেকে আমি এই অফিসের চার্জে।' এক পা না এগিয়ে হাত বাড়িয়ে দিল মেয়েটি।

রঞ্জন বাধ্য হলো দূরত্ব কমাতে। মেয়েটির করতল মোটেই মেয়েলি নয়। বললো, 'মিস্টার ঘোষ, যিনি কাজ করছিলেন এখানে—।'

'ওহো, দ্যাট ইডিয়ট। ওকে আমি দশটায় আসতে বলেছি, একটার মধ্যে কাজ শেষ করে চলে যাবে। বুড়ো লোকগুলোকে আমি বেশিক্ষণ সহ্য করতে পারি না। আমি শুনেছি আপনার স্ত্রীর হাতে নাকি চেইন আছে।'

'চেইন ?'

'যার শেষ হয় বকলমে।' উচ্ছ্বসিত হাসিতে ভেঙে পড়ল মেয়েটি।

মুখ চোখ লাল হয়ে গেল রঙ্গনের, 'কার কাছে শুনলেন।'

'সূর্য বলছিল। যাক ছেড়ে দিন ওসব কথা। বাই দ্য বাই, একটু আগে আপনার একজন ক্লায়েন্ট এসেছিল। সে টাকাটা তুলে নিতে চায়, আমি আপনার সঙ্গে কথা বলতে বলেছি।'

'কি নাম ?'

'কি সাম দাস। ওল্ড ম্যান।'

দাসবাবু। দুমাস দেখা হয়নি ওর সঙ্গে। চোপরার চাকরি ছেড়ে দেবার পর আর যাওয়ার কোনো সময়ই পায় না সে। এমন কি মিসেস চোপরা যখন ওঁর সঙ্গে এসে ডিভিডেন্ড নিয়ে যান তখনও দেখা হয় না। কিন্তু দাসবাবু হঠাৎ টাকা তুলে নিতে চাইছেন কেন ? পাঁচ হাজার অবশ্য হাতের ময়লা তবু প্রজেক্ট শেষ হবার আগেই কোনো ক্লায়েন্ট সরে যাচ্ছে এই খবর পাঁচকান হলে নানান গল্প ছড়াবে। তাছাড়া এটা তার পক্ষেও অসম্মানের। সূর্য আঙ্কল নিশ্চয়ই কিছু বলবেন না কিন্তু সেই অদৃশ্য এজেন্টটি—। রঙ্গন বললো, 'আমি টেলিফোন করছি।'

মেয়েটি চেয়ারে ফিরে গিয়েছিল, ঘাড় নেড়ে হ্যাঁ বললো। চোপরার অফিস একবারেই পাওয়া গেল। রঙ্গন খুশি হলো, দাসবাবুই ধরেছে।

'কি ব্যাপার ? আমি রঙ্গন বলছি। শেয়ার বিক্রি করতে চাইছেন কেন ?'

'ও, রঙ্গনবাবু খুব ভালো হলো। আপনার ওখানে যে মেমসাহেবকে আজ দেখলাম তার ব্যবহার খুব খারাপ! আমার সঙ্গে ভালো করে কথাই বলেন নি। যাক, আমি টাকাটা তুলে নিতে চাই।' খুব বিনীত গলা দাসবাবুর।

'কেন ?'

'কিছু মনে করবেন না, আমি শিক্ষিত নই। কিন্তু আমাকে একজন বোঝাল যে আপনারা নাকি বে-আইনি ভাবে ফর্‌টি এইট পার্সেন্ট দিচ্ছেন। কোনো ব্যাংক কিংবা কোনো কোম্পানি যা দিতে পারে না তা আপনারা কেমন করে দিচ্ছেন ? নিশ্চয়ই গোলমাল আছে। আমিও প্রথমে তাই ভেবেছিলাম। কিন্তু আপনি আছেন বলে আপত্তি করি নি। আজ এই ব্যাপারটা জানতে গিয়েছিলাম, কোনো বিপদ আপদ এলে আমাকে যেন বাঁচাবেন। কিন্তু ওই মেমসাহেবটি যে-রকম ব্যবহার করলেন তাতে মনে হলো আমার অবিলম্বে টাকা তুলে নেওয়া দরকার।'

'দূর মশাই, কে কি বলেছে আর আপনি ঘাবড়ে গেলেন। আমি যখন আছি তখন আপনার কোনো ভয় নেই। মিসেস চোপরা কেমন আছেন ?' প্রশ্নটা করে একটু কুণ্ঠিত হলো রঙ্গন। বস্তুত সেই ঘটনার পর তার সঙ্গে মিসেস চোপরার খুব দেখা সাক্ষাৎ হয় নি। কমিশনের টাকাটা পেয়ে তিন হাজার যেদিন ফেরত দিতে গিয়েছিল সেদিন কি কান্নাকাটি, 'তুমি যে বিবাহিত একথা বল নি কেন ?' কোনোরকমে পালিয়ে এসেছিল টাকাটা রেখে। আর যখন ডিভিডেন্ড নিতে আসে তখন হচ্ছে করে আড়ালে থাকে রঙ্গন। এটা কি অপরাধ বোধ। হয় তো।

'ভালো আছেন। ও'কে অবশ্য আমার সন্দেহের কথা বলি নি। ও হো, আপনি কি সুসংবাদটা পেয়েছেন ?' দাসবাবুর কন্ঠস্বর পালটে গেল। 'সুসংবাদ ? কি ব্যাপারে ?'

চাপা গলায় হাসি ভেসে এল, 'আমাদের মেমসাহেব মা হতে যাচ্ছেন। বুড়ো বয়সে চোপরা সাহেবের এখন খুব আনন্দ। ঠিক আছে, আপনি যখন বলছেন কোনো ভয় নেই তখন টাকাটা থাক। তবে তেমন কিছু হওয়ার আগে জানিয়ে দেবেন। দিনকাল বড় খারাপ। ওই পাঁচ হাজার টাকাই আমার সম্বল।'

রিসিভার নামিয়ে রেখে বোবা হয়ে দাঁড়াল রঙ্গন। শেষের কথাবার্তা তার কানে ঢোকে নি। সেই ঘটনার বয়স হিসেব করছিল সে। মিসেস চোপরা যদি ঝুঁকি নিয়ে থাকে, যদি বাচ্চাটা সেই দিনের ফসল হয়। একটু বড় হলে চোপরা বুঝতে পারবে না চেহারা দেখে ? নাকি বুঝেও তখন চেপে যাবে। মাথা ঝিম ঝিম করছিল রঙ্গনের। সে মুখ ফিরিয়ে দেখল সূর্য আঙ্কেলের নতুন কর্মচারিটি তার দিকে ড্যাবড্যাবিয়ে তাকিয়ে আছে। সে হাত নাড়ল তারপর কোনো কথা বলার সুযোগ না দিয়ে হনহন করে বেরিয়ে এসে নিজের ফ্ল্যাটের বেল বাজাল সজোরে। একটানা।

চাকর দরজা খুলে দিয়ে এক পাশে সরে দাঁড়াতে রঙ্গন পর্দা সরিয়ে ভেতরে এল। উৎকট বেল-এর শব্দে নীপা এগিয়ে এসেছিল গাউনের বোতাম আটকাতে আটকাতে, 'কি ব্যাপার, ওরকম অসভ্যতার মানে কি ?'

রঙ্গন কোনো উত্তর না দিয়ে নিজের বিছানায় শরীর এলিয়ে চোখ বন্ধ করল। তার জুতোসমেত পা সাদা বিছানার ওপর পাশাপাশি।

'কথার উত্তর দিলে না যে ?' নীপার এখন কোমরে হাত।

'বিরক্ত করো না।' রঙ্গনের চোখ বন্ধ।

'তোমার কোনো অধিকার নেই আমাকে অপমান করার।' ফুঁসে উঠলো নীপা।

রঙ্গন চোখের পাতা খুললো, 'অপমান করেছি ?'

'নিশ্চয়ই। চাকরটা কি মনে করল। সাব মেমসাবকে পাত্তাই দেয় না, এই কথাই বলে বেড়াবে। তোমার সামান্য ভদ্রতা বোধও নেই।' নীপা দুমদাম পা ফেলে নিজের ঘরে চলে যেতে যেতে দরজায় দাঁড়াল, 'আমার সঙ্গে একটু ভেবে-চিন্তে ব্যবহার করবে। এইরকম অসভ্যতা আমি বরদাস্ত করব না।'

'ভয় দেখাচ্ছ ?'

'না, সত্যটাকে মনে করিয়ে দিচ্ছি। আজ তোমার গাড়ি, ফ্ল্যাট, ফ্রিজ, কালার টিভি কার জন্যে হয়েছে ?'

রঙ্গন বুঝতে পারছিল এখনি একটা সমঝোতা করা দরকার। নীপার সঙ্গে ওই ব্যবহারে একটু বাড়াবাড়ি হয়ে গেছে। সে উঠে বসে বললো, 'কিন্তু তোমার সূর্য আঙ্কল আমাকে না জানিয়ে একটা বাজে মেয়েকে এই অফিসের চার্জে পাঠাতে পারেন না, তাই না ?'

এবার নীপার মুখে হাসি ফুটল, 'তাই বল। আমি ভেবেছিলাম ওকে দেখলে

তুমি খুশি হবে। গায়ে গতরে তো খারাপ নয়।'

'নীপা।' চেঁচিয়ে উঠল রঞ্জন।

'সূর্য আঙ্কল যা করেছেন ঠিকই করেছেন। এ নিয়ে মাথা গরম করা আর যাকেই মানাক তোমাকে নয়।' পর্দা সরিয়ে পাশের ঘরে চলে গেল নীপা।

এখন দুই ঘরে স্বামী স্ত্রীর বিছানা। মাঝখানে যদিও দরজা বন্ধ হয় না তবু পর্দা ঝোলে। নীপার মতে এটাই সভ্যতা। স্বামী স্ত্রীর যে পাশাপাশি শুতেই হবে তার কোনো মানে নেই। বরং ওতে পরস্পরের প্রতি আকর্ষণ কমে যায়। তাছাড়া পাশাপাশি শুলে পুরুষের রতি বাসনা বেড়ে যেতে পারে, সেক্ষেত্রে অনিচ্ছা থাকলেও বাধ্য হতে হয় আত্মসমর্পণে। এই কারণেই পৃথক ঘরে শোওয়ার ব্যবস্থা।

মাঝে মাঝে মন খারাপ হলেও রঞ্জনের মনে হয় এ বরং বেশ ভালো। মাঝ রাত্তিরে সে কখন এলো গেল, তা নিয়ে নীপার কাছে জবাবদিহি করতে হয় না। ইদানীং নীপারও শরীর সম্পর্কে এক ধরনের শীতলতা এসেছে। বাধ্য না হলে ও রাজী হয় না। হঠাৎ রঞ্জনের সন্দেহ হলো অফিস ঘরে যেটিকে বসিয়ে রাখা হয়েছে তার আগমনের পেছনে হয়তো নীপার হাত আছে। রঞ্জনকে ঘরে বাইরে বিকল্প সুখ দেওয়ার আয়োজন হয়তো!

এখন আর কোনো আক্ষেপ নেই। কোনো অভাব নেই তার। তবে কমিশন বাবদ যা পাচ্ছে তার পুরোটাই খরচ হয়ে যাচ্ছে স্ট্যান্ডার্ড বজায় রাখতে, জমছে না কিছুই। ছয় হাজার টাকা মাসিক আয়ের কথা সে কখনও চিন্তা করতে পেরেছে। হ্যাঁ, এ সবই নীপার জন্যে হয়েছে। কিন্তু কথাটা এতো ঘন ঘন মনে করিয়ে দেবার কি দরকার?

টেলিফোনটা বেজে উঠতেই অভ্যেসবশে হাতটা চলে গেল। নীপা অবশ্য বারংবার বলেছে এখন টেলিফোন তুমি রিসিভ করবে না। ওতে স্ট্যাটাস কমে যায়। চাকরবাকররা নাম জেনে তোমায় বললে তবে ঠিক করবে তুমি কথা বলবে কিনা। মনে থাকে না সব সময়।

'হেলো।'

শব্দটা কানে যাওয়ামাত্র সোজা হয়ে বসল রঞ্জন। তারপর ঘরের দিকে আড়-চোখে তাকিয়ে বললো, 'হ্যালো।'

'সেইন?'

'হ্যাঁ।'

'তোমার কোম্পানীকে ধন্যবাদ। একটু আগে আমি কনফার্মেশন পেয়েছি। সুইস ব্যাঙ্কে আমার নামে দুটো ইনস্টলমেন্টস জমা পড়েছে।'

'উই আর এ্যাট ইওর সার্ভিস।'

সঙ্গে সঙ্গে কট করে লাইনটা কেটে গেল। রিসিভার রেখে দিয়ে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছাড়ল রঞ্জন। সবই হলো, কিন্তু এই মহিলা তাকে কুকুরের সম্মান দিতেও রাজী নন। অথচ ওর দশ লক্ষ টাকা যেদিন সে গোপনে সূর্য আঙ্কেলের কাছে পৌঁছে দিয়েছিল সেদিনের কথা মনে এলেই গায়ে কাঁটা দেয়।

মিস্টার গুপ্তার কেস-এর রায় বেরিয়েছিল। চোপরা সাহেবের তদারকির ফলে অতবড় পেনাল্টি যা ওপরের তলায় পুনর্বিবেচিত হলো। এবং শেষ পর্যন্ত নাম-মাত্র পেনাল্টি করে আগের অর্ডার খারিজ করে দেওয়া হয়েছিল। গুপ্তা সাহেব খুশী হয়ে অবশ্য সমস্ত পাই পয়সা মিটিয়ে দিয়েছিলেন। আগের কথামতো তিনি চোপরার সঙ্গে দেখা করেন নি। টাকা পয়সা পেয়ে চোপরা এত আহ্লাদিত ছিল যে রঞ্জন যখন তার দেরাজ থেকে এ-সংক্রান্ত কাগজপত্র সরিয়ে এনে গুপ্তা সাহেবকে ফেরত দিয়েছিল তা প্রথমে নজরেই আসে নি। যখন ধরা পড়লো তখন আর কিছুই করার নেই। রঞ্জনকে সন্দেহ করলেও কিছু বলা সম্ভব ছিল না। শুধু আরও ওই ধরনের কাজ এনে দেবার জন্য অনুনয় করেছিল চোপরা সাহেব। এদিকে মিস্টার গুপ্তার কাজ মিটে যাওয়ার পর রঞ্জন কোনো ছুতো পাচ্ছিল না ও বাড়িতে যোগাযোগ করার! অথচ সূর্য আঙ্কল তখন ক্রমাগত তাড়া দিচ্ছেন। অন্য এজেন্ট যে পরিমাণ শেয়ার বিক্রী করছে তাতে তিনি রঞ্জনের জন্যে বেশি দিন আটকে রাখতে পারবেন না। সুইস ব্যাংকের সম্মতিপত্র এসে গেছে! আর ঠিক তখনি মিসেস গুপ্তার টেলিফোন এল, নুমার্কেটের ওপর একটা এয়ার-কন্ডিশনড্ রেস্তোরাঁয় তিনি দুপুর আড়াইটেয় অপেক্ষা করবেন।

সেজেগুজে ঠিক সময়ে হাজির হয়ে একটু হকচকিয়ে গিয়েছিল রঞ্জন। গোটা দশেক টেবিল কিন্তু একটিও খদ্দের নেই। এই সময় দুজন লোক এসে কোণার টেবিল দখল করলো। তারা খুব নিরীহ দেখতে, বেশী কথাও বলছিল না। ওয়েটারকে অর্ডার দিয়ে গম্ভীর হয়ে ছিল। মিসেস গুপ্তা এলেন মিনিট দশেক পরে। আলখাল্লার মতো ঢোলা পোশাক, মাথায় বড় রুমাল বাঁধা, হাতে ঢাউস ব্যাগ। এর মধ্যে মেনু দেখে এই নির্জনতার কারণ বুঝেছিল রঞ্জন। সাধারণ রেস্তোরাঁর চেয়ে অন্তত তিনগুণ এর খাবারের দাম। উলটোদিকের চেয়ার টেনে বসে মিসেস গুপ্তা বললেন, 'সময় নষ্ট করার সময় আমার নেই। আমার জন্যে কোনো খবর আছে?'

দ্রুত পকেট থেকে সূর্য আঙ্কলের কাছে পাওয়া সুইস ব্যাংকের চিঠিটা বের করে এগিয়ে দিল রঞ্জন। মিসেস গুপ্তার মুখের অর্ধেক রোদ-চশমার গোল কাচে ঢাকা। সরু আঙুলগুলো চিঠিটাকে ধরল। তারপর ভাঁজ করে ব্যাগে সেটা রেখে দিয়ে বললেন, 'গুড। কিন্তু এটা যে জাল নয় তা ভেরিফাই করতে সময় লাগবে। তোমাদের প্রজেক্টের সমস্ত কাগজপত্র এনেছ?' দুটো আঙুল অবহেলায় সামান্য এগিয়ে এল।

মোটা খামটা বাড়িয়ে দিল রঞ্জন। এতে সূর্য আঙ্কেলের প্রজেক্টের যাবতীয় তথ্য এবং ফর্মস রয়েছে। সেটাও ব্যাগে চালান করে দিয়ে মিসেস গুপ্তা বললেন, 'ঠিক দশদিন পরে ওই লোক দুটি এখানে আসবে। দে উইল ক্যারি দা ক্যাশ! অবশ্য এর মধ্যে এগুলো যদি সত্যি বলে প্রমাণ হয় তবেই। দশদিন পরে ঠিক এই সময়। বাই।'

মিসেস গুপ্তা একটা দশ টাকার নোট টেবিলে ফেলে দিয়ে ওয়েটারকে ইংগিত করে নিচে নেমে গেলেন। রঞ্জন হকচকিয়ে গিয়েছিল। সে চকিতে ঘাড় ঘুরিয়ে

দেখল লোকদুটো একমনে খাবার খাচ্ছে। এই প্রান্তে কি হচ্ছে না হচ্ছে তাতে যেন ওদের কোনো উৎসাহ নেই। আরও কয়েক মিনিট অপেক্ষা করে নিচে নেমে এল রঙ্গন। মিসেস গুপ্তার কোনো চিহ্ন নেই চারপাশে। লোকদুটোও নামলো না। তার মানে কেউ তাকে অনুসরণ করছে না। কিন্তু এই দুটো লোকের পরিচয় কি? মিসেস চোপরা কি বিশ্বাসে এদের হাতে টাকা দেবেন? রঙ্গনের মনে হচ্ছিল একটা বিরাট জালের মধ্যে সে পা বাড়াচ্ছে। তার মনে হলো লোকদুটোকে যত নির্বিকার মনে হচ্ছিল তত নির্বিকার নয়। কোথায় যেন পড়েছিল শ্রেষ্ঠ শয়তানকে নাকি ঈশ্বরের মতো দেখতে। মহিলা স্বামীকে লুকিয়ে টাকা খাটাবেন এবং সুইস ব্যাঙ্কে ডিভিডেন্ড জমাবেন। আবার এইসব সন্দেহজনক লোক ও'র হয়ে কাজ করছে। এই ব্যাপারে জড়িও না রঙ্গন, মাথার ভেতরে কেউ যেন বলে উঠল। সেই সময় লোকদুটো রেস্তোরাঁ থেকে বেরিয়ে এসে নির্বিকার ভঙ্গিতে হেঁটে গেল। একটা দোকানের আড়ালে দাঁড়িয়ে ওদের চলে যাওয়া দেখল রঙ্গন। অনুসরণকারি হবার কোনো চেষ্টাই ওদের নেই। উলটো দিকের রাস্তায় খানিকটা এলোমেলো ঘুরে ফ্ল্যাটে ফিরে এসেছিল সে। সূর্য আঙ্কল তখন অফিসে বসে। দেখা হওয়ামাত্র জিজ্ঞাসা করলেন, ক্লায়েন্ট কি বল্লে?'

'রাজী হয়েছে। দশ দিন পরে টাকা পাওয়া যাবে। কিন্তু।'

'কিন্তু?'

রঙ্গন বলতে গিয়েও চেপে গেল। সূর্য আঙ্কেলের কাছে নিজের দুর্বলতা প্রকাশ করা উচিত হবে না। সে বলল, 'কিন্তু উনি ব্যাঙ্কের ব্যাপারটা খোঁজ খবর নিয়ে তবে টাকা দেবেন।'

'ও এই ব্যাপার। ওটা স্লেটের মতো পরিষ্কার। চিঠিটা দাও।'

'চিঠি। ও হ্যাঁ, উনি চিঠিটা রেখে দিয়েছেন।'

'রেখে দিয়েছেন? গড্। তুমি রাখতে দিলে কেন? এখনও উনি আমাদের শেয়ার হোল্ডার হন নি। তাছাড়া এটা আমাদের অফিসিয়াল চিঠি। নেক্সট ডে ওটা ফেরত আনবে।' সূর্য আঙ্কল-এর বিরক্তি-স্পষ্ট।

তখন রঙ্গন ঠিক করেছিল সে কোনো অন্যায় করছে না। একজন প্রাপ্ত-বয়স্কা মহিলা যদি প্রজেক্টের শেয়ার কিনতে চান তাহলে তিনি কোত্থেকে টাকা পাচ্ছেন, কাকে লুকোচ্ছেন তা তার জানার দরকার নেই। এতে কোনো বিপদ থাকতে পারে না। সে নিজে কোনো অন্যায় করছে না। আর মহিলাই বা প্রথম থেকে তাদের বিশ্বাস করবেন কেন?

দশটা দিন পাখির মতো উড়ে গিয়েছিল। রঙ্গন তখন প্রাণপণ খাটছে। পরি-চিত-অর্ধপরিচিত যত মানুষ চারপাশে ছড়ানো প্রত্যেকের কাছে প্রজেক্ট নিয়ে যাচ্ছে সে। আর তার কপালগুণেই হোক কিংবা প্রজেক্টের লোভনীয় সম্ভাবনার জন্যেই হোক শেয়ার বিক্রি হচ্ছিল হু হু করে। তবে বেশীর ভাগই পাঁচ দশ হাজার। এদের বোঝানো খুব ঝামেলার। ব্যাপার দাসবাবুর মতো ওই পাঁচ দশই এদের সম্বল। সেটাকে দ্রুত বাড়াবার বাসনা প্রত্যেকের আবার ভয়ও প্রচণ্ড। সূর্য আঙ্কল বলেন, যদিও টাকাটা কম তবু এদের কাছে শেয়ার বিক্রি করাই উচিত।

সাধারণ মানুষ বলতে তো এদেরই বোঝায়। লক্ষ্য মানুষের আয়রেখা বাড়ানো যদি হয় তাহলে এদের কাছে টানতে-হবে। এদের বিশ্বাস কোম্পানির পাথেয়।

রঙ্গন দেখছে প্রচণ্ড ছোটাছুটি করছেন সূর্য আংকল। আজ দিল্লী কাল বোম্বাই তো আছেই, মাঝে মাঝে হিমালয়ের সেই স্পটে যেতে হচ্ছে। কাজ শুরু হয়ে গেছে সেখানে। খচ্চরের পিঠে তো বটেই, হেলিকপ্টারে করে মাল যাচ্ছে। খুব খরচ বেড়ে যাচ্ছে। কিন্তু সূর্য আংকল নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই হোটেল শেষ করার ব্যাপারে বদ্ধপরিকর। ইদানিং তিনি রঙ্গনকে বলতে শুরু করেছেন, 'তোমাকে আরও ওপরে উঠতে হবে রঙ্গন, আরো ওপরে। এই পাঁচ ছয় হাজার টাকা মাসে পাচ্ছ, এ কিছু নয়। আরো টাকা পেতে হবে তোমাকে। মনে রেখ টাকার গায়ে গভর্ণরের সই থাকে। তাই টাকার অন্য নাম হলো ক্ষমতা। আরও খাটো, আরও।'

কিন্তু আজকাল রঙ্গন একমত হতে পারছে না। আর কি দরকার তার টাকার। এক হাজার যখন পেত তখনও অবস্থা ছয় হাজারেও তো তার হের ফের হলো না। বাড়তি পাঁচ হাজার যদি স্ট্যাটাস বাঁচাতে ব্যয় হয়ে যায় তাহলে আরও রোজগার বাড়লে খরচের অনেক মুখ খুলে যাবে। তার চেয়ে এই ভালো, বেশ ভালো। মুখে কিছু না বললেও মনে মনে নিজেকে বোঝাতো রঙ্গন, আর নয়, এই ভালো, বেশ আছি।

তা দশটা দিন দেখতে দেখতে যেদিন ফুরোল সেদিন রঙ্গন হাজির হয়েছিল নুমার্কেটে। সেই রেস্তোরাঁতে সেদিনও ভিড় ছিল না। রঙ্গন দেখলো দুটো চাইনিজ মেয়ে ছাড়া কোনো টেবিলে মানুষ নেই। মিনিট দশেক অপেক্ষা করার পর বুকের ভেতরটা ধক্ করে উঠল রঙ্গনের। টাইট লাল জিনস এবং সাদা হাত-কাটা গেঞ্জী, চোখে রোদ-চশমা এবং মাথায় লাল রুমাল বেঁধে মিসেস গুপ্তা স্বয়ং উঠে এলেন। রঙ্গনকে দেখতে পেয়ে হেসে ওর উল্টোদিকের চেয়ার টেনে বসলেন 'না, ওই লোক দুটোকে কাজে লাগাতে হলো না। গুপ্তা আজ সকালে দিল্লী চলে গিয়েছে। সুতরাং আমি ফ্রি।'

রঙ্গনের সংবাদটা ভালো লাগল। তার সামনে যে আগুন রয়েছে তার কাছ থেকে একটু নিরাপদ দূরত্বে থাকলে ভালো লাগাটা বেঁচে থাকবে, এই সত্যটুকু বুঝতে পারছে সে। বয় এগিয়ে এসেছিল, মিসেস গুপ্তা তাকে নির্দেশ দিলেন, 'দো আইসক্রিম।'

রঙ্গন ঢোঁক গিললো। সে আইসক্রিম খাবে কি? তার পরেই মনে হলো, অনেকদিন আইসক্রিম খাওয়া হয় নি, আজ খেলে মন্দ কি! সে একটু নড়েচড়ে বসলো, 'লোক দুটো কারা?'

রোদ চশমায় দেখবার উপায় নেই। মুখের চামড়া টান টান। সোজা হয়ে বসেছেন মিসেস গুপ্তা। দুটো ঠোঁট সামান্য কাঁপল, 'আমি কৈফিয়ৎ দিতে পছন্দ করি না। তোমার পেছনে কতটা সত্যি সেটা আমার জানা দরকার ছিল।'

রঙ্গন আবার শীতল স্পর্শ পেল। ইদানিং এরকম হচ্ছে। এই মহিলার সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে সে লক্ষ্য করেছে উত্তেজনা আসা মাত্র তাতে বরফজল ঢেলে দেয়

মহিলার কথা বলার ভঙ্গী এবং স্বর।

একদম নিঃশব্দেই খাওয়া শেষ হলে মিসেস গুপ্তা দুটো কুড়ি টাকার নোট টেবিলে ফেলে দিয়ে বললেন, 'আমার আজই শেয়ার সার্টিফিকেট চাই, দু'ঘণ্টার মধ্যে। শেয়ার সার্টিফিকেট নিতে হবে মিসেস এস ভার্মার নামে।'

দু ঘণ্টার মধ্যে। রঙ্গন চট করে ভেবে নিল। সূর্য আঙ্কল তার জন্যে ওর অফিসে অপেক্ষা করবেন। কিন্তু দু ঘণ্টার মধ্যে কি সার্টিফিকেট পাওয়া যাবে? অন্যান্য কেসে দিন চারেক পর রঙ্গন অফিস থেকে ওগুলো পায় পার্টিকে দেবার জন্যে। কিন্তু মিসেস গুপ্তাকে না বলার সাহস রঙ্গনের হলো না। সে নিঃশব্দে ঘাড় নাড়ল। আর তখনই একটা ঢাউস কাগজের প্যাকেট টেবিলের ওপর নামিয়ে দিলেন মহিলা, 'ঠিক দু ঘণ্টা বাদে আমি ফন্নুরি রেস্তোরাঁতে তোমার জন্যে অপেক্ষা করব।' উঠে দাঁড়ালেন তিনি, 'মাথা গরম বোকারা করে থাকে। গুডবাই।'

ভালো করে চেয়ে দেখবার আগেই নেমে গেল শরীরটা দোতলা থেকে। সেদিকে তাকিয়ে থাকতেই রঙ্গনের শিরদাঁড়া কন কন করে উঠলো। তার চোখ চকিতে টেবিলের ওপর সেখানে কাগজের প্যাকেটটা নিরীহ চেহারা নিয়ে পড়ে রয়েছে। নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করছিল না। সে কি ঠিক চোখে দেখছে? ওই প্যাকেটের ভেতর দশ লক্ষ টাকা সাজানো রয়েছে? রঙ্গনের মনে হচ্ছিল ওর শরীরে এক ফোঁটা শক্তি নেই, কুল কুল করে ঘাম বের হতে শুরু হয়েছে। হাত বাড়াতে গিয়ে সে নিজেই লক্ষ্য করলো সেটা থর থর করে কাঁপছে। দশ লক্ষ টাকা। কিন্তু কেউ এটার দিকে তাকালেও বুঝতে পারবে না এখানে কি সম্পদ অবহেলায় রাখা হয়েছে। আর তখনই একটা বিপরীত বরফ-স্রোত বইল। যদি প্যাকেটে কিছুই না থাকে। পুরো ব্যাপারটাই যদি মিসেস গুপ্তার চাল হয়। সঙ্গে সঙ্গে প্যাকেটটাকে টেনে নিল রঙ্গন। দ্রুত হাতে কাগজের মোড়ক খুলতে গিয়ে সে স্থির হয়ে গেল। একটু আড়াল রেখেও সে যতটুকু দেখেছে তাতেই একশ টাকার বান্ডিলগুলো চোখ এড়ায় নি। না, মিসেস গুপ্তা কোনো ফাঁদ পাতেন নি তার জন্যে। চকিতে সে প্যাকেটটাকে ঠিক করে নিল। কেউ যদি জানতে পারে রঙ্গন সেন দশ লক্ষ টাকা কাগজের প্যাকেটে নিয়ে বসে আছে—সে উঠে দাঁড়াল। দাঁড়াতেই মনে হলো হাঁটু কেমন আলগা হয়ে যাচ্ছে। যেন তার নিচে শরীরের অংশগুলো সব অকেজো হয়ে গেছে। প্রায় টলতে টলতে প্যাকেটটাকে দুহাতে আঁকড়ে সিঁড়ি বেয়ে নেমে এসেছিল রঙ্গন। একটা ট্যাক্সি দরকার। কিন্তু সেটা খুঁজতে গেলে মিনিট দুয়েক হেঁটে মার্কেট থেকে বের হতে হবে। খদ্দেরদের ভিড় মার্কেটের প্যাসেজগুলোয়। রেস্তোরাঁর দরজায় দাঁড়িয়ে সেই চলমান ভিড়ের দিকে তাকিয়ে খুব অসহায় বোধ করছিল রঙ্গন। মানুষের মধ্যে কার পকেটে ছুরি কিংবা রিভলভার থাকে তা কে জানে। একটা ব্যাঙ্ক ডাকাতি করেও তো অনেক সময় এতো টাকা একসঙ্গে পাওয়া যায় না।

রঙ্গন প্রাণপণে এমন ভঙ্গিতে হাঁটার চেষ্টা করলো যেন সে আলু-কুমড়ো নিয়ে যাচ্ছে। এবং কয়েক পা এগোতেই সে হোঁচট খেতে খেতে বেঁচে গেল। সেই লোকদুটো। না, তার ভুল হয় নি। সেদিনের রেস্তোরাঁয় বসে গম্ভীরমুখে খেয়ে

যাওয়ায় লোকদুটো এখন তার চলার পথে দাঁড়িয়ে আছে। কি উদ্দেশ্য ওদের? মিসেস গুপ্তা কি ওদের পাঠিয়েছেন তার উপর নজর রাখতে? সে তো দশ লক্ষ টাকা নিয়ে হাওয়া হয়ে যেতে পারত। তাই এই পাহারার ব্যবস্থা না করে মিসেস গুপ্তা নিশ্চিন্ত হন নি। মাথা গরম বোকারা করে থাকে। মাথা গরম করা মানে টাকাটা নিয়ে হাওয়া হয়ে যাওয়া এবং সেটা এক্ষেত্রে বোকামি। কোনোরকমে ন্যুমার্কেটটা পার হয়ে এলো রঙ্গন। লোকদুটো যে তাকে অনুসরণ করছে এটা লুকোবার কোনো চেষ্টাই করলো না। খুব কাছাকাছি একজন এবং একটু দূরে আর একজন অন্যমনস্ক হবার ভান করেও সেঁটে রয়েছে। রঙ্গন কিন্তু স্বস্তি পাচ্ছিল। এই লোকদুটো তাকে ছিনতাইকারিদের হাত থেকে বাঁচাবে।

সামনেই একটা ট্যাক্সি খালি হতেই রঙ্গন পেছনের সিটে উঠে বসতে গিয়ে আঁতকে উঠলো। ড্রাইভারের পাশের দরজা এবং পেছনের সিটের তখনও বন্ধ না হওয়া দরজা দিয়ে একসঙ্গে এমন ভঙ্গিতে দুজনে উঠে বসল যেন ওরা রঙ্গনেরই সহযাত্রী। প্রতিবাদ করতে গিয়ে চুপ করে গেল। প্যাকেটটাকে দুহাতে আঁকড়ে ধরে সে ড্রাইভারকে ঠিকানাটা জানাতেই ট্যাক্সি চলতে শুরু করলো। লোকদুটো এমন ভঙ্গিতে বসে রয়েছে যেন শেয়ার-ট্যাক্সিতে ধর্মতলায় যাচ্ছে। পেছনের সিটে যে লোকটা বসেছিল তার দিকে তাকিয়ে রঙ্গনের মনে হলো এ ব্যাটা নিশ্চয়ই পুলিশ কিংবা পুলিশে কাজ করতো। অন্য সময় হলে এই লোকদুটোকে মজা দেখিয়ে দেওয়া যেত, কিন্তু এখন কোলের ওপর যে দশ লক্ষ টাকা। লোকদুটো কি সে খবর জানে। মিসেস গুপ্তা কি এদের এই সংবাদটি দেবেন? না, মনে হয় না। রঙ্গনের মনে হলো এই লোকদুটো কোনো ডিটেকটিভ এজেন্সির। মিসেস গুপ্তা এদের ভাড়া করেছেন রঙ্গনের ওপর নজর রাখবার জন্যে কিন্তু টাকার কথা জানান নি। জানালে যদি এরাই ছিনতাই করে তাহলে রঙ্গনের কিছুই করার থাকতো না। সূর্য আঙ্কেলের হেড-অফিসের সামনে এসে দাঁড়াতে বললো রঙ্গন। ভাড়া মিটিয়ে দেওয়ার সময় লোকদুটো সন্তর্পণে গাড়ি থেকে নেমে ফুটপাতে উঠে দাঁড়িয়েছে। প্যাকেটটা আঁকড়ে ওদের পাশ দিয়ে বাড়িটায় ঢোকার সময় কথা বলার লোভ সামলাতে পারল না সে, 'অনেক ধন্যবাদ, আমি আমার জায়গায় পৌঁছে গেছি, আর পেছনে আসতে হবে না।'

বলার সময় যতটা পারে বিদ্রূপ ঠুসে দিয়েছিল রঙ্গন কিন্তু একটুও প্রতিক্রিয়া হলো না দুজনের। রঙ্গন আর কথা না বাড়িয়ে সোজা বাড়ির ভেতরে ঢুকে পড়ে লিফটের বোতাম টিপল। শন শন করে লিফট যখন নির্দিষ্ট তলায় গিয়ে থামল তখন যেন ঘাম দিয়ে জ্বর ছেড়েছে রঙ্গনের। সূর্য আঙ্কেলের চেম্বারে ঢুকেই দরজা বন্ধ করে দিল সে। বিরাট সেক্রেটারিয়েট টেবিলের ওপর ঝুঁকে পড়ে ফাইল দেখছিলেন সূর্য আঙ্কল, শব্দ হতেই চমকে সেটা বন্ধ করে বললেন, 'কি ব্যাপার, এমন না জানিয়ে ঘরে ঢোক কেন? সত্যি কথা, বাঙালির ভদ্রতাবোধ বলে কিছু নেই। বসো।' ফাইলটা সযত্নে ড্রয়ারে রেখে চাবি দিয়ে প্যাকেটটার দিকে তাকালেন তিনি, 'ওটা কি?'

'দশ লক্ষ টাকা। মিসেস গুপ্তার শেয়ার।' রঙ্গন রুমালে মুখ মুছিল।

'হোয়াট ?' সূর্য আঙ্কল চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছিলেন, 'তুমি ওই প্যাকেটটা নিয়ে রাস্তা দিয়ে হেঁটে এলে ! গুড গড ?'

'আমি একা ছিলাম না।' রঙ্গন ঘটনাটা বিস্তারিত বললো।

চোখ বন্ধ করে সমস্ত ঘটনাটা শুনে সূর্য আঙ্কল বললেন, 'নো, খুব ভুল করেছ, এই টাকাটা নিয়ে তোমার এখানে আসা উচিত হয় নি।'

ঘাবড়ে গেল রঙ্গন, 'আপনাকে জানিয়েই তো গিয়েছিলাম।'

'গিয়েছিলে কিন্তু এর মধ্যে যে প্রাইভেট এজেন্সির লোক রয়েছে তা আমি জানতাম না। আমি ভেবেছিলাম ওই মহিলা সরাসরি তোমার হাতে টাকা তুলে দেবেন। কিন্তু শী ইজ প্লেয়িং ডার্টি গেম।' সূর্য আঙ্কেলের গলার স্বর শুনে ঘাবড়ে গেল রঙ্গন। এখন যদি টাকা ফেরৎ দেওয়ার কথা উনি বলেন তাহলে বিরাট বিজনেস হারাবে রঙ্গন। সে তাড়াতাড়ি বলে উঠলো, 'উনি আমার প্রটেকশনের জন্যেই এই ব্যবস্থা করেছেন। ওরা থাকায় আমার খুব সাহায্য হয়েছে।'

সূর্য আঙ্কল রঙ্গনের মুখের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে কেটে কেটে বললেন, 'এই মুহূর্তে যদি পুলিশ ওই দরজা নক্ করে তাহলে ওই টাকার মালিক হিসেবে তুমি কার নাম করবে ? কেউ যদি ডায়েরি করে থাকে তার দশ লক্ষ চুরি গেছে তাহলে জেলের ঘানি থেকে তোমাকে কে বাঁচাবে ?'

রঙ্গন আর ভাবতে পারছিল না। মিসেস গুপ্তা খামোকা এসব করতেই বা কেন যাবেন তা সে বুঝতে পারছিল না। তবে একথা ঠিক, এই টেবিলের ওপর দশ লক্ষ বেওয়ারিশ টাকা পড়ে আছে। রঙ্গনের মাথায় চট করে মতলবটা খেলে গেল, আচ্ছা, আমরা যদি ওঁর নামে শেয়ার ইস্যু করে ফেলি তাহলে এই টাকাটা আর বেওয়ারিশ থাকবে না, তাই তো ?' কথাটা শুনে সূর্য আঙ্কল হাসলেন, 'কিন্তু তুমি সেদিন বলেছিলে মহিলার পরিচিতি গোপন রাখতে। সেক্ষেত্রে ওঁর নাম আমরা খাতায় এন্ট্রি করতে পারছি না। যাক, যখন এনে ফেলেছ আজ আর কি করা যাবে। তাড়াতাড়ি টাকাটা গুণে ফেল।'

দশ লক্ষ টাকা সেই প্রথম গুণেছিল রঙ্গন। একশ টাকার নোট তবু গুণতে আঙুল ব্যথা হয়ে যায়। গোণা হয়ে গেলে দেখা গেল একদিন নোটও কম বা বেশি নেই। তখন রঙ্গন সার্টিফিকেটটার কথা সূর্য আঙ্কলকে জানাল।

'কেন ? এত তাড়াতাড়ি সার্টিফিকেটের কি দরকার ? সবাই যেমন পেয়ে থাকেন উনিও পেয়ে যাবেন। দশ লক্ষ দিয়েছেন বলে মাথা কিনে নিয়েছেন নাকি !' সূর্য আঙ্কল টাকাগুলো তার বড় ভি আই. পি. তে সাজিয়ে নিচ্ছিলেন। রঙ্গন ঘড়ি দেখল, আর বেশি সময় নেই। সে অনুনয়ের ভঙ্গিতে বললো, 'ওটা তো এমন কিছু ব্যাপার নয়। স্পেশাল কেস হিসেবে সার্টিফিকেট যদি আজই ইস্যু করেন—মানে, আমি কথা দিয়েছি।'

'কথা দিয়েছ ? গুড গড। তুমি কি মহিলার প্রেমে পড়েছ ? আহা, বেচারি নীপা ডার্লিং একথা শুনলে, দেখতে কি রকম ?'

'এ সব কি বলছেন ?' প্রায় আঁতকে উঠলো রঙ্গন।

'বয়স কত ?'

'বোঝা মুশকিল। কিন্তু আপনি নিজেই এসব কথা বলছেন।'

হো হো করে হেসে উঠলেন সূর্য আঙ্কল, অত ব্লাশ করছ কেন ? আমি ঠাট্টা করছিলাম। তবে ওই বোঝা মুশকিল বয়সগুলোই বড্ড বিপদে ফেলে। সাবধান।'

ঠিক দুঘণ্টা ফুরোবার পনের মিনিট আগে শেয়ার সার্টিফিকেট পকেটে রেখে-ছিল রঞ্জন। তর তর করে নিচে নেমে ট্যাক্সি ধরে সোজা পার্কস্ট্রিটে চলে এসেছিল সে। সেই লোকদুটোর আর কোনো হদিশ পায় নি পথে। ফার্নিরতে ঢুকেই বুকের ভেতরটা বন্ধ হবার যোগাড়। তিনি বসে আছেন।

সামনের চেয়ারে বসে সার্টিফিকেটটা এগিয়ে দিল রঞ্জন। একবারও চোখ না বুলিয়ে সেটাকে ব্যাগে ফেলে দিয়ে মিসেস গুপ্তা আর একটা খাম এগিয়ে দিলেন। একটু অবাক হয়ে খামটা নিল সে। তারপরে সন্তর্পণে মুখটা সরাতেই গ্লসি পেপারে ছাপা তিনটে নরম ছবি বেরিয়ে এল। একটায় রঞ্জন নুমার্কেটে কাগজের প্যাকেটটা আঁকড়ে ধরে আছে। দ্বিতীয়টিতে সে ট্যাক্সিতে বসে, কোলের ওপর সেই কাগজের প্যাকেট দুহাতের বেড়ে, তৃতীয়টিতে সে সূর্য আঙ্কেলের অফিসে ঢুকছে এবং হাতের সেই প্যাকেটটা ধরা।

হতভম্ব হয়ে রঞ্জন তাকাল মহিলার দিকে। এসব ছবি কখন তোলা হলো এবং কখন প্রিন্ট করে এঁর হাতে চলে এলো। মিসেস গুপ্তা খামটা ফেরত দিয়ে হেসে উঠলেন, 'আমি তোমার সঙ্গে সন্ধ্যেটা কাটাতে পারতাম। কিন্তু বিবাহিত পুরুষদের গা থেকে এমন একটা গন্ধ বের হয় যে আমার বমি করতে ইচ্ছে হয়। সরি।'

কয়েক সেকেন্ড বাদে যখন মিসেস গুপ্তার চিহ্ন ধারে কাছে নেই তখন রঞ্জন পার্কস্ট্রিটের ফুটপাতে দাঁড়িয়ে চুলে আঙুল বোলাচ্ছিল। সূর্য আঙ্কল ঠিকই বলেছেন, শী ইজ প্লেয়িং ডার্টি গেম। কিন্তু খেলাটা কি সেটাই যে জানা যাচ্ছে না।

অন্যমনস্ক রঙ্গন, নীপার ডাকে চেতনায় এল। বাঃ, নীপাকে বেশ সুন্দর দেখাচ্ছে। মনে মনে প্রশংসা করলো সে। নীপার অঙ্গে এখন সাদা সিল্কের পেলবতা যার পাড়ে ভোরের রোদের উজ্জ্বল লাবণ্য! নীপার মুখে বিরক্তি খেলা করছে, 'কি ভাবছ তখন থেকে। ডাকলেও শুনতে পাও না।'

'ভাবছিলাম। কোথায় ছিলাম আর কোথায় চলে এলাম।'

'তাই ভাবো বসে বসে। আমি ব্যাঙ্কে যাচ্ছি।'

'ব্যাঙ্কে ?'

'হ্যাঁ, দুটোয় বন্ধ হবে। আর বেশি দেরি নেই। এই গয়নাগুলো রেখে ধার নেব। ভল্টে যা আছে তাও জুড়ে দেব। ওরা হিসেব করে বলেছে আমি তিরিশ হাজার টাকার মতো লোন পেতে পারি।' নীপা দরজার দিকে পা বাড়াল।

'তুমি লোন নিয়ে কি করবে ?' চিৎকার করে উঠলো রঞ্জন।

'সেকি! তোমাকে আমি বলি নি ?'

'না, আমি কিছুই জানি না।'

'ওমা, আমি ভেবেছিলাম বলেছি। এই গয়নাগুলো বাড়িতে কিংবা ব্যাঙ্কের ভল্টে মিছিমিছি পড়ে আছে। তাই আমি ব্যাঙ্কে এগুলো জমা দিয়ে লোন নেব, বোধহয় আঠার পার্সেণ্ট ইণ্টারেস্ট নেবে ব্যাঙ্ক সেই টাকাটার উপরে।' মানে তিরিশ হাজার টাকা নিলে আমাকে পাঁচ হাজার চারশো সুদ দিতে হবে। আর আমি যদি সেই টাকাটা দিয়ে প্রজেক্টের শেয়ার কিনি তাহলে আমি পাচ্ছি চৌদ্দ হাজার চারশ। মানে নীট নয় হাজার টাকা লাভ। এতে আমাদের সংসারের আয় বাড়বে। সূর্য আঙ্কেলের সঙ্গে আমার কথা হয়ে গিয়েছে। ওঃ, খুব দেরি হচ্ছে, বাই।' নীপা চলে গেল।

ছয় মাসের মাথায় সূর্য আঙ্কেলের কোটা শেষ হয়ে গেল। হোটেলের জন্যে আর শেয়ার বিক্রি করা হবে না। কিন্তু সূর্য আঙ্কল অন্য যেসব প্রজেক্টে হাত দিচ্ছেন সেগুলোর কাজ শুরু হয়ে গেল। এখন রঙ্গনের মাসিক আয় প্রায় সাত হাজার টাকা অথচ পুরো টাকাটাই নীপার হাত দিয়ে চলে যাচ্ছে। কি করে টাকা জমানো যায় বুঝতে পারছিল না রঙ্গন।

তিন দিন হলো নীপা আর ওর মা সূর্য আঙ্কেলের সঙ্গে দিল্লী গিয়েছে। দিল্লী থেকে ওরা চলে যাবে হিমালয়ের মাঝখানে সেই হোটেলে। ওরকম অ্যাডভেঞ্চার করার জন্যে বেশ কিছুদিন থেকেই নীপা মুখিয়ে ছিল। যাওয়ার আগে ওরা দলে টানতে চেয়েছিল রঙ্গনকে। রঙ্গনের ইচ্ছে ছিল না সঙ্গে যাওয়ার : পুরো যাতায়াতের প্লেনের খরচ থেকে শুরু করে দিল্লীর হোটেলের বিল তার কাঁধে এসে চাপতো। শেষ পর্যন্ত সূর্য আঙ্কলই তাকে বাঁচালেন। তিনি বললেন, 'রঙ্গনকে আমি আমার অর্গানাইজেশনের দুনম্বর করে নিতে চাই। আমরা দুজনেই যদি একসঙ্গে শহর ছেড়ে যাই তাহলে এদিকটা কে দেখাশোনা করবে? আমার মনে হয় কলকাতা অফিসের জন্যে রঙ্গনের এখানেই থাকা উচিত।'

এর ওপর আর কথা চলে না। রঙ্গন দু'নম্বর হবে এই আনন্দে নীপা নেচে উঠেছিল, 'ওঃ আঙ্কল হাউ সুইট য়ু আর।' বলে সূর্য আঙ্কেলের কাঁধ জড়িয়ে ধরেছিল। দৃশ্যটা মোটেই ভালো লাগে নি রঙ্গনের কিন্তু ওটাকে শিশুসুলভ চাপল্য বলে মেনে নিয়েছিল।

ওরা চলে যাওয়ার পর নিজেকে সম্রাটের মতো মনে হয়েছিল রঙ্গনের। তার ওপর খবরদারি করার কেউ নেই। হাতে যে টাকা আছে তাতে মৌজ করা যাবে। আপাতত কয়েকটা দিন কোনো কাজ করবে না সে। সকাল থেকেই স্কচের বোতল নিয়ে বসেছিল তাই।

ইদানিং এই অভ্যেসটা ক্রমশঃ গাঢ় হচ্ছে। দু'তিন পেগ বাড়তে বাড়তে পাঁচ ছয়ে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। সাধারণত সন্ধ্যের পর শুরু হয় নীপার জন্যে। রাত্রে সে কখন শুচ্ছে বা খাচ্ছে তা দেখার সময় ওর নেই। রোজ পার্টি মিটিং থাকলে সেটা সম্ভবও নয়। নীপা চলে যাওয়ার পর আজ সকালে মনে হলো দিনটা স্কচ খেয়েই কাটিয়ে দেওয়া যাক। কি চাকরগুলো নাকের ডগায় ঘুরছে, এটা ভালো লাগছিল

না। কোনো হোটেলে ঘর নিয়ে দিনটা কাটালে কেমন হয়, 'রাত দিনে' ফোন করবে বলে রিসিভারের দিকে হাত বাড়াতেই সেটা বেজে উঠলো, 'হ্যালো সেইন ?'

'ইয়েস।'

'আমাকে চিনতে পারছ ?'

থমকে গেল রঙ্গন। এই গলায় কথা বললে সব মেয়েকেই এক রকম মনে হয়। কে কথা বলছে ? এই ঢংগুলো আজকাল ভালো লাগে না। সে বিরক্তি চাপল না, 'নামটা বললেই হয়। আমি খুব ব্যস্ত।'

'চমৎকার!' ওপাশে যেন দীর্ঘশ্বাস পড়ল, 'শোন, আমি তোমাকে এতদিন বিরক্ত করি নি। কিন্তু আজ খুব ইচ্ছে হচ্ছে একবার দেখতে। তুমি জানো তোমার সন্তান আমার পেটে।'

মাথার সমস্ত চুল যেন খাড়া হয়ে দাঁড়াল। মিসেস চোপরা। এই মুখটাকে একটু একটু করে বেশ ভুলে ছিল সে। রঙ্গনের সন্তান ওর পেটে।

মিথ্যে কথা। ব্যাপারটা যে সম্পূর্ণ সাজানো নয় তার প্রমাণ কি ? তাকে ফাঁদে ফেলার মতলব। কিন্তু কি জন্যে ? টাকা চাই ? প্রশ্নটা করেই নিজের মনে উত্তর দিয়ে ফেললো সে। মিসেস চোপরা টাকার জন্যে তাকে ফাঁসাবেন না। কি করে এই বিশ্বাস এলো সে জানে না কিন্তু বিশ্বাসটাকে মিথ্যে ভাবতে ইচ্ছে হচ্ছে না।

'কি চাই আপনার ?' রঙ্গন দাঁতে দাঁত চাপল।

'চাইব ? কিছু চাওয়ার নেই আমার। না চাইতেই তো শরীরে পেয়েছি। প্রতি মাসে দাসবাবু ডিভিডেন্ড এনে দিচ্ছে লুকিয়ে। আর কি চাওয়ার থাকতে পারে, তাই না ? তবু যে কি হলো, তোমাকে খুব দেখতে ইচ্ছে করছে। একবার আসবে। খুব নরম শোনাল মিসেস চোপরার গলা।

'কোথায় ?'

'আমার এখানে। যে ঘরে তুমি শেষ বার এসেছিলে।'

'চোপরা সাহেব নেই ?'

'থাকলে কি তোমাকে ডাকতে পারতাম। আজ সকাল থেকে ও খুব ব্যস্ত একটা কেস নিয়ে। সন্ধ্যের আগে ফিরতে পারবে না।'

'তুমি বাইরে এসো, এই ধরো রাত দিনে।' রঙ্গন ওই বাড়িটার কাছাকাছি হতে চাইছিল না। সে নিজে ক্রিমিন্যাল নয়। মিসেস চোপরা চেয়েছিল বলেই সেই ঘটনাটা ঘটে গিয়েছিল। তবু বারবার ওই ঘরে যাওয়ার কোনো অর্থ নেই।

'আমার পক্ষে বেশী হাঁটাহাঁটি সম্ভব নয় যে।'

'কেন ?'

'এসেই দেখ। তোমার ভয় নেই চোপরা ফিরবে না। সে ক্লায়েন্টের কেস তাকে তুমিই এনে দিয়েছিলে। ওর কেস নাকি খুব খেটে করতে হয়।'

'কার কেস ?' রঙ্গনের গলায় নিরাসক্তি।

'সেই যে মিস্টার গুপ্তা যার প্রচুর টাকা আছে।'

মাথার ভেতরটা ঝনঝন করে উঠলো রঙ্গনের। চোপরার সঙ্গে মিস্টার গুপ্তার

যোগাযোগ হয়েছে। তাকে বাদ দিয়ে চোপরা কাজ করছে? গুপ্তা বলেছিল যে সে নিজের পরিচয় গোপন রাখতে চায়; এক্ষেত্রে কি হলো? রঞ্জনের মনে হচ্ছিল এরা দুজন তাকে লেঙ্গি দিয়েছে। উত্তেজনাটা মাথার মধ্যে হঠাৎ এমন পাক খেল যে, সে চিৎকার করে উঠলো, 'অলরাইট, আমি যাচ্ছি।'

আর তখনই কলিং বেল বেজে উঠলো। রিসিভার নামাতে নামাতে রঞ্জন শুনলো চাকরটা ছুটে যাচ্ছে দরজা খুলতে। এখন মাত্র এগারটা। এই সময়ে আবার কে এল! স্কচের গ্লাসটা তুলে এক চুমুকে খালি করে হাতে উল্টো পিঠ দিয়ে ঠোঁট মুছল রঞ্জন। চাকরটা তখন দরজায়, 'সাব অফিসবালা মেমসাব আয়া।'

চোখ কুঁচকে তার দিকে তাকাল রঞ্জন। অফিসবালা মেমসাব! মানে আত্রেয়ী! সোফা ছেড়ে উঠতে গিয়ে মনে হলো বেশী কষ্ট হবে। এইভাবে গা এলিয়ে শুয়ে থাকাতেই আরাম। সে ইশারা করলো ওকে ভেতরে পাঠিয়ে দেওয়ার জন্যে। চোখের পলক ফেলতে না ফেলতেই আত্রেয়ী দরজায়, 'মর্নিং; এভাবে বিরক্ত করার জন্যে দুঃখিত। আমি টেলিফোনও করতে পারতাম কিন্তু পাশের ঘর থেকে টেলি-ফোনে কথা বলবো বিশেষ করে আপনি যখন একা।' মোহিনীহাসি হাসবার চেষ্টা করলো আত্রেয়ী।

নেশা যে হয়েছে তা বুঝতে পারছে রঞ্জন নইলে আত্রেয়ীকে তার সুন্দর লাগছে কেন? শরীরে সম্পদ আছে মেয়েটার কিন্তু মুখ? ওই মুখের দিকে তাকালে অন্ধ না হলে হৃদয়ে প্রেম জাগা মুশকিল। হাত বাড়িয়ে সোফা দেখিয়ে দিল রঞ্জন, 'বসো।'

'বাঃ কি সুন্দর আপনি বললেন। এতদিন ধরে যে কেন অমন ব্যবহার করেছিলেন বুঝতে পারছিলাম না। মিসেস সেনকে এত ভয় করেন আপনি!' বলতে বলতে সোফায় শরীর এলিয়ে দিয়ে পায়ের ওপর পা তুলে দিল আত্রেয়ী। তারপর বললো, 'কি খাচ্ছেন, স্কচ?'

'খাবে?'

'উহুঁ। ওটি পারব না। সূর্য পারে নি আমাকে খাওয়াতে তো আপনি! যাক, যে জন্যে এসেছিলাম, আপনি সূর্যের কাছ থেকে কোনো খবর পেয়েছেন!'

'কি খবর? ওরা ঠিকঠাক পৌঁছেছে কিনা? কোনো দরকার নেই আমার।'

হেসে উঠলো আত্রেয়ী, 'খুব সাহস দেখছি। সূর্য বলেছে আপনাকে রাস্তা থেকে তুলে এখানে বসিয়েছে ও। তখন খুব বোকা ছিলেন আপনি।'

'সূর্য আঙ্কল একথা বলেছে! আমি বিশ্বাস করি না।' রঞ্জনের গলার স্বর জড়িয়ে আসছিল 'কিন্তু তুমি ওকে সূর্য সূর্য বলো কেন? হি ইজ আওয়ার বস। তাছাড়া তোমার চেয়ে অনেক বড় বয়সে।'

আবার খিলখিলিয়ে হেসে উঠলো আত্রেয়ী। হাসির দমকে কাঁধ থেকে আঁচল গেল খসে। বিশাল কিন্তু তীক্ষ্ন স্তন কাঁপছিল থরথরিয়ে। আঁচলটা টেনে নিতে নিতে হাসি থামাল সে, 'আমরা বন্ধু। এই শরীরটার জন্যে আমি বন্ধুত্ব কিনেছি। অতএব আমার সঙ্গে ওর সম্পর্ক খুব নিবিড় বুঝলেন মশাই। আপনার সঙ্গে

বাজে কথা বলতে আমি আসি নি। কাল থেকে সূর্যকে ট্রাংক কল করে করে আমি হয়রান হয়ে গেলাম। আপনার স্ত্রী শাশুড়ীকেও লাইনে পাচ্ছি না। যে হোটেলে ওদের ওঠার কথা সেখানে ওরা ওঠে নি।

বোতল থেকে আর কিছুটা গ্লাসে ঢেলে জল মিশিয়ে রঙ্গন বললো, 'দিল্লীতে হোটেল একটাই নেই। এ নিয়ে চিন্তা করার কোনো মানে হয় না।'

আত্রেয়ী ব্লাউজের ভেতর থেকে রুমাল বের করে সযত্নে চিবুকের ঘাম মুছল, 'মানে হতো না যদি গতকাল হেড অফিসে ফোন করে কানেকশন পেতাম। রিং হচ্ছে অথচ কোনো স্টাফ ধরছে না। ফলে নিজেই গেলাম সেখানে। সামনের মাস শুরু হতে তিন দিন বাকি। ডিভিডেন্ড যাদের দিতে হবে তাদের লিস্ট সময়মতো পাঠিয়ে দিয়েছে। সেটা সূর্য এ্যাপ্রুভ না করে গেলে মুশকিলে পড়তে হবে। গিয়ে দেখলাম অফিসের দরজায় তালা ঝুলছে। স্টাফরা সামনে ভিড় করে দাঁড়িয়ে। কে তালা দিল, চাবি কার কাছে কেউ বলতে পারছে না। সূর্যের সঙ্গে কথা না বললে তালা ভাঙতেও পারছি না। সমস্ত ব্যাপারটাই রহস্যজনক। তাই ট্রাঙ্ককলে সূর্যকে খুঁজেছি, এবার বুঝতে পারছেন?'

এক ঢোঁক হুইস্কি গলা দিয়ে চালান করতে করতে রঙ্গন বললো, 'কেউ হয়তো ইয়ার্কি মেরেছে। তালা ভেঙে ফেলুন।'

'আপনি হুকুম দিচ্ছেন!'

'ইয়েস।'

'কিন্তু সূর্য—?'

'ওফ্। আমি এই অর্গানাইজেশনের নাম্বার টু। আমি যখন বলছি, তখন আপনার দ্বিধা হচ্ছে কেন? সূর্য আঙ্কেলের সঙ্গে আপনার যা সম্পর্কই থাকুক এখানে আমি আপনার সিনিয়র। যান, যা বলছি তাই করুন।'

চিৎকার করে উঠলো রঙ্গন।

'বেশ। কিন্তু আপনি রিটন অর্ডার দিন।

'কেন? আমার মুখের কথার দাম নেই! ও, অফিসিয়াল রেকর্ড। আপনাকে দেখে তো মনে হয় না বুদ্ধির ব্যবহার জানেন। বেশ, ওখানে কাগজ কলম রয়েছে, লিখে আনুন সই করে দিচ্ছি।' হাত বাড়িয়ে টেবিলটা দেখিয়ে দিল রঙ্গন।

স্প্রিং-এর মতো উঠে গেল আত্রেয়ী। টেবিলে ঝুঁকে খসখস করে লিখে নিয়ে রঙ্গনের সামনে বাড়িয়ে দিল। রঙ্গন ওর মুখের দিকে তাকিয়ে বিড় বিড় করলো, 'আর কি বললে, এ মাসে ডিভিডেন্ড দেওয়া যাবে না? তাহলে তো তালা ভাঙতেই হবে।' হাত বাড়িয়ে কাগজটা নিল সে। রঙ্গন সেন এই মর্মে হুকুম দিচ্ছে যে তালা ভেঙে অফিসের স্বাভাবিক কাজকর্ম শুরু করতে। তলায় সই করে দিল রঙ্গন। হঠাৎ ওর মনে হলো নেশার ভাব যেন খুব দ্রুত পাতলা হয়ে যাচ্ছে। আত্রেয়ী চলে যাচ্ছিল, রঙ্গন ডাকল, 'শোন, যেভাবেই হোক তুমি ব্যাপারটা ম্যানেজ কর। আমি তোমার ওপর নির্ভর করছি।'

আত্রেয়ী চলে যাওয়ার পর কিছুক্ষণ ঝুম হয়ে পড়ে রইলো রঙ্গন। ব্যাপারটা কি হলো। সূর্য আঙ্কল কি এসব জানেন? আজ বাদে কাল শেয়ার হোল্ডাররা

ডিভিডেণ্ড নিতে আসবে তাদের সামলাবে কে ? কোথাও নিশ্চয়ই ভুল হয়ে গেছে। তেমন দরকার হলে আজ বিকেলের ফ্লাইটে সে দিল্লী যাবে। হুইস্কির বোতলের দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়ল সে ; তারপর উঠে দাঁড়াল।

ফ্ল্যাটের দরজা পেরিয়ে বারান্দায় পা দিয়ে রঞ্জন দেখল অফিসের দরজা খোলা। ঘোষকে দেখতে পেল সে। কিছু একটা টাইপ করছে। ওকে দেখে মুখ তুলতেই রঞ্জন বললো, 'আত্রেয়ীকে বলবেন দিল্লীতে কনট্রাক্ট করতে। যে করেই হোক। নইলে আজ সন্ধ্যের ফ্লাইটে আমি সেখানে যাব।'

রাস্তায় নেমে দাঁড়াতেই একটা গাড়ির দরজা খুলে গেল। এই গাড়ি তার কিন্তু পছন্দটা নীপার। ড্রাইভারও ওরই পছন্দের। ঠিকানাটা বলে রঞ্জন চোখ বন্ধ করলো। সবই নীপার, সে শুধু পাহারা দিয়ে বেড়াচ্ছে। কিন্তু নীপা আর ওর মা গেল কোথায় ! কোন্ হোটেলে উঠেছে ওরা ? নীপাও পেঁৗছে ফোন করতে পারত। এমনও হতে পারে ওরা দিল্লীতে পা দিয়েই হিমালয়ে চলে গিয়েছে। ফলে আত্রেয়ী টেলিফোনে ধরতে পারছে না।

গাড়িটা থামতে খেয়াল হলো রঞ্জনের। ড্রাইভারকে অপেক্ষা করতে বলে সে সিঁড়ি ভেঙে ওপরে চলে এলো। দাসবাবু খাতা লিখছেন। ওকে দেখে নমস্কার করে বললেন, 'কি আশ্চর্য ! আপনি এখানে স্যার ?'

'দরকার আছে। চোপরা কোথায় ?' খুব নিরাসক্ত গলায় বললো রঞ্জন।

'সাহেব তো গুপ্তা সাহেবের কেস নিয়ে ব্যস্ত। একটু আগে ফোন করেছিলেন, চারটে নাগাদ ফিরবেন। বসুন স্যার।'

'আপনারা যে শেয়ার কিনেছেন তা চোপরা জানে ?'

'না স্যার ! মিসেস চোপরা অবশ্য জানান নি।'

'উনি আছেন ?'

'নিশ্চয়ই। এখন তো ওঠা নামা করা ডাক্তারের বারণ।' কথাটা শেষ করে দাসবাবু হাসলেন কিনা বুঝতে পারল না রঞ্জন। সে আর সময় নষ্ট না করে তেতলায় উঠে এসে বেলে হাত দিল। কয়েক মুহূর্ত অপেক্ষার পর দরজা খুললো। মিসেস চোপরা উজ্জ্বল মুখে হাসলেন, 'এসো। কি ভাগ্য আমার।'

রঞ্জন অবাক হয়ে দেখছিল। কি বেটপ চেহারা হয়েছে মিসেস চোপরার। ওই রোগা শরীরের মধ্যদেশ স্ফীত হয়েছে এমন বিকট ভাবে যে যে-কোনো মুহূর্তেই ফেটে পড়তে পারে। মুখ শুকিয়ে আরও ছোট্ট হয়ে গিয়েছে। সমস্ত সত্তা একসঙ্গে দুমড়ে উঠলো। রঞ্জন কোনো রকমে বললো, 'কেন ডেকেছেন ?'

'দরজায় দাঁড়িয়ে থেকো না। ভেতরে এসো। ও এখন ফিরছে না।'

ফিরে যেতে গিয়েও পারল না রঞ্জন। ঘরে ঢুকে সোফায় এমন সংকুচিত হয়ে বসল যে সেটা মিসেস চোপরার দৃষ্টি এড়াল না। দরজা বন্ধ করে মিসেস চোপরা বললেন, 'আমি খুব খারাপ দেখতে হয়ে গেছি, তাই না ?' এ প্রশ্নের কি জবাব দেবে রঞ্জন।

খুব সন্তর্পণে উল্টো দিকের সোফায় বসে মিসেস চোপরা বললেন, 'তুমি কেমন আছ ?'

'ভালো। কি ব্যাপার ?'

'উঁহু মিথ্যে কথা বলছ। ভালো থাকলে কেউ মদ খায় না।'

রঙ্গন বুঝল তার নেশা কেটে গেলেও গন্ধ ছাড়ে নি। সে হাসল, উঁচু তলায় ভালো থাকলেই মদ খেতে হয়।'

'তাই হবে হয় তো, আমি জানি না' তারপর নিজের পেটে হাত রেখে মিসেস চোপরা বললেন, 'আজ সকাল থেকে অনবরত লাথি খাচ্ছি। এ ছেলে না হয়ে যায় না। তাই তোমার কথা মনে হচ্ছিল। চোপরা তো কোনোদিন আমাকে মা করতে পারত না, তোমার কাছে আমার ঋণের শেষ নেই। আমি জানতাম ডাকলে তুমি আসবেই। আমার একটা ইচ্ছে পূর্ণ কর।'

'কি ?' সন্দিগ্ধ চোখে তাকাল রঙ্গন। একদিনের আনন্দের বিনিময়ে এতসব বোঝা যদি বইতে হয়—! মিসেস চোপরা ধীরে ধীরে ভেতরে উঠে গেলেন। রহস্যটা বুঝতে পারছিল না রঙ্গন। মতলবটা কি ? আর কোনো ফাঁদে পা বাড়াচ্ছে না সে। এখন শরীরের যা অবস্থা ওসব বাসনা নিশ্চয়ই হবে না। মিসেস চোপরা দরজায় এসে দাঁড়ালেন, 'এসো !'

রঙ্গন ওকে অনুসরণ করে পাশের ঘরে গিয়ে হকচকিয়ে গেল। টেবিলে খাবার দেওয়া হয়েছে। অন্তত দশ বারো রকম মেনু। মিসেস চোপরা লাজুক হাসল, 'এ সবই আমার বানানো। কেমন হয়েছে জানি না। তুমি খেতে বসো !'

'আমি ? আমি খাব ?' আঁতকে উঠল রঙ্গন।

'হ্যাঁ। তোমাকে খাওয়াব বলে এত রেঁধেছি। তুমি খাবে আর আমি দেখব, বড় সাধ আমার। তোমাকে আমার সাধ মিটিয়ে খাওয়াতে পারলে এর মঙ্গল হবে।' নিজের পেটে পরম মমতায় হাত রাখলেন মিসেস চোপরা।

রঙ্গনের মনে হলো একটি অশরীরী অস্তিত্ব তাকে স্পর্শ করেছে। মিসেস চোপরার হাসি, ওই স্ফীত উদর এবং ভাবী সন্তানের কথা সেই স্পর্শটাকে আরও উশকে দিচ্ছিল। এখান থেকে পালিয়ে যাওয়া দরকার। সে বললো, 'আমাকে যেতে দিন, এসব খাওয়ার সময় নেই।'

'তুমি খাবে না ?' প্রায় আর্তনাদ করে উঠলেন মিসেস চোপরা।

'না। তাছাড়া এরকম পাগলামো আর করবেন না।' মুখ ঘুরিয়ে কথাগুলো ছুঁড়ে দিল রঙ্গন। সঙ্গে সঙ্গে ওই শরীর নিয়ে প্রায় ছুটে এলেন মহিলা, 'তুমি খাবে না ?' ওঁর চোখ বিস্ফারিত। সমান হয়ে আসা বুক ওঠা নামা করছে, 'আমি পাগল ?'

রঙ্গন মিসেস চোপরার চেহারা দেখে ঘাবড়ে গেল। এই রূপ কখনও দেখেনি সে। এক পা পিছিয়ে গিয়ে কথা ঘোরাবার চেষ্টা করলো. 'এখন তো খাওয়ার সময় নয়। তাছাড়া আমাকে লুকিয়ে এইভাবে খাওয়ানো ঠিক নয়।'

'ঠিক নয় ? ও, যেদিন টাকার লোভে লুকিয়ে এসে আমাকে ভোগ করে চলে গেলে সেদিন সেই ঠিক বেঠিক কোথায় ছিল। কোথায় ছিল বলো ?' রঙ্গনের দু'হাত ধরে ঝাঁকুনি দিলেন মিসেস চোপরা।

'কিন্তু সেদিন কি পুরোটাই আমার ইচ্ছেয় হয়েছে ?' নিজেকে বাঁচাবার শেষ

চেষ্টা করলো রঙ্গন। চোখ বড় বড়, মুখে অদ্ভুত হাসি ফুটলো মিসেস চোপরার, 'দু'হাত না হলে তালি বাজে না। জানি। কিন্তু আমি ভেবেছিলাম চোপরা খুব খুশি হবে। ও হয় তো বুঝতে পারবে না কিছু। কিন্তু আমি হেরে গেলাম। চোপরা আমার কাছে খুশি হবার ভান করে।'

'ভান করে ?' রঙ্গন আর্তনাদ করে উঠলো, 'কি করে বুঝলেন ?'

'মেয়েরা বুঝতে পারে। এই সন্তান যে ওর নয় সেটা বোঝাবার জন্যে ও বেশি রকমের বাড়াবাড়ি করে। কিন্তু তা হোক, তোমাকে ওই খাবার পুরোটা খেয়ে তবেই এখান থেকে যেতে হবে।' চোখ পাকালেন মিসেস চোপরা।

'আপনি অবুঝ হবেন না—।' রঙ্গন বাইরের ঘরে যাওয়ার জন্যে পা বাড়াতেই মিসেস চোপরার কণ্ঠ উচ্চগ্রামে উঠলো, 'দাঁড়াও। যদি তুমি আমার কথা না শোন তাহলে আমি চেঁচিয়ে বলবো তুমি আমার ইজ্জত নিয়ে যাচ্ছ।' ওই দৃষ্টির সামনে দাঁড়িয়ে রঙ্গনের মনে হলো তার মেরুদণ্ড যেন কেউ খুলে নিয়েছে। থপথপে পা ফেলে খাবার টেবিলে ফিরে গেল সে। সুস্বাদু কিন্তু রঙ্গনের কাছে স্বাদহীন, খাবারগুলো যন্ত্রের মতো মুখে তুলতে লাগল সে। খানিকটা দূরে একটা চেয়ারে বসে পরম তৃপ্তির সঙ্গে এই দৃশ্যটা গিলতে লাগল মিসেস চোপরা। রঙ্গনের মনে হলো যে নিজেই নিজের পিণ্ড খাচ্ছে।

চোখ বন্ধ করে গাড়ির পেছনের দিকে পড়েছিল রঙ্গন। সমস্ত শরীর গুলিয়ে উঠছে। ওই উন্মাদ রমণী সমস্ত খাবার তাকে খেতে বাধ্য করেছে। একটু বমি করতে পারলে ভালো হতো। রঙ্গনের মনে হচ্ছিল এই এক ঘণ্টায় ওর বয়স যেন কুড়ি বছর বেড়ে গিয়েছে। ড্রাইভার গাড়িটা থামানোমাত্র একটি উত্তেজিত কণ্ঠস্বর শোনা গেল, 'স্যার, স্যার, থামবেন না ভীষণ বিপদ।'

রঙ্গন চোখ খুলল। গাড়ির দরজায় ঘোষকে দেখতে পেল সে। উত্তেজনায় থর থর করে কাঁপছে। সে কিছু বলার আগেই গাড়ির দরজা খুলে উঠে পড়ল ঘোষ, 'চালাতে বলুন স্যার, এখান থেকে বেরিয়ে যেতে বলুন।'

ড্রাইভার বিস্মিত চোখে ওদের দেখছিল, রঙ্গন ইঙ্গিত করলো চালাতে; গাড়ি ডালহৌসি স্কোয়ারে ঘুরে দক্ষিণের দিকে মোড় নিতে ঘোষবাবু যেন একটু শান্ত হলেন, 'সর্বনাশ হয়ে গিয়েছে স্যার।'

একটুও নড়ল না রঙ্গন। তার পেটের ভেতর গোলাচ্ছে, শুধু ইশারায় জিজ্ঞাসা করলো, 'কি ব্যাপার ?'

'সি. বি. আই.।' ঘোষবাবু যেন হেঁচকি তুললেন।

সঙ্গে সঙ্গে কপালে ভাঁজ পড়ল রঙ্গনের, 'সি. বি. আই. ?'

'হ্যাঁ স্যার। হেড অফিসে রেইড হয়েছে। ওরা সিল করে দিয়েছে। মিস রায় একটুর জন্যে বেঁচে গেছেন। আপনার অর্ডার নিয়ে ওখানে গিয়ে তালা ভেঙে কাজ শুরু করে দিয়েছিলেন উনি। আমাদের অফিস থেকে যে লিস্ট পাঠানো হয়েছিল সেইটে তার চেক বই নিয়ে বেরিয়ে আসার সময় রেইড শুরু হয়। ওকে ওরা বুঝতে পারেন নি। বাইরে থেকে আমায় টেলিফোন করেন মিস রায়। সমস্ত কাগজপত্র নিয়ে 'খাদি গ্রামদ্যোগ'-এর কাছে চলে আসতে বলেন। আমি সেগুলো

ও'র হাতে পৌঁছে দিয়ে আপনার জন্যে অপেক্ষা করছিলাম।' এক নিঃশ্বাসে কথাগুলো বলে গেলেন ঘোষবাবু। 'কি হবে স্যার ? আমার যে পাঁচ হাজার টাকার শেয়ার কেনা আছে।'

'সি. বি. আই. রেইড করতে গেল কেন ?'

'জানি না স্যার। যে-কোনো মুহূর্তে আপনার ফ্ল্যাটের অফিসে আসতে পারে। আমি এখন কি করব ?' প্রায় কেঁদে ফেললেন ঘোষবাবু।

ঘাবড়াচ্ছেন কেন ? নিশ্চয়ই কোনো ভুল হয়েছে।' সোজা হয়ে বসল রঙ্গন. 'মিস রায় কোথায় ?'

'উনি 'রাত দিন' হোটেলে আপনার জন্যে অপেক্ষা করছেন।'

'রাত দিন' ? চমকে উঠল রঙ্গন। এই হোটেলটার কথাই না আজ সকালে সে ভেবেছিল ? কি করে যে মিলে যায়।

ঘোষবাবু বললেন, 'ওখানে বড় সাহেবের সারা বছরের জন্যে ঘর নেওয়া আছে। আমি এই মিস রায়কে খুব খারাপ ভাবতাম, কিন্তু স্যার উনি আজ খুব খেটেছেন।'

'ঠিক আছে। আপনি এখানে নেমে যান। সন্ধ্যে পর্যন্ত আমাদের অফিসের সামনে থাকবেন। যদি দ্যাখেন সি. বি. আই. ওখানেও গিয়েছে তাহলে 'রাত দিনে' চলে আসবেন। বুঝলেন ?' রঙ্গন ড্রাইভারকে থামতে বললো।'

'স্যার, ওখানে যেতে আমার ভয় করছে।'

'কোনো ভয় নেই। আড়াল থেকে দেখবেন। যান।' গাড়ি থেকে প্রায় জোর করে ঘোষবাবুকে নামিয়ে দিয়ে রঙ্গন 'রাত দিনে' চলে এল। রিসেপসনে এগিয়ে যেতে যেতে ওর খেয়াল হলো সূর্য আঙ্কল যদি নিজের নামে ঘর বুক না করে থাকেন। কি করা যায় ?

রিসেপসনিস্ট চোখ না তুলে বললেন, 'বলুন।'

'আমার নাম রঙ্গন সেন। কোনো ইমফরমেশন কেউ রেখেছেন ?'

ঘরের নম্বরটা বলে কাজ করতে লাগলেন ভদ্রলোক। মুখ তুলে দেখবার প্রয়োজন বোধ করলেন না। রঙ্গন বুঝল ও'দের এরকম অভিজ্ঞতা আছে। নির্দিষ্ট ঘরের দরজার বোতাম টিপতেই কেউ খুললো না। দ্বিতীয়বার টেপার পর সটান পাল্লা টেনে ধরল আত্রেয়ী। রঙ্গনকে দেখে ওর আর একটা হাত বুক থেকে নেমে এলো, 'ও, আপনি। আসুন।'

ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করলো রঙ্গন। আত্রেয়ী ততক্ষণে ফিরে গেছে বিছানায়। রঙ্গন দেখল বিছানার পাশে রাখা এ্যাশট্রেতে সিগারেট জ্বলছে। সেটাকে দু'-আঙুলে তুলে নিয়ে আত্রেয়ী বললো, 'শেষ পর্যন্ত শেষের সেদিন চলে এলো। সূর্য না এলে আমরা কেউ বাঁচব না।'

'মানে ?' চিৎকার করে উঠলো রঙ্গন।

'সি. বি. আই. এখন আমাদের খুঁজবে।'

'বাট হোয়াই ?'

'পাবলিকের টাকা নিয়ে প্রতারণা করেছে সূর্য আর আমি আপনি ওকে সেই

প্রতারণা করতে সাহায্য করেছি। না, আমাদের পালাবার কোনো উপায় নেই যদি সূর্য এসে সামাল না দেয়। ওকি, আপনি ওরকম করছেন কেন?' এগিয়ে এল আত্রেয়ী। ততক্ষণে দৌড়ে টয়লেটে ঢুকে পড়েছে রঙ্গন। হড় হড় করে মুখ থেকে বেরিয়ে আসছে ঠেসে পোরা খাবার আর স্কচ।

সমস্ত পেট খালি হয়ে যাওয়ার পর যেন ধাতস্ত হলো রঙ্গন। তোয়ালেতে মুখ মুছে ঘুরে দাঁড়াতেই সামনে আত্রেয়ী, 'কী হলো?'

মাথা নেড়ে রঙ্গন বললো, 'কিছু না।' তারপর ঘরে ঢুকে বিছানায় শরীর এলিয়ে দিল ধীরে ধীরে। আত্রেয়ী ঘরের মাঝখানে এসে কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়াল, 'আপনি এখনও ড্রাংক?'

মাথার ভেতরটা কিছুতেই পরিষ্কার হচ্ছে না কিন্তু শরীর আচমকা দুর্বল হয়ে পড়ল। রঙ্গন তবু চোখ খুললো, 'না, ড্রাংক নয়।'

কাঁধ ঝাঁকাল আত্রেয়ী। কথাটা বিশ্বাস করতে অসুবিধা হচ্ছে ওর।

চোখের ওপর থেকে হাত সরাল রঙ্গন, 'বলুন।'

'আপনি কি বিপদটা বুঝতে পেরেছেন?'

'না। সি. বি. আই. কেন রেইড করছে?'

'আমরা পাব্লিক মানি নিয়ে প্রতারণা করছি।'

'আমরা? কি বলছেন আপনি?'

'সি. বি. আই.-এর তাই ধারণা।'

'ধারণা হলেই হবে? প্রমাণ কোথায়? তাছাড়া পাব্লিক টাকা দিয়েছে নিজে থেকে, আমরা জোর করে নিই নি। তাছাড়া প্রত্যেককে আমরা নিয়মিত ডিভিডেণ্ট দিচ্ছি। ওই টাকায় হোটেল প্রায় শেষ হয়ে এলো। উত্তেজনায় উঠে বসল রঙ্গন, 'নো নো, আমাদের কোর্টে যাওয়া উচিত।'

আত্রেয়ী খুব ধীরে ধোঁওয়া ছাড়ল, 'সেই হোটেল আপনি নিজের চোখে দেখেছেন? কোন্ আইনে আছে বিজনেস শুরু হবার আগেই ডিভিডেণ্ট দিতে হবে, তাহলে দিচ্ছিলাম কেন?'

'হোটেল নেই!' রঙ্গনের নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে এলো।

'আমি জানি না। তবে অফিসের দরজায় যখন তালা দিয়ে গিয়েছে তখন সূর্য জানে এরকম একটা হবে। আমার মন বলছে সে আর ফিরবে না।' আত্রেয়ী সিগারেটের অবশিষ্টটুকু এ্যাসট্রেতে গুঁজলো, 'রঙ্গন। সূর্য আমাদের সঙ্গে খেলা করতেও পারে।'

'কি যা তা বলছ! সূর্য আঙ্কল নীপার মায়ের ঘনিষ্ঠ পরিচিত। এধরনের সন্দেহ করার জন্য তোমাকে জবাবদিহি করতে হবে। রঙ্গন উঠে দাঁড়াল বিছানা ছেড়ে।

'আমি কিছুই বলছি না, সম্ভাবনার কথাগুলো জানাচ্ছি। রঙ্গন, আমি তোমার চেয়ে সূর্যকে ভালো করে চিনি।'

'কি চেন? এইসব প্রজেক্টের কথা ভাঁওতা?'

'আমার বিশ্বাস করতে কষ্ট হতো। ব্যবসা শুরু হবার আগেই কি করে

ডিভিডেন্ট দিচ্ছিল সূর্য ? আমি ওকে জিজ্ঞাসা করেও সঠিক উত্তর পাই নি। ওই হোটেলের কথাই আমরা শুনেছি কিন্তু কেউ চোখে দেখি নি। আর এই তালা দেওয়ার কথাটা আমি ভুলতে পারছি না।'

'তুমি আর কি জানো ?'

'আমি ? আমি আর কিছুই জানি না। এতক্ষণে সি. বি. আই. বোধহয় আমার চেয়ে অনেক বেশী জেনে গেছে। কিন্তু আমি সূর্যকে ছাড়ব না। ও আমাকে কথা দিয়েছিল দিল্লী থেকে ফিরে এসে আমাকে দু'লক্ষ টাকা দেবে। এখন আমি বুঝতে পারছি।' থামল আত্রেয়ী। তারপর ড্রেসিং টেবিলের সামনে এগিয়ে গিয়ে নিজেকে দেখতে লাগল।

'কেন তোমাকে দু'লক্ষ টাকা দেবে সূর্য আঙ্কল ?'

'আমি সন্দেহ করতে আরম্ভ করেছিলাম, তাই। কিন্তু তুমি কি করবে রঙ্গন ? কত টাকার শেয়ার বিক্রি করেছ তুমি ?'

'আমি ?' রঙ্গনের দুটো ঠোঁট হাঁ হয়ে গেল।

'যারা শেয়ার কিনেছে তারা এসে তোমার কাছে টাকা ফেরত চাইবে। তাদের কি জবাব দেবে তুমি ?'

সঙ্গে সঙ্গে ভেঙে পড়লো রঙ্গন। দুহাতে মুখ ঢেকে বিছানায় গড়িয়ে পড়ল সে। সমস্ত শরীর কেঁপে কেঁপে উঠেছিল তার। কেউ যেন এই মুহূর্তে মুরগীর গলাটা ছিঁড়ে ধড়টা ছুঁড়ে ফেলেছে। কিছুক্ষণ বাদে আত্রেয়ীর হাতের স্পর্শ পেল রঙ্গন। আত্রেয়ী যে ওর পাশে এসে বসেছে তা টের পায় নি। 'রঙ্গন। এভাবে ভেঙে পড়ো না। আমরা এখনও কিছুই জানি না। সূর্যকে বের করতেই হবে। একটাই ভরসার কথা ওর সঙ্গে তোমার স্ত্রী এবং শাশুড়ী রয়েছে। সুতরাং তাকে ফিরতেই হবে।'

রঙ্গনের চোখের সামনে তখন অনেক মুখ। দাসবাবু, মিসেস চোপরা থেকে শুরু করে অনেক অনেক পাঁচ দশ হাজার রাখা মানুষগুলো যেন চোখের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। এবং এদের সবাইকে সরিয়ে দিয়ে মিসেস গুপ্তা এবং তার পেছনে সেই লোক দুটো এগিয়ে এল। পাগলের মতো চিৎকার করে কেঁদে উঠতেই আত্রেয়ী দু'হাতে রঙ্গনকে জড়িয়ে ধরলো, 'রঙ্গন, শান্ত হও, এখন ব্যালান্স হারালে আর কখনও মাথা তুলতে পারবে না। আমাদের সমস্ত ব্যাপারটা ঠান্ডা মাথায় ভাবতে হবে। তুমি আমার সঙ্গে হাত মেলাও, আমরা যে করেই হোক রাস্তা খুঁজে বার করবো।'

রঙ্গন ধীরে ধীরে মুখ তুললো, 'যদি পুরো ব্যাপারটা ভাঁওতা হয় তাহলে আমি ওকে খুন করবো। ওর চেহারা এমন বীভৎস দেখাচ্ছিল।

আত্রেয়ী বললো, 'তুমি কি জানো তোমার শাশুড়ীর সঙ্গে ওর কি সম্পর্ক ?'

'ওরা পারিবারিক বন্ধু।'

'তাই যদি হবে তোমার শ্বশুর নিশ্চয়ই ওর খবর রাখেন। ওঁকে একবার টেলিফোন করে জিজ্ঞাসা কর না।' আত্রেয়ী খুব ধীরে ধীরে রঙ্গনের বুকে হাত বোলাচ্ছিল। তড়াক করে উঠে টেলিফোনটা টেনে নিয়ে অপারেটরকে নম্বর বললো

রঙ্গন। ওপাশে রিং হয়ে যাচ্ছে। বুড়ো কোথায়? মিনিট খানেক বাদে খুব বিরক্ত শুনতে পেল সে, 'কে?'

টেলিফোন তুলে ইনি হ্যালো বলেন না। কোনোরকম ভনিতা না করে সে জিজ্ঞাসা করলো, 'দিল্লী থেকে কোনো খবর পেয়েছেন?'

'না। কে বলছেন?'

'আমি রঙ্গন। সূর্য আঙ্কল সম্পর্কে আপনি কি জানেন?'

'কে রঙ্গন! মাই গড! তুমি দিল্লী যাও নি?'

'না। সূর্য আঙ্কল আপনার কিরকম বন্ধু।'

সূর্য তো আমার বন্ধু নয়। ও তো তোমার শাশুড়ীর পরিচিত।'

'তাই নাকি!' আপনার স্ত্রীর সঙ্গে ওর কি সম্পর্ক?'

'এসব কথা আমাকে জিজ্ঞাসা না করলেই পারতে রঙ্গন। আমি যতটুকু জানি তোমার শাশুড়ীর সঙ্গে বিয়ের আগে ওর আলাপ ছিল। বহুদিন বাইরে থাকায় মাঝখানে যোগাযোগ ছিল না। কিন্ত এসব প্রশ্ন তুলছ কেন? তোমাদের ফ্ল্যাট নিয়ে গোলমাল হয়েছে কিছু?'

'ফ্ল্যাট?'

'হ্যাঁ। সূর্যবাবু একটা নির্দিষ্ট সময়ের জন্যে ওই ফ্ল্যাটটা ভাড়া নিয়েছিলেন শুনেছিলাম। আমি তোমার শাশুড়ীকে বলেছিলাম সূর্যকে বলে তোমাদের কারো নামে ট্রান্সফার করে দিতে। সেই ব্যাপারে কিছু হয়েছে?'

রঙ্গন অসহায় চোখে আত্রেয়ীর দিকে তাকাল। আত্রেয়ী বিছানায় টানটান হয়ে শুয়ে এদিকে তাকিয়ে আছে। ওপাশ থেকে নীপার বাবা বলে চলেছেন, রঙ্গন, কথা বলছ না কেন? রঙ্গন, শুনতে পাচ্ছ?'

'ওর এখানে কোনো আস্তানা আছে?'

'আমি জানি না। কিন্তু তুমি ওদের সঙ্গে দিল্লীতে যাও নি?'

'আমার তো যাওয়ার কথা ছিল না।'

'সেকি! আমি শুনেছিলাম তুমি ওদের সঙ্গে যাবে। তোমাকে প্রজেক্টের ইনচার্জ করে সূর্য কিছুদিনের জন্যে বিদেশে যাবে। এ ব্যাপারে কাগজপত্র তৈরী করে রেখে গিয়েছে সে অফিসে।'

'মানে? আপনি কি বলছেন?' রঙ্গন আর্তনাদ করে উঠলো।

'আমায় তো কিছুই বলে না কেউ। যাওয়ার আগের দিন তোমার শাশুড়ী দয়া করে জানালেন যে সূর্য কলকাতার সমস্ত দায়িত্ব তোমার ওপর ছেড়ে দিচ্ছে এই রকম একটা অর্ডার নাকি সে সইসাবুদ করে অফিসে রেখে দিয়েছে। ফিরে এসে তোমাকে সারপ্রাইজ দেবে।

নীপার বাবার কথা শোনার ধৈর্য আর ছিল না রঙ্গনের। ধীরে ধীরে রিসিভারটা রেখে দিল সে। হঠাৎ মনে হলো তার চারপাশে অতল খাদ। সে নিজের অজান্তেই সেখানে পা বাড়িয়েছে। সমস্ত ব্যাপারটাই সূর্য আঙ্কেলের সাজানো। অথচ গতকালও যদি সে শুনতো এই প্রজেক্টের সে সর্বময় কর্তা হয়েছে তাহলে পৃথিবীতে তার চেয়ে কে বেশী সুখী হতো! কিন্তু এখন? তার গলায় ফাঁস পরা-

বার চমৎকার ব্যবস্থা করেছেন সূর্য আঙ্কল।

'কি হলো?' আত্রেয়ী জিজ্ঞাসা করলো।

হিংস্রচোখে তাকাল রঙ্গন। তারপর বিছানায় এসে ওর পাশে বসে জিজ্ঞাসা করলো, 'সি. বি. আই-এর রেইড হবার আগে তুমি হেড অফিসে গিয়েছিলে?'

'হ্যাঁ। তুমিই তো পাঠালে।' আত্রেয়ীর গলায় বিস্ময়।

'সমস্ত কাগজপত্র এনেছ?'

'যতটা পেরেছি।'

'আমার নামে সূর্য আঙ্কল কোনো ডিড করেছেন?'

হাসল আত্রেয়ী, 'হ্যাঁ। দেখে আমি অবাক হয়ে গিয়েছিলাম।'

'কোথায় সেটা?' রঙ্গনের গলায় গোঙানি।

'ওর টেবিলের ওপর।'

যেন ভুস করে অতল জলের নিচ থেকে ওপরে উঠে আসছে এমন অনুভূতি হলো। দুহাতে আত্রেয়ীকে জড়িয়ে ধরে পাগলের মতো চুমু খেতে লাগল রঙ্গন। আত্রেয়ী বেশ অবাক হয়ে গিয়েছিল এই অভিব্যক্তিতে। দুহাতে সে রঙ্গনকে ঠেলে তুলতে চাইল, 'এ্যাই কি করছ আরে এখন নয়, আঃ রঙ্গন, পাগলামি করো না।' একটু একটু করে শান্ত হতে হতে হাউ হাউ করে কেঁদে উঠলো রঙ্গন আত্রেয়ীর বুকে মুখ গুঁজে, 'সূর্য আঙ্কল আমাকে ফাঁসাতে চেয়েছিল।

ওর মাথা বুকে আঁকড়ে আত্রেয়ী জিজ্ঞাসা করলো, 'তোমার শ্বশুর কি বললেন? রঙ্গন, বি স্টেডি।'

নীপার বাবার সঙ্গে যা যা কথা হয়েছিল সমস্ত খুলে বললো রঙ্গন। এবার আত্রেয়ী রঙ্গনের মাথাটাকে সরিয়ে দিয়ে বিছানা ছেড়ে উঠে টেবিলটার কাছে চলে গেল। 'এই দ্যাখো, তোমার নামে ডিড, ইন ট্রিপলিকেট। কিছু না ভেবেই এটা এনেছিলাম। তখন পড়ে খুব রাগ হয়েছিল। মনে হয়েছিল মূর্খ আমাকে বিট্রে করেছে। কিন্তু এখন দেখছি এটা না আনলে এতক্ষণ তোমার হাতে হাতকড়া পড়ত।' আর একটা সিগারেট ধরালো আত্রেয়ী।

'আই অ্যাম গ্রেটফুল আত্রেয়ী, তোমার কাছে কৃতজ্ঞ আমি।' রঙ্গন এগিয়ে আসছিল, 'মনে হয় এক তারিখ থেকে ফ্ল্যাটটাও আমাকে ছেড়ে দিতে হবে। ওঃ, ভগবান।'

'আমরা আজ রাত্রেই দিল্লী যাব। তোমার সঙ্গে টাকা আছে?'

রঙ্গন পার্স বের করলো। আটশো টাকা রয়েছে সঙ্গে। সে বললো, 'ফ্ল্যাটে যেতে হবে। হাজার চারেক বোধ হয় আছে।'

'তুমি সত্যিই বোকা।' আত্রেয়ী হাসল, 'ওখানে গেলে তুমি ফিরতে পারবে?'

রঙ্গন ঠোঁট কামড়ালো। তার পরেই মনে পড়ল ঘোষবাবুর কথা। সি, বি, আই, যদি ওর ফ্ল্যাটে রেইড করে তাহলে ঘোষবাবু এতক্ষণে এখানে পেঁছে যেত কথাটা বলতেই আত্রেয়ী মাথা নাড়ল. 'তুমি জানো না ওরা ওয়াচ করছে কিনা। ফ্ল্যাটে ঢোকা মাত্র হয়তো ঝাঁপিয়ে পড়বে। এটা ঘোষবাবুর পক্ষে জানবার কথা নয়।'

তাহলে ? পকেটে যে টাকা আছে তাতে স্বচ্ছন্দে ট্রেনে যাওয়া যায়। কিন্তু দিল্লীতে পৌঁছতে কাল রাত্তির হয়ে যাবে। কার কাছে টাকা পাওয়া যায় ? রঙ্গন ঘাড় দেখল। মিসেস চোপরা ! না, অসম্ভব।

'রঙ্গন, মিসেস গুপ্তার কেসটা তুমি এনেছ না ?

চমকে আত্রেয়ীর দিকে তাকাল রঙ্গন। এই নামটা জানল কি করে ও।

সূর্য আঙ্কেলের সঙ্গে সত্যিই আছে ওঁর পরিচয় গোপন রাখতে হবে।

'তুমি জানলে কি করে ?'

'সূর্য বলেছিল আমাকে। তাছাড়া হেড অফিসের শেয়ার হোল্ডারদের যে লিস্ট সি, বি, আই, পাবে সেখানেও নামটা থাকতে পারে। তোমার খুব পরিচিত শুনেছিলাম।'

'ওঁর স্বামী আমার পরিচিত।' রঙ্গন এড়িয়ে যেতে চাইছিল।

'তাহলে আমরা যদি ওঁর কাছ থেকে এক্ষুনি টাকা চাই তাহলে আপত্তি হওয়ার কথা নয়, তাই তো ?'

'উনি টাকা দিতে যাবেন কেন ?' রঙ্গনের চোখের সামনে সেই লোক দুটো ভেসে উঠলো। ওরা ঠাণ্ডা মাথায় খুন করতে পারে। অবশ্য প্রাইভেট এজেন্সির লোক হলে আলাদা কথা, সেক্ষেত্রে পুলিসের সঙ্গে নিশ্চয়ই যোগাযোগ আছে।

কারণ ওঁর স্বামী জানেন না যে সুইস ব্যাঙ্কে ওঁর নামে টাকা জমছে। ওঁর স্বামী জানেন না যে উনি দশ লাখ টাকার শেয়ার কিনেছেন। দুটি কিস্তি সুইস ব্যাঙ্কে জমা পড়েছে কিন্তু তৃতীয়টি আর কখনই জমা পড়বে না। অতএব আমাদের খরচের টাকার জন্যে ওঁকে টেলিফোন করা যায়, কি বল ? নম্বর কত ?'

আত্রেয়ী হাসল, 'প্রেম আর যুদ্ধে অন্যায় বলে কোনো শব্দ নেই রঙ্গন।'

'বাট শী ইজ ডেঞ্জারাস। টাকা জমা দেবার সময় বুঝিয়ে দিয়েছেন উনি মোটেই নরম ধাতের মেয়ে নন।' রঙ্গন বুঝতে পারছিল না তার কি করা উচিত।

'মেয়েরা মেয়েদের কাছে আয়নার মতো সরল। সময় চলে যাচ্ছে রঙ্গন।'

অপারেটরকে নাম্বারটা জানিয়ে আত্রেয়ী বললো, 'তুমি ততক্ষণে কাগজপত্রগুলো ওই সুটকেসে গুছিয়ে নাও রঙ্গন। আমার যা কিছু ছড়ানো আছে সেগুলোও নিও। অপারেটরের মাধ্যমে কথা বলায় নানান ঝামেলা—।'

এই সময় রিং হলো। রিসিভার তুলে কিছুক্ষণ কানে লাগিয়ে তারপর হাসল আত্রেয়ী,' গুড আফটারনুন। মিসেস গুপ্তা আছেন ?' ওহো, আপনিই মিস্টার গুপ্তা ? নমস্কার। আমি একটু মিসেস গুপ্তার সঙ্গে কথা বলতে চাই। আমি ? ওহো, দিশ ইজ চায়না মেইন, রিপোর্টার অফ শী, দি ফেমাস জার্নাল-ফর উওমেন ফ্রম বোম্বে। ধন্যবাদ, ধন্যবাদ, হ্যাঁ, আপনার মতো বিখ্যাত শিল্পপতির স্ত্রীর একটা ইন্টারভ্যু নিতে চাইছি। কি বলছেন ? য়ু আর লিভিং ফর দিল্লী, আজকেই। ওহো, তার তো অনেক দেরি আছে এখনও। হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমি ধরে আছি।' রিসিভারে হাত চাপা দিয়ে আত্রেয়ী বললো, 'তোমার বান্ধবী স্বামীকে নিয়ে দিল্লী

যাচ্ছেন আজই। চমৎকার যোগাযোগ।' তার পরেই হাত সরিয়ে বললো, 'হ্যালো! ইয়েস! গুড আফটারনুন। আপনার সঙ্গে আপনার বাড়িতে একদম একা দেখা করতে চাই। না, কোনো আপত্তি শুনবো না। টেলিফোন নামিয়ে রাখলে আপনার নিজেরই ক্ষতি হবে। আপনার স্বামী যদি সামনে দাঁড়িয়ে থাকেন তাহলে মুখের ভঙ্গি এমন করুন যেন আমি মজার কথা বলছি। ন্যাকামি করে লাভ নেই, আপনার বিদেশ-যাত্রার পরিকল্পনা যদি মিস্টার গুপ্তার কাছ থেকে লুকিয়ে রাখতে চান তাহলে আমার জন্যে টাকা রেডি রাখবেন। এই সামান্য অঙ্ক দিতে আপনার কোনো অসুবিধে হবে না। সুইস ব্যাঙ্কে অনেক বেশী জমা পড়ছে। কোনোরকম ডার্টি গেম খেলার আগে সতর্ক থাকবেন।' রিসিভার নামিয়ে রেখে আত্রেয়ী বললো, 'কি হলো?'

'তুমি জানলে কি করে মিসেস গুপ্তা বিদেশে যাচ্ছেন?'

'সহজ ব্যাপার। স্বামীকে লুকিয়ে যে সুইস ব্যাঙ্কে টাকা জমায় তার এদেশে থাকার ইচ্ছে নেই। নাউ কুইক। জানি না অপারেটর আড়ি পেতে শুনেছে কিনা। যত তাড়াতাড়ি পারি এখান থেকে চলে যেতে চাই। তোমার গাড়ি আছে না নিচে?' আত্রেয়ী নিজেই গোছাচ্ছিল।

'হাঁ।' রঞ্জন যেন পায়ের তলায় মাটি পেল, 'এসব না করে আমরা তো গাড়ি-টাই বিক্রি করে দিতে পারতাম।'

'কার কাছে? এই অল্প সময়ে?' সুটকেসটা রঞ্জনের হাতে ধরিয়ে দিয়ে বাইরে বেরিয়ে এল আত্রেয়ী। লিফটে উঠে বললো, 'আমি রিসেপশনকে সামলাচ্ছি তুমি গাড়িতে উঠে বসো।'

লিফট থেকে বের হতেই বেয়ারাগুলো অবাক হয়ে তাকাল। রঞ্জনকে ছেড়ে আত্রেয়ী এগিয়ে যেতেই সে ডান দিকে ঘুরে সিঁড়ি ভেঙে গাড়ির কাছে গিয়ে দাঁড়াল। ড্রাইভারটা অন্য ড্রাইভারগুলোর সঙ্গে গল্প করছিল, রঞ্জনকে দেখে এগিয়ে এল। আত্রেয়ীর বেরিয়ে আসতে বেশী সময় লাগল না। গাড়িতে উঠে বললো, 'এদের অপারেটর মনে হয় বেশ ভদ্র। আড়ি পাতার অভ্যেস নেই। সুর্য এ মাসের ভাড়া মিটিয়ে গেছে। ওর ঠিকানা কি?' রঞ্জন সেটা জানাতেই আত্রেয়ী বললো, 'তুমি রেসকোর্সের কাছে এই গাড়িতে অপেক্ষা করবে। বাড়িতে কুকুর আছে?'

'হ্যাঁ। মিসেস গুপ্তার খুব প্রিয়।'

'ঠিক আছে।'

'কিন্তু আমার ভয় করছে। তুমি খুব ঝুঁকি নিচ্ছ। ওরা পুলিসে খবর দিলে কি হবে ভাবতে পারছ?'

'ওরা খবর দেবে না। যদি সি. বি. আই. এর মধ্যে ওখানে পেঁছে যায় তাহলে আলাদা কথা। কিন্তু তোমাকে ঝুঁকি নিতেই হবে। দয়া করে আমায় দুর্বল করে দিও না।' আত্রেয়ী ওর হাত চেপে ধরল। রেসকোর্সের কাছে গাড়ি পার্ক করতে বললো রঞ্জন। কোনো কথা না বলে আত্রেয়ী নেমে গেল। গাড়ির সিটে হেলান দিয়ে আত্রেয়ীকে ট্যাক্সি ধরতে দেখল। এই মেয়েটাকে এতোদিন সে

অফিসে দেখেছে কিন্তু দেহ-সর্বস্ব ছাড়া অন্য কিছু মনে হয় নি। আজ ওর অন্য চেহারা দেখল সে। যদি আত্রেয়ী সঙ্গে না থাকতো তাহলে যে কি হতো ভাবতে পারছে না।

সূর্য আঙ্কল তাকে ডুবিয়েছে। এখন সমস্ত মানুষ তাকে শকুনের মতো ছিঁড়ে খাবে। সবাই তার কাছে এসে টাকা ফেরত চাইবে। সামনের মাসে এক তারিখেই ঘটনাটা ঘটতে শুরু করবে। ওরা কেউ সূর্য আঙ্কলকে চেনে না। সে-ই কি চেনে? নীপার মায়ের পূর্ব-প্রেমিক! চমৎকার। হঠাৎ রঙ্গনের মনে হলো উত্তেজনায় এতক্ষণ নীপার কথা তার খেয়ালেই ছিল না। নীপা কি করছে। সূর্য আঙ্কল যদি ওদের দিল্লীতে ফেলে পালাতো তাহলে নিশ্চয়ই এতক্ষণে তারা কলকাতায় জানাতো। নীপার জন্যে কেমন কষ্ট হচ্ছিল রঙ্গনের। সে আজকাল নীপাকে ভালবাসে কিনা জানে না। নীপাই বা কি তাকে ভালবাসে। কিন্তু তাদের শ্যামবাজারের ফ্ল্যাটে যে সময় কাটতো তা কতো সুন্দর ছিল। শুধু নীপা যদি একটু অল্পে সন্তুষ্ট হতো। এখন আর ওকে দোষ দিয়ে কি হবে? সে নিজেও কি শেষ পর্যন্ত টাকার নেশায় মেতে ওঠে নি। আজ সকালে যে ছিল রাজা এই বিকেলে তাকে চোরের মতো লুকোতে হচ্ছে। কিন্তু নীপাকে দরকার। ও যখন জানবে আর কখনও গয়নাগুলো ছাড়াবার টাকা রঙ্গন রোজগার করতে পারবে না, তার আগেই সি, বি আই-এর হাত তাকে জেলে ছুঁড়ে দেবে তখন পাগল হয়ে যেতে পারে। গয়নাগুলোকে প্রচন্ড ভালোবাসে নীপা।

'সায়েব!'

ডাক শুনে চমকে উঠলো রঙ্গন। ড্রাইভার ওর দিকে তাকিয়ে আছে। নীপার পছন্দ করা ড্রাইভার। খুব সতর্ক ভঙ্গিতে রঙ্গন বললো, 'কিছু বলছো?'

'কোনো বিপদ হয়েছে স্যার?'

'কেন? একথা বলছো কেন?'

'আপনাদের ব্যাপার-স্যাপার দেখে। ঘোষবাবু তখন যা বলছিলেন তা সত্যি? পুলিস আসবে কেন?'

'ওই প্রজেক্টের ব্যাপারে একটা গোলমাল হয়েছে। আমরা দিল্লী যাচ্ছি সব ঠিকঠাক করার জন্যে। বড় সাহেব সেখানেই আছেন।'

'প্রজেক্টের কিছু হবে না তো স্যার?'

'কেন? তাতে তোমার কি প্রয়োজন?'

'গতমাসে আমি মায়ের গয়না বিক্রি করে পাঁচ হাজার টাকার শেয়ার কিনেছি স্যার, কিছু হলে আমার সর্বনাশ হয়ে যাবে।' ড্রাইভারের মুখ ভাঙচুর হচ্ছে।

রঙ্গন লোকটার দিকে তাকাল। এও শেয়ার কিনেছে। গয়না বিক্রি করেছে কার কথায়। 'কে তোমাকে কিনতে বলেছিল?'

'মেমসাহেব।। উনি বলেছিলেন কোনো ভয় নেই।'

হায় নীপা, তুমি কি এতক্ষণেও জান না যে তোমার গয়নাগুলোও আর ফেরাবার সামর্থ্য আমার নেই, এ-বেচারাকে কি জবাব দেবে! রঙ্গন সচেতন হলো।

একটু ইঙ্গিত দিলেই লোকটা ভেঙে পড়বে। এখন গাড়িটার খুব প্রয়োজন। সে হাসল, 'তুমি পাগল হয়েছ! এত বড় প্রজেক্ট এত টাকার ব্যবসা কি হঠাৎ ডুবে যেতে পারে! কিছু যদি হয়ও তো মেমসাহেব আছেন।'

ড্রাইভার যেন নিশ্চিন্ত আশ্বস্ত হলো, 'কিন্তু ঘোষবাবু তখন যেসব কথা বলছিলেন, তাতে আমার খুব ভয় হচ্ছিল। তাছাড়া আজ আপনাকেও অন্যরকম দেখাচ্ছে।'

'কি রকম দেখাচ্ছে! দূর, ও তোমার মনের ভুল। যাও বিশ্রাম নাও।' রঙ্গন দু'হাতে চুলে হাত বোলালো।

আত্রেয়ী ফিরে এল চল্লিশ মিনিট বাদে। ট্যাক্সি ছেড়ে দিয়ে রঙ্গনের পাশে বসে ড্রাইভারকে বললো, 'তুমি আমাদের লিন্ডসে স্ট্রিটে ছেড়ে দাও।'

রঙ্গনের খুব কৌতূহল হচ্ছিল কিন্তু ড্রাইভারের জন্য সে কোনো প্রশ্ন করতে পারছিল না। লোকটা নির্ঘাত তাদের সন্দেহ করছে কারণ গাড়িতে বসেই সে ঘনঘন সামনের আয়নায় চোখ রাখছে। কিন্তু লিন্ডসে স্ট্রিটে কেন? আত্রেয়ী চুপচাপ বসে আছে, মুখে নিশ্চিন্ত। রঙ্গন আড়চোখে ওকে দেখলো। মুখটুকু ঢেকে দিলে এ মেয়ে সোফিয়া লোরেনকেও টেক্কা দিতে পারত। গাড়ি তখন ভিক্টোরিয়ার সামনে দিয়ে ক্যাজুরিনা এভিন্যুতে ঢুকেছে। হঠাৎ ড্রাইভার বললো, 'স্যার, পেছনের ওই গাড়িটাকে ভালো লাগছে না, তখন থেকে পেছন পেছন আসছে।'

চকিতে আত্রেয়ী পিছন ফিরে তাকাল। রঙ্গনও দেখল একটা নীল রঙের অ্যাম্বাসাডার নিরীহভঙ্গিতে আসছে। ব্যাপারটা উড়িয়ে দেওয়ার জন্যে বললো, 'তুমি খুব গোয়েন্দা গল্প পড় বুঝি?'

'না স্যার, আমার ভুল হয় নি। দাঁড়ান দেখছি।' চট করে গাড়িটাকে ঘুরিয়ে নিল সে ডাইনে এবং রঙ্গন দেখলো নীল অ্যাম্বাসাডারও বাঁক নিল। এবার গাড়ির গতি বাড়িয়ে দিল ড্রাইভার। প্রায় উড়ে এসে পার্কস্ট্রিটের মোড়ের ট্র্যাফিকে ঢুকে পড়তেই পুলিস হাত দেখাল। নীল অ্যাম্বাসাডার আর তাদের মধ্যে গোটাকয়েক গাড়ির ব্যবধান। আত্রেয়ী বললো, 'বাঁ দিকে টার্ন নিয়ে সামনের ট্র্যাফিকে ঢোকা যায় না?'

'বেআইনি হবে, পুলিস নম্বর নেবে।'

'সে পরে দেখা যাবে। তাই কর।' রঙ্গন হুকুম করলো। একটু অনিচ্ছায় ড্রাইভার ঝুঁকি নিল। ওদের সামনে মাত্র একটি গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে পুলিসের হাত দেখানোয়। তার পেছন দিয়ে হঠাৎ বাঁক নিয়ে দ্রুত দক্ষিণ থেকে আসা ট্র্যাফিকের সঙ্গে মিশে গেল ওরা। ট্র্যাফিক পুলিস প্রচণ্ড জোরে হুইস্‌ল বাজাতে লাগল। আর তখনই পেছন দিকে তাকিয়ে রঙ্গনের বুক হিম হয়ে। ওদের গাড়িটা এভাবে বেরিয়ে যাচ্ছে দেখে নীল অ্যাম্বাসাডারের দরজা খুলে লোক দুটো হতভম্ব হয়ে এদিকে তাকিয়ে আছে। সেই লোকদুটো যাদের সঙ্গে সে ট্যাক্সিতে আসতে বাধ্য হয়েছিল। সামনে গাড়ি আটকে থাকায় ওদের পক্ষে আর বেরিয়ে আসা সম্ভব

হলো না। তার মানে মিসেস গুপ্তা আত্রেয়ীর পেছনে লোক লাগিয়ে ছিলেন। কিন্তু ওরা তো রেসকোর্সের কাছে গাড়ি বদলের সময় আত্রেয়ীকে ধরতে পারত। না, মিসেস গুপ্তা বোধহয় আত্রেয়ীর উৎস দেখতে চেয়েছেন। লোকদুটো কি তাকে চিনতে পেরেছে পেছন থেকে?

সদর স্ট্রিট দিয়ে গ্লোব সিনেমার পেছনে পেঁছে গাড়ি দাঁড় করাতে বলতেই ড্রাইভার সটান ঘুরে বসলো, 'স্যার, আপনি মিথ্যে কথা বলেছেন আমাকে!'

'মিথ্যে কথা? কি বলতে চাইছ তুমি?'

'গোলমাল না হলে এভাবে পালিয়ে এলেন কেন?'

হঠাৎ একটু উঁচু স্বরে হেসে উঠলো আত্রেয়ী, 'ওদের একজন আমাকে বিয়ে করতে চায় কিন্তু আমি চাই না, আমার কথা বলতেই প্রবৃত্তি হয় না, তাই। বুঝেছ! থাক, তুমি এখানে অপেক্ষা কর আমরা মিনিট পনেরোর মধ্যে আসছি। সোজা হোটেলে ফিরব।'

ড্রাইভারের মুখ হতভম্ব। কথাটা সে বিশ্বাস করতে পারছে না আবার মুখের ওপর অবিশ্বাসের কথা জানাতে দ্বিধায় পড়েছে। সুটকেসটা নিয়ে নেমে পড়ল রঙ্গন। ওপাশে দরজা খুলে আত্রেয়ী। এখন আর দিনের আলোয় তেজ নেই। সদর স্ট্রিটে বেশ ভিড়। দ্রুত পা চালিয়ে একটা রেস্তোরাঁতে ঢুকে পড়ল ওরা, বেশ ভিড় দোকানটায়। অনেক রকমী পুরুষ জোড়ায় জোড়ায় খেতে এসেছে বলে কেউ ওদের দিকে নজর দিচ্ছে না এই রক্ষে। একটা খালি টেবিল পেয়ে দুটো কফি বললো আত্রেয়ী। চারধারে এত কথার শব্দ হচ্ছে যে স্বচ্ছন্দে কথা বলে যাওয়া যায়, অন্য টেবিলের কারো কানে যাবে না। রঙ্গন আত্রেয়ীর মুখের দিকে তাকিয়ে চাপা গলায় এই প্রথম জিজ্ঞাসা করল, 'কি হলো?'

'অনেক বাজিয়ে নিঃসন্দেহ হয়ে তবেই দিয়েছেন। মিস্টার গুপ্তা বাড়িতে ছিলেন না!'

'কিন্তু ওই লোক দুটোকে তোমার পেছনে লাগিয়েছেন।'

'হ্যাঁ। আমার টেলিফোন পাওয়ার পরই নিশ্চয় ওদের নিয়োগ করা হয়েছে। ছেড়ে দাও এসব কথা, লোক দুটো খুঁজে মরুক ততক্ষণে আমরা কাজের কথা সেরে নিই। এখন থেকে আমাদের দুজনকে একসঙ্গে চলতে হবে। সূর্যকে খুঁজে বের না করা পর্যন্ত আমাদের সব রাস্তা বন্ধ। অতএব এখন আমরা এমন কাজ না করি যাতে পরস্পরের ওপর বিশ্বাস নষ্ট হয়।' আত্রেয়ী কফি আসছে দেখে চুপ করলো। রঙ্গনের দিকে কাপ এগিয়ে দিয়ে বললো, 'তুমি এখান থেকে বাড়িতে একটা টেলিফোন কর।'

'বাড়িতে?'

'হ্যাঁ। অপরিচিত গলা পেলে ছেড়ে দেবে। এখন হোটেলে ফোন করে জিজ্ঞাসা করবে ঘোষবাবু সেখানে গিয়েছেন কিনা। তারপরেই আমরা এখান থেকে ট্যাক্সি নিয়ে এয়ারপোর্টে যাব কিনা ঠিক করব।'

কফি খেয়ে রঙ্গন ক্যাশ কাউন্টারের কাছে অনুরোধ করলো টেলিফোন পাওয়ার জন্যে। লোকটা টাকা গুনতে গুনতে ঘাড় নাড়তেই রঙ্গন ডায়াল

করলো। রিং হচ্ছে। চারবারের পর ওপাশ থেকে রিসিভার তুলতেই ধক করে উঠলো বুক। নীপার গলা 'হ্যালো।'

আড়চোখে আত্রেয়ীকে দেখে নিয়ে রঙ্গন বললো, 'নীপা, আমি বলছি। কখন ফিরেছ। খুব সংক্ষেপে বলো।'

তৎক্ষণাৎ নীপার আর্তনাদ শোনা গেল, 'ওঃ, তুমি। কোথা থেকে কথা বলছ? তুমি কি জানো না আমাদের সর্বনাশ হয়ে গিয়েছে। সূর্য আঙ্কল হঠাৎ পাল্টে গেছেন। দিল্লীতে আমাদের ফেলে দিয়ে কোথায় যে চলে গেলেন জানি না, আমি ট্রেনে করে এইমাত্র ফিরছি। এসে দেখছি এখানকার অফিস সি. বি. আই. থেকে সিল করে দেওয়া হয়েছে। ওরা তোমাকে আর সূর্য-আঙ্কেলকে খুঁজছে। আমাকে প্রশ্ন করেছিল, আমি বলেছি জানি না। কে এক মিসেস গুপ্তাও টেলিফোন করে তোমাকে খুঁজছিলেন। তুমি কোত্থেকে বলছো?'

রঙ্গন চাপা গলায় বললো, 'নীপা, আমার ফিরতে দেরী হবে। ওই ফ্ল্যাটে যা জিনিস আছে সব বিক্রি করে তোমার বাবার কাছে চলে যাও। কথাটা শুনবে, তোমার মা ফিরেছেন?'

'না। মায়ের সঙ্গে আমার ঝগড়া হয়ে গিয়েছে। মা দিল্লীর কালিবাড়িতে আছেন। কিন্তু রঙ্গন, এসব কি হয়েছে?' নীপার প্রশ্নটা শেষ হওয়া মাত্র লাইনে কট্ করে শব্দ হতেই রঙ্গন রিসিভার নামিয়ে রাখল।

ঘণ্টাখানেক বাদে ওরা ভি আই পি রোডের ট্যাক্সিতে বসে। টিকিট কাটার পর এখন চার হাজার করে দুজনের কাছে। আত্রেয়ী বলেছে টাকাটা আলাদা রাখতে। টেলিফোনের খবরটা জানার পর আত্রেয়ী বলেছিল, 'আর ফেরার পথ নেই রঙ্গন। আমাদের আজ দিল্লীতে পেঁছতে হবেই।'

'কিন্তু ওরা যদি এয়ারপোর্টে আমাদের জন্যে অপেক্ষা করে?'

'কারা?'

'ওই লোক দুটো।'

'না। ওরা করবে না। কারণ মিসেস গুপ্তা দিল্লীর ফ্লাইটে আমাদের কখনও আশা করবেন না। সি. বি. আই. অপেক্ষা করতে পারে তোমার জন্যে।'

'তাহলে?'

'ওরা একজনকেই খুঁজবে। সস্ত্রীক কাউকে দেখলে হয়তো সন্দেহ না করতেও পারে। টিকিটের নাম দুটো মনে রেখ।'

'আত্রেয়ী তুমি আমার জন্যে এত ঝুঁকি নিচ্ছ কেন?'

'তোমার জন্যে কেন? আমি সূর্যকে মুখোমুখি চাই।'

'তোমার মা-বাবা?'

'ওঃ রঙ্গন, ডোণ্ট বি সিলি। আমি শেষ হয়ে গেছি। এখন দয়া করে মেড ফর ইচ আদার-এর অভিনয় কর। তুমি আমার শরীরটাকে পছন্দ কর, কি কর না? সেটা সবাইকে বুঝিয়ে দিও এয়ারপোর্টে নেমে।' আত্রেয়ী চোখ বন্ধ করতেই রঙ্গন ওর হাত তুলে নিল নিজের হাতে। এছাড়া সে আর কিভাবে কৃতজ্ঞতা বোঝাবে!

নাম্বার নিয়ে দৌড়ে দৌড়ে ওরা যখন প্লেনের কাছে পৌঁছল তখনই সিঁড়ি সরানো হচ্ছে। কোনো মতে উপরে ওঠার পরেই দরজা বন্ধ করে দিল এয়ার হোস্টেস। ট্যাক্সি থেকে নেমে আত্রেয়ীর সঙ্গে এয়ারপোর্টে ঢুকে ঠান্ডা হয়েছিল রঙ্গন। আত্রেয়ীর মাথায় নতুন বউ-এর মতো অর্ধেক ঘোমটা। বাঁ হাত প্রায় সব সময় রঙ্গনের হাত জড়িয়ে রেখেছিল। কারা সি. বি. আই.-এর লোক রঙ্গন চেনে না। সেই লোক দুটোকেও নজরে পড়ছে না। তবু প্রতি মুহূর্তে মনে হচ্ছিল কেউ না কেউ তাকে লক্ষ্য করছে। প্লেনের দরজা বন্ধ হওয়ার পর ওর নিঃশ্বাস সহজ হলো। মাঝখানের প্যাসেজে আত্রেয়ীর পেছন পেছন যেতে সে থমকে দাঁড়ালো। দু'পাশে সুবেশ যাত্রীরা বসে আছে। সামনেই পাশাপাশি তিনজন। মিসেস গুপ্তা, মিস্টার গুপ্তা এবং চোপরা সাহেব।

'আরে সেইন। তুমি এখানে?' চোপরা সাহেব চেঁচিয়ে উঠলেন। মিস্টার গুপ্তা হেসে ঘাড় নাড়লেন। তৃতীয় জনের মুখে কালবৈশাখী, দৃষ্টি রোদ-চশমার আড়ালে।

'হ্যালো।' রঙ্গন কোনোমতে বললো।

'দিল্লী যাচ্ছ?'

'তাছাড়া আর কোথায় এই প্লেনে যাব।'

মিস্টার গুপ্তা হাসলেন 'ওয়েল মেইড।'

চোপরা সাহেব মাথা ঘুরিয়ে আত্রেয়ীকে খোঁজার চেষ্টা করে বললেন, 'কবে বিয়ে করলে টেরই পেলাম না। এভাবে ফাঁকি না দিলেই পারতে।'

'হয়ে গেল।' রঙ্গন কথাটা বলা মাত্র রোদ চশমার তলায় ঠোঁট দুমড়ে উঠলো। 'তা আপনারা দল বেঁধে দিল্লী যাচ্ছেন কি ব্যাপার?'

'মিস্টার গুপ্তার একটা কেস আছে বোর্ডে। তুমি তো জানো এসব।' চোপরার কথা শেষ হওয়ামাত্র রঙ্গন এগিয়ে গেল। ওই কথাটা বলার সময়ে চোপরার অস্বস্তি চোখ এড়ায়নি। মিস্টার গুপ্তা স্বাভাবিক ব্যবহার করেছেন। কিন্তু ওই মহিলা এখন আহত বাঘিনী। আত্রেয়ীর সঙ্গে রঙ্গনের যোগাযোগ দেখতে পেয়ে হয়তো আঙুল কামড়াচ্ছেন মনে মনে।

পাশে বসামাত্র আত্রেয়ী বললো, 'ওদের সঙ্গে কথা না বললেই পারতে।' 'কি করব। লোকটার কাছে কয়েক বছর কাজ করেছি। প্রশ্ন করলে কিছু না বলে চলে আসা যায় না। আমি ভাবছি ভদ্রমহিলা কি জেনে গেছেন তার টাকা জলে চলে গিয়েছে?' রঙ্গন চোখ বন্ধ করে বললো।

'বোধহয় না। ভুল বললাম। নিশ্চয়ই জেনেছেন। তোমার অফিস যখন সি. বি. আই. সিল করে দিয়েছে তখন ওঁর পক্ষে না জানার কোনো কারণ নেই।'

'কিন্তু ভেঙে পড়ার লক্ষণ দেখছি না।'

'যে মেঘ ভাসিয়ে দিতে আসে তাতে খুব বেশি বজ্র থাকে না।' মিনিট দশেক বাদে আত্রেয়ী আবার কথা বললো, 'আমার কিন্তু ভালো লাগছে না।'

'কি ব্যাপার?'

'মনে হচ্ছে দিল্লী এয়ারপোর্টে সি. বি. আই. আমাদের জন্যে অপেক্ষা করবে।

আমাদের ছদ্মনাম তখন শত্রু হয়ে দাঁড়াবে।'

'কি রকম?'

'তোমার ওই তিনজন পরিচিত জানিয়ে দেবে আমরা মিস্টার অ্যান্ড মিসেস কে. মুখার্জী নই। কাজটা আরো সহজ হয়ে যাবে। ওই মহিলা সেটা করতে খুব আনন্দ পাবেন। আমি এভাবে ধরা দিতে রাজী নই।'

'ওরা যদি ধরে তাহলে আমাকে ধরবে, তোমাকে নয়।'

'ছেলেমানুষের মতো কথা বলো না। তোমাকে ছাড়া আমি দিল্লীতে কিছুই করতে পারব না। শোন, আমি যা বলছি তুমি তাই করবে। একটু বাদেই তুমি এয়ার হোস্টেসকে বলবে এখানে কোনো ডাক্তার আছে কারণ আমার পেটে যন্ত্রণা হচ্ছে। সেটা যদি খুব বেড়ে যায় তাহলে একটুও অবাক না হয়ে ওই মতো অভিনয় করে যাবে।'

'তাহলে কি হবে?'

তাহলে আমাদের অন্য দরজা দিয়ে বেরিয়ে যাওয়ার চান্স থাকবে। তুমি শুধু একবার বলে দিও এর আগে একবার এরকম হয়েছিল এবং তখন আমাকে অক্সিজেন দিতে হয়েছে। ব্যাস।'

দিল্লী যখন আর মিনিট পঁচিশেক তখন ছটফট করতে শুরু করলো আত্রেয়ী। রঙ্গন প্রথমে ওর মাথায় হাত বোলাচ্ছিল কিন্তু পাশের যাত্রী বললেন, 'আপনি এয়ার হোস্টেসকে বলুন ওষুধ দিতে।'

এয়ার হোস্টেস সব শুনে জিজ্ঞাসা করলেন, 'খুব পেইন হচ্ছে?'

দাঁত দিয়ে ঠোঁট চেপে ঘাড় নাড়ল আত্রেয়ী। মেয়েটি বললো, 'দাঁড়ান, আমি একটা ওষুধ এনে দিচ্ছি।' কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যে কাটা ছাগলের মতো ছটফট করতে লাগল আত্রেয়ী। ছোটখাটো ট্যাবলেটে তার কাজ হচ্ছে না। পাইলট এসেছিল দেখতে। রঙ্গন তাকে জানাল যে চিকিৎসার জন্যেই তারা দিল্লী যাচ্ছিল এবং এর আগের বার অক্সিজেন দিতে হয়েছে। পাইলট ফিরে গেল চোপরা সাহেব এলেন, 'কি হয়েছে?' রঙ্গন এই ভয় পাচ্ছিল। হাতল তুলে আত্রেয়ীকে সিটের উপর শুইয়ে দেওয়া হয়েছে। পাশের সিটের ভদ্রলোক পেছনে চলে গেছেন। আত্রেয়ীর মুখ সাদা, বুকের কাপড় সরে গেছে। অত সরু কোমরের ওপর নিটোল কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখে চোপরার মুখ শুকিয়ে গেল, 'সিরিয়াস কিছু?'

'পেটে যন্ত্রণা হচ্ছে। খুব কষ্ট হচ্ছে। আলসার আছে।' রঙ্গন হাঁপ ছেড়ে বাঁচল কারণ 'সরি সরি' বলে চোপরা সাহেব নিজের সিটে ফিরে গেলেন। এয়ার হোস্টেসটি খুব সেবা করছিল। এই সময় ক্যাপ্টেন এসে বলে গেলেন যে তিনি দিল্লীকে জানিয়ে দিয়েছেন পেসেন্টের কথা। একটা অ্যাম্বুলেন্স অক্সিজেন নিয়ে প্লেনের কাছে অপেক্ষা করবে। কোনো চিন্তার কারণ নেই। পেসেন্টকে তখন একটু আরাম দেবার চেষ্টা করা হোক।

পাইলট চলে যাওয়া মাত্র হাঁটুর নিচে প্রচণ্ড চিমটি খেল রঙ্গন। কিন্তু তাকে প্রাণপণে চেষ্টা করতে হচ্ছিল মুখটাকে উদ্বিগ্ন দেখাতে।

দিল্লী এয়ারপোর্ট থেকে অ্যাম্বুলেন্সে চেপে ওরা বেরিয়ে এল। গাড়ির ভেতরে

ওরা ছাড়া আরও দুজন রয়েছে। আত্রেয়ী এখনও অভিনয় করে যাচ্ছে কিন্তু অক্সিজেনের প্রয়োজন হয় নি। মুখে গোঙানিটাকে ঠিক রেখে আত্রেয়ী ইশারা করলো রঞ্জনকে মুখ নামাতে, 'হসপিটালে ভরতি হবার পরেই কাটবো। তোমার স্যুটকেস নিয়েছ ?'

সংগে সংগে ফ্যাকাশে হয়ে গেল রঞ্জন। তাড়াহুড়োতে সেটাকে প্লেনেই ফেলে এসেছে। ওই স্যুটকেসে সমস্ত কাগজপত্র এবং আত্রেয়ীর কিছু পোশাক রয়েছে। সে চিৎকার করে অ্যাম্বুলেন্সটাকে থামাতে বলল। কোনোমতে রঞ্জন বোঝাল যে সে খুব প্রয়োজনীয় স্যুটকেস প্লেনে ফেলে এসেছে অতএব গাড়িটাকে ফেরানো হোক। সঙ্গের লোকটা ড্রাইভারকে বলতে গাড়ি থামল। কিন্তু তারা বললো যে এরকম পেসেণ্টকে নিয়ে আর ফেরা ঠিক হবে না। তার চেয়ে নিজে ফিরে গিয়ে ওটাকে নিয়ে হসপিটালে চলে আসুক। এই কয়েক মুহূর্তেই রঞ্জনের কপালে ঘাম জমেছিল। সে দেখল আত্রেয়ী তাকে ইশারা করছে এদের কথা শুনতে। সময় নষ্ট না করে লাফিয়ে নেমে পড়তেই এ্যাম্বুলেন্সটা আত্রেয়ীকে নিয়ে বেরিয়ে গেল। আর তখনই শব্দটা শুনতে পেল রঞ্জন। পুলিসের জিপ আসছে। চট করে একটু সরে যেতেই জিপটাকে ছুটে যেতে দেখল সে অ্যাম্বুলেন্সের পেছনে। এখন অনেক রাত। দিল্লীর রাস্তায় লোক জন নেই। সোজা পথটার দৃশ্যটা স্পষ্ট দেখতে পেল সে। অ্যাম্বুলেন্সটাকে আটকালো পুলিসের জিপ। রঞ্জনের মনে হচ্ছিল ওর নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে যাবে। কোনোরকমে সে একটা গলির মধ্যে ঢুকে পড়ল। ভাগ্যিস এয়ারপোর্ট ছাড়িয়ে অনেকটা চলে এসেছে ওরা। নইলে এই আড়াল মিলত না।

আর একটু দেরি করলেই সে গ্রেপ্তার হয়ে যেত। ভাগ্যিস স্যুটকেসটার কথা মনে করিয়ে দিয়েছিল আত্রেয়ী। রঞ্জনের দুই চোখ ভিজে উঠলো। এই মেয়েটা তাকে প্রতি পদে বাঁচিয়ে দিয়ে গেছে। এখন, এখন আর ওর সাহায্য পাওয়া যাবে না। পুলিসের কাছে কতটা সত্যি কথা বলবে আত্রেয়ী ? রঞ্জন মাথা নাড়ল, একটাও না। অন্তত আজ রাত্রে না। কিন্তু পুলিস অ্যাম্বুলেন্সকে তাড়া করল কেন ? ওরা যদি কলকাতা থেকেও খবর পায় তাহলে মিস্টার মিসেস মুখার্জী বাছাই করা মুশকিল। মিসেস গুপ্তা। রঞ্জনের চোয়াল শক্ত হলো। এই মহিলাই পুলিসকে জানিয়েছে। কিভাবে তা এখন মাথায় ঢুকছে না। কিন্তু এছাড়া বিকল্প কোনো সম্ভাবনা নেই।

এই নির্জন রাস্তায় আর বেশীক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকা যায় না। রঞ্জন প্রথমে ভেবে পাচ্ছিল না সে কোথায় যাবে ? পুলিস নিশ্চয়ই এখন তাকে খুঁজছে। নিশ্চয়ই এই রাস্তাটা চষে ফেলবে ওরা। রঞ্জন দেখল এদিকের বাড়ি ঘরদোর নতুন তৈরি হচ্ছে। আজ রাত্রে এখানেই লুকিয়ে থাকতে হবে যে করেই হোক। দিনের আলো না ফুটলে রাস্তায় পা বাড়ানো বোকামি হবে। পকেটে চার হাজার টাকা নিয়ে একটা অন্ধকার কোণে ইট বালির আড়ালে বসে পড়ল রঞ্জন। ওর চোখ দুটো খোলা, কান সজাগ।

আলো ফোটা মাত্র রাস্তায় পা দিল রঞ্জন। সারারাত না ঘুমিয়ে ওর নার্ভের

ওপরে প্রচণ্ড চাপ থাকায় ওর শরীর টলছিল। দিল্লীতে এসে কোনে লাভ হলো না। কলকাতায় থাকলে অনেক লুকোনর জায়গা পাওয়া যেত। সূর্য আঙ্কল এখন যে এখানে থাকবেন তার নিশ্চয়তা কি? কিন্তু আত্রেয়ী নিশ্চিত ছিল লোকটা এখানেই আছে। মেয়েটার কখনও ভুল হয় নি।

একটা খালি ট্যাক্সি পেয়ে বর্তে গেল রঙ্গন। সোজা কালিবাড়িতে চলে এল সে। এই একটিমাত্র সূত্র অবশ্য নীপার মা দিল্লী ছেড়ে যদি না গিয়ে থাকেন। এখন তেমন করে সকাল হয় নি। রাস্তাটা একদম ফাঁকা। ট্যাক্সিটা দাঁড় করিয়ে রঙ্গনের মনে হলো যদি এখানে পুলিস ইতিমধ্যেই এসে থাকে তাহলে তো হয়ে গেল। যাই হোক, তাকে ঝুঁকি নিতেই হবে। আর কিছু ভাবতে পারছে না।

আর তখনই তার হৃদপিণ্ড লাফিয়ে উঠলো। নীপার মা বেরিয়ে আসছেন। ডান হাতে একটা ভারি স্যুটকেস। রাস্তায় পা দিয়ে এপাশে ওপাশে দেখে এই ট্যাক্সিটার উদ্দেশে হাত নাড়লেন। হয় তো ভেবেছিলেন এটা ফাঁকা। রঙ্গন ড্রাই-ভারকে বললো গাড়িটাকে ঘুরিয়ে ওই ফুটপাতে নিয়ে যেতে। ট্যাক্সিটা আসছে দেখে নীপার মা কয়েক পা এগিয়ে গেলেন কিন্তু দরজা খুলে রঙ্গন নামতেই ভুত দেখার মতো আঁতকে উঠলেন। রঙ্গন গম্ভীর গলায় বললো, 'উঠে আসুন।'

সমস্ত মুখ চোখে আতঙ্ক, নীপার মা মাথা নাড়লেন, 'না।'

'রাস্তায় সিন করবেন না।'

'না, আমি যাব না। আমার অন্য কাজ আছে, আমি কিছুতেই কলকাতায় যাব না।'

'আপনাকে আমি কলকাতায় নিয়ে যেতে আসি নি।'

'তাহলে?' আতঙ্কটা এখনও খেলা করছে চোখে, 'তোমাকে ওরা পাঠায় নি?'

'কেউ আমাকে পাঠায় নি। উঠে আসুন, কথা আছে।'

প্রায় বাধ্য হয়ে নীপার মা উঠলেন, 'তুমি আমাকে নিতে আস নি।'

'বললাম তো, না। কোথায় যাচ্ছেন আপনি?'

'সে তোমাকে আমি বলব না। রঙ্গন তোমার পায়ে পড়ি আমাকে ছেড়ে দাও। এতদিন পরে আমার স্বপ্ন সার্থক হতে চলেছে, আমি কোনো বাধা আর মানব না; স্বামী মেয়ে সংসার আজ আমার কাছে মূল্যহীন।'

রঙ্গন দেখল ভদ্রমহিলা আবেগে চোখ বন্ধ করলেন। সে খুব অবাক হচ্ছিল যদিও কিন্তু মুখে তা প্রকাশ করলো না, 'ঠিকানাটা বলুন আপনাকে পৌঁছে দিয়ে আসছি।'

'না। ও আমাকে নিষেধ করেছে।'

'কিন্তু আমার যে ওঁকে দরকার। ওঁর অনেক টাকা আমি সঙ্গে নিয়ে এসেছি, এগুলো ওঁর হাতে তুলে দিয়ে আমি ফিরে যেতে চাই।'

'তুমি ওর জন্যে টাকা নিয়ে এসেছ?'

'হ্যাঁ। দেখুন।' একশ টাকার নোটগুলো দেখালো রঙ্গন।

'কিন্তু পুলিস, পুলিস ওখানে হামলা করে নি?'

'না তো। কেন করবে?' মিথ্যে কথাটা চমৎকার বললো রঙ্গন।

'তবে কি ভুল হলো ওর! মানুষ মাত্রেই ভুল হতে পারে! ঠিক আছে চল, তুমি যখন ওর জন্যে টাকা নিয়ে এসেছ।' ড্রাইভারকে ঠিকানাটা বললেন নীপার মা।

আঃ রঙ্গনের স্বস্তিতে নিঃশ্বাস পড়ল। শেষ পর্যন্ত সূর্য আঙ্কেলের মুখোমুখি হওয়া যাবে। যেতে যেতে একটু একটু করে নীপার মায়ের মুখে ও'র স্বপ্নের কথা জেনে স্তম্ভিত হয়ে গেল রঙ্গন। সূর্য আঙ্কলকে উনি নাকি বিয়ের আগে থেকেই ভালবাসেন। দুর্ভাগ্য যে এতকাল আলাদা থাকতে হয়েছে। কিন্তু আর নয়, এবার তিনি মরীয়া হয়ে উঠেছিলেন। সূর্য আঙ্কেলও নাকি তাই চেয়েছিলেন। তবে সংসার ছেড়ে যাওয়ার আগে তিনি চেয়েছিলেন তার মেয়ে জামাই অর্থবান হোক। তাই এত ব্যবস্থা। স্বামীকে কোনোদিন তিনি ভালবাসেন নি, সে প্রশ্ন ওঠে না। কিন্তু দিল্লীতে এসেই সব গোলমাল হয়ে গেল। কেউ সূর্য আঙ্কেলের পেছনে পুলিস লেলিয়ে দিয়েছে। বাধ্য হয়ে গা-ঢাকা দিতে হয়েছে তাকে। নিজের মেয়েকে সব খুলে বলেছেন তিনি। সে ভুল বুঝে একা ফিরে গেল। তিনি আর ফিরবেন না। যমুনা নদীর ধারে এক যোগীর আশ্রমে দীক্ষা নিচ্ছেন ও'রা আজ। সেখানেই স্বামী স্ত্রীর মতো থাকবেন। পুলিসের ঝামেলা চুকলে সূর্য আঙ্কেলের সঙ্গে তিনি সুইজারল্যান্ডে চলে যাবেন। নীপার মা বললেন, 'জানি না তোমার কি মনে হচ্ছে। কিন্তু রঙ্গন, ভালবাসার কোনো বয়েস নেই। এখন তো আমার শরীরের চাহিদা নেই কিন্তু প্রিয়জনকে কাছে পাওয়ার জন্যে আমি সব কষ্ট সহ্য করতে পারি।'

ট্যাক্সিটা ছুটছিল। কথাগুলো শেষ করে নীপার মা চোখ বন্ধ করলেন। তাঁর শরীরে যে রোমাঞ্চ তা কণ্ঠস্বরেই স্পষ্ট ছিল এখন অভিব্যক্তিতেও ধরা পড়ল।

রঙ্গন কোনোরকমে নিজেকে শান্ত রাখছিল। তার চোখের সামনে যে প্রৌঢ়া বসে আছেন তিনি প্রতারিতা হয়েও উপলব্ধি করতে পারছেন না। কোনো কোনো মেয়ের মনের বয়স হয়তো এক ইঞ্চিও বাড়ে না। নীপার মায়ের বহু পুরনো দুর্বলতাকে সুন্দরভাবে ব্যবহার করছেন সূর্য আঙ্কল। নিশ্চয়ই এই মহিলার সঙ্গ সূর্য আঙ্কলকে সাহায্য করবে। রঙ্গনের মনে হলো নীপার মাকে সব কথা খুলে বলা উচিত। সব শুনেও যদি ও'র চেতনা না ফেরে তাহলে—। ঠিক সেই সময় নীপার মা ট্যাক্সির জানলার দিকে ফিরে অদ্ভুত গলায় বললেন, 'যে যাই বলুক, আমি এখন আর কাউকেই কেয়ার করি না।'

কথাটা শোনামাত্র মন পাল্টালো রঙ্গন। না, এ'কে সূর্য আঙ্কেলের কথা বলে কোনো লাভ হবে না। এখন ইনি পুরোপুরি সম্মোহিতা। বরং বিপরীত কথা শুনলে রঙ্গনকে সূর্য আঙ্কেলের কাছে উনি নিয়ে যাবেন কিনা সন্দেহ। অতএব যা করবার নিজেই করবে সে।

যমুনা নদীর গায়ে খুব নির্জন একটা জায়গায় ট্যাক্সিটা ছেড়ে দেওয়া হলো।

নীপার মা সুটকেসটা নিয়ে নামতে যেতেই রঙ্গন বললো, 'ওটা আমাকে দিন। আপনি কেন কষ্ট করবেন ?'

সঙ্গে সঙ্গে নীপার মা চমকে উঠলেন যেন, 'নাঃ। এটা আমি কাউকে দেব না। যত ভারি হোক আমার কষ্ট হবে না।'

এবারও রঙ্গন নিজেকে শান্ত রাখল। তার পর উদাসীন গলায় বললো, 'চলুন।'

কথাগুলো বলেই বোধহয় নিজের উত্তেজনা টের পেয়েছিলেন নীপার মা। সামান্য নীচু গলায় বললেন, 'আসলে আমি এখন থেকে স্বাবলম্বী হতে চাই। তাই —। ওই দিক দিয়ে চলো।'

রঙ্গন দেখল চারদিকে অসংখ্য ঝুপড়ি। খুব নীচু শ্রেণীর ভিখিরীরা এই জায়গায় থাকে। ঝকমকে দিল্লী শহরের গায়ে যে এরকম একটা এলাকা আছে তা জানা ছিল না রঙ্গনের। অথচ নীপার মাকে দেখে মনে হচ্ছে তিনি এই জায়গায় এর আগে অনেকবার এসেছেন। এতবড় এবং ভারি সুটকেস নিয়েও মহিলার হাটতে কোনো অসুবিধে হচ্ছিল না। পথ চিনতে কাউকে প্রশ্ন করছিলেন না তিনি। সেই ঝুপড়িগুলোর মধ্যে দিয়ে অনেকটা হেঁটে নদীর গায়ে চলে আসতেই একটা কালীমন্দির চোখে পড়ল। মন্দিরের অবস্থা খুবই সাধারণ। দূর থেকে মায়ের উগ্র মূর্তি দেখা যাচ্ছে। চারপাশে যে সব মানুষ যাওয়া আসা করছে তাদের চেহারাই বলে দেয় যে ওদের জীবন স্বাভাবিক নয়। রঙ্গনের মনে হলো দিল্লী শহরের নীচুস্তরের অপরাধীদের ঠেক এই ঝুপড়িগুলো।

মন্দিরের ঠিক পেছনেই কয়েকটা টিনের চালা। রঙ্গনকে চাপা গলায় নির্দেশ দিলেন নীপার মা, 'তুমি একটু দূরে দাঁড়াও। আমি ওকে তোমার কথা বলি। কিরকম মেজাজ আছে জানি না তো।'

রঙ্গন ঘাড় নাড়ল। সে জায়গাটাকে লক্ষ্য করছিল। টিনের চালার সামনেই নদী। পেছনে একটা ঝাঁকড়া গাছ। এরকম একটা জায়গায় সূর্য আঙ্কেলের মতো লোক আশ্রয় নেবেন তা কল্পনাও করা যায় না। চারধারে উলঙ্গ শিশুরা চিৎকার করে খেলছে, মেয়েরা সামান্য ব্যাপার নিয়ে পরস্পরের সঙ্গে কলহে মত্ত।

নীপার মা একটি টিনের দরজায় শব্দ করলেন। কোনো সাড়া এল না। দ্বিতীয়বার শব্দ করতে ভেতর থেকে একটা মোটা গলা ভেসে এল, 'কে ?'

নীপার মা খুব নরম স্বরে জবাব দিলেন, 'আমি গো।' রঙ্গনের মনে হলো যেন একটি কিশোরী কথা বললো। তারপর ধীরে ধীরে দরজাটা খুলে গেল। দূরে দাঁড়িয়ে রঙ্গন দেখল দরজায় এসে দাঁড়ালেন সূর্য আঙ্কেল।

তাঁর পরনে লাল লুঙ্গি, খালি গা, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা, কপালে সিঁদুরের টিপ আর হাতে গাঁজার কল্কে। নীপার মাকে দেখে তাঁর মুখে একটা খিলখিলে হাসি ছড়িয়ে পড়ল, 'এসো, এসো গো আমার ভৈরবী।' তারপর হাত বাড়িয়ে সুটকেসটা নিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'সব আছে তো সখী ?'

নীপার মা সুখী বেড়ালের ভঙ্গিতে ভেতরে ঢুকে গেলেন সূর্য আঙ্কেলের সঙ্গে। রঙ্গন দ্রুত পা চালাল। দরজার পাশে এসে দাঁড়াতেই সে সূর্য আঙ্কেলের

গলা শুনতে পেল, 'সব ব্যবস্থা হয়ে গেছে। আজ ভোরেই উড়ে যাচ্ছি আমরা।'

'কোথায় ?' নীপার মায়ের গলা কাঁপল।

'ফ্র্যাংকফুর্টে। সেখান থেকে জুরিখ। ব্যস, আর আমায় পায় কে ?'

'তুমি আর একটা খবর শুনলে খুব খুশী হবে।'

'কি খবর ? একটু কাছে এসো ভৈরবী।'

'রঙ্গন এসেছে। তোমার জন্যে অনেক টাকা নিয়ে এসেছে সে।' নীপার মায়ের কথা শেষ হওয়া মাত্র সূর্য আঙ্কল চিৎকার করে উঠলেন, 'কে এসেছে ?'

'রঙ্গন।'

'কোথায় সে ?'

'বাইরে দাঁড়িয়ে আছে। আমি যখন বের হচ্ছিলাম—।' কথাটা শেষ হবার আগেই রঙ্গন দরজায় গিয়ে দাঁড়াল। সঙ্গে সঙ্গে সূর্য আঙ্কেলের মুখটা বীভৎস হয়ে গেল, 'ওকে তুই পথ চিনিয়ে এনেছিস হারামজাদী।' চাপা গর্জন করে সপাটে চড় মারলেন সূর্য আঙ্কল নীপার মায়ের গালে। কোনো শব্দ বের হলো না মুখ থেকে, নীপার মা ঘুরে পড়ে গেলেন মেঝেয়, পড়ে রইলেন নিঃস্পন্দ হয়ে। একলাফে খাটিয়ায় পাতা বিছানার নীচ থেকে রিভলভার বের করে উঁচিয়ে ধরলেন সূর্য আঙ্কল, 'কি চাই ?'

সেই উদ্যত অস্ত্রের সামনে দাঁড়িয়ে হঠাৎ একদম নিরাসক্ত হয়ে গেল রঙ্গন। সেই সূর্য আঙ্কল, যাঁর ব্যাঙ্ক ব্যালেন্সে ছাতা পড়েছে, অঙ্গে হাজার টাকার পোশাক, তিনি একটা আহত জন্তুর মতো তার দিকে তাকিয়ে আছেন লুঙ্গি পরে খালি গায়ে এই নোংরা বস্তিতে ? এর কাছে কি চাইবে সে। কি চাওয়া যায় ?

সূর্য আঙ্কল হিসহিসে গলায় জিজ্ঞাসা করলেন, 'কেন এসেছ এখানে ?'

উত্তরটা আপনি জানেন।' রঙ্গন কেটে কেটে উচ্চারণ করলো।

'টাকা চাই ?'

'হ্যাঁ।'

'কত টাকা চাই ?'

'আমার ক্লায়েন্টদের যা জমা ছিল তা ফিরিয়ে দিন।'

'হুকুম ? হুকুম করছ আমাকে ? জানো, তোমাকে ইচ্ছে করলে কুকুরের মতো গুলি করে মেরে ফেলতে পারি ? কেউ আসবে না বাঁচাতে।'

'টাকাগুলো আমার চাই।'

'চাই ? চাই বললেই পাওয়া যায় ? যখন জমা রেখেছিলে তখন খেয়াল ছিল না ? টাকায় টাকা বানাবার লোভ তখন ফোঁস ফোঁস করছিল না ? টাকা চাইবার সময় লোভের রাশ টানতে খেয়াল ছিল না। মুফতে টাকা চাই। কি লোভ কুকুরদের।' সূর্য আঙ্কল অস্ত্রটা উঁচিয়ে রঙ্গনের দিকে এগিয়ে আসছিলেন।

'টাকাগুলো কোথায় ?'

'নেই। সব হাওয়া। তোদের ছিল পুকুরের লোভ আমার সাগরের। এখন এই সুটকেসটা আর ওই বুড়ি মেয়েমানুষটা—এই আমার সম্বল।'

'অত টাকা সব হাওয়া হয়ে গেল ?' রঙ্গন বিশ্বাস করতে পারছিল না।

'বিশ্বাস হচ্ছে না ? আমারও হয় নি। চোরের ওপর বাটপার থাকে। নইলে আমার মতো লোক এই ভিখিরীদের আস্তানায় লুকিয়ে থাকে ?'

'আপনি মিথ্যে কথা বলছেন। নিশ্চয়ই আপনি টাকা পাচার করেছেন।'

সূর্য আঙ্কল মাত্র তিন হাত দূরে। কথাটা শোনা মাত্র তাঁর চোখ জ্বলে উঠলো, 'বেশ করেছি। তুই কি ভেবেছিস এখান থেকে বেঁচে ফিরতে পারবি। আমি সংকেত করা মাত্র ওরা তোকে কেটে যমুনার জলে ভাসিয়ে দেবে।'

রঙ্গনের মনে হলো কথাটা সত্যি। সূর্য আঙ্কেলের মুখের প্রতি স্পন্দন বলে দিচ্ছে তিনি ওকে ছেড়ে দেবেন না। তার গোপন আস্তানার খবর বাইরে পাচার করবার সুযোগ তিনি বেঁচে থাকতে দিতে চাইবেন না। রঙ্গন শেষবার বাঁচবার চেষ্টা করলো। যেন এসব কথায় তার কোনো প্রতিক্রিয়া হয় নি এমন ভঙ্গী করে সে পেছন ফিরে চিৎকার করলো, এসো আত্রেয়ী, উনি এখানে।'

'আত্রেয়ী ?' চমকে উঠলেন সূর্য আঙ্কল। যেন ভূত দেখলেন সামনে।

রঙ্গন চমৎকার মিথ্যে বললো, 'হ্যাঁ, ও আমাকে ফলো করে এখানে এসেছে। আপনার সঙ্গে বোঝাপড়া করতে চায় ও।'

পলকে কয়েক পা পিছিয়ে গেলেন সূর্য আঙ্কল। তাঁর মুখে এখন ভয়। নার্ভাস গলায় বললেন, 'না না, মিথ্যে কথা। আত্রেয়ী আসতে পারে না। আমি, আমি ওকে ঠকাতে চাই নি। আমি শুধু বাচ্চাটাকে নষ্ট করতে বলেছিলাম। ওঃ গড! এখন কি হবে ? শী উইল নট লিভ মি।'

'নিশ্চয়ই। আর ওই মহিলা যদি আত্রেয়ীর কথা শোনেন তাহলে আজ রাত্রে ফ্র্যাঙ্কফুর্টে উড়ে যাওয়ার স্বপ্ন ত্যাগ করতে হবে আপনাকে।'

'নো!' পাগলের মতো ঘুরপাক খেতে খেতে চিৎকার করে উঠলেন সূর্য আঙ্কল। আর তখনই নীপার মা উঠে বসে হাউ হাউ করে কেঁদে উঠলেন, 'শয়তান। তুমি শয়তান। আমি তোমাকে ছাড়ব না।'

আর তখনই শব্দটা ছিটকে উঠলো। রঙ্গনের চোখের সামনে নীপার মায়ের মুখটা নড়ে উঠলো। তারপর একগাদা রক্তের সঙ্গে শরীরটা ধীরে ধীরে মেঝেতে গড়িয়ে পড়ল। এক লাফে রঙ্গন দরজা ছেড়ে মন্দিরের কাছে চলে আসতেই পিল পিল করে লোকজন ছুটে আসছে গুলির শব্দ শুনে। মুহূর্তেই টিনের ঘরটাকে ঘিরে জনতার বৃত্ত দাঁড়িয়ে গেল। সবাই উত্তেজিত হয়ে লক্ষ্য করছে দরজাটা। ঠিক সেই মুহূর্তে সূর্য আঙ্কল উম্মাদের মতো দরজায় এসে দাঁড়ালেন রিভলভার হাতে। সামনে এত মানুষ দেখে তাঁর কপালে ভাঁজ পড়ল। তিনি চিৎকার করে ডাকলেন 'রঘুবীর রঘুবীর।'

কিন্তু কেউ সাড়া দিল না। সূর্য আঙ্কেলের মুখে চিন্তার ছাপ পড়ল। এক মুহূর্ত তাঁর চোখ দুটো জনতার মাঝখানে কাউকে খুঁজল। রঙ্গনের বুঝতে অসুবিধে হচ্ছিল না তিনি কাকে খুঁজছেন। তার ওপর দৃষ্টিটা পড়তেই সূর্য আঙ্কল অস্ত্রটা হাতে নিয়ে কিছুক্ষণ স্থির হয়ে থাকলেন। এখন রঙ্গনের চারপাশে ভিখিরী টাইপের মানুষের ভিড়। তাকে লক্ষ্য করে গুলি ছোঁড়া সম্ভব নয়।

সূর্য আঙ্কেলের ঠোঁটে হাসি খেলে গেল। তিনি আবার ঘরে ঢুকে দরজাটা বন্ধ করে দিতে উৎসাহী জনতা দরজা অবধি পৌঁছে গেল! আর সেই সময় দ্বিতীয় গুলির শব্দ ছিটকে এল ঘরের ভেতর থেকে। কোনো আর্তনাদ নয়, শুধু অস্ত্রের শব্দ চারপাশ কাঁপাল।

আর একবার আত্রেয়ীর কাছে কৃতজ্ঞ হলো রঙ্গন। এবারও তার জীবন বাঁচাল মেয়েটা। হয়তো এই মুহূর্তে আত্রেয়ী পুলিসের হেপাজতে হাসপাতালে কিংবা থানায়। অথচ তার নামটাকে সে বর্মের মতো ব্যবহার করে বেঁচে গেল। মানুষগুলো চিৎকার করছে। এর মধ্যে কেউ কেউ ঢুকে গেছে দরজা ঠেলে ঘরের মধ্যে।

নির্লিপ্ত পায়ে হেঁটে যাচ্ছিল রঙ্গন। কোথায় যাচ্ছে সে জানে না। দুটো মৃতদেহ পেছনের ঘরে পড়ে আছে। অথচ নিজেকে তার মৃত মানুষ বলে মনে হচ্ছিল। ঝুপড়ির মধ্যে দিয়ে যখন সে হাঁটছিল তখন তার পেছনে উত্তেজিত জনতার ভিড় জমেছে। ভিড়টা তার পেছন পেছন আসছে। কিন্তু রঙ্গন সেদিকে তাকাচ্ছিল না। সে চুপচাপ হেঁটে যাচ্ছিল। এখন আর কিছুতেই তার কিছু এসে যায় না।

তীর্থযাত্রী

উৎসর্গ

সাধন ও আলপনাকে

সস্নেহে

প

সূর্যোদয় দেখবে বলে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তের তিনজন মানুষ একটি পর্বত-চূড়ায় জড়ো হয়েছিল। তাদের ভাষা আলাদা, গায়ের রঙ আলাদা কিন্তু লক্ষ্য এক দেবদর্শন। সেখানকার ভোরের সূর্য-দেখা ঈশ্বর দেখার সমান। এই তীর্থ-যাত্রীদের সঙ্গে মিলিত হল একটি মেয়ে। যে জীবনকে দেখেছে নিষ্ঠুর হতে, জীবনের কাঠিন্য যাকে করেছে নির্লিপ্ত। সেও ঈশ্বর দর্শনে এসেছে।

সমুদ্র থেকে অনেক উপরে সেই নির্জনে তিনটে মানুষ তাদের উদ্দেশ্য ভুলে নিজেদের মধ্যে কামড়াকামড়ি শুরু করল মেয়েটিকে নিয়ে। প্রবৃত্তি তাদের নেকড়ে করল।

গোটা পৃথিবীটা এখন তিনটে রঙের দাপটে তটস্থ। সাদা, তামাটে এবং কালো রঙের থাবা চাইছে পৃথিবী দখল নিতে। কিন্তু তা সত্ত্বেও পৃথিবীতে সুন্দর বেঁচে থাকে, থাকবে। এই উপন্যাস তারই প্রতিবিম্ব।

এতক্ষণ ঠাণ্ডা হাওয়ায় জিপটা চলছিল স্বচ্ছন্দে। লাট্টুর গায়ে পেঁচানো লেত্তির মতো রাস্তা ধরে তিন হাজার থেকে সাত হাজার ফুট উঠতে কোনো অসুবিধেই হয় নি। সুতরাং খুশ মেজাজে একটু একটু করে আকাশের গায়ে উঠে আসছিল পার্থ।

এই মুহূর্তে মিহি রোদের মশারি চারপাশে টাঙানো। নিচের পাহাড়গুলো পৃথুলা রমণীর মতো গায়ে গা এলিয়ে পড়ে নীলচে ছায়া মেখে। আর আকাশ, স্থৈর্য্য পুরুষের মতো আকাশ ওই পাহাড়ের গায়ে মাথা ঝুঁকিয়েছে যেখানে অসাড়ে গলে যাওয়া যৌবন ঝিরঝিরিয়ে নেমে যাচ্ছে ঝরনা হয়ে। এসব অনেক নিচে রেখে পার্থ উঠে যাচ্ছিল তার জিপে বসে। আর মাঝে মাঝেই তার গলা সুরেলা হবার চেষ্টায় ছিল, এই আকাশে আমার মুক্তি…।

সদ্য তৈরী রাস্তা শেষ হয়েছে রিনটেকে। রাস্তা না বলে যদিও উপায় নেই কিন্তু সাত হাজার ফুট ছাড়াতেই স্টিয়ারিং থরথরিয়ে কাঁপতে শুরু করেছে। ছোট ছোট বোল্ডার সাজিয়েছে যারা তারা এর বেশী পারে নি। এখনও পথের গায়ে কিলোমিটারের থাম বসে নি। কিন্তু যেতে-হবে চৌদ্দ হাজার সাতশ ফুট উঁচুতে। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সানরাইজ স্পট হিসেবে রিনটেক ইতিমধ্যেই চিহ্নিত হয়ে গেছে বলা যায়। জিপের পথ তৈরী হলেও এখনও যাতায়াত শুরু হয় নি। পাথুয়া থেকে পায়ে হেঁটে ট্রেকাররা যায় ওখানে। পথে কোনো আশ্রয় নেই, সঙ্গে খাবার নিয়ে হাঁটতে হয়। রিনটেকেও কোনো খাবারের দোকান নেই। কারণ মানুষের বসবাস শুরু হয়নি সেখানে। পি. ডবলু. ডি-এর বাংলো এবং ইয়ুথ হোস্টেল ছাড়া মাথা গোঁজার কোনো ব্যবস্থা নেই।

আমার মুক্তি আলোয় আলোয়—ব্রেকে চাপ দিতে কঁকিয়ে থেমে গেল জিপ। ভগবান! একি দেখছে সে? ওর নাম রাস্তা? অসম্ভব। এতক্ষণ যদি ছিল লেত্তির মতো লাট্টুকে জড়ানো, এখন তুবড়ির মতো ফট্‌সে উঠে যাওয়া। এই খাড়াই পথে গাড়ি উঠবে? পার্থ পেছন ফিরে তাকাল। না, ফেরার কোনো প্রশ্নই নেই। তাছাড়া জিপের জন্যে যখন পথটা তৈরী হয়েছে তখন নিশ্চয়ই কোনোমতে রিন-টেকে পৌঁছানো যাবে।

আর তখন থেকেই গোঙানিটা শুরু হলো। নতুন ইঞ্জিন প্রবল প্রতিবাদ করতে করতে জিপটাকে টেনে তুলছে। এই বোল্ডারে সাজানো পথ জিপের চাকা ছাড়িয়ে বড়জোর এক হাত বাড়তি। বাঁক নেওয়ার সময় শরীর এবং মনে যে ঝড় ওঠে তার বিনিময়ে কর্ণের চেয়ে বড় দানবীর হওয়া যায়। প্রতিটি মুহূর্তে নার্ভের ওপর সমানে দুরমুশ চলছে, চারটে চাকা কখনই সমান জায়গায় দাঁড়াবার সুযোগ পাচ্ছে না। এই তিন চার ডিগ্রীতেও পার্থর কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম, ঠোঁট দাঁতের তলায়। আর তখনই রোদ নিভল, নিচের খাদ থেকে ঘন নীল কুয়াশাগুলো নেকড়ের মতো জিভ-লকলকিয়ে ছুটে এল। পরের বাঁকটা ঘুরতে যেতেই খাদের হা-নিশ্বাস থেকে ছিটকে এপাশের পাহাড়ে ঘষটানি খেল জিপ। হঠাৎ পার্থর মনে হলো তার কিছু করার নেই, শেষমুহূর্ত আগত এবং তখনই হাত পনের সমতল পেয়ে কোনোরকমে ইঞ্জিন বন্ধ করে দুই হাতে মুখ ঢাকল স্টিয়ারিং-এর ওপরে।

সমস্ত শরীরে এখনও মৃত্যুর ছোঁয়া যেন মরে নি। সমস্ত দেহে কাঁটা জমে আছে, থর-থর করে কাঁপছে হৃদ্‌পিণ্ড। স্টিয়ারিং-এ হাত রেখে বিস্ফারিত চোখে সে তাকিয়েছিল নিচের দিকে ; যেখানে অন্ধ-কুয়াশা ছাড়া আর কিছু দেখার নেই।

এমন জানলে কোন্ শালা আসতো। একটু ধাত ফিরে পেলে পার্থ চেঁচিয়ে ওই কথাগুলো বললো। খাদের বুকে থেকে উঠে আসা পপলার গাছ ছাড়া সে-কথা শোনার কেউ নেই এখানে, তবু বললো। কোথাও যে অনেক সময় সঙ্গী, চমৎকার টের পেল সে। ওরা বলেছিল রাস্তা খারাপ তবে অসুবিধে হবে না। অসুবিধে না হবার এই নমুনা ? মরার আগেই মরে মরে যেতে হয়। এখন আর ফিরে যাওয়ার পথও নেই, গাড়ি ব্যাক করা মানে চিতায় উঠে বসা। এখানে সেটাও জুটবে কিনা সন্দেহ। ভাগ্যিস এখনও গাড়ির যাতায়াত শুরু হয় নি নইলে ওপর থেকে একটা এলে—। ভাবতে চাইল না পার্থ।

কিছুক্ষণ প্রতিরোধ করেও পারল না সে। এখন নার্ভের যা অবস্থা এটুকু না হলে তার পক্ষে আর স্টিয়ারিং ধরা অসম্ভব। যদিও পাহাড়ে জিপ চালাবার সময় মদ্যপান অবশ্যই নিষিদ্ধ তবু ঝুঁকি নিতেই হবে। বাস্কেট থেকে পিটার স্কট বের করে দু'ঢোক কাঁচা ঢেলে নিল গলায়। আঃ। মুহূর্তেই শরীর গরম। উলেন প্যান্ট এবং উইন্ড চিটারে মোড়া শরীর নিজেই যে ঠাণ্ডা তৈরী করছিল তার দাঁত ভাঙলো।

দুই যখন চার হয়েছে তখন পার্থ সতর্ক হলো। তিরতিরে নেশা হয়ে গেছে। এখন জিপ চালানো তার কর্ম নয়। চারপাশ কুয়াশায় আটকানো, সামান্য দূরের জিনিস চোখে ঠেকে না। আফসোসে জিপের গায়ে হেলান দিয়ে সে নিজেকে গালাগাল দিল। কি দরকার ছিল এই পাকামো করার। স্রেফ নায়ক হবার ধান্দার জের এবার টানো। একটা মেয়েছেলে কি বলেছিল, কি ভঙ্গীতে তাকিয়েছিল আর সঙ্গে সঙ্গে বুকের চিড়িয়া ঝটপটিয়ে ডানা নাড়ল, কোনো মানে হয় ? আচ্ছা, জিপটাকে এখানে ফেলে যদি সে হেঁটে ফিরে যায়। নামবার সময় তো কোনো কষ্ট নেই। পরে যেকোনো ভাবে জিপটাকে উদ্ধার করা যাবে না হয়। অসম্ভব। হিসেবটা ওকে আরও শীতল করলো। পাথুয়া পৌঁছাতে মাঝরাত পেরিয়ে যাবে। আর এই খোলা আকাশের নিচে বিষাক্ত ঠাণ্ডায় চুপচাপ মরে যেতে হবে পৌঁছানোর আগেই।

গত সপ্তাহে ক্লাবে গিয়ে রেনটেকের সঠিক খবর প্রথম জানতে পারে পার্থ। আগে ভাসা ভাসা শুনেছিল কিন্তু খেয়াল করে নি। অসম্ভব ভালো জায়গা, সূর্য নাকি বলের মতো গড়িয়ে গড়িয়ে উঠে আসে, কাঞ্চনজঙ্ঘা এত কাছে যে মনে হয় হাত বাড়িয়ে ছুঁয়ে নিই। বনবিভাগের লোকজন পায়ে হেঁটে কিংবা ঘোড়ায় চেপে বছরে একবার যেত ওখানে। সম্প্রতি একটু নজর দেওয়া হচ্ছে বিদেশীদের উৎসাহ দেখে। কিন্তু ওই চৌদ্দ হাজার ফুট ওপরে পায়ে হেঁটে যাওয়ার কথা চিন্তা করতে ক্লাবের সবাই নারাজ। বোস বলেছিল, 'সূর্য ! হু। আমার বাগানে দাঁড়ালে বিশাল সূর্য দেখা যায়। ওইতো একই জিনিস।'

ভার্মা হেসেছিল, 'ইজ ইট ? মিসেস বোসের প্রোটেস্ট করা উচিত।'

চাল্লিশ বছরের খুকী চোখ নাচিয়েছিল, 'শ্যুড্ আই-ই-ই ?'

ভার্মা খ্যাক খ্যাক করে হেসেছিল, 'সব সূর্য সমান ? একজন লেডির সঙ্গে আর একজন লেডির কোনো তফাত নেই ? তাহলে তো বেঁচে থাকাই যায় না।'

'ওয়েল সেইড ! ওয়েল সেইড।' চিৎকার উঠেছিল ঘরে উদ্দাম হাসির মিশেল হয়ে। হাত নেড়েছিল বোস, 'স্ত্রীলোকদের সঙ্গে সূর্যের তুলনা— ।'

সঙ্গে সঙ্গে চোখ পাকিয়েছিলেন মিসেস বোস, 'ডোণ্ট বি সিলি। স্ত্রীলোক বলছ কেন ? যতসব ছোটলোকি শব্দ, গা ঘিন ঘিন করে ওঠে !'

'হিয়ার ! হিয়ার।' উল্লসিত সবাই।

আর তখন মিসেস মুখার্জির মুখটা নজরে এল পার্থর। অবজ্ঞার হাসিটা চোখে এবং ঠোঁটের কোণে বোলানো। দেখলেই মাথা গরম হয়ে যায় পার্থর। অথচ এই ভদ্রমহিলার মতো সুন্দরী সচরাচর চোখে পড়ে না। বৃদ্ধ স্বামীটিকে চেনে বেঁধে সঙ্গে নিয়ে ঘোরেন। পার্থর মনে আছে পরিচয়ের তৃতীয় দিনে দেখা হতেই বলেছিলেন, ও পার্থ ! কাল সারারাত ঘুমুতে পারি নি।' মুখ চোখ কাঁদো কাঁদো। 'সেকি ! কেন ?' পার্থ বিচলিত হয়েছিল।

'ড্রিমি ! স্বপ্ন ! একটা স্বপ্ন আমার ঘুম কেড়ে নিল।' ঘোরের মধ্যে কথা বলার ভঙ্গী। 'মে আই হেল্প য়ু ?' খুব আন্তরিক গলায় কথাটা বলেছিল পার্থ। আড়চোখে সে দেখে নিয়েছে বুড়ো ভাম মুখার্জী তখন মিসেস বোসকে ইণ্ডিয়ান ফিলজফি বোঝাচ্ছে।

'আপনি আবার হেল্প করবেন কি !' ঠোঁট মুচড়ে হেসেছিলেন সুন্দরী, 'যত নষ্টের মূলে তো আপনি !'

'আমি !' আচমকা খাবি খেয়েছিল পার্থ। সেই কৈশোর থেকে যে প্রতিরোধ তা চুরমার হয়ে যাচ্ছিল। তীরটা সব বাধা সরিয়ে মাছের চোখে বিঁধছে।

'ইয়েস !' খুব সিরিয়াস ভঙ্গী মিসেস মুখার্জীর, 'দেখলাম বিশাল নদীতে আমি একা নৌকোয় বসে আছি। আপনি এসে আমাকে পার করে দিতে চাইলেন। কিন্তু মাঝ নদীতে যাওয়া মাত্র ঝড় উঠল, নৌকো ডুবল। আর আপনি খাবি খেতে খেতে চিৎকার করলেন, আমি সাঁতার জানি না।' তিন হাজার ঝরনা জড়াজড়ি করে ছুটে গেল ওঁর গলা থেকে। কোনোরকমে সামলে নিয়ে বলেছিলেন, 'ওফ্। হরিবল।'

তারপর থেকেই গুটিয়ে গিয়েছিল পার্থ। দেখা হলে ওই হাসি দ্বিতীয়ার চাঁদ হয়ে যায়। নিজেকে বুঝিয়েছিল পার্থ, ঝুট ঝামেলায় যেও না। তার জীবনে অ্যাদ্দিন কোনো মহিলা ছায়া ফেলেনি। মহিলা না বলে ও কৈশোর থেকে মেয়েছেলে বলেই এসেছে। এই সমাজে স্ত্রীলোক বললেই যদি ছোটলোকমী হয় তাহলে মেয়েছেলেতে কি দশা হবে কে জানে। ধাপে ধাপে ওঠার সময় একটি বাক্য সে মন্ত্রের মতো জপ করে এসেছে, নারী নরকের দ্বারী। ছোটবেলার কিছু কথা, শব্দ বা গন্ধ আমৃত্যু ভেতরে ভেতরে বেঁচে থাকে। এটাও ছিল। কিন্তু মিসেস মুখার্জীকে দেখার পর ব্রতচ্যুতি ঘটতে যাচ্ছিল। দুদিনেই জেনেছিল ওই বৃদ্ধ ভামটির দুবার স্ট্রোক হয়েছে, ব্লাড-প্রেসারের অবস্থা নড়বড়ে, সুগার ভালো-

রকমের খারাপ। এইসব সুন্দর গুণ থাকলে কতদিনে পৃথিবীকে ভারমুক্ত করা যায় তার সরল হিসেব করেছিল পার্থ। কিন্তু ওই ঘটনাটির পর সে নিজের আবর্তে ফিরে গেল। জীবনে অনেক কিছু পাওয়ার কথা ছিল না তবু পেয়ে গেল। মেয়েছেলে-চিন্তা থাকলে কি আর তা পাওয়া যেত?

কলকাতার নিম্ন মধ্যবিত্ত (কথাটা এখন চমৎকার শ্ল্যাং) পরিবার থেকে অনেক মেহনত করে সে এখানে উঠে এসেছে। মজার কথা হলো হাজার টাকার চাকরিতে উঠে মনে হয়েছিল আমাদের বংশে আর কেউ এত মাইনে পায় নি। দু-দিন বাদেই দেড় হাজারিদের দেখে বুক জ্বলে গেল। পরিশ্রম আর কপাল যখন তাকে ওই ধাপে নিয়ে এল তখন দু'হাজাররা চোখের সামনে লকলক করছে। এখন তিন হাজারে এসেও অবিরত অশান্তি। সামনে চার পাঁচ ছয় দশ হাজার রাজত্ব করছে। উঠতেই হবে ওই চুড়োয়, কিন্তু চুড়োটা কোথায় তা কেউ জানে না। এই করে করে বড় কোম্পানির দায়িত্ব নিয়ে সে এসেছে পাহাড়তলির শহরে। বিশাল বাংলো, গাড়ি এবং কিঞ্চিত ক্ষমতা, তা সত্ত্বেও মিসেস মুখার্জী ঘুরিয়ে বলে গেলেন সে অপদার্থ। শালা! ওই বুড়ো ভাম কোন্ বীর! তবু জ্বলুনি উপেক্ষা করে নিরাসক্ত হয়েছিল পার্থ।

সেদিন ক্লাবে গিয়ে সে দুবার ডজ্ খেল। পিছনে যাচ্ছে চোখ, ঠোঁট দুটোয় শব্দহীন ঢেউ-এর মোচড়। সেই মোচড়-এর অনেকটাই অর্থ, তুমি একটি ইঁদুর। এসব দেখবে না ঠিক করেও বেঠিক হলো। রিনটেকের প্রসঙ্গ শেষ হওয়ার আগেই সে গম্ভীর গলায় ঘোষণা করলো, 'ব্যাপারটা এমন কিছুই নয়, আমিই তো যাচ্ছি।'

সঙ্গে সঙ্গে সবকটি চোখ সার্চলাইট। বোস বললো, 'আপনি পাগল হয়েছেন? কি ডেঞ্জারাস রাস্তা, ট্রেকিং-এর অভ্যেস না থাকলে—।'

পার্থ সম্রাটের গলায় বললো. 'আমি জিপে যাব।'

তৎক্ষণাৎ চমকানির শব্দ ছড়ালো। ভার্মা উঠে এল, 'ওঃ গড! ডু ইউ ওয়াণ্ট টু কিল ইওরসেলফ? ও পথে এখনও জিপ ওঠেনি এবং খুব এক্সপার্ট ড্রাইভার ছাড়া ড্রাইভ করা অসম্ভব। রাস্তার কণ্ডিশন জানা যাচ্ছে না জিপ না গেলে। একটা বোল্ডার লুজ থাকলে আর দেখতে হবে না।'

মিসেস বোস চোখ ঘোরাল, 'না না, আমরা আপনাকে হারাতে চাই না।'

পার্থ হাসল, 'আমি তো একা। কিছু হলে কাঁদবার লোক নেই। তাছাড়া ওখানকার ভার্জিন কাঞ্চনজঙ্ঘাকে আমি ছাড়া আর কে দেখবে?' কথাটা শেষ করে যার দিকে তাকিয়েছিল তার মুখ ভাঁটার সমুদ্র, দুটো চোখ চড়ায় আটকে থাকা নৌকো। সমস্ত হৃদয় তৃপ্ত হয়েছিল তাই দেখে।

কিন্তু এখন এই প্রায় বিকেলে নিজেকে কুরুক্ষেত্রের শেষ সন্ধ্যেবেলায় একা দাঁড়ানো যুধিষ্ঠিরের মতো মনে হচ্ছিল। সেদিন ওরকম জেদ যদি মনে না আসতো! এখন কি দাম যে দিতে হবে ঈশ্বর জানেন।

বেশ কিছুক্ষণ বাদে নেশাটা সামান্য জুড়লো। পার্থ স্টিয়ারিং-এ বসে ঘড়ি দেখল। দিনের আলো থাকতে থাকতে যে করেই হোক পৌঁছাতে হবে।

অ্যালকোহলের প্রতিক্রিয়ায় মনে জোর এল, হয়তো সে পারবে। ইঞ্জিন চালু করে জিপটাকে তুলে নিল ওপরে। গোঁ গোঁ শব্দ হচ্ছে। চাকাগুলো নেহাত নতুন তাই পিছলে যাচ্ছে না। চারপাশে এখন জমাট ফগ তবে একটাই সুবিধে, যত সে এগোয় তত ওরা সরে দাঁড়ায়। সব কটা আলো এই দুপুরেই জেলে নিয়েছে পার্থ। ক্রমশ একটা বেপরোয়া ভাব এল মনে, দুর্ঘটনা হয় হোক কিন্তু সে থামবে না। একটা খাড়াই বাঁক নিতে গিয়ে চাকার তলা থেকে ছোট বোল্ডার ছিটকে চলে গেল খাদের বুকে। প্রচণ্ড দুলুনি খেয়ে জিপের চাকা কামড়ে ধরলো রাস্তা। একই জায়গায় পেছনের চাকা পাক খেয়ে উঠে এল ওপরে। পার্থ এখন এসব নিয়ে আর মাথা ঘামাচ্ছে না। হয় রিনটেকে পৌঁছাবো নয় খাদে গড়াবো। এর মাঝামাঝি যখন কিছু নেই তখন তা নিয়ে ভেবে কি লাভ; মোটামুটি এই মেজাজে চলছিল সে।

কত হাজার উঠেছে হিসেব নেই, কতটা পথ বাকী তাও জানে না। চলতে চলতে যে ক্লান্তি আসে সেটাও যেন ভোঁতা এতক্ষণে। একটা বাঁক নিতে গিয়ে মনে হলো পাহাড়ের গায়ে সেঁটে দাঁড়িয়ে কেউ যেন হাত নেড়ে তাকে থামতে বলছে। সামনের পথ ছাড়া অন্য কোনো দিকে নজর দেবার সময় নেই, পার্থ তাকাল না, গাড়ি থামাবার কোনো প্রশ্নই ওঠে না। আমি এখানে দানছত্র খুলতে আসি নি যে হাত দেখালেই থামতে হবে।

হঠাৎ ওর মনে হলো নাক এবং হাতের আঙুলগুলো নিঃসাড় হয়ে যাচ্ছে! অথচ জিপের ইঞ্জিনের যে তাত সেটাও তো কিছু কম ছিল না এতক্ষণ। ব্যাগে মাঙ্কি ক্যাপ এবং গ্লাভস রয়েছে। ও দুটো বের করতে গেলে গাড়ি থামাতে হবে যেটা কিছুতেই সম্ভব নয়। ক্রমশ মনে হল সে ঠাণ্ডায় জমে যাবে। জিপ দুর্ঘটনা নয়, এইভাবে চললে আপসেই প্রাণ বেরিয়ে যাবে।

এই বাঁকটাই যে শেষ বাঁক তা কে জানতো। জিপ মুখ ঘোরাতেই পার্থর মনে হলো এ যাত্রায় সে বেঁচে গেছে। মাথার ওপরে আর পাহাড় নেই। এতক্ষণ যাকে পাক দিয়ে উঠতে হয়েছিল তার চূড়োয় জিপ গড়িয়ে চলছে। দুটো ফুটবল মাঠ-এর চেয়ে বেশী নয় যে জায়গা তার নাম রিনটেক। বেশ সমান রাস্তা ঘোড়ার নালের মতো পাক খেয়ে একটু ওপরের কাঠের বাংলোর গায়ে শেষ হয়েছে। জিপ থামিয়ে অপলক তাকিয়ে থাকল পার্থ। সুন্দর। ছোট্ট হলুদ রঙা বাংলোটার চারপাশে নীল ফগ। ডানদিকে আর একটা ঘর যার গায়ে লেখা ইয়ুথ হোস্টেল। পার্থ দেখল, হোস্টেলের দরজা নেই, জানলা নেই, কেমন খাঁ খাঁ করছে। তারপরেই খেয়াল হলো এই যদি রিনটেক হয় তাহলে এখানে কোনো মানুষ নেই। সামান্য প্রাণের অস্তিত্বও টের পাওয়া যাচ্ছে না। ব্যাগ খুলে মাঙ্কি ক্যাপ আর গ্লাভস বের করে গলিয়ে নিতে সামান্য আরাম লাগল। হঠাৎ এক ধরনের বুক-উপচানো আনন্দ এল, অনেক উঁচুতে উঠে এসেছে, প্রচুর ধাপ ভেঙে, এবং আপাতত সামনে কোনো পাহাড়ের প্রতিবন্ধক নেই। আঃ কি আরাম! অথচ শেষ সিকি মাইল— ! পার্থ চোখ বন্ধ করল। তারপর পিটার স্কটের বোতল থেকে খানিক গলায় ঢালল।

শালারা রাস্তাই তৈরী করে নি। দুটো চাকার মাপে পর পর বোল্ডার সাজিয়ে রেখেছে শুধু। কিভাবে চালিয়ে এসেছে তা এখনও মাথায় ঢুকছে না। ওই সময় কোনোরকম বোধশক্তি ছিল না তার। থাকলে আর উঠে আসতে হতো না। কোনোদিকে না তাকিয়ে একরোখা চালিয়ে এসেছে সার্কাসের জিপ-ওয়ালাদের মতো।

ধীরে ধীরে বাংলোর নিচে জিপটাকে নিয়ে এল পার্থ। দরজা খুলে বের হতেই মনে হলো সপাং করে কেউ যেন তাকে চাবুক মারল। আরেব্বাস, পার্থ নিজের দাঁতের বাজনা শুনল, এাঁক ঠাণ্ডা! এক দৌড়ে বাংলোর দরজায় পেঁাছে চিৎকার করলো সে, 'চৌকিদার!'

মুখ থেকে ধোঁয়ার মতো কিছু বের হলো, শব্দটাকে খুব ছেলেমানুষ শোনাল নিজের কানেই। এই খোলা আকাশের তলায় স্থির হয়ে দাঁড়ানো যাচ্ছে না। পা দুটো নাচিয়ে শরীর সচল করার চেষ্টা করে আর একবার চিৎকার করল পার্থ, 'চৌকিদার!'

এবারও কোনো উত্তর নেই। প্রাণপণে দরজায় আঘাত করতে লাগল সে। এবং তখনি খেয়াল হলো কড়ায় তালা ঝুলছে। হিম চোখে দৃশ্যটা দেখল সে। বাংলোটাকে বন্ধ করে চৌকিদার হাওয়া হয়ে গিয়েছে! অথচ ওরা বলেছিল এখানে লোকটা আঠাশ দিন থাকে। মাইনে এবং খাবার নিতে দুদিনের জন্যে নাকি নিচে নামে। সেই দুদিনের একদিন যদি আজ তাহলে ওরা বলত। কেউ আসে না বলে কেটে পড়েছে লোকটা, সরকারী অর্থ হজম করে কাজে ফাঁকি দেবার চূড়ান্ত উদাহরণ।

কিন্তু তাতো হলো, এখন কি করা যায়! পার্থ ফিরে তাকাল। দূরে ইয়ুথ হোস্টেল এখন আবছা। কিন্তু ওখানে রাতকাটানো অসম্ভব ব্যাপার। আর মিনিট দশেকের মধ্যেই বোধহয় আলো মরে যাবে। যা করার এখনই এই মুহূর্তে করতে হবে। অসহায় চোখে বাংলোটার দিকে তাকাল সে। দরজার পাশের কাঁচের দেওয়ালে এর মধ্যেই হিম জমেছে। তবু ভেতরের চেয়ার টেবিল দেখা যাচ্ছে। আরামের গন্ধ পেয়ে মুহূর্তেই বুদ্ধি খেলে গেল। তার পকেটে এই বাংলোর রিজার্ভেশন স্লিপ রয়েছে। অর্থাৎ আইনসম্মত অধিকার আছে এখানে রাত্রিবাসের। কোনো দায়িত্বহীন চৌকিদারের কর্তব্যে অবহেলার কারণে সে সেই অধিকার থেকে বঞ্চিত হতে পারে না।

এক দৌড়ে সে জিপের কাছে ফিরে এল। তারপর দরজা খুলে হ্যাণ্ডেল বের করে নিয়ে এসে সামান্য মোচড় দিতেই খুলে গেল তালাটা। প্রায় লাফ দিয়েই ভেতরে ঢুকে প্রথমে দরজা বন্ধ করলো পার্থ। আর, কি আরাম। চমৎকার গরম হয়ে আছে ঘর। দরজার দিকে তাকাল সে। হয়তো বেআইনী হলো তালা ভাঙা, কিন্তু তা নিয়ে যথেষ্ট তর্ক করা যেতে পারে। একটা চেয়ারে শরীর এলিয়ে চোখ বন্ধ করতেই মনে হলো চাপা গলায় অনেকে কথা বলছে। এখানে আবার মানুষ এল কোত্থেকে? রিনটেকে থাকার মধ্যে তো ওই চৌকিদার। চট করে মুখ তুলে পেছনের দিকে তাকাতেই চোখে পড়ল

দরজাটা বন্ধ। তারপরেই ভুলটা ধরা পড়ল। বাইরে কি হাওয়া বইছে? পপলার গাছের পাতার ঘষটানি কি মানুষের চাপা গলার মতো শোনায়! সে সামনে তাকাল। ঘরটার তিনটে দেওয়ালের চারফুট বাদ দিয়ে কাঁচে ঘেরা। এরমধ্যে ফগেরা উধাও হয়ে গেছে। একধরনের মরে যাওয়া আলোর ছায়া সমস্ত রিনটেকে জড়ানো। কিন্তু তার বাইরের আকাশের দিকে তাকিয়ে বুক ছ্যাঁত করে উঠল পার্থর। কুমিরের মতো কুচকুচে কালো মেঘ আকাশের এক-কোণে গুঁড়ি মেরে এগিয়ে আসছে। ক্রমশ তার চেহারা জলহস্তীর আকার নিল। পেছনে ধাওয়া করে আসছে বিশাল চেহারার জন্তুরা। পার্থ দেখল রিনটেকের বাইরে কোনো পৃথিবী নেই, কোনো পাহাড়ের বরফচুড়ো দেখতে পাওয়া দূরের কথা আলোর ছায়াটাও সরে যেতে লাগল। ডানদিকের আকাশে গর্জন করে উঠল চাপ মেঘের দল। পৃথিবীর সব আকাশ থেকে যেন মেঘেদের তুলে এনে এখানে ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে আসন্ন যুদ্ধের জন্যে। আর তারপরেই সমস্ত চরাচর ঘন অন্ধকারে মুড়ে গেল।

ঘরের ভেতরেও একফোঁটা আলো নেই। একটা হ্যারিকেন কিংবা মোমবাতি জ্বালা দরকার। পার্থর মনে পড়ল গাড়িতে সবকিছু রয়ে গেছে। বৃষ্টি ফিস্টি শুরু হবার আগেই ওগুলো নিয়ে আসা দরকার। বাইরের দরজাটা খুলতেই বাংলোটা ঝনঝনিয়ে উঠল। হাওয়া এখন উথাল পাথাল করছে, স্পর্শ লাগা মাত্র মনে হলো বরফের নখে কেউ খামচে নিচ্ছে শরীর। কিন্তু ব্যাগটা দরকার। পার্থ অন্ধের মতো পা বাড়াল সামনে। হাওয়ার ঝটকায় একপাশে পড়ে যেতে যেতে সে সামলে নিতে চাইল। চোখের সামনে পৃথিবীটা অন্ধ। এত গরম জামাকাপড় তবু শরীরের কোথাও উত্তাপ নেই। অনেকবার হোঁচট খেতে খেতে সে একসময় জিপের কাছে পৌঁছাল। দরজা খুলতেই মনে হলো জিপ গড়িয়ে যাবে হাওয়ার টানে। কোনরকমে ব্যাগ আর পিটার স্কটের বোতলটা দুহাতে ধরে হাঁটু দিয়ে দরজাটা বন্ধ করে জিপের আড়ালে দাঁড়াল। ঘণ্টায় কত মাইল বেগে হাওয়ারা ছুটছে কে জানে! তবে আর একটু বাড়লে জিপটাকে খুঁজে পাওয়া যাবে না। আর তখনই হুড়মুড় করে কিছু পড়ল বলে মনে হলো তার। সে চকিতে বাংলোর দিকে তাকাল। অন্ধকারে যদিও স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না তবু মনে হলো শব্দটা বাংলোর দিক থেকে আসে নি। এমনও তো হতে পারে ওই পাহাড়ের গা থেকে বাংলোটাকেই উপড়ে নিয়ে গেল হাওয়া! দূর! অ্যাদ্দিন যখন হয় নি তখন আজকের রাত্রেই সেটা ঘটবে কেন? এইসময় টুপ করে একফোঁটা জল মাঙ্কি ক্যাপের ওপর পড়তেই জিপের আড়াল ছেড়ে সে দৌড় শুরু করলো। এক হাতে ব্যাগ অন্য হাতে পিটার স্কটের বোতল নিয়ে অন্ধের মতো টলতে টলতে সে যখন বাংলোর খোলা দরজায় পা রাখল ঠিক সেই মুহূর্তেই বৃষ্টি নামল। কেনোরকমে দরজা বন্ধ করে সে মুখ ঢাকল দুই হাতে। ওঃ ভগবান!

কিছুক্ষণ পরে ব্যাগ খুলে হাতড়ে হাতড়ে টর্চ খুঁজে পেল পার্থ। বোতাম টিপতেই অন্ধকার কেটে আলোর ফিনকি আছড়ে পড়ল ওপাশের দেওয়ালে। টর্চটা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে সে ঘরের চেহারা দেখে নিল। শুধু টেবিল চেয়ার আর

পায়ের নিচে কাঠের মেঝের ওপর দাঁড়ির গালচে ছাড়া অন্য কোনো আসবাব নেই। না, পেছনের একমাত্র কাঠের দেওয়ালে একটা ছবি খুলে গিয়ে কোনো-রকমে ঝুলছে। বরফের চূড়ার একটা ঝকঝকে বাঁধানো ফটোগ্রাফ। নিশ্চয়ই দরজা খুলে রাখার সময় হাওয়ার দাপটে ওটা খুলেছে। কিন্তু বাংলোটাকে এবার ভালো করে দেখা দরকার। টর্চের আলো যতই তীব্র হোক পেছনে অন্ধকার থাকে। ব্যাগ থেকে মোটা মোমবাতি বের করতে গিয়ে ঠকঠকিয়ে কেঁপে উঠল পার্থ। এখানে হাওয়া নেই তবু এত শীত করছে কেন? দেশলাই ঠুকে মোমবাতি ধরাতেই সমস্ত ঘরে আলো কাঁপতে লাগল। এক হাতে টর্চ অন্যহাতে মোমবাতি নিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে সে চারপাশে তাকাল। ভেতরে যাওয়ার দরজা দুটো। দুটোই বন্ধ তবে ছিটকিনি টানা। মাঝখানের দরজাটা খুললো সে।

ফাইন! শরীরের কাঁপুনি ছাপিয়ে এতক্ষণে খুশী এল। একটা দশ বাই বারো ঘর। পায়ের তলায় কার্পেট। নিভাঁজ বিছানার ওপর চারটে লাল কম্বল, দামী। বালিশের চেহারাটাও সুন্দর। দুটো চেয়ার আর একটা স্টিলের টেবিল। পেছনে ড্রেসিং টেবিলের গা ঘেঁষে ওয়ার্ডরোব। বিছানার উল্টো দিকে ফায়ার প্লেস।

মোমবাতিটাকে ড্রেসিং টেবিলের সামনে রাখতে ঘরটা আলোয় ভরে গেল। পার্থর ইচ্ছে হচ্ছিল বিছানায় শরীর এলিয়ে কম্বলগুলো টেনে নেয়। অনেক কষ্টে লোভ সামলালো সে। সারারাত তো সামনে-পড়ে, এখনই ঠাণ্ডাব কাছে আত্মসমর্পণ করাটা বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। বিছানায় বসে মনে হলো ওটা কনকন করছে। ঠাণ্ডায় ভিজে রয়েছে যেন। আর তখনই সে দেখতে পেল ফায়ার প্লেসের ওপরে একটা বড় বোতলে কেরাসিন রয়েছে। তার মানে যদি কাঠ যোগাড় করা যায় তাহলে ফায়ারপ্লেসটাকে চালু করতে অসুবিধে হবে না। ঘরের অন্য দরজাটি খুলে টর্চ হাতে উঁকি মারতেই একটা প্যাসেজ দেখতে পেল সে। টর্চের আলো ফেলে বোঝা গেল অনেকদিন মানুষ বাস করে নি এখানে। চৌকিদারটা থাকলে এসব হ্যাপা পোয়াতে হতো না। ফিরে গিয়ে এমন কমপ্লেন করতে হবে যাতে এরপর থেকে ব্যাটা আর ফাঁকি দিতে পারবে না।

প্যাসেজের শেষে ছোট্ট দুটো ঘর। একটা টয়লেট, শুকনো। অন্যটা স্টোর। উঁকি মারতেই খুশী হলো পার্থ। একগাদা কাঠ সাজানো রয়েছে। ওপরের তাকে সবরকমের ইউটেনসিলস। পাঁজা করে কিছু কাঠ তুলে ঘরে ফিরে এল পার্থ। টর্চ বগলে চেপে রাখায় অদ্ভুত আলো ছিটকাচ্ছিল দেওয়ালে। কয়েকটা কাঠের টুকরো ফায়ার প্লেসে ঢুকিয়ে সামান্য কেরাসিন ছড়িয়ে দেশলাই জ্বালল সে। দপ করে জ্বলে উঠল আগুন। খুব দ্রুত লকলকিয়ে উঠল। কিন্তু তা সত্ত্বেও ঘরের ঠাণ্ডা কমলো না এক ফোঁটাও। দুটো হাত গ্লাভশুদ্ধ প্রায় আগুনের ওপরে রাখল পার্থ। কিন্তু তেল পুড়ে শেষ হওয়া মাত্রই কাঠের শরীরে কিছু ফুলকি রেখে নিভে গেল আগুন।

জীবনে কখনও উনুন ধরায় নি, ফায়ার প্লেস তো দূরের কথা। অসহায় চোখে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল পার্থ। তারপরেই ব্লোয়ারটা চোখে পড়ল। পাম্প করলেই হাওয়া বের হচ্ছে। আবার কেরোসিন ঢেলে ব্লোয়ার চালাতে আগুনটা কাঠের গায়ে ছড়িয়ে পড়ল। মিনিট পাঁচেকের চেষ্টা সাফল্য এনে দিল পার্থকে। বাঃ, গুড। দাউ দাউ করে জ্বলছে ফায়ার প্লেস। উত্তাপে ভরে যাচ্ছে ঘর। মাথার মাঙ্কিক্যাপটাকে খুলে ফেলতে বাধ্য হলো সে। আগুন কত আরামের। ধোঁয়াগুলো ওপরের গর্ত দিয়ে বাইরে বেরিয়ে গেছে। কিন্তু মাঝে মাঝে সেখান দিয়েও হাওয়ার ধমক আসছিল।

আর এইসময় গোঙানিটা শুরু হলো। মাঝে মাঝে বিদ্যুতের আগুন যে আকাশে ঝলসাচ্ছে তা জানলার পর্দার ফাঁক দিয়েও বোঝা যাচ্ছে। বৃষ্টি পড়ছে তবে খুব জোরে নয়। চোদ্দ হাজার সাতশ পঁচিশ ফুট উঁচুতে এসবের আলাদা মেজাজ আছে। ফায়ার প্লেসের সামনে বসে পার্থ পা নাচাল। এখন এই বাংলো তার। আজকের রাতটাকে কিভাবে উপভোগ করা যায়? কম্বল মুড়ি দিয়ে বাইরে বসবে নাকি? ওই ডিমঘরে? মাথা খারাপ! এই ফায়ার প্লেসের মেজাজ ছেড়ে কেউ নড়ে। বাইরের ঘরটা যখন ডিমের মতন তখন চমৎকার নামকরণ করা গেল, ডিমঘর!

এখন একটু মদ্যপান করা যাক। তারপর হট-বক্স থেকে খাবার বের করে পেটে পুরে শুয়ে পড়তে হবে। ভোর সাড়ে তিনটেতে উঠতেই হবে। না হলে এত কষ্ট করার কোনো মানে থাকবে না। সাড়ে তিনটে থেকেই নাকি অন্ধকারের চেহারা পালটায়। পাঁচটার একটু বাদেই সূর্য ওঠার সময়। তার পাঁচ মিনিট আগেই কাঞ্চনজঙ্ঘার চূড়োয় আলো পড়ে। পার্থ শুনেছে প্রচণ্ড বৃষ্টি যদি প্রথম রাতে হয়ে যায় তাহলে ভোরের কাঞ্চনজঙ্ঘা হাতের তেলোর মতো পরিষ্কার। ফায়ার প্লেস যখন জ্বলছে তখন যত ইচ্ছে বৃষ্টি হোক মাঝরাত পর্যন্ত। এসব ব্যবস্থা তার সূর্য দেখার লগ্নটিকে পাকা করার জন্যে, তাছাড়া কি!

কিন্তু পিটার স্কটের বোতল আনতে ওই ডিমঘরে যেতেই হবে। ব্যাগটাও পড়ে রয়েছে ওখানে। এঘরের উত্তাপ ছেড়ে উঠতে ইচ্ছে করছিল না কিন্তু উপায় নেই। দরজা খুলতেই কাঁপুনিটা ফিরে এল। ডিমঘরের কাঁচে কালো রঙ যেন মোটা করে বোলানো। দৌড়ে বোতল আর ব্যাগ তুলে সে ফিরে এল ভেতরের ঘরে, ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল। আর ওই ঘরে এরাতের মতো ঢুকছে না সে। বোতলটা খুলতেই খেয়াল হলো জল নেই। গ্লাসে ঢেলে চুক চুক করে খাওয়ার সময় এখন। গ্লাস? মনে পড়ল স্টোর রুমে বাসনকোসনের মধ্যে কয়েকটা গ্লাস দেখেছিল যেন। কিন্তু জল পাবে কোথায়? চৌকিদারকে মনে মনে শাপান্ত করলো পার্থ। শালার চাকরি খেতেই হবে।

বিছানাটাকে ফায়ার প্লেসের কাছে টেনে এনে সেখানে আরও কয়েকটা কাঠ ফেলে দিয়ে কম্বলের তলায় ঢুকল পার্থ। তারপর বোতলের ছিপি খুলে এক ঢোক গলায় নিতেই সে সিঁটিয়ে গেল। সর্বনাশ! খাবারের হটবক্স জিপে

পড়ে আছে। রোস্ট চিকেন আর পরোটা। খুব যত্ন করে করিয়ে নিয়েছিল সে। কিন্তু এই ঠাণ্ডায় বৃষ্টিতে ভিজে কে ওই গাড়ির কাছে যাবে? অসম্ভব। নিজেকে চড় মারতে ইচ্ছে করছিল তার। সারাটা রাত না খেয়ে থাকতে হবে! অথচ খাবার আছে তিন মিনিটের দূরত্বে। সে জানলার পর্দার দিকে তাকাল। হাওয়া এবং বৃষ্টি যেন বেড়েই চলেছে। পার্থ তবু আর একবার চিন্তা করলো, জিপের কাছে ছুটে যাবে কিনা! হুট-বক্স পেছনের সিটেই আছে। কোনোরকমে দরজা খুলে নিয়ে আসা। গোটা চারেক কম্বলও ছিল সঙ্গে। অবশ্য সেগুলোর এখন প্রয়োজন নেই। পার্থ উঠে দাঁড়াল। ফায়ার প্লেসের আগুনে ঘরটা যতই তেতে থাক কম্বলের বাইরে আসামাত্র শরীর সিরসিরিয়ে উঠল। একটা ওয়াটার প্রুফ সঙ্গে আনা উচিত ছিল! এইসময় দরজার পাশে দেওয়ালের গায়ে নিজের ছায়াকে কাঁপতে দেখল সে।

দূর! দরজা খুলে খোলা আকাশের নিচে যাওয়া মানে যেচে হাড়িকাঠে গলা বাড়ানো। একটা রাত না খেয়ে থাকলে কি হয়! পৃথিবীর কত মানুষ তো দিনের পর দিন না খেয়ে কাটাচ্ছে। অত কথা কি, মা মাসীমারা তো মাঝে মাঝেই নির্জলা উপোস করেন। এইসব ভাবনা চিন্তা তার খিদেটাকে একটু একটু করে ভোঁতা করছিল। বিছানায় ফিরে এল সে। আর কাঁচা হুইস্কি খেতে ইচ্ছে করছে না। শুয়ে পড়া যাক। ঘড়ি দেখল পার্থ। ছটা বাজতে পাঁচ! তার মানে এখনও বিকেল চলছে। কে বিশ্বাস করবে?

কম্বলের তলায় শরীর রেখে ও ফায়ার প্লেসের দিকে তাকাল। এত ক্লান্তির পরও ঘুম আসছে না কেন? আগুনের লাল শিখাগুলো লকলক করে যেন কয়েকটা মূর্তির চেহারা নিচ্ছে। হঠাৎ তার মনে হলো মিসেস মুখার্জী না থাকলে এখানে তার কখনই আসা হতো না। একটি সুন্দর বাংলোর মালিক সে, কাউকে ভাগ দেবার নেই। আগামীকালের সূর্য কেমন হবে? পাহাড়কে যাঁরা ভালবাসেন তাঁরা বলেন কাঞ্চনজঙ্ঘার মাথায় যখন সূর্যের প্রথম কিরণ স্পর্শ করে তখন ঈশ্বর দর্শন হয়। পৃথিবীর যে-কোনো মন্দিরের চেয়ে সেটা অনেক বেশী লাভজনক। হঠাৎ পার্থর মন প্রশান্ত হলো। আগামীকালের ভোর তার জন্যে অনুপম নৈবেদ্য নিয়ে অপেক্ষা করছে। এই পৃথিবীর একমাত্র সৌভাগ্যবান হিসেবে সে আগামী ভোরে সূর্যের সামনে দাঁড়াবে। মোমবাতিটা যদি জ্বলে জ্বলে নিভে না যায় তাহলে অগ্নিকাণ্ড হবে। ফায়ার প্লেসের আগুনেই ঘর যখন আলোকিত তখন ওটাকে নিভিয়ে ফেলা যাক। কাজকর্ম সেরে পার্থ বিছানায় ফিরে এল। এখন ঘুম চাই। কম্বলে সমস্ত শরীর ঢেকে সে চোখ বন্ধ করতেই আওয়াজটা শুনতে পেল। ঝড় উঠেছে। এতক্ষণ যা ছিল জোরালো হাওয়া তা ঝড় হয়ে গেল। কিন্তু শব্দটা এখন অন্যরকম হয়ে কানে বাজছে! একটু বেসুরো। এতক্ষণের প্রাকৃতিক আওয়াজগুলোর সঙ্গে এর কোনো মিল নেই। হঠাৎ পার্থর মনে হলো কেউ নিশ্চয়ই দরজায় ধাক্কা দিচ্ছে! বিরক্তিতে তার কপালে ভাঁজ পড়ল। এই বাংলোয় কারো আসার কথা নেই। আজ রাত্রের একমাত্র আইনসম্মত মালিক সে। অতএব অন্য কেউ এখানে আসতে

পারে না। তার মনে হলো সে ভুল শুনেছে। ওটা হাওয়ারই শব্দ। দরজায় যদি একটু ফাঁক থাকে তাহলে ওরকম শব্দ হবেই। কিন্তু পরের মুহূর্তে সে উঠে বসল। এবার আর সন্দেহ নেই, কেউ দরজা ধাক্কা দিচ্ছে। চৌকিদার নয় তো? কোথাও আড্ডা মারতে গিয়েছিল, এখন ফিরে এসেছে। দূর! এই পাহাড়ে ও আড্ডা মারবে কোথায়? কিন্তু চৌকিদার ছাড়া আর কেউ এখন আসতে পারে না। হঠাৎ বেশ আরাম লাগল পার্থর। লোকটাকে দিয়ে হট-বক্স এবং জল আনিয়ে নিতে হবে।

বিছানা থেকে কম্বলটা টেনে নিয়ে আপাদমস্তক মুড়ি দিয়ে টর্চটা তুলে নিল পার্থ। দরজায় এসে দাঁড়াতেই আর সন্দেহ রইল না। হাওয়া নয়, মানুষই। হঠাৎ বুকের ভেতর কাঁপুনি উঠলো। ডাকাত নয়তো? এই নির্জন পাহাড়ে কেউ গাড়ি নিয়ে এসেছে দেখে লুঠ করার লোভেও তো আসতে পারে। পরক্ষণেই হেসে ফেলল সে। মিডলক্লাস মেণ্টালিটি! ধারে কাছে যখন লোকালয় নেই, হেঁটে আসাও কষ্টকর তখন ডাকাত আসবে কোত্থেকে? এইসময় পার্থর নজরে গাড়ির হ্যাণ্ডেলটা এল। তালা ভাঙার সময় ওটা কাজে লেগেছিল। নিচু হয়ে সেটাকে তুলে নিয়ে টেবিলের ওপর রাখল সে। প্রয়োজনে এটাকে ব্যবহার করা যাবে। ডিমঘরেব দরজায় তখনও শব্দ হচ্ছে। সেই সঙ্গে একটা স্বর, যেন চিৎকার, কিন্তু হাওয়ার দাপটে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে না।

কাঠের দরজার পাশেই কাঁচের দেওয়াল। ঠাণ্ডায় ঝাপসা হয়ে রয়েছে। চট করে মুছে নিয়ে উঁকি মারল পার্থ। অন্ধকারে কিছুই দেখা যাচ্ছে না। তবে বৃষ্টি খুব জোরে নয়, বড় বড় ফোঁটায় ঝরছে বোঝা গেল। আর তখনই বিদ্যুতের আলোয় রিনটেক ঝলসে উঠল। চকিতে একটা কালো পোশাকপরা মানুষকে দেখতে পেল সে। এবং স্পষ্ট গলার স্বর শুনতে পেল, 'ওপেন দি ডোর।'

একটু ইতস্তত করে দরজা খুললো পার্থ। সঙ্গে সঙ্গে হিম করাত টুকরো টুকরো করে ফেললো তাকে। আর হুড়মুড়িয়ে ঘরে ঢুকলো যে তার শরীর থেকে জল ঝরছে। কোনোরকমে দরজা বন্ধ করেই ঘুরে দাঁড়াল পার্থ।

'হা-ই' সমস্ত শরীরের থরথরানি কাঁপুনি, তবু মেয়েটি হাসবার চেষ্টা করলো।

পার্থর দু'চোখ বিস্ফারিত। কয়েক মুহূর্ত যেন মুখে বাক্য এল না। এই প্রচণ্ড ঠাণ্ডা জড়ানো বৃষ্টির সন্ধ্যেতে একটি রক্তমাংসের মেয়ে সশরীরে চোদ্দ হাজার ফুট উঁচুতে!

মেয়েটি ততক্ষণে উইণ্ডচিটারের ঘোমটা খোলার চেষ্টা করছে, পিঠ থেকে রুকস্যাক নামিয়ে রেখেছে মেঝেয়। চোখাচোখি হতেই বললো, 'আই ওয়াণ্ট শেল্টার, মে আই?'

সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত শরীর যেন একত্রে সাড়া দিল, 'ও, ইয়েস। সিওর।'

মেয়েটি ভেজা উইণ্ডচিটারটা এক হাতে ঝুলিয়ে বললো, 'ইটস টেরিবুল! এরকম ব্যাড ওয়েদার আমি কখনও দেখি নি। তুমি নিশ্চয়ই আমার ডাক

শুনতে পাওনি?' কথাগুলো বলার সময়ে মেয়েটি যেন শিউরে শিউরে উঠেছিল, ওর দাঁত শব্দ করছে, মুখ সাদা।

দ্রুত ঘাড় নাড়ল পার্থ, 'না। আমি ভেবেছিলাম হাওয়া।'

মেয়েটি মাথা নামাল, 'থ্যাঙ্কস! দরজাটা খোলার জন্যে ধন্যবাদ। কিন্তু আমার খুব শীত করছে। এখানে কি আগুন নেই?' ভেজা চুলগুলো মুঠোয় নিংড়ালো মেয়েটি।

এক হাতে টর্চ জেবলে ঘরটায় আলো রাখছিল পার্থ। ঘটনার আকস্মিকতায় তার সব চেতনা যেন অসাড় হয়েছিল, এবার তৎপর হলো, 'তুমি এসো, এই ঘরে এসো। এখানে ফায়ার প্লেসে আগুন জবলছে।'

দ্রুত পাশ কাটিয়ে সে শোওয়ার ঘরের দরজাটা পুরো খুলে দিতেই মেয়েটি চলে এল, 'আঃ। হাউ নাইস!' তারপর ছুটে ফায়ার প্লেসের গায়ে যেন হুমড়ি খেয়ে পড়ল। হাঁটু গেড়ে বসে দুটো হাত পারলে আগুনের গায়ে ঢুকিয়ে দেয়। পার্থ একটা চেয়ার এগিয়ে দিল ওর পাশে, 'তুমি নিজেকে পুড়িয়ে ফেলবে।'

এবার ঘাড় ঘুরিয়ে মেয়েটি হাসল, 'নো। আমার আরাম লাগছে। আর কিছুক্ষণ বাইরে থাকলেই আমি মরে যেতাম। তুমি আমাকে বাঁচিয়েছ! থ্যাঙ্কস!'

পার্থ অগত্যা খাটে গিয়ে বসলো। মেয়েটি হাত পা মুখ সেঁকতে সেঁকতে একটু একটু করে সহজ হচ্ছে। কিন্তু ওর প্যান্টের অনেকটা ভিজে গেছে, চুলেও জল। পার্থ অনুমান করলো ওর বয়স অবশ্যই বাইশের বেশী হবে না। আমেরিকান? ব্রিটিশও হতে পারে। আগুনের আঁচ লাগছে মুখে, টকটকে লাল দেখাচ্ছে গায়ের চামড়া। মাথায় একরাশ সোনালী চুল নেতিয়ে আছে, ভিজে। যখন ঘরে ঢুকছিল তখন পার্থ লক্ষ্য করেছে মেয়েটি মাথায় ওর চেয়ে অন্তত ইঞ্চি চারেক নিচে।

হঠাৎ ঘাড় বেঁকিয়ে মেয়েটি বললো, 'ইজ দেয়ার এনিবডি হেয়ার?'

কাঁধ নাচাল পার্থ, 'নো।'

'আই সি! কেয়ার টেকার নেই!'

'এসে অবধি আমি ওকে দেখি নি। অথচ আমি যখন শহরে এই বাংলো বুক করি তখন ওরা বলেছিল লোকটা এখানে থাকবে।' পার্থ বিশদ হলো।

'তুমি এই বাংলোটা বুক করেছ?'

'হ্যাঁ।'

'বুকিং ছাড়া এখানে থাকা যায় না?'

'না।'

'দেন, তোমাকে আর একবার ধন্যবাদ, কারণ তুমি আমাকে ভেতরে ঢুকতে দিয়েছ।'

পার্থ চুপ করে থাকল। যেন ধন্যবাদটা সে যুক্তিযুক্ত কারণেই গ্রহণ করলো।

মেয়েটি বোধহয় এতক্ষণে পর্যাপ্ত উত্তাপ গ্রহণ করেছে, তাই তড়াক করে উঠে দাঁড়াল, 'নাউ আই অ্যাম ইন ওয়ান। ওঃ, আমার জুতোটার অবস্থা দ্যাখো!' উবু হয়ে বসে চুপসে যাওয়া কেডস-এর ফিতে চটপট খুলে ফেলে সেই দুটোকে ফায়ার প্লেসের ওপর রাখলো সে। তারপর দুটো পা পর্যায়ক্রমে আগুনের ওপর তুলে সেঁকতে সেঁকতে বললো, 'তুমি কি আজই এখানে এসেছ?'

'হ্যাঁ।' পার্থ লক্ষ্য করছিল মেয়েটির পাদুটো শঙ্খের চেয়ে সাদা এবং নিটোল। ওরকম ভিজলে সে কি এত দ্রুত নিজেকে ফিরে পেত? অসম্ভব!

এবার চেয়ারটা ঘুরিয়ে নিয়ে মেয়েটি আগুনে পিঠ দিয়ে পার্থর মুখোমুখি বসলো, 'আই অ্যাম এ্যানিটা, এ্যানিটা, পারলেন।' সুন্দর হাসল সে।

আর সেই হাসির রেশ মিলিয়ে যাওয়ার আগেই পার্থর নিঃশ্বাস ভারী হয়ে গেল। হাসির সঙ্গে সঙ্গে গালে যে টোল, চোখে যে রঙ খেলে গেল তা যেন এক ধাক্কায় পার্থকে বিরাট খাদের কিনারায় এনে দিল। ওর জিভ শুকিয়ে আসছিল। কোনোরকমে সে জিজ্ঞাসা করলো, 'তুমি কি ব্রিটিশ?'

'নো!' টোকা দিয়ে উচ্চারণ করলো এ্যানিটা, 'আমেরিকান। তুমি কখন এখানে এসেছ?'

'বিকেলে।'

'বিকেলে? কখন রওনা হয়েছিলে? আমি তোমাকে রাস্তায় দেখি নি! আমি অবশ্য সর্টকাট রাস্তায় এসেছি কিন্তু আমার আগে তুমি কি করে পৌঁছাবে?' মেয়েটির চোখে মুখে বিস্ময় ফুটে উঠলো।

'আমি গাড়ি নিয়ে এসেছি!'

'ওঃ গড! তাই বল। ইউ আর নট ট্রেকার!'

'না।'

'তাহলে নিশ্চয়ই তুমি খুব বড়লোক!'

এবার মাথা নাড়ল পার্থ, 'না। আমি একটা ভালো চাকরি করি।'

মেয়েটি চোখের তলা দিয়ে দেখলো, 'তোমার মধ্যে হঠাৎ কিছু চেঞ্জ হয়েছে!'

'চেঞ্জ!' পার্থ চমকে উঠে প্রাণপণে সহজ হতে চাইল, 'কই না তো।'

'তোমার মুখ বলছে। আমি আসায় তুমি কি ডিস্টার্বড বোধ করছ?'

'নো, নেভার।'

'কিন্তু দরজা খোলার পর তুমি আর এখনকার তুমির মধ্যে প্রচুর পার্থক্য। আমার মনে হচ্ছে তুমি খুশী হওনি। কিন্তু আমি হেল্পলেস, ওরা আমাকে সত্যি কথা বলে নি।' এ্যানিটা কাঁধ নাচাল। এখন ওর শরীরে পুরো হাতা পুলওভার, গলায় মাফলারের মতো জড়ানো কিছু। সেটা বোধহয় ভিজে অনুভব করে এ্যানিটা খুলে ফেললো, 'আমার সোয়েটারেও বোধহয় জল লেগেছে।'

পার্থ সহজ গলায় বললো, 'তুমি আসায় আমি খুশী হয়েছি। একা থাকতে আমার কষ্ট হচ্ছিল। কথা না বলে কতক্ষণ থাকা যায়!'

আবার হাসিতে উজ্জ্বল হলো এ্যানিটা, 'তাহলে এখনও নাম বলনি কেন ?'

পার্থ সহজ হলো, 'পার্থ।'

'পাতর।'

'নো। পা-র-থো।'

'পার-তো।'

'ওয়েল, অনেকটা কাছাকাছি !'

আর একবার উচ্চারণ করে খিলখিলিয়ে হেসে উঠে হাত বাড়াল এ্যানিটা, 'গ্লাড টু মিট ইউ। কল মি অ্যান।'

করমর্দনের সময় পার্থর রক্তচলাচলের গতি বেড়ে গেল। প্রাণপণে নিজেকে সংযত করতে চেষ্টা করছিল সে। কিছু একটা বোকার মতো করে ফেললে পরে আফসোস করতে হবে।

এবার অ্যান অনেক সহজ হয়ে বললে, 'এগুলো চেঞ্জ করা দরকার। ভিজে প্যাণ্টে আর থাকা যাচ্ছে না। হোয়ার ইজ মাই ব্যাগ, ওহো, ওটা বাইরে আছে, না ?' অ্যান তরতরে পায়ে দরজার দিকে এগোচ্ছিল কিন্তু পার্থ হাত বাড়িয়ে বাধা দিল, 'তুমি যেও না, আমি এনে দিচ্ছি।'

কপট অভিব্যক্তি অ্যানের মুখে, 'কেন ?'

'তোমার গায়ে গরম জামাকাপড় নেই। ওখানে প্রচণ্ড ঠাণ্ডা !' কম্বল শরীরে জড়িয়ে পার্থ ডিমঘরে ঢুকলো। জোর বৃষ্টি হচ্ছে, কাঁচের গায়ে সপাং সপাং শব্দ, দরজাটা হাওয়ার দাপটে কাঁপছে। মেঝে থেকে রুকস্যাক তুলে নিয়ে কাঁপতে কাঁপতে ফিরে এল পার্থ। তারপর সেটাকে মাটিতে রেখে বললো, 'এত ওজন কাঁধে নিয়ে হাঁটলে কি করে ?'

অ্যান হাসল, ঝুঁকে ব্যাগের চেন খুলে জিনিসপত্র বের করলো, 'মাই গড। এগুলো তো অলরেডি ভিজে গিয়েছে। ওরা বলেছিল ওয়াটার প্রুফ, তার নমুনা দ্যাখো ! ওঃ, আমি এখন কি করি !' পাগলের মতো সবকটা জিনিস মেঝের ওপর উপুড় করা হয়ে গেলে দেখা গেল একটা নীল স্লিপিং গাউন ছাড়া কেউ জলের ছোঁওয়া থেকে বাঁচে নি। পার্থ দেখলো জামাকাপড় বেশী নেই ওখানে। তবে আণ্ডার গার্মেণ্টস্-এর সংখ্যাই বেশী। সেগুলোর দিকে তাকাতে সংকোচ হচ্ছিল ওর। পূর্ণ যুবতীর ব্রেসিয়ার ভাঁজ করা অবস্থাতেও বড় উদ্ধত ! সে চোখ সরিয়ে ফায়ার প্লেসের ওদিকে তাকাল। আগুনের শরীর ছোট হয়ে আসছে। উঠে দুটো কাঠ তুলে ভেতরে ঢুকিয়ে দিল পার্থ। এর মধ্যে বয়লারের মতো তেতে গেছে ফায়ার প্লেসটা। অধিক উত্তাপ কখনও যে এত আরামদায়ক হয়—এর আগে জানা ছিল না।

ভেজা জামাকাপড়গুলো ফায়ার প্লেসের ওপর ছড়িয়ে দিয়ে অ্যান দু'হাতে টেনে মাথার ওপর দিয়ে পুলওভারটাকে খুলে নিল। চকিতে তাকাল পার্থ, জিনের সার্ট পুলওভারের নিচে। সে উঠে দাঁড়াল, 'তুমি চেঞ্জ করে নাও আমি বাইরে দাঁড়াচ্ছি।'

'হোয়াট ফর ?' সবিস্ময়ে তাকাল অ্যান।

'তুমি তো পোশাক পাল্টাবে ?'

'হ্যাঁ, কিন্তু তার জন্যে তোমাকে ওই ঠাণ্ডায় গিয়ে কাঁপতে হবে কেন ?'

পার্থ হাসল, 'আমাদের দেশে মেয়েরা পোশাক ছাড়ার সময় ছেলেরা থাকে না।'

'খুব ভালো প্রথা।' অ্যান মাথার চুল থেকে ক্লিপগুলো খুলছিল, 'কিন্তু যে মেয়ে একা একা সারা পৃথিবী ঘুরে বেড়ায় তাকে কতগুলো কায়দাকানুন জানতে হয়।'

সোনালী চুল ঝরনার মতো পিঠময় ছড়িয়ে গেল। ছোট্ট তোয়ালে তুলে সেগুলো থেকে জল শুষে নিচ্ছিল অ্যান।

পার্থ আবার বিছানায় বসে পড়ল। অ্যানের যদি লজ্জা না আসে তাহলে সে কেন সংকোচ করবে ! চুল শুকিয়ে নিয়ে অ্যান বললো, 'এ-কথা মানতেই হবে ভারতবর্ষের মানুষ মেয়েদের সম্মান করতে জানে। আমি এদেশে একমাস এসেছি, কখনও কোনো বিপদে পড়ি নি। এমনকি কেউ টিজ পর্যন্ত করে নি' কথা বলতে বলতে সার্টের বোতাম খুলে ফেললো সে। তারপর অবলীলায় একটা হাত খুলে নিয়ে পেছন ফিরে দাঁড়াল। পার্থ চোখ সরাতে চেষ্টা করলেও শেষপর্যন্ত হেরে গেল। দু'তিন সেকেণ্ডের জন্যে শঙ্খের চেয়েও সাদা পিঠে হালকা নীল স্ট্রাপ টলটল করে উঠতেই ওর নিঃশ্বাস যেন বন্ধ হয়ে এল। সমস্ত ইন্দ্রিয় একত্রিত হয়ে শরীরকে উত্তেজিত করছিল অ্যানের কাছে ছুটে যেতে। এবং ততক্ষণে স্লিপিং গাউনের আড়াল নেমে এসেছে শরীরে। সেই আড়ালে অভ্যস্ত হাতে প্যাণ্ট খুলে ফেললো অ্যান। খুলে বললো, 'আঃ। নাউ আই অ্যাম হ্যাপি।' তারপর পার্থর দিকে তাকিয়ে বললো, 'কত অল্পে আমরা সুখী হই না ? কিংবা সুখী হবার ভান করি ! তুমি অমন করে তাকিয়ে আছ কেন ?'

'কি করে ?'

'তোমার মুখে রক্ত জমেছে।'

পার্থ হাসবার চেষ্টা করলো, এবং এই হাসির কি অর্থ তা সে নিজেই জানে না।

ফায়ার প্লেসের সামনে খাটের লাগোয়া চেয়ার সরিয়ে এনে দুটো পা সামনে ছড়িয়ে বসলো অ্যান। পার্থ বুঝতে পারছিল না সে কি করবে। এখন তার একটুও ঠাণ্ডা লাগছিল না। সেটা যত না ফায়ার প্লেসের কারণে তার চেয়ে অনেক বেশী শরীরের নিজস্ব উত্তাপে। বলা যায় পার্থ নিজেই ফায়ার প্লেস হয়ে যাচ্ছিল কিন্তু তার আগুন না দেখানোর চেষ্টাই প্রকট, এটুকু পার্থক্য।

'তুমি কোথায় থাকো ?' দুটো কনুই খাটে, তাতে শরীরের কিছুটা ভার।

'কোলকাতায়।' ইচ্ছে করে অর্ধেক সত্যি বললো পার্থ। কিন্তু তার চোখ ততক্ষণে অ্যানের স্লিপিং গাউনে। বাঁ দিকের থাই-এর কাছ থেকে গাউনটা কাটা, ফলে চকচকে পুরুষ্টু থাই চলকে উঠেছে। আগুনের ছায়া পড়েছে সেখানে, মনে হচ্ছে লাল মাখন স্থির।

'ক্যালকাটা ! ওঃ হরিবল। আমি একদিন ছিলাম ওখানে। হোটেল থেকে

বেরিয়ে দম আটকে গিয়েছিল। অ্যান্ড দ্যাট টেরিবল্ লোডশেডিং। তোমরা ওরকম জায়গায় কিভাবে থাক বুঝতে পারি না। এই দেশে এত সুন্দর সুন্দর জায়গা যখন খালি পড়ে আছে তখন ওরকম— । বিরক্তিতে ঘাড় নাড়ল অ্যান।

পার্থ বললো, 'তবু শহরটাকে আমরা পছন্দ করি।'

কাঁধ নাচাল অ্যান, 'কখনও কখনও মানুষের আচরণ খুব ক্রেজি হয়ে যায়। তুমি অত দূরে বসে আছো কেন? আগুন পাচ্ছ? সরে এস।'

ফায়ার প্লেসের ভেতরে ফুটফাট করে কাঠ ফাটছিল। পার্থ উত্তপ্ত শরীরটাকে অ্যানের কাছে নিয়ে এল। এখন সামান্য বেঁকলেই সে স্পর্শ পাবে। কিন্তু না, নিজেকে বোঝাল পার্থ, সারাটা রাত সামনে পড়ে আছে। এই নির্জন পাহাড়ে অমন সুন্দরী মেয়ে আর সে। তাড়াহুড়ো করে কোনো লাভ হবে না। রাতটাকে চুটিয়ে উপভোগ করার অনেক সময় পড়ে আছে। আজকের রাতের জন্যে এই বাংলো তার এবং হ্যাঁ, ওই রমণীও। আরও প্রচণ্ড বেগে বৃষ্টি পড়ুক, বাতাস বয়ে যাক, কোনো ক্ষতি নেই। সে জিজ্ঞাসা করলো, 'এ জায়গাটার কথা কোথায় শুনলে?'

'হ্যারল্ড বলেছিল। দিল্লীতে ওকে মিট করি আমি। আমরা দুজনে রাজস্থানটা ঘুরেছিলাম। কোলকাতায় এসে ও চলে গেল কাঠমাণ্ডু। আমি সোজা এখানে।'

'তোমার সঙ্গে বিছানাপত্র নেই?'

'দ্যাটস এ সিলি মিসটেক। আমার স্লিপিং ব্যাগ হোটেলে ফেলে এসেছি। ওরা বলেছিল এখানে এভরিথিং পাওয়া যাবে। তুমি যদি না থাকতে তাহলে আমি মরে যেতাম।'

পার্থ হাসল, 'কোন অসুবিধে হবে না। এখানে চারটে কম্বল আছে।' ইঙ্গিতটা বুঝতে পেরেছে কিনা টের পেল না পার্থ। কিন্তু দৃশ্যটা কল্পনা করে সে বুঁদ হয়ে গেল।

হঠাৎ খিলখিল করে হেসে উঠল অ্যান, 'তোমার কোনো গার্ল ফ্রেণ্ড নেই?'

'নো।' পার্থ হকচকিয়ে গেল।

'ইউ আর নট ম্যারেড, আই সাপোজ!' চোখ ছোট করলো অ্যান।

'নো।'

'দেন আই অ্যাম রাইট। তোমার তাকানো দেখেই বুঝতে পারছি।'

'কি করে?'

তখন থেকে আমার পায়ের দিকে তাকিয়ে আছ তুমি। আমার শরীরটা কি শুধু পা-সর্বস্ব? আমি চুরি করা পছন্দ করি না।' যেন ঠাণ্ডা জল ছুঁড়ে মারল মুখে, পার্থ গ্রাস করলো। তারপর ব্যাপারটা তুচ্ছ বোঝাতে বললো, 'তুমি অনেক কিছু অনুমান করে নিচ্ছ। এই নির্জ্জন পাহাড়ে আমি একা বাংলো রিজার্ভ করে রয়েছি এই সময় তুমি এলে। প্রচণ্ড ঝড়জলের মধ্যে একজন সুন্দরীকে দেখে আমার চিত্তচাঞ্চল্য ঘটতেই পারে, আমি ঈশ্বর নই।'

'আর ইউ সিওর যে তুমি ঈশ্বর নও?'

এইবার হতভম্ব হলো পার্থ, একি হেঁয়ালি !

'ঈশ্বরই, কারণ তুমি যদি এই রাত্রে দরজা না খুলতে তাহলে আমি মরে যেতাম !'

'দূর ! সে তো আমার স্বার্থের জন্যে করেছি !'

'স্বার্থ ?'

'হ্যাঁ। তুমি ছেলে হলে কি দরজা খুলতাম।'

অ্যান কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল। তারপর কাঁধ নাচিয়ে বললো, 'হবে হয় তো। কিন্তু এখন আমার খুব খিদে পেয়েছে।' হাত বাড়িয়ে রুকস্যাক থেকে বের করে রাখা একটা প্যাকেট তুলে নিল সে। তারপর মোড়ক খুলতে গিয়ে বললো, 'হায়রে, এটাও নষ্ট হয়েছে।'

পার্থ দেখলো কতগুলো বিস্কুট এবং চিজ আর রুটি এখন প্রায় থকথকে কাদায় পরিণত হতে চলেছে। প্যাকেটটাকে আবার নামিয়ে রাখল অ্যান, 'তোমার কাছে খাবার আছে ?'

মাথা নাড়ল পার্থ, 'এখানে নেই। আমার মালপত্র গাড়িতে পড়ে আছে। ওখানে বৃষ্টি না থামলে যাওয়া অসম্ভব।'

অ্যান উঠে জানালার পর্দা সরালো। কাঁচের গায়ে জলকণা থাকায় কিছুই দেখা যাচ্ছে না। নিজের মনেই যেন সে বললো, 'পৃথিবীতে আর কোনো প্রাণী নেই।' তারপর ঘুরে দাঁড়িয়ে বললো, 'আমার খুব তেষ্টা লাগছে।'

পার্থ মাথা নাড়ল, 'না, জলও নেই। তোমরা কি বাইরের জল খাও ?'

কাঁধ নাচাল অ্যান। এবং এই সময় সে পিটার স্কটের বোতলটাকে দেখতে পেল, 'হা-ই ! ইটস ইওরস ?'

মাথা নাড়ল পার্থ, 'হ্যাঁ।'

'নো গ্লাস ?'

পার্থ উঠলো। কম্বলে শরীর মুড়ে ভেতরের দরজা খুলে টর্চ হাতে স্টোর রুমে চলে এল। দুটো কাঁচের গ্লাস তুলে নিয়ে প্রায় দৌড়ে ফিরে এসে দরজা বন্ধ করলো সে। এখন প্যাসেজেও আর হাঁটা যাচ্ছে না, ঠাণ্ডায় মাথার ঘিলু অবধি জমে যাবে।

জল নেই, অতএব র' হুইস্কি নিয়ে ওরা দুজনে আগুনের সামনে বসলো। বসে পার্থ বললো, 'তোমার কথা বল।'

ঠোঁট টিপে হাসল অ্যান, তারপর ছোট্ট চুমুক দিয়ে বললো, 'কি কথা ?'

'তুমি কি কর ?'

'ওয়েল, এই মুহূর্তে আমি বেড়াচ্ছি। আমি দু'বছর চাকরি করে যা জমিয়েছিলাম তাই নিয়ে এখন ঘুরে বেড়াচ্ছি।'

'ভারতবর্ষে এলে কেন ?'

'সেতার শুনে। য়ু নো রবিশংকর ? ওঁর বাজনা শোনার পর মনে হয়েছিল। আই মাস্ট সি দিস কাণ্ট্রি ! ইটস বিউটিফুল, তোমাদের এই দেশ সত্যিই সুন্দর !'

'কিন্তু তোমার চাকরি ?'

'যেটা করতাম সেটা গেছে। ফিরে গিয়ে আবার জুটিয়ে নেব।'

'তোমার বাবা মা ?'

'তাঁরা আছেন, নো প্রব্লেম।'

'এইভাবে একা বেরিয়ে আসতে তোমার ভয় করে নি ?'

'ভয় ? হোয়াই ?'

'তুমি বাজে লোকের হাতে পড়তে পার—।'

'সেটা আমি ন্যুয়র্কে'ও পড়তে পারি। আমি শুনেছি এখানে প্রথম সূর্যের আলো যখন কাঞ্চনজঙ্ঘার ওপরে পড়ে তখন, বিউটিফুল। ন্যুয়র্কে থাকলে কি আমি সেটা দেখতে পেতাম ? নো নেভার!' গ্লাসটা শেষ করলো অ্যান। তারপর বোতল থেকে খানিকটা ঢেলে নিয়ে বললো, 'ইটস গুড্।'

অ্যালকোহল ধীরে ধীরে থাবা বাড়াচ্ছে। পার্থ বুঝতে পারছিল তার নার্ভগুলো এখন স্বাভাবিক নয়। এক হাতে গ্লাস নিয়ে অ্যান ঝুঁকে কাঠ খুঁচিয়ে দিচ্ছে অন্য হাতে, পার্থ দেখলো স্লিপিং গাউনের ওপরের অংশ দুলে উঠলো ঢেউ-এর মতো। এখন ওরা এমন পাশাপাশি যে স্পর্শ এড়ানো যাচ্ছে না। অ্যান যখন সোজা হয়ে বসলো তখন ওর কাঁধে তার কাঁধ। শীত দুটো মানুষকে হয়তো কাছাকাছি নিয়ে আসে। এবার অ্যান বললো, 'খুব ক্লান্ত লাগছে। ঘুম পাচ্ছে।'

'এখনই শোবে ?' পার্থ চঞ্চল হলো।

'শোওয়া যেতে পারে।'

'তোমার কোনো বয় ফ্রেণ্ড নেই ?'

'প্রচুর, কেন ?'

'আমার সঙ্গে শুতে তোমার আপত্তি হবে না তো ?'

'ইট ডিপেণ্ডস। আমি ডিভোর্সি।'

'সেকি! তোমার বয়স কত ?'

'ডোণ্ট আস্ক দিস সিলি কোয়েশ্চেন। আমি সতেরতে বিয়ে করেছি উনিশে আলাদা। আমার ঘুম পাচ্ছে।' হাই তুললো অ্যান।

পার্থ উঠলো। তারপর দ্রুত হাতে কম্বলের ভাঁজ খুলে বিছানায় ছড়িয়ে দিল। ওর সমস্ত শরীর অস্থির হয়ে উঠেছিল। গ্লাস নামিয়ে রেখে অ্যান বললো, 'তুমি খুব টিমিড টাইপের, না ?'

'টিমিড!'

'মোটেই অ্যাগ্রেসিভ নও। একটা আমেরিকান ছেলে তোমার জায়গায় থাকলে আমাকে এত তোয়াজ কখনই করতো না। আমি শুনেছি ভারতীয়রা সবসময় হাত পেতে নেয়, জোর ফলাতে জানে না।' অ্যান উঠে বিছানায় বসলো।

'জোর করে তো কিছুই পাওয়া যায় না।' পার্থ এবার কি করবে বুঝতে পারছিল না।

'ইণ্ডিয়ান ফিলজাফার।' অ্যান শব্দ করে হাসলো, 'তুমি এর আগে কোনো মেয়ের সঙ্গে শুয়েছ ?'

দ্রুত মাথা নাড়ল পার্থ, ওর মুখ বেশ তেতেছে, 'না।'

'সত্যি ?' অ্যানের চোখ বিস্ফারিত। 'এত বড় হয়েছে অথচ কোনো মেয়েকে আবিষ্কার করো নি ?'

পার্থ বিছানার এক কোণে বসলো, 'আমাদের দেশে সেটা নিয়ম নয়।'

'তাই নাকি এইসব ছেঁদো কথা আমায় শুনিও না। আমি অনেক ভারতীয়ের সঙ্গে মিশেছি। শিক্ষিত সমাজ পৃথিবীর সব জায়গায় এখন একই ছাঁদে গড়া। তুমি নিশ্চয়ই অশিক্ষিত গ্রাম্য যুবক নও ?' অ্যান শূন্য গ্লাস ফায়ার প্লেসের ওপরে নামিয়ে রাখলো। তারপর গলা পালটে বললো, 'তুমি কখন শোবে ?'

'মানে ?' পার্থ হকচকিয়ে তাকাল। এতক্ষণ যে ভঙ্গীতে কথা বলছিল অ্যান, এই জিজ্ঞাসা সেই ঘরানায় নয়। অ্যান একটু ঝুঁকে ফায়ার প্লেসের কাছে মাথাটা নিয়ে গিয়ে চুলে বিলি কাটতে বললো, 'আমরা রাতটাকে ভাগাভাগি করে নিই। দু'জনের একসঙ্গে ঘুমোনোর কোনো দরকার নেই। শেষ রাত্রে যে জেগে থাকবে সে আর একজনকে ডেকে দেবে যাতে ভোরের সূর্যটাকে আমরা না হারিয়ে ফেলি। কি বল ?'

'ভোরের সূর্য ?' বিড়বিড় করলো পার্থ। ভোর তো অনেক দেরী, এখন তো রাতও আসে নি।

'হ্যাঁ। আমরা তো সানরাইজ দেখব বলে এত কষ্ট করে এসেছি, তাই না ?'

কথা বলতে বলতে অ্যান কয়েক পা হেঁটে পার্থর পাশে এসে বসলো, 'যদি দুজনেই ঘুমিয়ে থাকি আর সেই ফাঁকে সূর্যটা টুপ করে উঠে যায় তাহলে এত কষ্ট করার কোনো মানে থাকবে না। বরং প্রথম রাতটা আমি জেগে থাকি দ্বিতীয় রাতটায় তুমি—ঠিক আছে ?'

পার্থ আড়চোখে অ্যানের বুকের দিকে তাকাল। ওর সমস্ত শরীরে এখন গ্রীষ্মের পোড়া হাওয়া পাক খাচ্ছে। গলার স্বরে প্রাণপণে স্বাভাবিকতা রেখে সে বললো, 'ভয় পাওয়ার কিছু নেই, আমার ভোরে ওঠার অভ্যেস আছে। তাছাড়া এই সন্ধ্যেবেলায় শুলে রাত একটার সময় আপনি ঘুম ভেঙে যাবে, ওসব নিয়ে চিন্তা করো না।'

'কিন্তু আমি কোনো রিস্ক নিতে চাই না।'

'ওফ্। তুমি এমনভাবে কথা বলছো যেন আমি কষ্ট করে সূর্য দেখতে আসি নি। তুমি সূর্য দেখবে আর আমি ঘুমুবো তাই বা ভাবছ কি করে। তাছাড়া—।' কথাটা বলবে কিনা বুঝতে পারছিল না পার্থ। ওর মনে একটু একটু করে যে বোধ জন্মাচ্ছিল তা হলো মেয়েটি নির্ঘাৎ খেলাচ্ছে।

পার্থর গলা একটু উঁচুতে ওঠায় অ্যান সকৌতুকে ওর মুখের দিকে তাকিয়েছিল। দ্বিধায় পার্থ চুপ করতেই সে জুড়ে দিল, 'তাছাড়া ?' সে চোখের তলা দিয়ে তাকাল যা পার্থর কাছে বিদ্রূপের মতো দেখাল, 'তাছাড়া ওই ইয়ুথ হোস্টেলে থাকলে তোমাকে আগামী কালের ভোর পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হতো

না। সূর্য দেখা বেরিয়ে যেত, তাই না?'

অ্যান স্পষ্টত বিস্ময়ে মাথা নাড়ল, 'আমি বুঝতে পারছি না।'

পার্থ খপ করে অ্যানের হাত ধরলো, 'এটা না বোঝার কি আছে? এই বাংলো আমি রিজার্ভ করেছি। আমি যদি তোমাকে এই বাংলোতে ঢুকতে না দিতাম তাহলে তোমার কি অবস্থা হতো তা ভেবে দেখেছ? কাল সকালের সূর্যটাকে দেখতে পেতে? পেতে না তো! বেশ, তাহলে এখন যে বলছ তুমি কোনো রিস্ক নিতে চাও না, আমি জায়গা না দিলে তা বলতে পারতে? আমি এভাবে বলতে চাই নি কিন্তু তুমি আমাকে বলতে বাধ্য করলে।'

অ্যান যেন নিজের সঙ্গে বোঝাপড়া করলো মাথা নেড়ে। তারপর বললো, 'তুমি কি আমার কাছে এই আশ্রয়ের মূল্য চাইছ? এই সহজ কথাটা বলতে এত অবুঝিধে হচ্ছে কেন?'

পার্থর মনে সঙ্গে সঙ্গে অন্যরকম প্রতিক্রিয়া হলো। নিজেকে মাছের কারবারী মনে করার কোনো কারণ নেই। সে ব্যবসা করতে বসে নি। বাইরে বৃষ্টি এবং ঝড়ো বাতাস, মাইনাসে চলে গেছে পৃথিবীর উত্তাপ। এই হিম-নির্জন পাহাড়ের চূড়োয় নরম উত্তাপে একটি পুরুষ এবং একটি নারী কেন দায়বন্ধ হিসেব নিকেশে জর্জরিত থাকবে? কেন স্বতস্ফূর্ত হবে না তাদের শরীরের প্রয়োজন? সে নিঃশব্দে মাথা নাড়ল, না। এই পরিবর্তন নিশ্চয়ই অ্যানের চোখে পড়েছিল। সে স্থির চোখে পার্থকে দেখতে লাগল, 'তুমি ছেলেমানুষ! কি চাইছ তা জানো না।'

'আমি কি চাইছি তা আমি জানি না?' পার্থ যেন সংলাপটাকেই আবৃত্তি করলো। তারপর দু'হাতে অ্যানের কাঁধ আঁকড়ে বললো, 'আমি তোমাকে চাইছি। কোনো কিছুর মূল্য হিসেবে নয়, কোনো দরদাম করেও নয়।'

পার্থর নিঃশ্বাস ঘন, বুকের ভেতর অতল সমুদ্রের চাপ।

অ্যান একটুও বিস্মিত হয় নি এই আচরণে কারণ সে সামান্য নড়ল না বরং ওর ঠোঁটে চিলতে হাসি এল, 'কিভাবে চাইছ?'

এরকম একটা জায়গায় একটি পুরুষ এবং নারী যে ভাবে পরস্পরকে চাইতে পারে সেইভাবে।' পার্থর মুখ নেমে আসছিল লক্ষ্যহীন হয়ে কিন্তু অ্যান বললো, 'দাঁড়াও।' তারপর নিজের কাঁধ থেকে পার্থর মুঠো ছাড়িয়ে নিয়ে তীক্ষ্ম গলায় উচ্চারণ করলো, 'পরস্পরের চাওয়ার কথা বললে না?'

পার্থ অ্যানের মুখের দিকে তাকাল, 'তোমার শরীরে এই মুহূর্তে কোনো চাহিদা নেই?'

অ্যান দ্রুত মাথা নাড়ল, না, নেই। পার্থ সবিস্ময়ে অ্যানের শরীরের দিকে তাকাল। ওর লোভনীয় বুক এবং তার ভাঁজ, হাঁটুর কাছে সরে যাওয়া গাউনের কল্যাণে বেরিয়ে আসে সিল্কি উরুর চামড়া অন্যকথা বলছে। সে ধীরে ধীরে উন্মুক্ত উরুতে পাঁচ আঙুল ছড়াল, 'তুমি আমার সঙ্গে খেলা করছ অ্যান, খেলা করছ!'

'খেলা? তোমার সঙ্গে আমার কয়েক মিনিটের পরিচয়, খেলা করার সুযোগ হলো কখন।'

'তাহলে ? তাহলে এই রাতটাকে উপভোগ করতে তোমার ইচ্ছে হচ্ছে না কেন ? আমি যদি জোর করি ? এখন চিৎকার করলেও তো কেউ তোমাকে সাহায্য করতে ছুটে আসবে না।'

'ওই ভুলটা করো না।' অ্যানের গলা স্থির এবং ধ্বনিতে সতর্কীকরণ।

'কেন ? আমি আমার কামনা মিটিয়ে নেব, এতে ভুল কোথায় ? তুমি বাধা দেবে ?'

'না। কিন্তু তুমি তৃপ্তি পাবে না। তুমি বলেছ এখনও কোনো নারীকে তুমি পাওনি, প্রথম পাওয়াটাকে এমন মাথা গরম করে নষ্ট করো না। জীবনে ওই মুহূর্তটা আর কখনও ফিরে আসবে না।'

অ্যান শেষ করতেই পার্থ ঠোঁট বেঁকাল, 'তুমি পাদরীদের মতো জ্ঞান দিচ্ছ। এসব কথা আমি শুনতে চাই না। তুমি এমনভাব করছো যেন তোমার মতো সতী আর কেউ নেই। অথচ একটু আগেই বললে তুমি ডিভোর্সি, অচেনা লোকের সঙ্গে ঘুরে বেড়িয়েছ। তারা কি তোমাকে ছেড়ে দিয়েছে ? আমি জানি আমেরিকান মেয়েরা খুব সেক্সি হয়, তুমি ধাপ্পা দিচ্ছ আমাকে।'

'কি বললে ? আমেরিকান মেয়েরা সেক্সি হয় ?'

'হ্যাঁ, বই-এ পড়েছি, সিনেমায় দেখেছি, গল্প শুনেছি।'

'অবাক কাণ্ড! যৌবন এসেছে অথচ সেক্স চায় না এমন মেয়ে পৃথিবীর কোন্ দেশে আছে বলো দেখি। অ্যাবনর্মালদের কথা বলছি না।'

'তাহলে, তাহলে তুমি আমাকে বাধা দিচ্ছ কেন ?'

'বাধা' দিই নি। আপত্তি করেছি। কারণ আমি সূর্য দেখতে এসেছি। শুনেছি, কাঞ্চনজঙ্ঘার ওপর প্রথম সূর্যের আলো যখন এসে পড়ে তখন ঈশ্বরদর্শন হয়। তোমরা কি ঈশ্বরেরে কাছে যাওয়ার মুহূর্তে শরীর নোংরা মেখে যাও ?'

'নোংরা ? এটাকে তুমি নোংরামি বলছ ?' আর এক চাতুরী সন্দেহ করে হেসে উঠলো পার্থ।

'হ্যাঁ, নোংরামি। দুটো শরীর যদি সামান্য ভালবাসা না নিয়ে পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হয় তাহলে সেটা নোংরামি। চিরকাল সেই নোংরা পাঁক মেয়েরা শরীরে বয়ে নিয়ে বেড়াবে আর পুরুষরা তৃপ্তির ঢেঁকুর তুলবে। একটি পুরুষ কোনো রমণীকে নির্জনে পেলেই নিজের পাঁক চালান করে দেওয়া ছাড়া অন্য কিছু ভাবতে পারে না ?' অ্যান উঠলো। ফায়ার প্লেসের আগুন নিভে আসছিল, নতুন কাঠের টুকরো গুঁজে দিলো তাতে। দিয়ে বললো, 'এ আমি ছেলেবেলা থেকে দেখে আসছি।'

'কি রকম ?' পার্থ এতক্ষণে গোলকধাঁধায় কিভাবে এগোন যায় বুঝে উঠছিল না।

অ্যান ফিরে এল। শরীরটাকে ধীরে ধীরে এলিয়ে দিলো বিছানায়। তারপর হাত বাড়িয়ে পিটার স্কটের বোতলটা খুলে এক ঢোক গলায় ঢেলে সেটাকে আগের জায়গায় রেখে দিয়ে চোখ বন্ধ করলো। এখন ওর শরীর টানটান বিছানায়, পায়ের

গেছে পার্থর শরীরকে স্পর্শ করছে। অ্যান খুব ক্লান্ত গলায় বললো, 'তুমি আমার পাশে শুতে পারো।'

পার্থর বুকে আবার ঢেউ। সে শুনেছে অনেক রকম খেলা আছে নারী-পুরুষের। চূড়ান্ত লক্ষ্যে পেঁছাবার আগে আঘাত দেওয়া অথবা আহত করাও কি সেরকম একটা খেলা। তার পরিণতিতে যখন এই ডাক তখন আর তাড়াহুড়ো করার কি দরকার। শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের মতো ধীর গতিতে এগোন যাক। ঝালায় যখন পেঁছাবে তখন তো আর কোনো বাধা শোনার অবকাশ থাকবে না। সে পোষা বেড়ালের মতো বিছানায় উঠে এল। দুটো কম্বল ছড়িয়ে দিলো অ্যানের শরীরে, দুটো টেনে নিল নিজে। এখন ইঞ্চি চারেকের ব্যবধান দুজনের। যদিও ওপরে আলাদা কম্বল কিন্তু তলার বিছানা যখন এক তখন? স্বচ্ছন্দে পিছলে মিশে যাওয়া যায়। কিন্তু পার্থ নিজেকে সতর্ক করলো, না, একটুও তাড়াহুড়ো করবে না। খুব ধীরে ধীরে এগোতে হবে।

অ্যান বললো, 'বৃষ্টি এখনও খুব জোরে নামেনি, না?'

অ্যানের শরীরের গন্ধ এখন পার্থর রন্ধ্রে খেলে বেড়াচ্ছে, সেই নেশায় ডুবে যেতে যেতে সে কোনোরকমে বললো, 'হ্যাঁ। খুব ঝড় উঠেছে।'

'সেদিনও উঠেছিল!' অ্যানের শরীর কি কাঁপলো? পার্থর মনে হলো খেলাটা যেন আচমকা বন্ধ হয়ে গেল, নেশাটা থমকে দাঁড়ালো, 'সেদিন মানে?'

'যেদিন আমাকে ভোগ করা হয়। এমন কিছু নতুনত্ব নেই। এখন মনে হয় এই সেক্স ব্যাপারটার মধ্যেই কোনো অভিনবত্ব নেই। পৃথিবীর যে কোনো অংশে লক্ষ লক্ষ লোক প্রতি মুহূর্তে একই ভঙ্গীতে যৌন আনন্দ উপভোগ করে, তাই না?' চোখ বন্ধ করলো অ্যান।

আবার সেই মেঘটা নেমে আসছে ছাদ হয়ে, নাকি দেওয়াল? পার্থ দ্রুত বলে উঠলো, 'পৃথিবীর কোটি কোটি মানুষ এই মুহূর্তে একই ভঙ্গীতে ভালবাসার কথাও বলে থাকে।'

মাথা নাড়ল অ্যান, 'ঠিকই। কিন্তু ভালবাসে কয়জন? যারা বাসে তারা আলাদা।'

পার্থ নড়ে চড়ে উঠলো। কনুই-এ শরীরের ভর রেখে আধশোয়া হয়ে বললো, 'তোমার কথা শুনি, ওই যে ঝড়ের কথা বলছিলে সেটা কি?'

'কি হবে শুনে? একটা মেয়ের গোপন লজ্জার কথা শুনে কি সুখ পাবে?'

'জানি না। কিন্তু আমি তোমাকে বুঝতে চাই?'

চকিতে অ্যান ওর মুখের দিকে তাকালো, 'আমাকে বুঝতে চাও?'

'হ্যাঁ।' পার্থ যেন ছোঁয়া বাঁচিয়ে রাখতে চাইলো।

'এত অল্প সময়ে?'

'সময়? সময়টাকে তো আমরাই তৈরী করে নিই।'

হাসবার চেষ্টা করলো অ্যান, 'কি জানি। তবে আজ অবধি কেউ আমায় বলে নি যে সে আমায় বুঝতে চায়। কত বন্ধুর সঙ্গে দিনরাত কাটিয়েছি তবু পরে মনে হয়েছে আমাদের ভালো করে চেনাজানাই হয় নি। মানুষের সঙ্গে মানুষের বোধহয়

আলাপের মধ্যেই সম্পর্কটা আটকে থাকে। কিন্তু তুমি বললে আমাকে বুঝতে চাও। অবাক কান্ড! অবাক কান্ড! ঠিক আছে, আমি তোমাকে বলছি।'

আর তখনই বাতাস যেন আছড়ে পড়লো বন্ধ জানলায়। শব্দটা এত ভারি যে ভেতরের পর্দায় কাঁপন এড়ালো না। পার্থ সচকিতে তাকাল। বাংলোটা উড়ে যাবে না তো! হঠাৎ অ্যান উঠে বসলো। ওর মুখচোখ একাগ্র, যেন কান পেতে কিছু শুনছে, চাপা গলায় বললো, 'কেউ যেন চিৎকার করছে?'

পার্থ শোনার চেষ্টা করলো। শুধু বাতাসের গোঙানি ছাড়া অন্য কোনো শব্দ নেই। সে হেসে মাথা নাড়লো, 'দূর! এখানে কে চেঁচাতে যাবে! ওটা ঝড়ো বাতাস। বলে সে হাত বাড়িয়ে অ্যানের কোমর স্পর্শ করে শোওয়ার ইঙ্গিত করলো।

অ্যান তখনও সন্দেহে দুলছে, 'কিন্তু আমি যেন স্পষ্ট শুনতে পেলাম গলার একটা আওয়াজ। বাইরের দরজায় কেউ ধাক্কা দিচ্ছে না?'

পার্থ বললো, 'ওটা তোমার শোনার ভুল। এখানকার হাওয়ারা খুব শক্তিশালী, দরজাটা বাধা দিয়ে যাচ্ছে।'

কিন্তু কথা শেষ করা মাত্র পার্থ সিঁটিয়ে গেল। হ্যাঁ, সত্যিই মানুষের গলার স্বর। ঝড়ের দাপট ছড়িয়ে চিৎকারটা এব ঘরে ঢুকেছে। অ্যান বললো, 'হ্যাঁ, আমিই ঠিক, তুমি শুনতে পেয়েছ?'

নিঃশব্দে মাথা নাড়া ছাড়া আর কি করতে পারে পার্থ। কিন্তু ভেতরে ভেতরে একটা ক্রোধ ক্রমেই তীব্রতর হলো। এই সন্ধ্যের অন্ধকারে ঝড়ো আবহাওয়ায় কোন্ হারামজাদা এসেছে। তৃতীয় ব্যক্তির উপস্থিতি এই মুহূর্তে সবচেয়ে অনাকাঙ্ক্ষিত। চৌকিদারটা ফিরতে পারে। সে এলে অবশ্য অনেক তোয়াজ অনেক আরামের ব্যবস্থা হতে পারে, কিন্তু এখন আর তার কি দরকার আছে। যে কোনো তৃতীয় ব্যক্তি মানেই অনাবশ্যক ঝামেলা বাড়া। তাছাড়া—! পার্থর চোয়াল শক্ত হলো, ওটা চৌকিদারের কণ্ঠস্বর না হয়ে যদি অন্য কোনো মানুষের হয় যে এই মেয়েটার মতো সূর্য দেখতে এসেছে! সে অ্যানকে এবার সজোরে টানলো, 'আঃ, শুয়ে পড়, তোমার গল্পটা শুনতে চাই।' আর তখন স্পষ্ট হলো চিৎকার, হেল্প, হেল্প!

অ্যান অবাক হয়ে গেল, 'কি বলছো তুমি? একটা মানুষ এই আবহাওয়ায় সাহায্য চাইছে আর—। না, না, তুমি দরজা খুলে দাও। লোকটা মরে যেতে পারে।'

পার্থ মাথা নাড়ল, 'কিন্তু আমরা জানি না লোকটা কে! কোনোরকম ঝুঁকি নেওয়া এক্ষেত্রে বোকামি।'

অ্যান তাকিয়ে আছে দেখে পার্থ বোঝাল, 'ওরা ডাকাত হতে পারে, পারে না?'

'ডাকাত? এত উঁচুতে ওরা কি ডাকাতি করবে? তাছাড়া মাইলের পর মাইল আমি কোনো মানুষ দেখতে পাই নি, ডাকাতরা আসবে কোথেকে। তুমি ভুল করছো! লোকটাকে বাঁচাতেই হবে।'

পার্থ বুঝতে পারছিল তার প্রতিরোধ নরম হয়ে আসছে। সে শেষ চেষ্টা

করলো, 'কিন্তু এই বাংলো আমি রিজার্ভ করেছি। তাই এর দরজা খোলা না খোলা সেটা আমার ইচ্ছে।'

এবার অ্যান পার্থর হাত জড়িয়ে ধরলো, 'এভাবে জেদ করে বসে থেকো না। আমি তোমার কাছে প্রার্থনা করছি লোকটার প্রাণ বাঁচাও। আমি জানি বাইরে কিরকম ঠান্ডা। তুমি তো আমাকেও জায়গা দিয়েছ।'

'তুমি মেয়ে তাই, ছেলে হলে দিতাম না।' পার্থ বলতে বলতে মুখ ফেরাল, 'তুমি কি আমার সঙ্গে একা থাকতে ভয় পাচ্ছ?' তারপর ধীরে ধীরে উঠে বসলো।

আর তখন অ্যান কম্বল সরিয়ে বিছানা থেকে নামবার চেষ্টা করলো, 'তুমি পাগল, একটা আস্ত পাগল। নাহলে এই অবস্থায় এসব কথা মাথায় আসতো না। ঠিক আছে, আমিই দরজা খুলে দিচ্ছি। লোকটা বাইরের ঠান্ডায় মরে পড়ে থাকবে আর আমি ঘরে আরাম ভোগ করতে পারব না।'

সঙ্গে সঙ্গে চিৎকার করে উঠলো পার্থ, 'থামো। আমার বাংলোর দরজা খুলে দেবার কোনো অধিকার তোমার নেই। চুপ করে বসো এখানে। পরোপকার করতে চাও? বেশ। সেটা আমিই করছি।' বিছানা থেকে উঠে অ্যানের কাঁধ ধরে পার্থ আবার বিছানায় বসিয়ে দিল। তারপর উত্তপ্ত গলায় বললো, 'কিন্তু একটা শর্ত আছে, এটা তোমাকে মানতেই হবে।'

'বলো।' অ্যানের গলা এবার শান্ত।

'আমি না বলা পর্যন্ত তুমি এই ঘর থেকে বের হতে পারবে না। যে-ই আসুক, আমি তাকে জানতে দিতে চাই না যে তুমি এখানে আছ। এটা তোমার নিরাপত্তার জন্যেই বলছি।'

'নিরাপত্তা!' হাসলো অ্যান, 'ঠিক আছে, তাই হবে। কিন্তু তুমি আর দেরী করো না!' দুটো কম্বল টেনে নিয়ে অ্যান আবার বিছানায় শুয়ে পড়ল। বাকী দুটো শরীরে জড়িয়ে নিল পার্থ। তারপর টর্চ আর মোমবাতি হাতে নিয়ে ডিম-ঘরের দরজাটা খুললো। ডিমঘরে এসে ভেতরের দরজাটা ভালো করে ভেজিয়ে দিয়ে ঘুরে দাঁড়াতেই মনে হলো বাইরের দরজাটা ভেঙে পড়বে। পার্থ চিৎকার করে উঠলো, 'কে, কে ওখানে?' কিন্তু বাইরে এই প্রশ্নের কোনো প্রতিক্রিয়া ঘটলো না। মোমবাতিটাকে টেবিলের ওপর রেখে সে হ্যান্ডেলটাকে তুলে নিল। ঠান্ডা লোহা যেন হাতে ছ্যাঁক করে উঠলো।

পার্থ দরজার পাশের কাঁচে চোখ রাখতে গিয়ে মুখ ফিরিয়ে নিল। যা জল ওখানে জমেছে তা ভেতর থেকে হাজারবার মুছলেও কিছু দেখা যাবে না। খুব সাবধানে দরজাটা খুললো সে। এবং খোলামাত্র প্রচন্ড শব্দে দুটো পাল্লা ধাক্কা খেল দু-পাশে। পার্থ একপাশে সরে দাঁড়িয়ে থরথরিয়ে কেঁপে উঠলো কারণ ঘরের ভেতর তখন ভিজে হাওয়া ক্রমাগত ছোবল মারছে। আর তখনই হুড়মুড়িয়ে ঘরের ভেতর ঢুকে পড়ল বিশাল শরীরটা, ঢুকে লম্বা দুই হাতে কোনোরকমে দরজাটা বন্ধ করে লাল দাঁত দেখিয়ে হাসলো, 'থ্যাঙ্কু, থ্যাঙ্কু, ভেরি মাচ।' যদিও হাসছে তবু লোকটার সঙ্গে প্রায় ভেজা এবং কাঁপুনিটা ওর শরীর থেকে ছিটকে

উঠছে। পার্থ বিস্ফারিত চোখে লোকটাকে দেখছিল। কমসে কম সাড়ে ছয়ফুট লম্বা এবং পার্থর দ্বিগুণ চওড়া ওর দেহ। পিঠে বাঁধা সেই বিদেশী রুকস্যাক। গায়ে ট্রেকারদের পোশাকের ওপর বাড়তি ওয়াটার প্রুফ। লোকটা ঈষৎ ঝুঁকে কাঁধ থেকে স্ট্র্যাপ সরিয়ে রুকস্যাকটাকে নামিয়ে ওয়াটার প্রুফের বোতামে হাত দিল। বস্তুটি থেকে তখন টুপটাপ জলের ফোঁটা পড়ছে। মাথার টুপিটাকে সরাতে লোকটাকে আরও বীভৎস দেখাল। কপাল চওড়া হয়ে ঠিক মাথার মাঝখান দিয়ে একদম ওপ্রান্তে চলে গেছে। দুদিকের স্প্রিং-এর মতো চুলগুলো যেন সেই টাকটাকে পাহারা দিচ্ছে। লোকটা এবার হাসলো এবং হাসতেই বাঁ দিকের একটা দাঁত চিকচিকিয়ে উঠলো। নিশ্চয়ই পেতল কিংবা সোনার বাঁধানো। লোকটা সামান্য ঝুঁকে আবার বললো, 'থ্যাংকু ভেরি মাচ। না হলে আমি মরে যেতাম।' তারপরই হঠাৎ বিশাল শরীরটা নিয়ে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে জগিং করতে লাগলো। পার্থ এর আগে অনেক নিগ্রো দেখেছে। সিনেমায় তো বটেই, কলকাতায় কিংবা ওদের শহরে মাঝে মাঝে এক আধজনকে যে দ্যাখেনি তা নয় কিন্তু এত বিশাল চেহারার কাউকে এই প্রথম দেখলো। পার্থ জানে না কেন হঠাৎ একধরনের ভয় তাকে আচ্ছন্ন করতে চাইলো। এবং সেই ভয়টাকে তাড়াবার জন্যে সে রেগে গেল, 'কেন এসেছো এখানে?'

প্রশ্নটায় যে বিতৃষ্ণা আছে তা বোধহয় টের পায় নি লোকটা। গালচের ওপর ততক্ষণে বসে পড়ে জুতোর ফিতেয় হাত দিয়েছে সে, 'সানরাইজ দেখতে। আমি শুনেছি এখানকার সানরাইজ নাকি দারুণ ব্যাপার। কেউ কেউ বলে এখানকার সানরাইজ আর ঈশ্বরকে দেখা একই ব্যাপার। তুমি দেখেছ?'

শেষ প্রশ্নটার জবাব দিল না পার্থ, 'তুমি কোথায় থাকবে?'

ভেজা জুতোটাকে পা থেকে মুক্ত করতে করতে লোকটা বললো 'ওরা আমাকে বলেছিল এখানে ইয়ুথ হোস্টেল আছে। কিন্তু ওটা যে ভাঙাচোরা, জলে ভর্তি তাতো বলে নি। তখন তোমার এই বাংলোটাকে দেখতে পেলাম। এটা তোমার বাংলো?' লোকটা অন্য জুতোয় হাত দিল।

'না। কিন্তু আমি এটাকে রিজার্ভ করেছি। আমি ছাড়া অন্য কেউ এখানে থাকতে পারবে না।'

'অনেক ধন্যবাদ তোমাকে, আমার প্রাণ বাঁচানোর জন্য অনেক ধন্যবাদ। আমার নাম চার্লি, তুমি?'

পার্থ লক্ষ্য করছিল লোকটা তার দিকে না তাকিয়ে কথা বলে যাচ্ছে। এই যে ধন্যবাদ দেওয়া এবং নিজের নাম বলার চেয়ে অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ হলো পায়ের চেহারাটা দেখা।

'তুমি আফ্রিকান?'

'নো। হয়তো কখনো, কিন্তু এখন নয়। মানে কয়েকপুরুষ ধরে আমি আমেরিকান। পৃথিবীর অন্যতম গণতান্ত্রিক বুর্জোয়া দেশ যেখানে কোনো কালা আদমি আজ অবধি প্রেসিডেন্ট হয় নি। কিন্তু তোমার নামটা আমার জানা হয় নি বন্ধু। এইরকম উপকার যে করলো তাকে মনে রাখতে হলে একটা নাম দর-

কার।' জুতোজোড়াকে বেশ যত্নে লোকটা উঁচু করে ধরলো যাতে জল বেরিয়ে যায়। মোজা দুটো ভিজেছে।

'আমার নাম পার্থ।' লোকটার কথাগুলো খারাপ নয়, কিন্তু—। দ্বিধায় দুলছিল পার্থ।

'পারতো? এইসব ইণ্ডিয়ান নামগুলো অদ্ভুত। শুনেছি প্রত্যেকটার নাকি একটা করে মানে থাকে। তাই কি? একটা লোক বেশ অর্থবান নাম নিয়ে ঘুরে বেড়ায়, কি সুন্দর। তোমার এখানে আগুন জ্বালোনি? একটু আগুন হবে?'

সঙ্গে সঙ্গে চোয়াল শক্ত হলো পার্থর, 'না আগুন ফাগুন এখানে নেই। শোনো, তোমাকে আমি এখানে থাকতে দিয়েছি এটাই অনেক কথা, তাই না?'

লোকটা এবার রুকস্যাক খুলছিল, নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই। ইণ্ডিয়ানরা খুব অতিথিবৎসল—।'

'চুপ করো।' থামিয়ে দিলো পার্থ, 'ওসব বস্তাপচা কথা আমাকে শোনাতে এস না। বাইরে থাকলে তুমি মরে যাবে তাই তোমাকে ঢুকতে দিয়েছি। এই ঘরে তুমি রাতটা কাটিয়ে ভোরে সূর্য দেখতে চলে যেও। আমি চাই না আজকের রাত্রে আর তুমি আমাকে বিরক্ত করো।' কেটে কেটে শব্দগুলো উচ্চারণ করলো পার্থ।

এতক্ষণে নিজের ওপর বেশ আস্থা ফিরে এসেছে। নিগ্রোটার চেহারা যতই বিশাল হোক না কেন সে নিজে হুকুম করার মতো জায়গায় আছে। তাছাড়া লোক-টাকে মোটামুটি ভদ্র-টাইপের বলেই মনে হচ্ছে। এই সুযোগ হাত-ছাড়া করা বুদ্ধিমানের কাজ নয়। ওপাশের ঘরে আগুন আছে তা জানতে দেওয়া ঠিক হবে না।

ধীরে ধীরে লোকটা উঠে দাঁড়ালো, 'তোমাকে আমি বিরক্ত করতে যাব কেন? কিন্তু একটু আগুন পেলে ভালো হতো। আমার হাত পা অসাড় হয়ে আছে। এখানে কিচেন নেই?'

বসতে দিলে শুতে চায়! কিচেনের খোঁজ করছে এরপর খাটের করবে। পার্থ আর কথা বাড়াতে চাইছিল না, 'না। নেই।' তারপর মোমবাতিটা তুলতে গিয়ে বললো, 'তোমার কি এটার দরকার?'

'হ্যাঁ, একটুখানি। কিন্তু তুমি শোবে কোথায়?'

'আমার কথা তোমাকে চিন্তা করতে হবে না। তুমি এখানেই শুয়ে পড়।'

ঘাড় ঘুরিয়ে ঘরটাকে দেখে নিয়ে রুকস্যাক এক কোণায় নিয়ে গেল লোকটা। তারপর প্যাণ্টের বোতামে হাত রেখে বললো, 'তুমি আমার ওপর খুব রেগে গেছ, তাই না?'

কথাটার জবাব দিলো না পার্থ। লোকটার যা চেহারা তাতে বেশীক্ষণ ওর সামনে দাঁড়ানো মোটেই সুবিধের নয়। সে হ্যাণ্ডেল আর টর্চ নিয়ে ভেতরের ঘরের দরজা আস্তে আস্তে খুললো। সঙ্গে সঙ্গে চার্লি বলে উঠলো, 'বাঃ, ওখানে একটা ঘর আছে নাকি?'

'হ্যাঁ এটা রিজার্ভ।'

বন্ধ দরজার দিকে তাকালো চার্লি। তারপর জিভ সরু করে শিষ দিল। প্যান্টের অনেকখানি ভিজেছে। বোতাম খুলে চেন টানলেই চলে না, বেশ কসরৎ করে টেনে খুলতে হয় ওটাকে। রুকস্যাক থেকে আর একটা প্যান্ট বের করে নগ্ন শরীরে গলিয়ে নিল সে। জাঙিয়াটাকে ভেজা প্যান্টের ওপর ছড়িয়ে দিয়ে কার্পেটের ওপর বসতে বেশ আরাম, হাল্কা লাগলো।

মোমবাতির আলোটা স্থির হয়ে আছে। তিরতিরে পাতলা আলো। শীত করছে খুব। বাইরে দমাদম বৃষ্টি ঝরছে। এই ছেলেটা বাঙালি। সন্দেহবাগীশ এরা কেমন যেন। ছেলেটা দরজা বন্ধ করে কি করছে। ওর সঙ্গে গল্প করতে পারলেও তো শীতটা কমতো। চার্লি হাসলো। শালার কথাবার্তার মধ্যে মালিক মালিক ভাব আছে। রুকস্যাক থেকে কম্বল বের করলো সে। কোণাটা ভিজেছে। এখানে যে এত শীত তা কেউ বলে নি। কি দরকার ছিল যে এখানে আসার! শালা মাথায় ভূত চেপে গেল। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সূর্যোদয় এখানে হয়। শুনেই বুকের ভেতরটা কিলবিল করে উঠলো। জীবনে সে অনেকদিন সূর্য ওঠা দেখেছে। একই ব্যাপার। দিগন্ত থেকে চট করে একটা লাল সূর্য আকাশে উঠে পড়ে। কিন্তু ওরা বললো এখানে নাকি সূর্য ওঠার আগে একটি ঘণ্টা জুড়ে নানান কান্ড হয়। এখন যা বৃষ্টি হচ্ছে তাতে সেই কান্ডটা আদৌ ঘটবে কিনা তাতে সন্দেহ। তাহলেই চিত্তির! এত পরিশ্রম এত সময় নষ্ট, ফালতু হয়ে গেল। ব্যাগ থেকে কৌটো বের করলো চার্লি। তারপর ঢাকনাটা খুলে দুই আঙুলের ডগায় খানিকটা গুঁড়ো পদার্থ তুলে জিভের তলায় ঢাললো। জিন্দেগীতে সে অনেক রকম নেশা করেছে কিন্তু ছোট মালটার জবাব নেই। কোলকাতায় ফ্রি-স্কুল স্ট্রীটে মাত্র পঞ্চাশ টাকায় পেয়েছে সে। এর আগে দু'দিন খেয়েছিল। মিনিট দুয়েকের মধ্যে শরীর গরম হয়ে যায়। মাথার ভেতরটা হাল্কা কারণ কান দুটো দিয়ে সব গরম বের হয়ে যায়। এতে শীত নির্ঘাৎ কম লাগবে। চার্লির গাল জিভ যেন পুড়ছিল। সে জানালার শার্সির দিকে তাকাল। চিরকাল যেটাকে সে অপছন্দ করে এসেছে আজ সেই ভুলটাই করলো। আমি পরিশ্রম করবো, সময় নষ্ট করবো আর ফলটা পাব কিনা তা ভাগ্যের হাতে ঝুলবে? কভি নেহি। ওসব ন্যাকাপনার মধ্যে থাকার কোনো ম্যানে হয় না। হাত মুঠো করে জোরে ঘুষি মারলো চার্লি ঘরের মেঝেতে। কার্পেটে শব্দটা শুইয়ে দিল কিন্তু কার্পেট কাঁপলো। চার্লি হাসলো। এইটাই ঠিক। হাতে হাতে ফল পাওয়া চাই। মানুষের জীবন এত ছোট যে ভাগ্যের ওপর সব ছেড়ে বসে থাকা মানে ভারত-বর্ষের শ্রেষ্ঠ গাধাটার বন্ধু হওয়া। হায়, সে নিজে ওই কাজটাই শেষ পর্যন্ত করলো! এখন বৃষ্টি যদি না থামে, না খেয়ে শুকিয়ে টলতে টলতে ফিরে যাও! গিয়ে বল, এবার হলো না, ঠিক আছে, নেক্সট টাইম। দুটো পা দুমদাম ছুঁড়লো সে, শালা নেক্সট টাইমের কাঁথায় আগুন।

শরীর সামান্য গরম হয়েছে। কিন্তু কোলকাতায় যে দুবার খেয়েছিল সেরকম

নয়। এই ঠান্ডার জন্যে রিঅ্যাক্ট করছে না নাকি। চার্লি চোখ বন্ধ করলো। চোখ বন্ধ করলেই শালা সেই বুড়িটা কোত্থেকে ফুড়ুৎ করে চলে আসে। কুঁজো হয়ে হাঁটছে তো হাঁটছেই। আর মাঝে মাঝে মুখ ফিরিয়ে বলে, 'ওঃ চার্লি, মাই বয়!'

চার্লি চোয়াল শক্ত করলো। তারপর আর একবার উচ্চারণ করলো, 'মাম্মি লিভ মি এ্যালোন, প্লিজ।' অথচ বুড়ি ছাড়ে না। ঘুম না আসা পর্যন্ত ফিরে আসেই। হার্লেমের রাস্তায় রাস্তায় রোজ একবার টহল দেওয়া চাই। বুড়ি ভেবেছিল তার ছেলে অ্যামেরিকার প্রেসিডেন্ট হবে। কমসে কম মেয়র কিংবা ভালো একটা চাকরি করে গুছিয়ে নেবে।

এই ভারতবর্ষে যদি বুড়ি আসতো। তুমি কে হে? আমি অ্যামেরিকান! শালা এখানকার একটা ভিখিরীও কথাটা শুনে হাসতো। অ্যামেরিকান বলতে এরা বোঝে লাল চামড়ার মানুষ যাদের দু'পকেট ভর্তি ডলার। তার রঙচটা জিনসের প্যান্ট এবং ময়লা জামা দেখে মানুষেরা যে চোখে তাকায় সেটা বুঝতে একটুও অসুবিধে হয় না চার্লির। ভারতবর্ষের এই গরীব কালো মানুষগুলো পর্যন্ত এড়িয়ে চলে। নুমার্কেটের সামনে দাঁড়িয়ে সে পথচলতি ইন্ডিয়ান ছোকরার মন্তব্য শুনেছে, 'আফ্রিকান, নিগ্রো।'

কেউ বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়ে দেয় নি। অবশ্য তা নিয়ে বিন্দুমাত্র মাথা ঘামায় না সে। তবে ভাবতে গেলে খারাপ লাগে। সদর সরাইখানায় জায়গা পেতে তাকে দু'ঘন্টা অপেক্ষা করতে হয়েছিল। কিন্তু সেইসময় যে হিপিগুলো এল তারা কিন্তু স্বচ্ছন্দে জায়গা পেয়ে গিয়েছে। শেষ পর্যন্ত তার বরাতে যে ব্যাঙ্কটা জুটেছিল তার আশে পাশে ছিল যত ভিখিরীমার্কা হিপিদের ভিড়। দিনরাত গাঁজা খেত তারা আর পয়সা ধার চাইতো। মেয়েগুলো ছিল শুঁটকো আর ছেলেগুলো পৌরুষহীন। প্রথম রাত্রেই একটা মেয়ে তাকে বলেছিল, 'হেই ব্ল্যাকি, ডু য়ু ওয়ান্ট মি? ফিফটি রুপিস উইল বি ওকে!' মেয়েটার দিকে তাকিয়ে ছিল সে। এক ইঞ্চি ময়লা খাবলা খাবলা হয়ে জমে রয়েছে সারা শরীরে। মাথার চুলে কতদিন যে চিরুনি দেয়নি তার ঠিক নেই। দুটো কোটরে বসা চোখ ধকধক করছে। অতদূরে বসে তবু পোশাকের দুর্গন্ধ নাকে আসছে। সে ঠাট্টা করে বলেছিল, 'আই কান্ট, আই কান্ট।'

মেয়েটা তার এক সঙ্গীকে খুঁচিয়ে হেসে উঠেছিল, 'লুক, এ্যান য়ুজলেজ বুল' রাগে শরীর জ্বলে উঠেছিল। ইচ্ছে করেছিল এক লাফে কাছে গিয়ে মেয়েটার ঘাড় মটকে দিতে। কিন্তু কিছুই করে নি সে। শুধু পাশ ফিরে শুয়েছিল। না, নো মোর ক্রাইম।

দেশ থেকে পালিয়ে আমার তিনদিন আগে সে জীবনে প্রথমবার অপরাধ করেছে। ওয়েল, য়ু মে টেক ইট অ্যাজ এ ক্রাইম। চটপট হাতটা উঠে গিয়েছিল। মেয়েটা তো বটেই, সে নিজে কিছু বুঝে ওঠার আগেই হাতটা আঘাত করেছিল মেয়েটার ঘাড়ে। চিৎকার করার সময় পায় নি মেয়েটা। কাটা গাছের মতো লুটিয়ে পড়েছিল মাটিতে, আর সে পালিয়েছিল, স্রেফ চোরের মতো তিনদিন লুকিয়ে

থাকা। তারপর এইভাবে ভেসে আসা। মেয়েটা বাঁচলো না মরলো সে জানে না। যেভাবে পড়েছিল তাতে মনে হয় না আবার উঠে দাঁড়াতে পেরেছে। এবং বুড়োটা, সেই বুড়ো সাদা চামড়ার শকুনটা তাকে নিশ্চয়ই খুঁজে বেড়াচ্ছে। পুলিশমহলে ভালো যোগাযোগ আছে লোকটার। কিন্তু মেয়েটাকে আঘাত করার বিন্দুমাত্র বাসনা ছিল না তার। যে ডিপার্টমেণ্টাল সেণ্টারে সে কাজ করতো মেয়েটা থাকতো তার ঠিক ওপরে। সুন্দরী, ছিমছাম এবং ছোটখাটো মেয়ে। হাসত চমৎকার। বাড়িওয়ালা ছিল স্টোরের মালিক ওই শকুনটা। মেয়েটার বাপ মা থাকতো জর্জিয়ায়। বুড়োর নজর ছিল মেয়েটার ওপর আর মেয়েটার তার। প্রথম প্রথম সে এড়িয়ে চলেছিল। ওই চাহনিতে তো অনেকখানি ভালবাসা ছিল। অন্তত তাই তখন মনে হয়েছিল। অথচ সবটাই যে খেলা, একটা শরীরকে নাচিয়ে আনন্দ পাওয়া, একটা মনকে এলোমেলো করে দূরে বসে মজা দেখা, এসব বুঝতে সময় লেগেছিল তার। যখন বুঝেছিল তখন—।

চার্লি থুতু ফেলতে গিয়ে দেখলো তার জিভ শুকিয়ে গেছে। এই গুঁড়োটা যেন শরীরের সব জল শুষে নেয় কিন্তু তেষ্টা পায় না। সাদা চামড়ার মেয়েদের সে চিরজীবন এড়িয়ে এসেছে। দূরে থেকে দেখেছে কিন্তু কাছে ঘেঁষেনি। অথচ কি কাণ্ড, সেই ভুলটাই করে বসলো সে। আমেরিকা থেকে আসার আগে ভেবেছিল পুলিশ তাকে আটকাবে। খুব ভয়ে ভয়ে ছিল কিন্তু কিছুই হলো না। কেন হলো না সেটাই সে বুঝতে পারে না। প্রায়ই মনে হয় একটা চিঠি লিখবে বুড়িকে মাম্মি, আমার জন্যে পুলিশ কি শানিয়ে বসে আছে? কিন্তু লেখার ইচ্ছেটা শেষ পর্যন্ত থাকে না।

ভারতবর্ষে এসে তার ভালো লেগেছিল। কালো চামড়ার দেশ। একমাত্র হিপি আর খুব বড়লোক ছাড়া সাদা চামড়ার মেয়েদের চোখে পড়ে না। কিন্তু যতক্ষণ তোমার পকেটে টাকা ততক্ষণ তুমি এখানে খাতির পাবে ফ্রি স্কুল স্ট্রীটে পা দিতেই দালালগুলো ছেঁকে ধরতো তাকে। গার্লস গার্লস এণ্ড গার্লস। এবং সেখানে একটা নতুন জেনারেশনকে দেখতে পেল সে। এ্যা; নো ইণ্ডিয়ানস। হোয়াইট গার্ল অথচ হোয়াইট নয়। এরা আবার অন্য ভারতীয়দের থেকে আলাদা। ঢং দেখে মনে হতো যেন সোজা লণ্ডন কিংবা ন্যুয়র্ক থেকে নেমেছে। এদের দেখে উদাস চোখে তাকাতো চার্লি।

সেদিন খুব মেঘ করে ছিল। কোলকাতাটা তার পুরোটাই দেখা হয়ে গিয়েছে। এখন সাধারণ মানুষ জন্তুর মতো বাস করে কিন্তু তাতেই বেশ আরাম পায়। পায়ে হেঁটে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরেছে সে। লক্ষ্য করেছে যেই সে নিম্নমধ্যবিত্ত পাড়ায় ঢুকতো অমনি একদল বাচ্চা তার পিছু নিত। তাদের ভাষা সে জানে না কিন্তু হাসি এবং হল্লা শুনে বুঝতে অসুবিধে হতো না সেটা টিটকিরি। ওই কালো বাচ্চাগুলো কেন যে তাকে টিটকিরি দিত সে বুঝে উঠতে পারে না। একদিন একটা ট্রামে উঠে দ্যাখে বেশ ভিড়। কিন্তু একজন মহিলা বসে আছেন এবং তাঁর পাশের আসন খালি, সেখানে কেউ বসছে না। মহিলা মধ্যবয়সী এবং মোটাসোটা। চার্লির পা ব্যথা করছিল, সে এক্সকিউজ মি বলে সেই আসনটিতে

বসতেই মহিলা যেন ইলেকট্রিক শক খেয়ে লাফিয়ে উঠলেন। সঙ্গে সঙ্গে দাঁড়িয়ে থাকা লোকগুলো হো হো করে হেসে উঠলো। চার্লি অবাক হয়ে দেখলো মহিলা নামলেন না, কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। তার মুখ চোখে ভয়ের চিহ্ন স্পষ্ট। চার্লির বুঝতে অসুবিধে হয় নি। তার বিশাল শরীর, কালো রঙকে মহিলা অপছন্দ করেছেন। কিন্তু মহিলার গায়ের রঙ তো ফর্সার ধারে কাছে নয়।

সেদিন সেই মেঘের সন্ধ্যায় সে পার্ক স্ট্রীট দিয়ে হাঁটছিল। এই জায়গাটার সঙ্গে কোলকাতার চরিত্রের কোনো মিল নেই। এই সময় দালালটা তার পেছনে লেগে শোনাল, 'ইন্ডিয়ান গার্লস স্যার, ভেরি চিপ। ব্ল্যাক সুইট গার্লস।'

চার্লি দাঁড়িয়ে গেল। এইরকম বর্ণনা সে কখনও শোনে নি। বিশাল লম্বাটে একটা বাড়ির দোতলায় তাকে নিয়ে গেল দালালটা। যাওয়ার সময় বলেছিল, হান্ড্রেড রুপিস স্যার, চিপ ভেরি চিপ। মেয়েটি ইন্ডিয়ান, গায়ের রঙ কালো, জীনসের প্যান্ট আর সার্ট পরে দাঁড়িয়ে আছে। চার্লিকে দেখে তার কপালে ভাঁজ পড়লো। সে দালালটাকে ভারতীয় ভাষায় কিছু জিজ্ঞাসা করে মাথা নাড়তেই দালালটা বললে, 'স্যার, ইউ আর ভেরি বিগ। টু হান্ড্রেড স্যার, টু হান্ড্রেড।'

এক ঝটকায় দালালটাকে সরিয়ে সে নিচে নেমে আসতেই হাসি শুনতে পেয়েছিল। মেয়েটা খিলখিল করে হাসছে। আজ এই প্রচন্ড শীতে, পাহাড়ের নির্জনে মোমবাতির আলোয় বসে চার্লি চোখ বন্ধ করলো। আই অ্যাম টু বিগ, আমি খুব কালো। ওয়েল, এতে আমার কি হাত ছিল? কাঁধ-ঝাঁকালো চার্লি। তারপর জিভে একটা শব্দ করে চোখ বন্ধ করতেই বুড়ি এসে গেল। সে মনে মনে আদুরে গলায় বুড়িকে বললো, 'লিশুন মাম্মি, আই অ্যাম গোয়িং টু ফেস গড টুমরো। ঠিক তোমার ভগবান নয় আবার অল দি সেম। ওরা বলেছে সকালে সূর্য ওঠার আগে এখানকার পাহাড়ে পাহাড়ে আর আকাশের গায়ে যে কারবার হয় তাতে ঈশ্বর দর্শন ঘটে। মাম্মি, আই উইল আস্ক দ্যাট বাস্টার্ড কেন সে মানুষের চামড়ার রঙ আলাদা করেছে। কেন শালা একজন সব সুখ ভোগ করবে আর একজন তাই চেয়ে দেখবে।' চার্লি চোখ খুলে শিষ দিল। তার খুব প্রিয় সুর। এই সুরটা তার বুড়ি মা খুব ভালবাসতো। রুকস্যাকে হেলান দিয়ে চার্লি সুরটা নিয়ে খেলা করতে লাগলো।

বন্ধ পাল্লায় পিঠ দিয়ে এবার পার্থর খানিকটা স্বস্তি হলো। শুধু ছিটকিনি নয়, হুড়কোটাও তুলে দিল সে। যা বিশাল চেহারা এই দুটোকেও ঠিক ভরসা নেই। সে হ্যান্ডেলটাকে দরজার পাশে এমনভাবে রেখে দিল যাতে প্রয়োজনেই ব্যবহার করা যায়। ফায়ার প্লেসের আগুন এখন টিম টিম করছে। মোমবাতি নেই সুতরাং ওটাকে বাড়ানো দরকার। যদিও সারা ঘরে একটা গরম লালচে আভা ছড়িয়ে আছে। পার্থ আরও দুটো কাঠ আগুনের মধ্যে গুঁজে দিয়ে বিছানার দিকে তাকাতেই দুটো চোখ দেখতে পেল। আপাদ-চিবুক কম্বলে ঢেকে অ্যান তার দিকে তাকিয়ে আছে। ও দ্রুত উঠে এল খাটের ওপর তারপর খুব নিচু গলায় বললো, 'একটা লোক এসেছে, বিশাল চেহারা, নিগ্রো।'

শেষ শব্দটা শোনামাত্র অ্যানের চোখ কুঁচকে গেল, কপালে ভাঁজ পড়লো। চট করে উঠে বসলো সে, 'আফ্রিকান ?' এই অভিব্যক্তির সঠিক অর্থ ধরতে পারলো না পার্থ। আমেরিকান বললে আবার দেশওয়ালী অনুভূতি বেড়ে না যায়। কিন্তু সত্যি কথাটা না বলে পারলো না সে। অ্যানের ঠোঁটে একটু একটু করে হাসি ফুটলো, 'আমার জীবনের প্রথম পুরুষ একজন নিগ্রো, তুমি যা শুনতে চাইছিলে।'

কোনো কারণ নেই তবু পার্থর মনে হলো পাশের ঘরের লোকটাকে ঢুকতে দেওয়া উচিত হয় নি। লোকটা যেন সব ব্যাপারে তাকে টেক্কা মেরে যেতে পারে। সে একটু জড়ানো গলায় বললো, 'এর নাম চার্লি, তার কি ছিল ?'

এবার হেসে ফেললো অ্যান, 'তুমি সত্যিই শিশু। এখন আর তার নাম দিয়ে কি হবে, চার্লি টম ডিক একটা হলেই হলো। ও কি করছে ?'

'আস্তে কথা বলো! লোকটা সুবিধের নয়। শুধু তুমি বললে বলে ওকে ঢুকতে দিয়েছি। ওর চেহারা গুন্ডার মতন, কথাবার্তা খুব চোয়াড়ে। আমি চাই না যে ও তোমার অস্তিত্ব টের পাক। ওই চেহারাকে আমি কখনই বিশ্বাস করি না।' চাপা গলায় বলছিল পার্থ।

হাসি চাপতে গিয়েও পারলো না অ্যান। শব্দটা ছিটকে বেরিয়ে এল চমকে উঠে পার্থ হাত বাড়াল ওর মুখ চাপা দিতে। কিন্তু ততক্ষণে সামলে নিয়েছে অ্যান। ফিসফিস স্বরে বললো, 'তুমি খুব জেলাস। কিন্তু আমার জন্যে তুমি এত ভাবছো কেন ? আমার কাছে তুমি যা ও তাই। যাক, ছেড়ে দাও এসব কথা। একটা লোকের চেহারা বিশাল হওয়া মানে সে খারাপ হবে এই যুক্তি ঠিক নয়। যে আমাকে রেপ করেছিল সে ছিল খুব রোগা, আমার চেয়েও।'

পার্থ নিজেকে বোঝাবার চেষ্টা করছিল অ্যান ঠিকই বলেছে। সত্যি কথাই চার্লির সঙ্গে তার পার্থক্য ওর কাছে কিছুই থাকতে পারে না। এক সে জায়গা দিয়েছে আর তার গায়ের রঙ উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ। কিন্তু তা সত্বেও ওকে চার্লির সঙ্গে মিলিয়ে ফেলা ভালো লাগছিল না পার্থর। কিছুক্ষণ এক ঘরে থেকে কি তার মনে অধিকার-বোধ জন্মে গেছে। অতএব সে ঘাড় নাড়লো, 'ঠিক আছে, তুমি যখন বলছো তখন ঠিক আছে। কিন্তু লোকটা যদি একটা বেড়ালও হতো তবু আমি অপছন্দ করতাম। খামোকা আমাদের প্রাইভেসিটাকে ও নষ্ট করলো।'

অ্যান ধীরে ধীরে বালিশে মাথা রাখল, 'পৃথিবীর সমস্ত পুরুষই এক ধাতুতে গড়া। ও কেন এসেছে ? সূর্য দেখতে তো ? তাহলে আমরা তিনজনেই তীর্থযাত্রী। অতএব রাগ করো না।'

পার্থ কম্বল দুটোকে শরীরের ওপর টেনে নিয়ে কাত হয়ে শুয়ে একটা হাত খুব আলতো করে অ্যানের পেটের ওপর রাখলো। যদিও হাতের তলায় কম্বল এবং পোশাকের স্তর তবু ওর শরীরে একটা উত্তাপ ছড়িয়ে পড়ছিল। সে কোনো-রকমে বললো 'বল।'

অ্যানের বোধহয় আর কথা বলতে ভালো লাগছিল না। সে ক্লান্ত গলায় বললো, 'কি আর বলবো!'

'তোমার কথা, তোমার সব কথা।' ক্রমশ পার্থর ডান হাত অ্যানকে বৃত্তের মতো ঘিরে ফেলছিল। অ্যান হাসলো, 'এভাবে কথা বলা যায় না! তাছাড়া আমার পেটে লাগছে, হাতটা সরাও।' কথাটা শেষ হয়ে আসামাত্র পার্থর হাত ছেঁড়া দড়ির মতো আলগা হয়ে যাচ্ছিল। এখন দুজনেই পাশাপাশি নিঃশব্দে শুয়ে। পার্থর মনে হচ্ছিল সে খুব ভুল করছে। বীরভোগ্যা বসুন্ধরা। অ্যানের ওপর অনেক আগেই তার জোর খাটানো উচিত ছিল। এবং সেটা করার এখনও সময় যায় নি। আর তখনই ডিমঘরে বেশ জোরে শব্দ হলো। ওটা কাশি কিংবা হাঁচি হতে পারে কিন্তু পার্থর নার্ভে চড়াং করে উঠলো। সে উঠে বসলো। তখনই অ্যান চোখ বন্ধ করে বললো, 'আমার তখন মাত্র পনের বছর বয়স।'

প্রসারিত দুই হাতকে কোনোরকমে সংযত করলো পার্থ। তার ফ্যাসফেসে গলায় শব্দ উঠলো, 'পনের?'

চোখ খুললো অ্যান, খুলে হাসলো, 'চৌদ্দ বছর দশ মাস। একটু আগে ভাগেই ঈশ্বর আমার শরীরে মেয়েলী সম্পত্তি চালান করেছিলেন। ফলে সব বয়সী ছেলেরা আমার দিকে চকচকে চোখে তাকাতো। আমার মা ছিলেন খুব রক্ষণশীল। অন্যান্য মেয়েরা যখন শরীর দেখানো পোশাক পরতো তখন আমার হাঁটুও কেউ দেখতে পায় নি। মা আমাকে অহরহ বলতেন মেয়েদের সবসময় পুরুষের সংস্পর্শ থেকে দূরে থাকা উচিত। একমাত্র স্বামী ছাড়া কোনো পুরুষ মেয়েদের আপন নয়, এইসব। আর এসব কথা শুনতে শুনতে হয়তো বিশ্বাস করে ফেলেছিলাম কারণ আমার কোনো ছেলেবন্ধু ছিল না। আমার মেয়ে বন্ধুদের যখন প্রেম দেওয়া নেওয়া শুরু হয়ে গেছে তখন আমি ছিলাম একদম একা। সেই সময় আমরা একবার আমার মায়ের মামার বাড়িতে বেড়াতে গেলাম। নির্জন গ্রামের বাড়িতে আমার দাদু এবং দিদিমা ছাড়া ছিল তিন-চারজন ঝি-চাকর। চাষবাস আর খামার দেখতে এক বৃদ্ধ নিগ্রো। ঝি-চাকররাও ছিল তাই। ওখানে যাওয়ার পর আমার বেশ স্বাধীনতা মিললো। আমি একা একা সারাদিন ঘুরে বেড়াতে পারতাম। ফলের বাগান, চাষের ক্ষেত এমন কি পাশের বনের ভেতরে চলে যেতাম। মাকে দিদিমা বলতেন ওখানে কোনো ভয় নেই। তাছাড়া পুরুষ মানুষরাও ওইসব অঞ্চলে বেশী নেই। চাকরবাকরদের মা ঠিক পুরুষ বলে ভাবতে চাইত না। একদিন বিকেলে এক বনে বেড়াচ্ছি হঠাৎ মনে হলো দুজন কেমন গলায় কথা বলছে। মেয়েটি খুব হাসছিল। কৌতূহল হলো। একটা ঘন ঝোপের আড়াল সরিয়ে এগিয়ে দেখি একটা নিগ্রো ছেলে উপুড় হয়ে শুয়ে রয়েছে। তার শরীরে একটাও পোশাক নেই। কুড়ি বাইশ বছরের একটি যুবতী নিগ্রো তার শরীরে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে। আমাকে দেখা মাত্র মেয়েটি যেন আঁতকে উঠলো। প্রচণ্ড ভয় ওর চোখে মুখে ফুটে উঠলো। আমি ওকে চিনতে না পারলেও বুঝতে পারলাম সে আমার দাদুর কাছেই কাজ করে। মেয়েটা এত ভয় পেয়েছিল যে হাত বাড়িয়ে তার পোশাক তুলে নিয়ে নিঃশব্দে দৌড়ে গেল উল্টোদিকে। আমি তার শরীরটাকে বনের আড়ালে মিলিয়ে যেতে দেখলাম। ও যে ভয় পেয়েছে এটা বুঝতে অসুবিধে হয় নি, কিন্তু কেন ভয় পেল তাই ঠাওর করতে পারছিলাম না। ওরা

নিশ্চয়ই অন্যায় কাজ করছিল যা কালো চামড়াদের করতে নেই। কিন্তু এসব ভাবনার সঙ্গে আমার মনে হয়েছিল ওই মেয়েটির শরীরের গঠন খুব সুন্দর, কিন্তু এই ছেলেটির মতো নয়। ওর কালো চামড়ায় রোদের আভা পড়ায় কেমন নীলচে জেল্লা বের হচ্ছিল। মেয়েটির হঠাৎ উঠে যাওয়া টের পেতে ছেলেটির সময় লাগল। উপুড় হওয়া অবস্থায় ও কিছু একটা বলে ডাকলো। আমার মনে হলো এই মুহূর্তেই ওই জায়গা ছেড়ে চলে যাওয়া উচিত। কিন্তু কেন জানি না আমি এক পা নড়তে পারলাম না। দু-তিনবার ডেকে খুব অবাক হয়ে ছেলেটি উঠে বসলো। এবং তখনই সে আমাকে দেখতে পেলো। অদ্ভুত অভিব্যক্তি ফুটে উঠলো ওর মুখে। না, শুধু ভয় নয় সেইসঙ্গে আরও কিছু। আমি বোকার মতো বলেছিলাম, ও চলে গিয়েছে। ছেলেটা যেন তাতে আরও অবাক হলো। ডানদিকে, বোধহয় মেয়েটির যাওয়ার পথ অনুমান করে সে নিঃশব্দে মাথা নাড়লো। আমি দেখলাম ছেলেটি সত্যি খুব রোগা কিন্তু ওর মধ্যে কি একরকম কাঠিন্য ছড়ানো। ধীরে ধীরে সে উঠে দাঁড়ালো। আমার চেয়ে অনেক লম্বা। কিন্তু তার পুরুসাঙ্গ এত উদ্ধত যে আমি চিৎকার করে উঠলাম। আমার চিৎকার কানে যাওয়ামাত্র সে লাফ দিল। এক হাতে আমার মুখ বন্ধ করে পাগলের মতো আমাকে বিবস্ত্র করার চেষ্টা করলো। আমি দু'হাতে তাকে বাধা দেবার চেষ্টা করলাম। কিন্তু রোগা শরীরেও অত জোর সে কি করে পেল জানি না, আমি হেরে গেলাম। ছেলেটিও আমাকে ধর্ষণ করলো। যে মুহূর্তে ও আনন্দ খুঁজছিল সেই মুহূর্তে আমি নিঃশব্দে কাঁদছিলাম। আমি জানি ও আনন্দ পায় নি। হয়তো ওর প্রেমিকার কাছে যে আনন্দ পাওয়ার জন্যে উন্মুক্ত ছিল তা আমার জন্যে পায়নি বলে প্রতিশোধ নিয়ে গেল। কিন্তু আমার মা যা পারেন নি ছেলেটা তাই পারলো। পুরুষ মানুষের সম্পর্কে এক ধরনের বিতৃষ্ণা ও আমার মনের গায়ে খোদাই করে দিয়ে গেল।' অ্যান দীর্ঘশ্বাস ফেললো। তারপর একটা হাত কপালের ওপর রেখে বললো, 'কতক্ষণ যে ওভাবে পড়েছিলাম আমি জানি না। হয়তো অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলাম। জ্ঞান ফিরলো যখন তখন দেখি সেই মেয়েটি আমার পাশে বসে। ছেলেটি নেই। আমার জামাকাপড় বিন্যস্ত। মেয়েটিকে দেখে আমি অবাক হয়ে গেলাম। কিন্তু জ্ঞান ফেরামাত্র সে আমার পায়ের ওপর মুখ রেখে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলো। ব্যাপারটা বুঝতে আমার সময় লেগেছিল। ক্রমশ, আমার জন্যে নয়, মেয়েটার জন্যে আমার কষ্ট হচ্ছিল। বাড়িতে বললাম পড়ে গিয়ে পায়ে লেগেছে। কেন মিথ্যে কথা বলেছিলাম, কেন সবাইকে ডেকে সত্যি কথা বলে ছেলেটিকে চিনিয়ে দেবার চেষ্টা করি নি তা জানি না। মেয়েটি কিন্তু আমাকে সেই অনুরোধ করেনি একবারও। পরে মনে হয়েছে, একটি পুরুষাঙ্গের আঘাত মেয়েদের শরীরের গোপন জায়গায় যে অনুরণন সৃষ্টি করে তা তার মনের বয়স অনেক বাড়িয়ে দেয়। অনেক না-বোঝা জিনিস বুঝতে এক লহমা দেরী হয় না তার। আমারও বোধহয় তাই হয়েছিল। না হলে একদিনে আমি অত বড় হয়ে গেলাম কেন? ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, সব বীজ ফসল বহন করে না। তাই আমি বেঁচে গেলাম। সেই রাত্রে ঠিক এইরকম ঝড় উঠেছিল আকাশ কাঁপিয়ে।'

অ্যানের কথাগুলো হাঁ করে গিলছিল পার্থ। শেষ হওয়ামাত্র বললো, 'ছেলেটিকে আর দ্যাখনি ?'

'দেখেছি। তবে অন্য চেহারায়, নানান জায়গায়। সাদা চামড়াতেও।'

এই সময় ডিমঘরে পায়ের শব্দ উঠলো। দরজার কাছে এসে চার্লি ডাকলো 'হেই মিস্টার!'

গলাটা এমন আচমকা কানে এল যে ত্রস্তে পার্থ অ্যানের মুখে হাত চাপা দিল। ইঙ্গিতে ওকে কথা না বলতে বলে ও শোওয়ার চেষ্টা করলো। মনে মনে বললো, শালা!

'হেই মিস্টার!' দরজায় আলতো শব্দ হলো, 'মিস্টার পাতরো!'

ফিসফিসিয়ে অ্যান বললো, 'ও কিছু চাইছে। সাড়া দাও নইলে থামবে না।'

ইচ্ছে ছিল না কিন্তু পার্থর মনে হলো কথাটা ঠিক। সে চিৎকার করলো 'কি চাও ?'

'প্লিজ দরজাটা একবার খোলো। প্লিজ।' চার্লির গলায় অনুরোধ।

'কি দরকার তোমার ? তখনই বলেছি আমাকে বিরক্ত করবে না।'

'আর করবো না। তুমি কি খাটে শুয়েছ ?'

'হ্যাঁ।'

'কম্বলের তলায় ? অনেক কম্বল কি তোমার কাছে আছে ? হেই মিস্টার, প্লিজ!'

'কেন, তাতে তোমার কি দরকার ?' শিরা ফুলিয়ে ঝাঁঝিয়ে উঠলো পার্থ।

'আমি এই ঠাণ্ডা সহ্য করতে পারছি না। আমার স্লিপিং ব্যাগ ভিজে গেছে। প্লিজ হেই মিস্টার।'

পার্থ অ্যানের দিকে তাকালো। অ্যান বললো, ফিসফিসিয়ে, যেভাবে কথা বললে শুধু নিজেই শোনা যায়, 'লোকটা খুব কষ্ট পাচ্ছে মনে হচ্ছে।'

মুখ ফেরালো পার্থ। একটু আগে যে মেয়ে তার জীবনের সবচেয়ে করুণ অভিজ্ঞতার জন্যে একটা নিগ্রোকে দায়ী করেছিল সে-ই আবার একটা নিগ্রো কষ্ট পাচ্ছে বলে অনুভব করছে! পার্থ চাপা গলায় বললো, 'আমি কি করবো ? আমাদের চারটের বেশী কম্বল নেই। ওকে একটা দিলে আমারই রাত্রে ঘুম হবে না ঠাণ্ডায়। নিজেকে কষ্ট দিয়ে আমি দান করতে চাই না।'

অ্যান হাসলো, 'এ ঘরে তো মোটেই ঠাণ্ডা নেই। যতক্ষণ ফায়ারপ্লেস জ্বলছে ততক্ষণ আমাদের কোনো কষ্ট হবে না। বেচারা তো সূর্য দেখতে এসেছে—।'

বেমালুম মিথ্যে কথা বললো পার্থ, 'যখন আর জ্বালাবার মতো কাঠ থাকবে না তখন?'

'ওঃ, তোমরা বড্ড ভবিষ্যতের কথা ভেবে বর্তমানকে অনিশ্চিত করে তোল। ঠিক আছে, তুমি আমার কম্বল শেয়ার করতে পার তেমন প্রয়োজন হলে।'

সমস্ত শরীরে যেন প্লাবন বয়ে গেল। এখন যদিও পাশাপাশি শুয়ে কিন্তু আলাদা কম্বলের পাতলা আড়াল একটু একটু করে কঠিন ইস্পাতের চেহারা নিচ্ছিল। অ্যানের জীবনের ওই ঘটনাটা শোনার পর সেই আড়াল সরাবার ক্ষমতা

তার আসতো কিনা সন্দেহ। কিন্তু দুটো শরীর যদি এক কম্বলের তলায় থাকে—ও ভগবান, তুমি কি দয়াময়। দ্রুত খাট থেকে নেমে একটা কম্বলে শরীর জড়িয়ে নিল পার্থ। তারপর অন্য কম্বলটাকে হাতে রেখে দরজায় দিকে এগিয়ে যেতে যেতে চিৎকার করলো, 'এই যে চার্লি, তুমি শুনতে পাচ্ছ?'

ডিমঘর থেকে আওয়াজ ভেসে এল, 'হ্যাঁ, কিন্তু এখানে ভয়ঙ্কর ঠাণ্ডা।'

'ঠিক আছে ঠিক আছে। আমি তোমাকে সাহায্য করতে পারি কিন্তু একটা শর্তে। তুমি ঘরের কোণে গিয়ে চুপ করে বসো।' পার্থ দরজার গায়ে হাত দিল।

'কেন? আমি বসতে পারছি না। এত ঠাণ্ডায় বসা যায় না। তাছাড়া ওই কোণায় আমাকে তুমি বসতে বলছো কেন? তুমি কি ভাবছো আমি জোর করে ঢুকে তোমার খাটে শুয়ে পড়বো?'

'আমি কিছুই ভাবছি না। শুধু তুমি দরজা থেকে দূরে সরে থাকো। আমি তোমায় জায়গা দিয়েছি, আশা করি তুমি আমার এই অনুরোধ রাখবে। তুমি কি সরে গিয়েছ?' পার্থ কথাগুলো বলার সময় বুঝতে পারছিল এতে চার্লির সন্দেহ বাড়তে পারে। কিন্তু সে নিরুপায়। আজকের রাতটা কেটে যাওয়ার পর ও যদি অ্যানের অস্তিত্ব জানতে পারে তাহলে বয়েই গেল। ওপাশের দরজা থেকে দুটো পায়ের শব্দ দূরে চলে গেল। তারপরে যে গলাটা পার্থ শুনলো সেটায় বোঝাল চার্লি কথা রেখেছে। খুব সন্তর্পণে দরজা খুলে পার্থ মুখ বের করলো। চার্লি এখন সেই কোণে স্লিপিং ব্যাগের ওপর বসে আছে বাবু হয়ে। অতবড় শরীরটাকে কি অসহায় দেখাচ্ছে। কম্বলটা ছুঁড়ে দিল পার্থ ওর গায়ে। দুহাতে লুফে নিয়ে সেটাকে সমস্ত শরীরে জড়িয়ে চার্লি বলে উঠলো, 'থ্যাঙ্কু, থ্যাঙ্কু, আঃ, কি আরাম।' তারপরই নাক টানল, 'মেয়েদের বুকের মতো গরম।'

ও যে গন্ধ বললো না তাতে পার্থ খানিকটা নিশ্চিন্ত হলো। সে গম্ভীর মুখে বললো, 'আশা করি আর আমাকে বিরক্ত করবে না। আমি বারবার বিছানা ছেড়ে উঠতে চাই না।'

কম্বলের একটা অংশ চটপট স্লিপিং ব্যাগের মধ্যে ঢুকিয়ে ভেজাটাকে এড়াবার ব্যবস্থা করছিল চার্লি, 'না না। আর তোমাকে ডাকবো না। ইটস টেরিবল কোল্ড। ওরা আমাকে ব্লাফ দিয়েছে। ইয়ুথ হোস্টেল না ছাই।' তারপর সেখানে আরাম করে বসে বললো, 'কিন্তু মুশকিল হলো, আমার প্রচণ্ড খিদে পেয়ে গেছে। আমার সঙ্গে যা ছিল বৃষ্টির জলে সব নষ্ট হয়ে গিয়েছে।' আঙুল দিয়ে একটা ভেজা প্যাকেট দেখালো চার্লি, 'তোমার কাছে খাবার আছে?'

কথাটা শোনামাত্র মাথার ভেতর চট করে বুদ্ধিটা খেলে গেল। এই লোকটার যা শরীর তাতে অল্পস্বল্প কষ্ট সহ্য করা এর কাছে কিছু নয়। একে যদি রাজী করানো যায় তাহলে নিজেদেরও প্রয়োজন মেটে। কিন্তু এই আবহাওয়ায় কোনো মানুষ বাইরে বের হতে চাইবে না। তাছাড়া মনে হচ্ছে এর ঠাণ্ডাটা একটু বেশী। সে নিজে অবশ্য এখানে ওইভাবে বসে থাকলে মরে যেত। সে একটু চিন্তার ভাণ করে জিজ্ঞাসা করলো, 'তোমার কি খুব খিদে পেয়েছে? অনেকক্ষণ না খেয়ে আছ?'

'তোমার কাছে তাহলে খাবার আছে!' চার্লির মুখ চোখে উল্লাস। সে উঠে দাঁড়াতে যেতেই পার্থ চিৎকার করলো, 'না, একদম উঠবে না, চুপ করে বসো!'

খুব অবাক হয়ে গেল চার্লি। তারপর বাধ্য ছেলের মতো স্লিপিং ব্যাগের ওপর বসে পড়ে বললো, 'তুমি আমাকে শত্রু বলে মনে করছো কেন? আমরা বন্ধুর মতো কথা বলতে পারি। বিশেষ করে আমরা দু'জনেই যখন কালো মানুষ।'

কালো মানুষ! পার্থ চার্লির মুখের দিকে তাকালো। স্প্রিং-এর মতো চুলগুলো মৌমাছির চাক হয়ে রয়েছে। চামড়া থেকে অজস্র কালো পিচ যেন অনবরত গলে পড়ছে। এই লোকটা ওকে দলে টানতে চাইছে। তার নিজের গায়ের রঙ একসময় দুধে আলতায় মেশানো ছিল। রোদে পুড়ে সামান্য তামাটে হলেও যে কোনো বাঙালী বলবে সে ফরসা। আর এই নিগ্রোটা বেমালুম বলে দিল আমরা দু'জনেই কালো। কি আস্পর্ধা। সে আড়ষ্ট হলো। কথাটা ভেতরের ঘরে গেলে হয়তো অ্যানের ব্যবহার পাল্টে যেতে পারে। বিশেষ করে ওর জীবনে একটা কালো লোকের দগদগে স্মৃতি রয়েছে। কিন্তু এ নিয়ে তর্ক করা বুদ্ধিমানের কাজ নয়। গরিব মানুষেরা কাউকে দলে টানতে চাইলে তাকে গরিব মনে করে খুশী হয়। প্রসঙ্গ ঘোরাবার জন্যে পার্থ বললো, 'আমার কাছে খাবার আছে। তুমি খেতে চাও?'

'ও সিওর। তুমি লোকটা সত্যিই ভালো। এইরকম দুর্যোগের রাত্রে আমাকে জায়গা দিলে, খাবার দিচ্ছ! আমি তোমাকে চিরকাল মনে রাখব!' বিগলিত গলায় বললো চার্লি।

'তাহলে তোমাকে একটু কষ্ট করতে হবে। বাংলো থেকে বেরিয়ে খানিকটা নিচে গেলেই তুমি আমার জিপ দেখতে পাবে। জিপের দরজা খুললেই একটা হটবক্স দেখতে পাবে যার ভেতরে প্রচুর লোভনীয় খাবার এখনও গরম রয়েছে।'

পার্থর কথা শেষ হওয়ামাত্র আর্তনাদ করে উঠলো চার্লি, 'তুমি এই ঠান্ডায় আমাকে বাইরে যেতে বলছো। ওই বৃষ্টি গায়ে যদি আবার লাগে—!' আতঙ্কে চোখ বন্ধ করে শিউরে উঠলো যেন সে।

পার্থ নির্বিকার গলায় বললো, 'তাহলে আমার কিছুই করার নেই। গুড নাইট!' দরজার পাল্লা বন্ধ করতে যেতেই চার্লি চিৎকার করে উঠলো, 'দাঁড়াও, দাঁড়াও। তোমার ওই ঘরে কি একটুও খাবার নেই? যদি থাকে তাহলে আমাকে আর বাইরে যেতে হয় না।'

'তোমার সঙ্গে এতক্ষণ রসিকতা করছি বলে যদি মনে কর—!'

'না না আমি সেকথা বলছি না। তুমি ওভাবে কথা বলছো কেন? ব্রিটিশরা আমাদের সঙ্গে ওই গলায় কথা বলে। যেন আমরা পৃথিবীর দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক। কিন্তু তুমি আমি তো আর ব্রিটিশ নই, সাদা চামড়ার লোকও নই। অলরাইট, আই উইল টেক দ্য চান্স। আমার খুব খিদে পেয়েছে। হয় পেটভরাতি খাবার নয় একটা মেয়েছেলে সঙ্গে না থাকলে আমার রাত্রে ঘুম আসে না।' ধীরে

ধীরে উঠে দাঁড়ালো চার্লি তারপর কাঁচের দেওয়ালে চোখ রাখলো। বৃষ্টি বোধহয় এই মুহূর্তে সামান্য ধরেছে। চার্লির চেহারা খুব করুণ হয়ে উঠলো। বোঝা যাচ্ছে যে সে বাইরে পা বাড়াতে সাহস পাচ্ছে না। পার্থ ওর এই সিদ্ধান্তে আবার খুশী হয়েছিল। কিন্তু চার্লির দ্বিধা দেখে সে উৎসাহ দেবার জন্যে বললো, 'যা খাবার আছে তা তোমার অর্ধেক আমার অর্ধেক। খুব ডিলিসিয়াস। তাছাড়া গরম কম্বলও রয়েছে গাড়িতে, ইচ্ছে হলে নিয়ে আসতে পার তাতে রাত্রে ঘুম খুব আরামদায়ক হবে। আর দেরী করো না, বৃষ্টি কম আছে বেড়িয়ে পড়।'

এতগুলো পাওয়ার কথা শুনে চার্লি ওয়াটারপ্রুফটা পরে নিল। তারপর দরজা খুলে স্প্রিং-এর মতো বেরিয়ে গেল। হাওয়া সমানে চলছে। পার্থ একবার ভাবলো এগিয়ে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দেওয়া উচিত, নইলে ঘরটার উত্তাপ জিরো ডিগ্রির নিচে চলে যাবে কিন্তু ঠান্ডার চোটে সে পা বাড়াতে সাহস করলো না। মিনিট তিনেক যদি হয় খুব বেশী। বুলেটের মতো ছিটকে ঢুকলো চার্লি। ঢুকেই পা দিয়ে দরজা ভিজিয়ে পিঠ চেপে দাঁড়িয়ে থর থর করে কাঁপতে লাগলো, 'ও মাই গড! কি ঠান্ডা! কিন্তু আমি এনেছি। উফ্। এই যে তোমার হটবক্স।' মাটিতে সেটাকে নামিয়ে দরজাটাকে ভালো করে বন্ধ করে হটবক্সটাকে ফের তুললো সে। তারপর থপথপ করে কয়েক পা এগিয়ে সেটা পার্থর সামনে বাড়িয়ে দিল। ছোঁ মেরে হটবক্সটাকে নিয়ে নিল পার্থ। চার্লি ততক্ষণে শরীর থেকে ওয়াটারপ্রুফ খুলে ফেলেছে। দুটো কম্বল শরীরে মুড়ে স্লিপিং ব্যাগের ওপর শরীর এলিয়ে দিয়ে চোখ বন্ধ করেছে। পার্থ এই প্রথম কৃতজ্ঞ বোধ করলো। চার্লির জায়গায় সে নিজে হলে মরে গেলেও যেত না। ওরকম শরীর বলেই এটা সম্ভব। সে খাবার গুলোকে ঠিক আধাআধি করলো। তারপব চার্লির অংশ একটা বাটিতে রেখে ওর সামনে এগিয়ে দিল। সঙ্গে সঙ্গে উঠলো না চার্লি। চোখ বন্ধ করেই নাক টানলো, 'আঃ, খুব সুন্দর গন্ধ। তোমাদের এই দেশটা অদ্ভুত। সবকিছু সুন্দর। এখানকার প্রকৃতি সুন্দর মানুষ সুন্দর, খাবার সুন্দর। তোমরা ভাগ্যবান। কিংবা আমরাই ফালতু।'

'কেন?' চার্লির কথা বলার ধরনে এখন বেশ ভালো লাগছে পার্থর। লোক-টার চেহারা দেখলে যে আতঙ্ক জাগে এইসব কথাবার্তা শুনলে সেটা মোটেই থাকে না।

'সাদা চামড়ারা তোমাদের দেশে এসে জুড়ে বসেছিল কিন্তু তোমরা তাদের তাড়িয়ে স্বাধীন হয়েছ। আর আমরা দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক বনে গেলাম।'

পিচ করে জিভে শব্দ তুললো চার্লি।

'সাদা চামড়ার মানুষের ওপর তোমার এত রাগ কেন?'

'রাগ?' তড়াক করে উঠে বসলো চার্লি, 'আমি ওদের ঘেন্না করি। গত রায়টের সময় ওরা আমার এক বান্ধবীর পরিবারকে কুকুরের মতো পুড়িয়ে মেরেছে। অ্যাব্রাহাম লিঙ্কন, গ্রেটেস্ট ধাপ্পাবাজ অব অল টাইম। ওই লোকটা যদি সে সময় আমাদের পক্ষ নিয়ে ওদের সঙ্গে সমঝোতায় না যেত তাহলে আজ একজন কালো মানুষ আমেরিকার প্রেসিডেন্ট হতো। তুমি জানো আমি কে?'

'আমি তোমাকে এই প্রথম দেখলাম, কি করে জানবো বলো!'

'ওয়েল, আই উইল টেল ইউ। আমি একটা স্কুলে পড়াই। দু বছর পরপর আমি এশিয়াতে চলে আসি, আফ্রিকায় ঘুরে বেড়াই। ছুটি পেলেই আর ওখানে ভালো লাগে না। ওয়েল, আই অ্যাম ব্ল্যাক ম্যান এবং আমি এই-জন্যে গর্বিত হতাম যদি আমার রক্তে সাদা চামড়ার স্মৃতি না থাকতো। এইটে ভাবলেই আমার ঘেন্না বেড়ে যায়। চার্লি'র মুখ বিকৃত হলো।

হটবক্সটা যে তখনও হাতে ধরা তা খেয়ালই নেই পার্থ'র, বিস্ময়ে সে তাকিয়ে ছিল। চার্লি বললো, 'আমার ঠাকুর্দার ঠাকুর্দা ছিল মুল্যাটো।'

'মুল্যাটো।' পার্থ শব্দটার মানে হাতড়ালো, কোথায় যেন এই শব্দটাকে পেয়েছে সে।

'ওয়েল, এটা একটা বিরাট গল্প। আমার ঠাকুর্দার ঠাকুর্দাকে কিনে এনেছিল একজন হোয়াইটম্যান। লোকটার ছিল বিরাট ব্যবসা। সেইসঙ্গে ক্রীতদাসদের খামার। ভালো চেহারার কালো পুরুষ কিংবা মেয়ে পেলেই কিনে নিত লোকটা। তারপর তাদের দিয়ে সন্তান উৎপাদন করিয়ে বাজারে বিক্রী করে দিত মোটা দামে। বাপ মায়ের স্বাস্থ্য ভালো হলে সন্তানেরও শরীর ভালো হয়। লোকটা এ বিষয়ে ছিল খুব ওস্তাদ। আমার ঠাকুর্দার ঠাকুমা নাকি খুব সুন্দর শরীরের অধি-কারিণী ছিলেন। মালিকের এক বন্ধু ওর কাছে রাত কাটাতে এসে সেই কালো মেয়েটিকে ভোগ করেন। এটা নাকি তার ন্যায্য পাওনা ছিল। আর তাতেই দুর্ঘটনাটা ঘটে গেল। মেয়েটি যে সন্তান প্রসব করলো তার চামড়া হল সাদা। একদম সাহেবদের মতো। এমনকি চুলও সেরকম। শুধু পিঠের মাঝখানে এক ইঞ্চি কালো চামড়া গোল হয়ে ছিল। মালিকের কি দুর্মতি হলো, জন্মমাত্রই তাকে সরিয়ে ফেললেন। সেই বাচ্চা সাদা চামড়াদের সঙ্গে সাদা হয়ে বড় হলো। এ খবর মালিক ছাড়া আর কেউ জানতো না। তিনি ওকে দত্তক নিলেন। সাদা চামড়া বলে ক্রীতদাসদের বাজারে তাকে বিক্রী করা যেত না। সাদা চামড়াদের সমাজেও ওকে নিজেদের লোক বলে গ্রহণ করা হয়েছিল। এই ছেলেটিও কখনও নিজের ইঞ্চি-খানেক কালো চামড়া কাউকে দেখাতো না। তারপর খুব সুন্দরী একটি সাদা মেয়ের সঙ্গে ওর বিয়ে দিলেন মালিক। বিয়ের পর ওর বউ ওকে কখনও নগ্ন অবস্থায় দ্যাখেনি। কিন্তু এদের যে সন্তান হলো তাকে দেখে সাদারা খেপে উঠলো। বাচ্চাটা ঠিক আমাদের মতো কুচকুচে কালো, মাথার চুল এইরকম।' নিজের মাথায় হাত বোলালো চার্লি।

পার্থ'র মুখ থেকে বেরিয়ে এল, 'তারপর?'

'প্রথমে কেউ কেউ সন্দেহ করেছিল সাদা মেয়েটি হয়তো কোনো কালোর সঙ্গে—। সন্দেহটা এত মারাত্মক চেহারা নিচ্ছিল যে ছেলেটা বোকামি করে বসলো। বোকামি ছাড়া আর কি বলবো একে, ওরা বলে ভালবাসা, লভ্। মেয়েটাকে ভালবেসেছিল বলে ছেলেটা প্রতিবাদ করেছিল যে কোনো কালো নয়, সেই সন্তানটির জনক। এবং তার পিঠে কুচকুচে কালো চামড়া আছে। তৎক্ষণাৎ বাচ্চাটাকে পাঠিয়ে দেওয়া হলো খামারে আর পাঁচটা কালোর কাছে। আর, তোমরা

ভাবতে পারো কি হয়েছিল ছেলেটার ? ওরা ওকে কুকুরের মতো গুলি করে হত্যা করে। আর সেই কালো বাচ্চাটার বংশধর আমি। ভগবানের অসীম দয়া এই যে ওই কালো বাচ্চার ঔরসে কালো সন্তানই জন্মেছে ? কে জানে সাদাদের যে রক্ত আমার শরীরে থেকে গেছে তা থেকে আমি বিয়ে করলে আমার সন্তান সাদা হবে কিনা। শুধু এই ভয়ে আমি বিয়ে করছি না। রক্ত ধোওয়া যায় না নইলে আমি আমার শরীরের সব রক্ত থেকে সাদাদের ভাগটা ধুয়ে ফেলতাম।' হঠাৎ একধরনের শব্দ আচমকা বেরিয়ে এল চার্লির শরীর থেকে যাকে আর্তনাদও বলা যায় না আবার কান্না বললেও কম বলা হয়। দু'হাতে মুখ ঢেকে বসে আছে লোকটা। যে খাবারের জন্যে জীবন বিপন্ন করে একটু আগে ছুটে গিয়েছিল সেটা সামনে পড়ে থাকলেও কোনো হুঁশ নেই। আচমকা এক অন্য জগতে চলে গেছে চার্লি।

ধীরে ধীরে দরজা বন্ধ করলো পার্থ। পেছন ফিরতেই চমকে উঠলো সে, অ্যান বিছানার উপর উঠে বসেছে। কম্বল বুক অবধি টেনে নিয়ে অদ্ভুত চোখে তাকিয়ে আছে দরজার দিকে। ও যে চার্লির পুরো গল্পটা শুনেছে তা বুঝতে অসুবিধে হলো না পার্থর। হঠাৎ একধরনের আনন্দ এলো মনে, দুই ঘরে পাশাপাশি দু'জন সাদা আর কালো রয়েছে। একজনের সতীত্ব ছিনিয়ে নিয়েছিল কোনো কামুক কালো মানুষ আর একজন নিয়ত শরীর থেকে সাদা মানুষের অস্তিত্ব অস্বীকার করার জন্যে ছটফট করে। অতএব এই দুইজন কখনও এক হবে না, অন্তত আজকের রাত্রে যে হবে না, এ ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হওয়া গেল।

পার্থ খাবারের জায়গাটা টেবিলে রেখে ফায়ারপ্লেসের সামনে এগিয়ে গেল। উবু হয়ে দুটো কাঠ গুঁজে দিতে দিতে মনে হলো আরও কাঠ স্টোর থেকে আনা দরকার। কিন্তু এই ঠাণ্ডায় ওই প্যাসেজে যাওয়া খুব কষ্টকর। ঠিক তখন অ্যান বললো, 'মানুষ মানুষকে কতো ঘেন্না করে, না ?'

পার্থ দেখলো অ্যান এখনও বন্ধ দরজার দিকে তাকিয়ে অথবা ও কোনোকিছু দেখছে না। কথাটা যেন নিজেকেই শোনালো অ্যান। পার্থর এই ভঙ্গী ভালো লাগলো না। বেশ সমব্যথার সুর গলায়। কি করে সম্ভব তার মাথায় ঢুকছে না। অ্যানের তো ওকে ঘেন্না করা উচিত। সে হটবক্সের দুটো পাত্রে খাবারগুলো ভাগ করে একটা অ্যানের দিকে বাড়িয়ে দিল। ধীরে ধীরে মুখ ফিরিয়ে অ্যান খাবার দেখে বললো, 'হোয়াটস দিস ?'

'রোস্ট চিকেন আর পরোটা। খেয়ে দ্যাখো, খুব খারাপ লাগবে না। একটু কম হবে হয়তো, ওই ব্যাটা নিগ্রোটাকে অনেকখানি দিয়ে দিতে হলো যে।' পার্থ অ্যানের হাতে পাত্রটি ধরিয়ে দিয়ে ওর পাশে আরাম করে বসলো। অ্যান করুণ গলায় বললো, 'ও এই ঠাণ্ডায় ভিজে ভিজে এনে দিল, না ?' খাবারের গন্ধে খিদেটা আরো জোরদার হয়েছিল। কিন্তু এই কথায় ছোট্ট ধাক্কা খেল পার্থ, 'তুমি কি ওই কালোটার ওপর সহানুভূতিশীল হচ্ছো ?'

অ্যান হাসলো, 'তুমিও ওকে কালো ভাবো তাই না ? যাক, ছেড়ে দাও এইসব কথা। আসলে লোকটা এমন আন্তরিক গলায় কথা বলছিল যে—।'

পাত্রটির ওপর সামান্য ঝুঁকে ঘ্রাণ নিল অ্যান, 'আঃ, ডিলিসিয়াস। খুব ঝাল নেই তো?'

প্রসঙ্গ বদলে যাওয়ায় স্বস্তি পেল পার্থ, 'না, না, মোটেই নয়। খেয়ে দ্যাখো।'

খুব সাবধানে এক টুকরো ভেঙে মুখে দিয়ে অ্যান বললো, 'চমৎকার।'

পার্থ লক্ষ্য করলো খাওয়া শেষ হওয়ার মধ্যেই অ্যান আবার সহজ হয়ে আসছে। হাত ধোওয়া দরকার কিন্তু এই ঠাণ্ডায় জল ছোঁওয়া যাবে না আর ভেতরে জল তো নেই-ই। অ্যান পাত্রটা মাটিতে নামিয়ে রেখে হাত উঁচু করে দেখলো, আঙুলগুলো তেলতেলে হয়ে গিয়েছে। তারপর সে মেঝেয় নেমে ব্যাগ থেকে একটা ছোট্ট তোয়ালে বের করে হাত মুখ মুছে পার্থর দিকে সেটা এগিয়ে দিল। আঙুল থেকে তেল উঠলেও যে গন্ধটা জড়িয়ে থাকলো সেটা খুব অস্বস্তিকর। যত ঠাণ্ডাই হোক এখন একবার আঙুল জলে ডোবাতে পারলে স্বস্তি হতো। দ্বিতীয় দরজার দিকে তাকিয়ে অ্যান বললো, 'টয়লেট কি এদিকে?'

'হ্যাঁ, কিন্তু ওখানে জল নেই। তুমি যদি যেতে চাও তাহলে কম্বলটা গায়ে জড়িয়ে ওই টর্চটা নিয়ে যাও।' অ্যান বেরিয়ে গেলে পার্থ চট করে বিছানাটা ঠিকঠাক করে নিল। দুটো কম্বল এমনভাবে পাশাপাশি রাখলো যাতে তৃতীয়টাকে ঠিক মাঝখানে ছড়িয়ে দিলে দুজন স্বচ্ছন্দে তলায় শুতে পারে। তারপর পিটার স্কটের বোতল থেকে এক ঢোঁক গলায় ঢালতেই মনে হলো, আর নয়, এবার নেশা হয়ে যেতে পারে। নেশা হলে রাতটাই মাটি হয়ে যাবে। এখন প্রায় পৌনে আটটা। রিণটেকে কোনো প্রাণ নিশ্চয়ই এই বাংলোর বাইরে জেগে নেই। অতএব আর সময় নষ্ট করার কোনো মানে হয় না। অ্যান ফিরে এলে ওকে একটু একা থাকার সুযোগ দিয়ে পার্থ অ্যানের কম্বলটা মুড়ি দিয়ে টয়লেটে গেল। ফেরার সময় কিছু কাঠ স্টোর থেকে নিয়ে এল সে। ঠাণ্ডায় থর থর করছে শরীর। ঘরে ঢুকে ফায়ারপ্লেসের সামনে উবু হয়ে বসে শরীর সেঁকতে গিয়ে শুনলো অ্যান বলছে, 'তুমি শুয়ে পড়।'

'তুমি?' পার্থর শরীর থেকে কাঁপুনিটা যাচ্ছিল না।

'অনেক রাত তো সারাজীবনে ঘুমোলাম, আজ আমি জেগে থাকব।'

'কেন?' অবাক হয়ে গেল পার্থ।

'কোনো বড় কারণ নেই। তাছাড়া এত কষ্ট করে এলাম যদি ভোরবেলায় ঘুমিয়ে পড়ি তাহলে আর কোনোদিন সূর্যটাকে কাঞ্চনজঙ্ঘার গায়ে দেখতে পাব না। তুমি শুয়ে পড়, আমি ঠিক সময়ে তোমাকে ডেকে দেব।' অ্যান চেয়ারটা ফায়ারপ্লেসের কাছে সরিয়ে সেদিকে পিঠ দিয়ে বসলো। সঙ্গে সঙ্গে পার্থর সমস্ত সত্তা চিড়বিড় করে উঠলো। আবার খেলাচ্ছে মেয়েটা। যত সে ভদ্রতা করছে তত ও তার সুযোগ নিচ্ছে। কিন্তু এখন যদি সে জোরজবরদস্তি করতে যায় তো পাশের ঘরের নিগ্রোটা সব টের পেয়ে যাবে। এই হয়েছে আর এক মুশকিল। অতএব ঠাণ্ডা মাথায় ভুলিয়ে ভালিয়ে ওকে বিছানায় নিয়ে আসতে হবে। সে হেসে

বললো, 'আসলে তুমি আমাকে বিশ্বাস করছো না।'

'বিশ্বাস করছি না? তোমাকে। কেন?'

'তোমার মনে হচ্ছে একসঙ্গে শুলে আমি তোমাকে ছেড়ে দেব না!'

অ্যান হাসলো, 'হয়তো! তুমি বলছো তুমি এখনও কুমার অতএব তোমার বাসনা তীব্র হওয়াই স্বাভাবিক। আবার আমার ক্ষেত্রে সেটা একদম উল্টো। এত দেখে দেখে চোখ পচে গেছে, মনে কোনো আবেগ আসে না, শরীরে রোমাঞ্চ ওঠে না। অথচ বাইরে থেকে এই শরীর দেখে লোকে লোভী হয়, হাত বাড়ায়। কি আর করা যাবে। তোমাকে একটা কথা বলি। সেদিন একটি লোকের সঙ্গে দিল্লী থেকে কলকাতায় আসবার সময় আমার পরিচয় হয়। চেয়ার কারের পাশাপাশি সিটে বসে আসছিলাম আমরা। লোকটা খুব আমুদে কিন্তু কথা বলে আস্তে আস্তে। অনেক অভিজ্ঞতার কথা বলছিল সে। যেগুলো শুনতে শুনতে আমার হাসতে হাসতে পেটে খিল ধরে যাচ্ছিল। আবার ঠিক সেই প্রচন্ড হাসির মুহূর্তে এমন একটা ছোট্ট ব্যথার টোকা দিচ্ছিল সে গল্পের মধ্যে যে আচমকা হৃদপিন্ড বন্ধ হয়ে যাচ্ছিল। আর ও যখন মেয়েদের সঙ্গে মাটির তুলনা করে বললো দু'জনেই এক তখন আমার শরীরে রোমাঞ্চ এল! লোকটার সঙ্গে আমার শরীরের কোনো সংশ্রব ছিল না, আমরা যৌন মিলনের চেষ্টাও করছিলাম না কিন্তু তবু মনে হলো আমার সমস্ত শরীর পুলকিত, আমি মৈথুনের আবেগে আপ্লুত হলাম। পরে এ নিয়ে অনেক ভেবেছি। যৌন-সম্পর্ক এখন জলভাতের মতন, কোনো প্রস্তুতির দরকার হয় না, হয়ে যাওয়ার পর এ নিয়ে মাথা ঘামায় না কেউ। ক্রমশ করমর্দনের মতো গুরুত্বহীন ব্যাপার হয়ে যাবে হয়তো। তা সেইসব মুহূর্তে আমি একটুও শিহরিত হই না, হয়তো সেই বালিকা বয়সের প্রথম স্মৃতি আমাকে শিহরণ এনে দেয় না কিন্তু শুধু কথা শুনে আমার সেটা হলো কি করে। যে মাটির শরীরে কর্ষণ করে মানুষ খাবার সংগ্রহ করে সেই মাটির বুকেই চিরদিনের জন্যে সে আশ্রয় নেয়। মাটি হলো স্ত্রীলোক। তাকে অনন্তকাল ধরে মানুষেরা খনন করে যাচ্ছে, সে খাদ্যের ইচ্ছেয় হোক অথবা আশ্রয়ের আকাঙ্ক্ষায় হোক। উঃ, শুধু এই একটা কথাই আমাকে রোমাঞ্চিত করে দিয়েছিল।'

ঠিক সেইসময় দরজায় নক্ হলো। এবার অত্যন্ত আস্তে এবং ভদ্রভাবে। অ্যান চকিতে সেদিকে তাকিয়ে দু'হাতে মুখ ঢাকলো। শব্দটা যেন বাঁচিয়ে দিল পার্থকে। তার অ্যানের কথা শুনতে শুনতে এতক্ষণ মনে হচ্ছিল কেউ যেন কুয়োর মধ্যে তার দু'পা ধরে আরও নিচে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। অ্যানের শরীর সম্পর্কে যেটুকু আশার প্রদীপ জ্বলেছিল সেগুলোকে যেন এতক্ষণ ফুঁ দিয়ে নিভিয়ে দেওয়া হচ্ছিল। এই শব্দটা যেন অবশিষ্টটাকে বাঁচিয়ে রাখতে সাহায্য করলো। সে গম্ভীর গলায় জিজ্ঞাসা করলো, 'কি ব্যাপার? আবার দরজায় শব্দ করছো কেন?'

চার্লির বিনীত গলা শোনা গেল, 'তুমি কি ঘুমিয়ে পড়েছ পাতরো?'

'ঘুমিয়ে পড়লে কেউ কথার জবাব দেয় না। তুমি কিন্তু বারবার আমাকে বিরক্ত করছো।'

'আমি দুঃখিত, খুব দুঃখিত। কিন্তু আমার টয়লেটে যাওয়ার দরকার ছিল।'

'আঃ, তাতে আমি কি করবো।'

'না, সেকথা তোমাকে বলছি না। তুমি একটু দয়া করে দরজাটা খুলবে?'

'না, চার্লি, এটা খুব বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে।'

'জানি। কিন্তু আমি কি ভুল দেখছি! আমি শুধু জানতে চাই, আমি কি ভুল দেখছি?'

'ভুল দেখছো, কি ভুল দেখছো তুমি? তুমি কি মাতাল?'

'মাতাল, নো নো, আমার সঙ্গে মদ নেই। আমি একটা দৃশ্য দেখতে পেয়েছি। ভেবেছিলাম দরজা খুলে তলপেটটা খালি করে নেব কিন্তু সেটা করতে গিয়েই দেখতে পেলাম।'

পার্থ ওই ঘরের জানলার দিকে তাকালো। না এখন বৃষ্টি হচ্ছে না। তবে হাওয়ার শব্দ হলেও ঝড় নেই। আকাশ কি পরিষ্কার হয়ে গেছে? চার্লির গলা আবার ভেসে এল, 'পাতরো, সময় নষ্ট করো না, প্লিজ, আমি যা ভেবেছি তা যদি ঠিক হয় তাহলে—। দরজা খোল পাতরো।'

পার্থ চকিতে অ্যানের দিকে তাকালো। অ্যান পাথরের মূর্তির মতো সেইভাবে বসে। ওর হঠাৎ মনে হলো ব্যাপারটা চার্লির চাল নয় তো। কোনোভাবে সে কি অ্যানের গলা শুনতে পেয়েছে? ঝড় কখন থেমেছে ওরা তো খেয়ালই করে নি। এই নির্জন পাহাড়ে চার্লি কি দেখতে পারে? কিছুই না। অতএব সেরেফ ভাওতা দিয়ে সে দরজা খোলাতে চাইছে। ওরকম শক্তিশালী চেহারার সঙ্গে সে গায়ের জোরে পারবে না। অ্যানকে চার্লি দখল করবেই। অ্যান চার্লির কথা শুনেছে কিন্তু কোনো আওয়াজ করছে না। যে মেয়েটা এই ঘরে ঢুকেছিল বিকেলবেলায় তার সঙ্গে এখন যে মেয়েটা বসে আছে তার কোনো মিল নেই। একদম পাল্টে গেছে মেয়েটা। চার্লি আবার তাড়া দিল, 'ফর গড শেক পাতরো, উঠে এসো।'

হঠাৎ মন বদলালো পার্থ। এই ঘরের আবহাওয়া এখন এত ভারী হয়ে গিয়েছে যে অ্যানকে বিছানায় নিয়ে আসা মুশকিল হবে। বরং সে যদি ঘর ছেড়ে বেরিয়ে চার্লির সঙ্গে কিছুক্ষণ কাটায় তাহলে অ্যানের পরিবর্তন হতে পারে। আর চার্লি যদি এ ঘরে মেয়ের অস্তিত্ব টের পেয়ে থাকে তো কিছুই করার নেই। এই দরজা ভাঙতে ওই শরীরের কোনো কষ্টই হবে না। সে কম্বলটাকে শরীরে জড়িয়ে নিয়ে অ্যানের কাছে গিয়ে ফিসফিসিয়ে বললো, 'তুমি বিছানায় গিয়ে শুয়ে থাকো, আমি এই লোকটাকে একদম বিশ্বাস করি না।'

একান্ত বাধ্য মেয়ের মতো অ্যান ওর কথা শুনতেই পার্থ দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়ালো, 'চার্লি।'

'ইয়া। কুইক।'

'তুমি তোমার জায়গায় ফিরে গিয়ে বসো।'

'ওকে। দরজা খোল।' পায়ের শব্দ শুনলো পার্থ। তারপর হ্যাণ্ডেলটা শক্ত করে ধরে দরজা খুললো। খুলেই সে চিৎকার করে উঠলো, 'আঃ, জানলা খুলেছ কেন?' হু হু করে ঠাণ্ডা বাতাস ঢুকছে ঘরে। কাঁচের জানলার একটা পাল্লা খুলেছে চার্লি। আর সেই জানলা দিয়ে মুখ বের করে কিছু যেন দেখার চেষ্টা

করছে। ওর গলা শোনামাত্র উত্তেজিত ভঙ্গীতে কাছে যেতে ইশারা করলো, 'দ্যাখো, দ্যাখো, ওটাকে তোমার কি মনে হয় বলো তো ?'

পার্থ বিশ্বাস করলো এটা চার্লির ভাঁওতা নয়। এত ভালো অভিনয় কোনো মানুষ করতে পারে না। ওই ঘর দখল করার যদি বাসনা থাকতো তাহলে সে দরজা খোলামাত্র লাফিয়ে পড়তে পারত। তার হাতে হ্যাণ্ডেল আছে বটে কিন্তু সেটা চার্লির কাছে খেলনা ছাড়া কিছু নয় তা সে নিজেই জানে। তাই ওই ঠাণ্ডা হাওয়ায় যেচে কেউ দাঁড়িয়ে থাকবে না। খুব সাবধানে হ্যাণ্ডেলটাকে ধরে এগিয়ে এল পার্থ। জানলার কাছে আসতেই মনে হলো কম্বল ভেদ করে অজস্র সূচ যেন শরীরে বিঁধছে। মুখের চামড়া অসাড় হয়ে আসছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও এক অসম্ভব সুন্দর দৃশ্য দেখে এসব কষ্ট ভুলে যেতে ইচ্ছে করছিল। বৃষ্টি নেই, ঝড় থেমেছে। আকাশ পরিষ্কার। ঝকঝকে তারারা যেন বড্ড কাছে নেমে এসেছে। আর সমস্ত রিণটেকের ওপর একটা সাদা আস্তরণ চাদরের মতো বিছিয়ে দিয়েছে কেউ। একটা পাতলা জ্যোৎস্না সেই সাদায় মাখামাখি হয়ে রয়েছে। হঠাৎ পার্থর মনে হলো যদি এখানে চার্লি না থাকতো তাহলে অ্যানকে ডেকে এনে দেখাতো সে। এত সুন্দর.দৃশ্য থেকে বেচারা বঞ্চিত হচ্ছে। কাঁচের ওপর যে জল জমেছে তা মুছলে বন্ধ ঘর থেকেই এসব দেখা যেত। সাদা আস্তরণ কি তুষার ? চার্লি বললো, 'দেখেছ ?'

'কি ?' কোনো বিশেষ কিছু দেখতে পেল না পার্থ।

'ওই যে, ভাঙা বাড়িটার বারান্দায়।' চার্লি আঙুল তুলে দেখালো।

ওটা ইয়ুথ হোস্টেল। ছাদ উড়ে গিয়েছে আজকের ঝড়ে। তার বারান্দায় কি যেন পড়ে রয়েছে। পার্থ ভালো করে ঠাওর করার চেষ্টা করলো। হলদেটে কিছু। দৃষ্টি ঠিক হলে সে অস্ফুট উচ্চারণ করলো, 'মানুষ ?' সঙ্গে সঙ্গে চার্লি উত্তেজিত হলো, 'আমারও তাই মনে হচ্ছে। তুমি সিওর ওটা মানুষ ?' ততক্ষণে একটা শরীরের আদল যেন দেখতে পেল পার্থ। উপুড় হয়ে কোনো মানুষ শুয়ে আছে। এই ঝড়বৃষ্টির মধ্যে ওই ভাঙা বারান্দায় কেউ যদি থাকে তাহলে চিরকালের জন্যে শুয়ে পড়া ছাড়া কোনো গত্যন্তর নেই। সে ধীরে ধীরে মাথা নেড়ে জানলা থেকে সরে এল। এই সুন্দর প্রকৃতিটাকে আর ভালো লাগছে না। চাপা গলায় বললো, 'জানলাটা বন্ধ করে শুয়ে পড়। ওটা মানুষ, নিশ্চয়ই মরে গেছে।'

'মরে গেছে ?' চার্লি চিৎকার করে উঠলো 'তুমি কি করে বুঝলে ও মরে গেছে ?'

'এই টেম্পারেচারে ওখানে পড়ে থাকা মানে মরে যাওয়া!' পার্থ তার দরজার কাছে ফিরে গেল।

'কিন্তু এটা তো শুধুই অনুমান। আর অনুমান যে সবসময় সত্যি হবে তার কোনো যুক্তি নেই। আমাদের একবার ওখানে গিয়ে দেখে আসা দরকার।' চার্লি তার ওয়াটারপ্রুফটা তুলে নিল। ওর কথা শুনে আঁতকে উঠলো পার্থ, 'তুমি এখন ওখানে যাবে ? বাইরে বরফ পড়ছে ?'

'বাট আই কান্ট হেল্প।' চিৎকার করে উঠলো চার্লি, 'মানুষটা যদি বেঁচে

থাকে এখনও তাহলে সারাজীবন নিজেকে খুনী মনে হবে। তুমি আসবে না?'

'আমি? ওঃ, নো. ইম্পসিবল। এই ঠান্ডায় আমি যাচ্ছি না। একটা ডেড বডি দেখতে যাওয়ার জন্যে এত কষ্ট করার কোনো মানে হয় না।' পার্থ সরাসরি বলে দিল।

উত্তরে চার্লি কাঁধ নাচাল, 'তাহলে আমি একাই যাব, তুমি প্লিজ ওয়েট করো।'

ওর সঙ্গে যা গরম জামা ছিল শরীরে চাপিয়ে দরজা খুলে বেরিয়ে যেতেই পার্থ দরজা বন্ধ করে ছুটে গেল ভেতরের দরজায়। পাল্লা খুলে চাপা গলায়—'নিচের হোস্টেলের বারান্দায় একটা লোক পড়ে আছে। বোধহয় মরে গেছে এতক্ষণে।'

চট করে উঠে বসলো অ্যান, 'সেকি? কি করে এল? লোকাল লোক?'

'বুঝতে পারছি না।' পার্থ গলায় উত্তেজনা আনবার চেষ্টা করলো, 'চার্লিকে পাঠিয়েছি।'

'পাঠিয়েছ?' অ্যানের বলার ধরনটা ঠং করে কানে বাজলো পার্থর। সে ধীরে ধীরে দরজাটা বন্ধ করে আবার জানলার কাছে ফিরে এল। ছিটকিনি তুলে দিয়ে গিয়েছিল চার্লি। সেটাকে খুলে সামান্য ফাঁক করে চোখ রাখলো পার্থ। সাদা আস্তরণের ওপর দিয়ে দৌড়ে নেমে যাচ্ছে চার্লি। ব্যাটার যে খুব ঠান্ডা লাগছে তা দৌড়োবার ভঙ্গীতেই বোঝা যায়। অ্যান যেন এই কালো ভূতগুলোর ওপর ক্রমশ সহানুভূতি দেখাতে শুরু করেছে। বিচিত্র মানুষের মন। ওর ধারণা যদি সত্যি হয় তাহলে কালো লোকগুলোর ওপর কখনই সহানুভূতি আসতে পারে না। পার্থ দেখলো চার্লি হোস্টেলের বারান্দায় পৌঁছে গিয়েছে। লোকটার ওপর ঝুঁকেপড়ে কিছু দেখছে। হাঁটু মুড়ে বসে পড়ে বোধহয় বুকের ওপর কান পাতার চেষ্টা করলো। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে এই বাংলোর দিকে মুখে করে দু'হাতে তালুর আড়াল রেখে চিৎকার করে কিছু বলার চেষ্টা করলো। চিৎকারটা অস্পষ্ট এল কিন্তু কোনো কথা বুঝতে পারলো না পার্থ। সে অবাক হয়ে দেখলো চার্লি দু'হাতে লোকটাকে তুলে নেওয়ার চেষ্টা করছে। অনেক কষ্টে কাঁধের ওপর তুলে চার্লি টলতে টলতে এগিয়ে আসার চেষ্টা করলো। তাহলে কি লোকটা বেঁচে আছে এখনও? নিশ্চয়ই আছে নইলে চার্লি ওকে বাংলোয় নিয়ে আসবে কেন? ঠোঁট কামড়াল পার্থ। আর একটা ঝামেলা বাড়লো। চার্লিকে এই ঘরে ঢুকতে দেওয়াই ভুল হয়েছিল। তা যাহোক করে সেটা ম্যানেজ হয়েছে। কিন্তু চতুর্থজন আসা মানে রাতটার বারোটা বেজে গেল। এখন একটা অর্ধমৃত লোকের পেছনে সময় যাবে। এরকম অবস্থা যে সে এই বাংলোর অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও কোনো হুকুম করতে পারছে না। চার্লি তার অনুমতি ছাড়াই আর একজনকে ঢোকাচ্ছে এবং সেখানে বাধা দিতে গেলে নিজেকে পশুর অধম মনে হবে। জানলা বন্ধ করার আগে পার্থ দেখলো চার্লি একবার পড়ে যেতে যেতে কোনোরকমে নিজেকে সামলে নিল। দু'তিন-পা হেঁটে জিরিয়ে নেবার জন্যে দাঁড়িয়ে পড়ছে। নিচে থেকে উঠে আসতে অনেক সময় লাগছে চার্লির।

দরজাটা খুললো পার্থ। সিঁড়িতে তুষার জমে আছে। থপ থপ করে চার্লি এগিয়ে আসছে। ওর জুতোর ধাক্কায় তুষার ছিটকে যাচ্ছে। মোজা ছাড়াই জুতোটা

এর মধ্যে কখন পরে নিয়েছে পার্থ জানে না। হয়তো তাকে ডাকার সময়, তাহলে সে লোকটার কাছে যাওয়ার জন্যে প্রস্তুত হয়েই ছিল। দরজা পেরিয়ে কার্পেটের ওপর কোনোরকমে লোকটাকে নামিয়ে থপ করে বসে পড়লো চার্লি। তার বুক ওঠা নামা করছে, মুখ হাঁ, সেখান থেকে ধোঁয়া বের হচ্ছে! কথা বলতে পারছে না এই মুহূর্তে। দরজাটা বন্ধ করে লোকটার দিকে তাকিয়েই চমকে উঠলো পার্থ। বিদেশী। চোখ বন্ধ, ঘাড়টা কাত হয়ে গেছে। সারা শরীরে প্রচুর গরম পোশাক কিন্তু সেগুলোর অর্ধেকই ভেজা। লোকটার পিঠে তখনও রুকস্যাক আটকানো। শরীরে কোনো প্রাণের চিহ্ন নেই, মড়ার মতো পড়ে আছে।

নিঃশ্বাস কিছুটা স্বাভাবিক হয়ে আসামাত্র চার্লি বললো, 'ও বেঁচে আছে, অন্তত আমি ওর বুকের শব্দ শুনেছি। হেল্প হিম, কিছু একটা করো।' বলতে বলতেই চার্লি উঠেছিল। প্রথমে লোকটার রুকস্যাক শরীর থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে বললো, 'দ্যাখো তো, এর মধ্যে শুকনো কিছু পাও কিনা।' তারপর ওর জুতো মোজা খুলতে লাগলো। ভিজে চপচপ করছে জুতোর চামড়া।

রুকস্যাক খুলে পার্থ বুঝতে পারলো লোকটা বেশ শৌখিন। ব্রুট ফর মেন, ওল্ড স্পাইস সেভিং লোশন থেকে শুরু করে জামাকাপড়গুলো পর্যন্ত তার সাক্ষ্য দিচ্ছে। ওপরের গুলো বেশ ভিজেছে চুঁইয়ে ঢোকা জলে। লোকটার রুকস্যাকের কাপড়টা খুব ভালো ওয়াটারপ্রুফে তৈরী। একটা মাঝারি সাইজের চামড়ার ব্যাগ এবং তার তলায় ঘুমোবার থলেও নজরে পড়লো। চার্লি ততক্ষণে লোকটাকে প্রায় নগ্ন করে ফেলেছে। শুধু অন্তর্বাস ছাড়া যা কিছু ভিজে তা খুলে চেয়ারের ওপর রেখে পার্থর দেওয়া কম্বলটা লোকটার গায়ে জড়িয়ে দিয়ে ওর দুটো পায়ের তলা ঘষতে লাগলো সজোরে। পার্থ দেখলো ব্যাগের কোণায় সাদা অক্ষরে লেখা, মাইক ল্যাম্ব, লনডন। ব্যাগটা খুললো না পার্থ। সে চার্লির দিকে তাকিয়ে বললো, 'লোকটার নাম মাইক ল্যাম্ব, ব্রিটিশ। তুমি একটা সাদা চামড়ার সেবা করছো!'

চার্লি হঠাৎ পিচ করে একদলা থুতু ছুঁড়ে দিল ঘরের কোণায়, 'ওয়েল, হি ইজ হোয়াইট। ওকে যখন প্রথম দেখি তখনই বুঝতে পেরেছিলাম।'

'তাহলে? তাহলে ওকে তুমি তুলে আনলে কেন? তুমি সাদাদের ঘেন্না কর বলছিলে।'

'ইয়েস আই হেট দেম।' মাইকের দুটো পা ভাঁজ করে বারংবার পেটের কাছে নিয়ে গিয়ে আবার সোজা করে দিচ্ছিল চার্লি, 'কিন্তু মনে হলো লোকটা মরে যাবে। মরে গেলে, তুমি কখনও তিনদিনের বাসি লাশের চামড়া দেখেছ? সাদা থাকে না। আচ্ছা, তুমি ওখানে বসে কি করছো? ওর বুকটা ম্যাসেজ করে দাও তাতে সেন্স ফিরে আসতে পারে।' চার্লির গলায় এবার ধমকের সুর। পার্থ কিঞ্চিৎ বিরক্ত হলেও অস্বীকার করতে পারলো না। লোকটাকে বাঁচানো দরকার। যদিও এই নামের লোকটা বেঁচে উঠবে বলে মনে হয় না তবু চার্লি যখন চেষ্টা করছে তখন তারও উচিত হাত দেওয়া। নইলে কাল সকালে নিজের কাছেই হয়তো খারাপ লাগবে।

মাইকের গালের চামড়া খুব মসৃণ, একটু মেয়েলী মেয়েলী। এই প্রথম কোনো ব্রিটিশের শরীর এভাবে স্পর্শ করলো পার্থ। এই শালারা দু'শ'বছর ভারতবর্ষকে শাসন করেছে। সাতচল্লিশ সালের আগে কি ওকে এভাবে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করতো সে ? মাইকের নাক, গাল, গলা এখন বেশ ঠাণ্ডা। খুব জোরে কিন্তু অনভ্যস্ত হাতে ম্যাসেজ করছিল পার্থ। এমন সময় চার্লি ওর পা দুটোকে আবার সোজা করে রেখে গুঁড়ি মেরে এগিয়ে এসে পার্থকে থামতে বলে বুকে কান পাতলো। পার্থর মনে হলো একটা সাদা কাগজের ওপর কয়লার চাঙর রাখা হয়েছে। মুখ তুলে চার্লি হাসলো, 'বেঁচে আছে। আগের থেকে এখন অনেক স্পষ্ট। তোমার কি মনে হয় ও খুব অসুস্থ হয়ে পড়বে ?'

পার্থ কাঁধ নাচালো, 'কি করে বলব্বো ? আমি ডাক্তার নই।'

চার্লি ভিতরের ঘরের দরজার দিকে তাকালো, 'তোমার কাছে আর যা কম্বল আছে নিয়ে এসো, কিছুক্ষণ চাপা দিলে ওর সেন্স ফিরে আসবে।'

পার্থ উঠে দাঁড়ালো, 'নো। আমার আর স্পেয়ার করার মতো কম্বল নেই।'

চার্লি বোধহয় কি করবে বুঝতে পারছিল না। মাইকের দিকে তাকিয়ে বললো, 'একটু আগুনের তাপ পেলে, এ ঘরে তো আগুন জ্বালা যাবে না। তোমার মোমবাতিটাও ফুরিয়ে আসছে। এসো আমরা ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি ওর জন্যে।' কথাটা শেষ করেই লাফিয়ে উঠলো সে, 'আই গট ইট। কাম অন।' মাইকের এক পাটি জুতো কুড়িয়ে নিয়ে মোমবাতিটাকে টেবিলের ওপর থেকে নিচে নামিয়ে আনলো সে। তারপর এক হাতে মোমবাতি ধরে অন্য হাতে জুতোটাকে তার আগুনে পোড়াতে লাগলো। একটু একটু করে উৎকট গন্ধে ঘরটা ভরে গেল। চামড়া চিড়বিড় করে ওঠামাত্র সেটা মাইকের নাকের তলায় ধরছিল চার্লি। একটু একটু করে, মনে হলো, মাইকের মুখের পেশী নড়ছে। তারপর সে মুখ বিকৃত করতেই চার্লি লাফিয়ে উঠলো, 'গড সেভ হিম। লুক পাতরো, ওর সেন্স ফিরেছে।'

পার্থ দেখলো মাইক ডানদিক থেকে বাঁদিকে মুখ নিয়ে গেল এবং ওর ঠোঁট থেকে কি একটা শব্দ অস্ফুট উচ্চারিত হলো।

'ওকে একটু হুইস্কি খাইয়ে দাও।'

যেন এই ঘরে আণবিক বিস্ফোরণ ঘটলো। পার্থ দরজার দিকে তাকিয়ে হাঁ হয়ে গেল। ওর কোনো বোধ কাজ করছিল না প্রথমে। তারপরে একই সঙ্গে ক্রোধ এবং হতাশা ওকে বিদ্ধ করলো। কিন্তু এখন আর কিছু করার নেই। চার্লি যেন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ আশ্চর্যজনক ব্যাপার দেখছে এমন ভঙ্গীতে তাকিয়ে। ওর চোখ আরও ছোট হয়ে এসেছে, যেন দুশো পাউন্ডের একটা ঘুষি পড়েছে মুখে, এমন ভঙ্গীতে চেয়ে আছে সে। পার্থ এবার চিৎকার করে উঠলো, 'তোমাকে আমি এই ঘরে আসতে নিষেধ করেছিলাম।'

সেইসময় চার্লি যেন শিশুর গলায় বলে উঠলো, 'হা। এ গার্ল।'

দরজায় দাঁড়িয়ে অ্যান। হাতে পার্থের পিটার স্কটের বোতল, 'ওকে একটু একটু হুইস্কি খাইয়ে দাও। এটা ওকে সুস্থ করতে সাহায্য করবে।' কথাটা বলে

খুব নির্বিকার ভঙ্গীতে হুইস্কির বোতল টেবিলে রেখে আবার ঘরে ফিরে গেল সে। দুই মুহূর্ত বাদে একটা কম্বল যেন উড়ে এল ভেতর থেকে, এসে পড়লো মাইকের ওপরে, 'ওকে আর একটু উত্তাপ দাও।' দরজাটা এখন খোলা।

ততক্ষণে সোজা হয়ে দাঁড়িয়েছে চার্লি। দ্রুত পার্থর কাছে এগিয়ে এসে জিজ্ঞাসা করলো, 'তুমি এতক্ষণ ওই ঘরে মেয়েটার সঙ্গে ছিলে? ইউ লাকি গাই।'

ক্রোধ যেন সোচ্চার হলো। রাগত মুখে পার্থ বললো, 'তুমি যা করছিলে তাই কর।'

'ইয়েস ইয়েস আই উইল। কিন্তু মেয়েটা কে?'

'তাতে তোমার কি দরকার?'

'ইওর ফ্রেন্ড? ওয়াইফ?'

'না। আমি তোমাকে বলেছি এ বিষয়ে আর আলোচনা করবে না।'

'গুড গড! মেয়েটা কে এটুকু বলতে তোমার আপত্তি হচ্ছে কেন?'

'ট্রেকার। তোমার মতো সূর্য দেখতে এসেছে। কিন্তু আমি ওকে আশ্রয় দিয়েছি।'

'তুমি আমাকেও আশ্রয় দিয়েছ। কিন্তু আমি এখানে মেঝের ঠান্ডায় আর ও ভেতরে ঘরের খাটে, আরামে। ও, তাই এতক্ষণ আমাকে তুমি ওই ঘরে ঢুকতে দিচ্ছিলে না। তুমি ওকে শেয়ার করতে চাও না। বাট শি ইজ সামথিং। দারুণ সেক্সি। ওঃ, আমি চিন্তাই করতে পারছি না এই রকম ঠান্ডার রাত্রে একটা জ্বলজ্যান্ত সেক্সি মেয়ে আমাদের মধ্যে রয়েছে। ওয়েল, তুমি কি আবিষ্কার করে ফেলেছ?' চার্লির মুখ এখন গদগদ। পার্থর মনে হলো সেখানে অদৃশ্য লালা ঝরছে। আর তখনই একটা শিরশিরে ভয় ওকে ছুঁয়ে গেল। ওর মনে হলো খুব দ্রুত তার হাত থেকে অ্যান বেরিয়ে যাচ্ছে। এতক্ষণ ধরে যে ধৈর্য নিয়ে সে অ্যানের সঙ্গে সময় কাটিয়েছে তা চার্লির মুখভঙ্গী অর্থহীন করে দিচ্ছে। উঃ! শালা হারামী মেয়েছেলেটাকে এত করে বলা সত্ত্বেও দরজায় এসে দাঁড়ালো। হুইস্কি খাইয়ে জ্ঞান ফেরাতে এসেছেন। সাদা চামড়া জেনে দরদ উথলে উঠলো। এতক্ষণ ধরে এত ভদ্রতা করার কোনো দরকার ছিল না। পার্থ আফসোসে ঠোঁট কামড়ালো। ঠিক তখনই চার্লি চিৎকার করে উঠলো, 'হায় ভগবান, তোমার ঘরের ফায়ারপ্লেসে আগুন জ্বলছে আর তুমি আমাকে—।'

পার্থ দেখলো খোলা দরজার সামনে দাঁড়িয়ে চার্লি ওর দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে। হঠাৎ ওর মনে হলো ওই কালো দৈত্যটাকে সামলাতে হলে এই সায়েবটাকে চাঙ্গা করতেই হবে। সে গম্ভীর গলায় বললো, 'লুক চার্লি, আমাদের উচিত এই লোকটার জ্ঞান ফিরিয়ে আনা। মানুষ হিসেবে সেটাই আমাদের কর্তব্য।'

কথাটা কানে যেতেই চার্লি মুখ ফিরিয়ে দেহটাকে দেখলো। তারপর একান্ত অনিচ্ছায় কাছে এগিয়ে এসে হাঁটু মুড়ে বসলো, 'দাঁড়াও, ওকে ডাকা যাক। হেই ম্যান, হেই—।'

আলতো করে মাইকের গালে চড় মারলো চার্লি যদি তাতে সেন্স ফিরে

আসে। তারপর একগাল হেসে বললো, 'সাদা চামড়ার গালে চড় মারতে খুব আরাম লাগে।'

পার্থ অবাক হয়ে তাকালো। যে লোকটা নিজের জীবন বিপন্ন করে ইংরেজ বাঁচিয়েছে সেই কি আনন্দে এই কথা বলতে পারছে। কিন্তু চার্লিকে মাইকের সঙ্গে আটকে রাখা দরকার।

সে বললো, 'ঠিক আছে। ও সুস্থ হলে তুমি যা ইচ্ছে তাই করতে পারো। কিন্তু আগে ও যাতে সুস্থ হয় সেই চেষ্টা করো। এই ঝামেলাটিকে তুমিই আমদানী করেছ।'

চার্লি হাসলো, 'এই হোয়াইটটা না এলে ওই সুন্দরীটিকে দেখতে পেতাম না আজ। ধরো, আমি যদি এখানে অজ্ঞান হয়ে পড়ে থাকতাম তাহলে কি ও আসতো, কক্ষনো না। বাই দ্য বাই, ওকে হুইস্কি খাওয়াতে বলেছিল, না?' হাত বাড়িয়ে বোতলটা টেনে নিল চার্লি। লেবেলটা পড়লো, 'পিটার স্কট।' ছিপি খুলে ঢকঢক করে নিজের গলায় অনেকখানি ঢেলে দিল সে। তারপর দুটো মোটা আঙুলে মাইকের ঠোঁট ফাঁক করে দাঁতের পাটি বিযুক্ত করলো, 'এ শালা তিনদিন দাঁত মাজে নি।'

হুইস্কির বোতলটা শেষ হয়ে যাচ্ছে বলে ঝিম মেরে গিয়েছিল পার্থ। হঠাৎ মনে হলো দুটো বোতল নিয়ে এলে ভালো হতো। এই দৈত্যটাকে তাহলে মদ খাইয়ে অজ্ঞান করে রাখা যেত। চার্লি তখন খুব সতর্ক ভঙ্গীতে মাইকের মুখের ভেতরে হুইস্কি ঢালছে। মাইকের জিভ নড়তেই এক হাতেই ঠোঁট দুটো চেপে ধরলো চার্লি। সামান্য প্রতিবাদের ভঙ্গী করে হুইস্কিটাকে গিলে ফেললো মাইক। সঙ্গে সঙ্গে চিৎকার করে উঠলো চার্লি, 'এই যে সুন্দরী, তোমার প্রেসক্রিপশন কাজে লেগেছে। শালা মাল গিলছে।' আবার জোর করে দাঁত ফাঁক করে খানিকটা হুইস্কি ঢেলে দিল চার্লি। এবার সেটাকে অনেকটা স্বচ্ছন্দে গিলে ফেলে মাইক স্পষ্ট উচ্চারণ করলো, 'আঃ।'

চার্লি উঠে দাঁড়ালো, 'ব্যাস হয়ে গেছে। এর জ্ঞান ফিরে এসেছে।'

সত্যি মাইকের চেতনা খুব দ্রুত ফিরে আসছিল। ওর পা ভাঁজ হলো, হাত নড়লো। মুখ থেকে আর কিছু শব্দ বের হলো। পার্থ কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলো, 'হ্যালো কেমন লাগছে এখন? শুনতে পাচ্ছ!'

দুটো চোখের পাতা ধীরে ধীরে খুলে গেল। মাইক যে কিছু দেখতে পাচ্ছে এমন মনে হলো না। দুটো হাত মুঠো পাকানো। পার্থ আবার জিজ্ঞাসা করলো, 'কেমন লাগছে?'

এবার মাইকের ঠোঁটের কোণে ভাঁজ পড়লো। গলা থেকে স্পষ্ট শব্দ বের হলো, 'ফাইন।'

তারপর দু'হাতের ওপর ভর দিয়ে ধীরে ধীরে উঠে বসলো সে। কম্বলটা শরীর থেকে পড়ে যাচ্ছিল দেখে টেনে নিয়ে বললো, 'ওঃ গড। কি ঠান্ডা। আমার কি হয়েছিল?'

'তুমি অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলে? তোমার নাম মাইক ল্যাম্ব?'

খুব শীর্ণ গলার স্বর, মাইক বললো, 'হ্যাঁ। হাউ ডু ইউ নো ?'

'তোমার ব্যাগে নাম দেখেছি। তুমি ওই হোস্টেলের বারান্দায় পড়েছিলে। কখন এসেছ তুমি ? তোমার কি মনে হয় কথা বলতে পারবে ?' পার্থ জিজ্ঞাসা করলো।

'ও ইয়েস। আমি যখন এসেছি তখন খুব বৃষ্টি পড়ছিল। আমি যে কেন রাস্তায় পড়ে যাইনি আমি জানি না। অন্ধকার হয়ে গিয়েছিল। বিদ্যুতের আলোয় আমি ইয়ুথ হোস্টেলের সাইনবোর্ডটা দেখতে পাই। তারপর আর খেয়াল নেই। তুমি কে ?' মাইক যখন কথা বলছিল তখন ওর শরীর মাঝে মাঝেই কেঁপে উঠছিল।

'আমি এই বাংলোটা রিজার্ভ করেছি। তুমি তো কাল ভোরের সূর্য দেখতে এসেছ ?'

'ওঃ, অফকোর্স! তুমি আমাকে বাঁচিয়েছ বলে ধন্যবাদ। কিন্তু আমার শীত করছে।'

পার্থ বোতলটা তুলে দেখলো সেখানে সিকি পেগও পড়ে নেই। তার মাইককে ভালো লাগছিল, 'তুমি কি কর ?'

'আমি ছাত্তর। রিসার্চ করছি। তুমি ইন্ডিয়ান ? হুইচ প্রভিন্স ?'

'আমি বাঙালী। ল্যান্ড অফ ট্যাগোর।'

'ট্যাগোর ? হু ইজ হি ?'

'পোয়েট। নোবেল প্রাইজ উইনার পোয়েট।' মাইকের অজ্ঞতা দেখে অবাক হয়ে গেল পার্থ।

'আই সি। এখন তো নোবেল প্রাইজ উইনারদের নিয়ে একটা বাজার খোলা যায়। তোমার নাম কি ?' সমস্ত শরীরে দু নম্বর কম্বলটা মুড়ে নিচ্ছিল মাইক।

'পার্থ। ঠিক আছে, তুমি এখানে শুয়ে পড়। কাল সকালে দেখা হবে।'

'এখানে আমার খুব ঠান্ডা লাগছে। তোমরা আগুন জ্বালোনি ?

পার্থ দ্বিধায় পড়ল। তারপর শান্ত গলায় বললো, 'সেখানে তুমি গেলে আমার অসুবিধা হবে।'

'কেন ?'

'ওখানে আমি আমার বান্ধবীকে নিয়ে আছি। অতএব রাতটা কোনোমতে এখানেই কাটিয়ে দাও ; সকালে দেখা হবে। তাছাড়া এখানে তোমার আর একজন সঙ্গী রয়েছে—।'

হাত বাড়িয়ে চার্লিকে দেখাল পার্থ। চার্লি এতক্ষণ ভেতরের দরজার গায়ে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে ওদের কথা শুনছিল। তার অস্তিত্ব টের পায়নি মাইক। এবার পার্থর কথায় মুখ ফেরাতে সে চার্লিকে দেখেই তার কপালে ভাঁজ পড়লো, 'হু ইজ হি ?'

'তুমিও যা আমিও তাই, সূর্য দেখতে এসেছি। দিস ইজ চার্লি ফ্রম ইউ এস এ।' একটুও না নড়ে চার্লি কথাগুলো বললো। এবার মাইকের মুখের পরিবর্তন

হলো। সে চাপা গলায় পার্থকে ডাকলো, 'একটু কাছে এসো, প্লিজ!'

পার্থ ওর বলার ভঙ্গীতে বুঝলো সে চার্লিকে না শুনিয়ে কিছু বলতে চায়। একটু ঝুঁকে মাথা নামালো পার্থ, 'কি বলছো?' মাইক আড়চোখে আর একবার চার্লিকে দেখে নিল। তারপর ফিসফিসিয়ে বললো, 'আমি ওই নিগ্রোটার সঙ্গে একঘরে শুতে পারবো না।'

পার্থ হেসে ফেললো। ওর এই প্রথম মজা লাগলো। নিচু গলায় সে জবাব দিলো, 'কিন্তু ওই নিগ্রোটাই তোমার জীবন বাঁচিয়েছে। ও না থাকলে তুমি এতক্ষণে— !'

'ইজ ইট?' মাইক আবার চার্লির দিকে তাকালো। চার্লি দরজা থেকে একটুও নড়েনি। এরা কি কথা বলছে তা শোনার বদলে তার চোখ এখন ঘরের ভেতরে। মাইক বললো, 'তাহোক, তোমার এখানে স্পেয়ারেবল রুম নেই!'

'আমি জানি না। এই বাংলোটাকে এখনও ঘুরে দেখি নি আমি। যাক, আর বাজে কথা বলে সময় নষ্ট করতে চাই না। তোমার কিছু জামা-প্যান্ট বোধহয় শুকনো আছে, সেগুলো পরে ফেলে এখানেই রাতটা কাটিয়ে দাও।' জিপের হ্যাণ্ডেলটালে তুলে নিল পার্থ।

চকিতে মুখ ঘোরাল চার্লি, 'ওটা নিয়ে কি করতে চাও?'

পার্থ চট করে কিছু বলতে পারলো না। তার মুখের দিকে তাকিয়ে চার্লি দরজা থেকে সরে দাঁড়ালো। পার্থর মনে হলো এখন আর কিছুতেই নরম হওয়া যায় না। সে খুব শান্ত রাখতে চাইলো নিজেকে, 'এটা হাতে রাখলে আমার ভালো লাগে।'

পেছন থেকে মাইক চিৎকার করে উঠলো, 'এখানে থাকলে আমি মরে যাব!'

'কেন?' পার্থ ঘুরে দাঁড়ালো, 'তোমাকে তো কম্বল দেওয়া হয়েছে।'

চার্লি হাত ওল্টালো, 'ওয়েল, আমি কি গায়ে দেব? আমি শুনেছিলাম ভারতীয়রা খুব অতিথিবৎসল, তুমি কি তাই করছো? তোমার ওই ঘরে ফায়ারপ্লেস জ্বলছে আমাদের এখানে কি আছে? টেল মি, তুমি তো হোয়াইট নও?'

মাইক উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করছিল, 'ফর গডস সেক, আমাকে একটু ফায়ারপ্লেসের সামনে নিয়ে যাও। দশ মিনিটের জন্যে, প্লিজ, আমি কথা দিচ্ছি তার বেশী থাকবো না।'

চার্লি এগিয়ে গেল মাইকের দিকে, 'হে ম্যান, কোনো ভদ্রমহিলার সামনে যেতে হলে একটু ভদ্রপোশাকে যেতে হয়। ইংরেজরা শুনেছি এসব ব্যাপার ভালো জানে কিন্তু তার নমুনা তো দেখতেই পাচ্ছি। লক্ষ্মী ছেলের মতো বসো এখানে, আমি তোমাকে সাহায্য করছি পোশাক পরতে।'

মাইক অসহায় চোখে পার্থর দিকে তাকালো। তারপর একহাতে সরিয়ে দিতে চাইলো চার্লিকে, 'ঠিক আছে, ওটা আমি নিজেই পারবো।'

পার্থর হঠাৎ মনে হলো চার্লিকে ঠেকিয়ে রাখতে হলে মাইকের সাহায্য দরকার। মাইক চাইছে মিনিট দশেকের জন্যে ফায়ারপ্লেসের কাছে বসতে। সেটুকু

অনুমতি দিলে যদি ওকে দলে পাওয়া যায় তাহলে বাকী রাতটা সে অ্যানের সঙ্গে কাটাতে পারে। অ্যান যা গোলমাল করার তা দেখা দিয়ে করে গেছে কিন্তু এটা তো ঠিক আর এঘরে আসে নি। হয়তো সে আর তার অবাধ্য হতে চাইবে না। যতটুকু সম্ভব পোশাক পাল্টে কম্বল-দুটো শরীরে জড়িয়ে মাইক দেওয়াল ধরে উঠে দাঁড়ালো। চার্লি পকেট থেকে কিছু একটা বের করে চিবোতে চিবোতে বললো, 'ওয়েল, এখন আর তুমি আমার সাহায্য চাও না, না ? ফাইন।'

মাইক ধীরে ধীরে দরজার সামনে চলে এল। ওর শরীরে এখনও কাঁপুনি রয়েছে। দরজায় দাঁড়িয়ে সে ফায়ারপ্লেস দেখতে পেয়ে উচ্ছ্বসিত হলো, 'ফাইন।' তারপর হুড়মুড় করে নিজের শরীরটাকে টেনে নিয়ে গেল আগুনের সামনে। পার্থর মনে হলো লোকটা হয়তো আগুনের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে। কিন্তু শেষ মুহূর্তে বেগ সামলে নিল মাইক। দুটো হাত ফায়ারপ্লেসের ওপর ছড়িয়ে দিয়ে চোখ বন্ধ করে বসে রইলো কিছুক্ষণ।

পার্থ দেখলো তার পাশ কাটিয়ে চার্লি ঢুকলো এই ঘরে। তারপর ফায়ার-প্লেসের একপাশে চেয়ার টেনে নিয়ে পা ছড়িয়ে বসলো, 'আমরা এখানেই রাত কাটিয়ে দিতে পারি. কি বলো ?'

'না, কখনই না। দশ মিনিট বাদেই তোমাদের ওই ঘরে ফিরে যেতে হবে।' পার্থ এগিয়ে এসে খাটের ওপর বসলো। ওর হাতে তখনও হ্যাণ্ডেলটা ধরা রয়েছে।

'ওটাকে মাটিতে রেখে দাও,দেখতে বিশ্রী লাগছে।'চার্লি আঙুল তুলে দেখালো।

'এ নিয়ে তোমাকে মাথা ঘামাতে হবে না।'

কাঁধ নাচাল চার্লি, 'কি জানি, ওটা দেখলেই আমার মনে হচ্ছে তুমি হেঁটে আসোনি, গাড়িতে এসেছ। তার মানে তুমি আমাদের থেকে আলাদা।' তারপর খাটের ওপর চোখ রেখে বললো, 'কেউ যখন আলাপ করিয়ে দিচ্ছে না তখন নিজেই আলাপ করছি। দিস ইজ চার্লি ফ্রম নুয়র্ক।' মাথা ঝুঁকিয়ে বললো সে।

'আ—। নুয়র্ক। আমিও। আমার নাম অ্যান। সূর্য দেখতে এসেছি।' বিছানায় উবু হয়ে বসা অ্যান মাথা নাড়লো। ওর বুক অবধি কম্বলে ঢাকা।

সঙ্গে সঙ্গে ফায়ার প্লেসের সামনে উপুড় হয়ে বসা মাইক মুখ ফেরালো। এখন ওর শরীরে আর কাঁপুনি নেই কিন্তু দুই চোখে বিস্ময়, 'তুমি, তুমিও সূর্য দেখতে এসেছ ?'

'হ্যাঁ।' অ্যান মাথা দোলাচ্ছিল, 'আমি তোমাদের খানিক আগে এখানে এসেছি।'

চার্লি সেই জিনিসটা এখনও চিবিয়ে যাচ্ছিল, 'গাড়িতে ?'

'নো। আমি হেঁটে এসেছি।' অ্যান প্রতিবাদ করলো।

'তাহলে তোমাদের মধ্যে আগে আলাপ ছিল না ?' চার্লি পার্থর দিকে তাকালো।

'না। কিন্তু এখানে আলাপ হওয়ার পর আমরা একটা বোঝাপড়ায় এসেছি।' পার্থ বুঝতে পারছিল পুরো ব্যাপারটাই হাত থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে।

ধীরে ধীরে মাইক উঠে দাঁড়ালো। এখন ওকে অনেকটা সুস্থ দেখাচ্ছে। মুখের

চামড়ার ফ্যাকাশে ভাবটা কেটে গিয়েছে। সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে যেন নিজেকে ফিরে পেল সে। তারপর দ্বিতীয় চেয়ারটা টেনে নিয়ে আরাম করে বসলো, 'আমি মাইক ল্যাম্ব ফ্রম লণ্ডন।'

'হাউ টু মিট ইউ।' অ্যান হাসলো, 'এখন কেমন বোধ করছো?'

'ভালো, অনেকটা ভালো। এই আগুন আমাকে ভালো করে তুলেছে।'

চার্লি বললো, 'কিন্তু এই মহিলার কাছে তোমার কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত। কারণ ওই হুইস্কির বোতলটা না পেলে তোমার জ্ঞান ফিরে আসতো না।'

'হুইস্কি?'

'হ্যাঁ। তোমার মুখে ঢেলে দিতে তবে চোখ খুলেছে।'

'ইজ ইট? তাহলে তোমার কাছে আমি কৃতজ্ঞ।' মাইক বিনীত ভঙ্গীতে বললো।

এবার চার্লি উঠে দাঁড়ালো, 'আমি তাহলে এই ঘরে আমাদের জিনিসপত্র নিয়ে আসি।'

'কেন?' পার্থর কপালে ভাঁজ পড়লো।

'এখন তো আর আমাদের একসঙ্গে থাকতে আপত্তি থাকার কথা নয়। প্রত্যেকের সঙ্গে প্রত্যেকের আলাপ হয়ে গিয়েছে অতএব এই ঘরের আরাম আমরা ভাগ করে নিতে পারি, তাই না। তোমার ফায়ারপ্লেসের আগুন নিভে আসছে।' চার্লি হাত তুলে দেখালো।

'আর কাঠ নেই?' মাইক জিজ্ঞাসা করলো।

পার্থ বললো, 'ওই দরজা খুলে যে প্যাসেজটা পাওয়া যাবে তার শেষে স্টোর রুমে কাঠ রাখা আছে। চার্লি, তুমি নিশ্চয়ই নিয়ে আসতে পারো।'

'পারি। কিন্তু আমাকে কেউ একটা কম্বল দাও।'

অ্যান নিজেরটা খুলে দিচ্ছিল কিন্তু মাইক বাধা দিল, 'না না, আমি দিচ্ছি।'

'কিন্তু তুমি অসুস্থ!' অ্যান আপত্তি করলো।

'এখন আমি ভালো আছি। তাছাড়া ফায়ারপ্লেসের সামনেই বসে আছি যখন—।' মাইক একটা কম্বল চার্লির দিকে ছুঁড়ে দিল। সেটাকে গায়ে জড়াতে জড়াতে চার্লি বললো, 'এই ঘরে ঢুকেই তুমি সুস্থ হয়ে গেছ মনে হচ্ছে।'

'হ্যাঁ, এই ফায়ারপ্লেসটা আমাকে সাহায্য করেছে। আমার একটু আগুনের দরকার ছিল।'

দরজা খুলে প্যাসেজে পা বাড়াবার আগে চার্লি চিবোতে চিবোতে বললো, 'আগুন তো শুধু ফায়ারপ্লেসে ছিল না, কি বলো মিস?'

প্যাসেজে ওর পায়ের শব্দ যখন শোনা গেল তখন এই ঘরে কোনো শব্দ নেই।

চার্লির ইঙ্গিত যেন কয়েক চাঙর বরফ ফেলে দিল তিনজনের মধ্যে। শেষ পর্যন্ত মাইক যেন অনেকটা নিজের মনে বলে উঠলো, 'এই লোকগুলো ভদ্রতা পর্যন্ত শেখে নি, এই ব্ল্যাকিরা।'

পার্থ দ্রুত বলে ফেললো, 'ঠিক বলছো মাইক। আমি এই লোকটাকে পছন্দ করছি না।'

'ও কি আমার অনেক আগে এখানে এসেছে ?'

'হ্যাঁ। আমি দরজা খুলতে চাই নি, অ্যান বললো বলে খুলতে হলো।'

মাইক অ্যানের দিকে তাকলো, 'তোমার মন মনে হচ্ছে খুব নরম। ওর সম্পর্কে সাবধানে থেকো। আমি কখনই ব্লাকিদের বিশ্বাস করি না।'

'কেন ?' অ্যান বাঁ হাতে ওর কপালে পড়ে থাকা চুল সরালো।

'আমি জানি না কেন ? শুধু আই ডোণ্ট বিলিভ দেম।'

এই সময় প্যাসেজে আবার পায়ের আওয়াজ উঠলো। একগাদা কাঠ দু-হাতে তুলে নিয়ে চার্লি ঘরে ঢুকলো, 'হেই ম্যান, এখানে আরও কয়েকটা ঘর রয়েছে।'

মাইক এবার উঠে দাঁড়ালো, 'ইজ ইট ? তাহলে চলো সেই ঘরগুলো আমরা দেখে আসি। যদি সেখানে খাট বিছানা থাকে তাহলে আর কাউকে কষ্ট করতে হবে না।'

প্রস্তাবটা পার্থর পছন্দ হলো। দুটো খাট পেলে এই দুটোকে নিয়ে আর কোনো সমস্যা হবে না। সে বললো, 'বেশ চলো, দেখে আসি।'

কাঠগুলো ফায়ারপ্লেসের পাশে নামিয়ে চার্লি মাথা নাড়লো, 'আমি বাবা যাচ্ছি না।'

'যাচ্ছ না ? কেন ?' পার্থ আবার বিরক্ত হলো।

'বাইরে ভীষণ ঠাণ্ডা। তাছাড়া এরকম আরামের ঘর ছেড়ে পাগল না হলে কেউ যায় ?'

চার্লি কথা শেষ করে অ্যানের দিকে তাকিয়ে চোখ ছোট করে হাসলো।

মাইক সেটা দ্যাখেনি, বললো, 'আমরা সেই ঘরেও ফায়ারপ্লেস থাকলে আগুন জ্বালিয়ে নিতে পারি। কোনো অসুবিধে হবে না। এখানে আর কাঠ নেই ?'

পার্থ বললো, 'প্রচুর কাঠ আছে।'

মাইক বললো, 'চমৎকার। চলো দেখে আসি। তোমাদের কাছে টর্চ আছে ? বাঃ, ওইতো, এটা সঙ্গে নাও। একটা মোমবাতি নেবে নাকি ?' এই প্রশ্নটা পার্থর উদ্দেশ্যে।

পার্থ মোমবাতি নিল, 'চার্লি, চলে এসো।'

চার্লি চোখ বন্ধ করে সেই জিনিসটা চিবিয়ে যাচ্ছিল, 'আমি এখান থেকে গেলে ওই মহিলার অসুবিধে হবে। এরকম জায়গায় কোনো মহিলাকে একা রেখে যাওয়া উচিত নয়।

'ঘর খুঁজতে তিনটে লোকের যাওয়ার কি দরকার ? মিস্, তুমি কি বলো ?'

অ্যান ধীরে ধীরে মাথা নাড়ল, ঠিকই। এটা পার্থকে আরও বিরক্ত করলো। মেয়েটা কি চার্লির মতলব বুঝতে পারছে না। 'লেটস গো।'

খুব খারাপ লাগছিল অ্যানকে চার্লির সঙ্গে একঘরে ছেড়ে যেতে কিন্তু মাইক যাচ্ছে দেখে যেতে বাধ্য হলো পার্থ। প্যাসেজটা এখন আরও কনকনে। যদিও বাইরে ঝড় কিংবা বৃষ্টি নেই তবু ঠাণ্ডা ওই ঘরের বাইরে আসতেই হাড়ের মধ্যে সেঁধিয়ে যাচ্ছে। পার্থ বললো, 'ওদিকে টয়লেট আর স্টোর ছাড়া আর কিছু নেই

মাইক, এদিকে চল।' কথা বলার সময় ওর দাঁতের নাচন শুরু হয়ে গেল। ডানদিকের দরজাটা খুলতেই একটা ঘর। নিচে দড়ির ম্যাট্রেস, একটা তক্তপোষের ওপর জীর্ণ গদি। আর কোনো আসবাব নেই এই ঘরে।

মাইক বললো, 'এখানে চার্লি শুতে পারে, কি বলো ?'

পার্থ মাথা নাড়লো, 'নিশ্চয়ই। কিন্তু আগুনের বায়না ধরতে পারে লোকটা।'

মাইক বললো, 'ওকে বুঝিয়ে দিতে হবে অন্য কোনো ঘরে যদি ফায়ারপ্লেস না থাকে তাহলে শোওয়ার ঘরটা মহিলাকেই ছেড়ে দেওয়া ভদ্রতা। তোমার সঙ্গে ওর আগে থেকে বন্ধুত্ব ছিল না ?'

'না। কিন্তু তাতে কিছু যায় আসে না। আমি এই বাংলো রিজার্ভ করেছি এবং অ্যানকে জায়গা দেওয়ার পর আমাদের চমৎকার বোঝাপড়া হয়ে আছে।' খুব কর্তৃত্বের সঙ্গে জানালো পার্থ। এই ঘরের দ্বিতীয় দরজা দিয়ে মাইক এগোতেই পার্থ তাকে অনুসরণ করলো। আর তখনই একটা ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দ কানে এলো। মেঝের ওপর দিয়ে কিছু টেনে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে এরকম একটা ঘষটানির আওয়াজও কানে এলো। বন্ধ দরজা খুলে এই ঘরে ঢুকতেই ওরা হতভম্ব হয়ে গিয়েছিল। এটা বোধহয় চৌকিদারের ঘর এবং তার বাইরে যাওয়ার দরজাটা অর্ধেক খোলা। হালকা জ্যোৎস্না এসে পড়েছে তার ফাঁক দিয়ে। মাইক চাপা গলায় বললো, 'দরজাটা খোলা। কোনো মানুষ থাকে নাকি এখানে ?'

পার্থ অনুভব করছিল ঠাণ্ডাটা চট করে খুব বেড়ে গেছে। ওই আধখোলা দরজা দিয়েই হু হু করে ঠাণ্ডা ঢুকছে এই ঘরে। টর্চের আলো কাঁপা হাতে চারপাশে ফেলে কিছু জামাকাপড়, ছেঁড়া বিছানার ওপর গোটা তিনেক মোটা কম্বল আর ঘরের কোণে হাঁড়িকুড়ি দেখতে পেল সে। এই ঘরের মেঝেতে কোনো ম্যাট্রেস নেই। এইসময় মাইক জিভ দিয়ে একটা শব্দ করলো, 'দ্যাখো, ওখানটায় দ্যাখো!' ওর হাত যেখানটা ইঙ্গিত করছিল সেখানে টর্চের আলো ফেললো পার্থ। শুকনো কিছু জমাট বেঁধে রয়েছে বিছানার পাশে, বিছানায়। ওটা যে রক্ত ছিল তা বুঝতে অসুবিধে হবার কথা নয়। ওরা এই ঘরে আসামাত্র সেই ঘষটানির শব্দটা থেমে গিয়েছিল। চারধার অসম্ভব শান্ত। কিন্তু এবার সেটা শুরু হলো। কোনো ভারি জিনিস যেন টেনে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। প্রায় পা টিপে টিপেই মাইক দরজার কাছে চলে গেল। তারপর মাথাটা বের করে সন্তর্পণে দেখার চেষ্টা করলো বাইরে কি হচ্ছে। এবং তখনই তার মধ্যে উত্তেজনা এলো। দ্রুত হাত নেড়ে সে পার্থকে ডাকলো। টর্চ নিভিয়ে পার্থ নিঃশব্দে ও পাশে এসে দাঁড়াতেই মাইক চাপা গলায় বললো, 'লুক্।' পার্থর মনে হচ্ছিল ওর নাক ঠোঁট গাল সব খসে খসে পড়ে যাচ্ছে। তবু সে মুখ বের করলো। এবং সঙ্গে সঙ্গে একটা আর্তনাদ মুখ থেকে ছিটকে বেরিয়ে এল। শব্দটা কানে যাওয়ামাত্র ওরা মুখ তুলে তাকালো। প্রত্যেকের জ্বলন্ত চোখে এখন সতর্কতা। কান খাড়া করে এদিকে তাকিয়ে আছে। মাইক বাঁ হাতে দরজাটাকে শব্দ করে খুলে দিতেই ওরা কয়েক লাফে নিচে গিয়ে দাঁড়াল। সংখ্যায় অন্তত পাঁচটা হবে। দাঁড়িয়ে হিংস্র দাঁতে এদিকে তাকিয়ে একজন চিৎকার করে উঠলো। পার্থর মনে হলো সে একা থাকলে এই চিৎকার শুনলেই রক্ত হিম

হয়ে যেত। মাইক বললো, 'নেকড়ে। কিন্তু লোকটা কে?' ততক্ষণে পার্থর নজরে পড়েছে। পেছন দিকে ছোট্ট একটা কাঠের বারান্দা রয়েছে। সেই বারান্দার শেষ প্রান্তে একটা শরীর চিৎ হয়ে পড়ে আছে। লোকটার শরীর ছোটখাটো।

মাইক এবার দৌড়ে বারান্দায় চলে গেল, 'ও ভগবান, কি ঠান্ডা! এরা লোকটাকে খেয়ে ফেলেছে!' তারপর সামান্য ঝুঁকে চিৎকার করলো, 'এখানে এসো, লোকটাকে খুন করা হয়েছে।' খুনের কথা শোনামাত্র পার্থ পা চালালো। লোকটা পড়ে আছে চিৎ হয়ে এবং তার বাঁ দিকের বুকের ভেতর কিছু একটা বিঁধে রয়েছে। বুঝতে অসুবিধে হচ্ছে না, লোকটাকে হত্যা করা হয়েছে। মাইক মুখ তুলে নেকড়েগুলোকে দেখলো তারপর দু-হাত তুলে মুখে শব্দ করে তাদের তাড়াতে চেষ্টা করলো। কিন্তু নেকড়েগুলো শুধু দুই-এক পা সরে গেল মাত্র, ভয় পাওয়ার কোনো লক্ষণ দেখা গেল না। মাইক বললো, 'এই লোকটাকে এখানে রেখে গেলে সকালে কিছুই পড়ে থাকবে না। চলো ওকে ঘরে নিয়ে যাই।' পার্থ লোকটার মুখ দেখে শিউরে উঠেছিল। তার সন্দেহ ছিল না, এই হলো বাংলোর চৌকিদার। কেউ ওকে হত্যা করে ঘরে ফেলে রেখে গিয়েছে। ঘরের দরজা নিশ্চয়ই খোলা ছিল তাই নেকড়েগুলো ঢুকতে পেরেছে। ঢুকেই ওর মুখ থেকে মাংস খুবলে খেয়েছে। শরীরের জামাকাপড় ছিঁড়ে কুচি কুচি করেছে, পেটের কাছে অনেকটা গর্ত। বোধহয় ওই ঘরের বাইরে নিয়ে আরাম করে বাকিটা সাবাড় করবে ভেবেছিল ওরা। কিন্তু এই বীভৎস শরীরটার দিকে তাকিয়ে পার্থর পেট গুলিয়ে উঠছিল। মাইক ততক্ষণে ওর জামার হাত ধরে টানতে শুরু করেছে। লোকটা এত হালকা যে পার্থকে সাহায্য করতেই হলো না। সড়সড় করে দেহটাকে ঘরের মধ্যে ঢুকিয়ে নিল সে। পার্থ দেখলো ওদের খাবার হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে বুঝতে পেরে নেকড়েগুলো দ্রুত পায়ে এগিয়ে আসছিল সিঁড়ির দিকে। পার্থ হাত নাড়তেই তারা থমকে দাঁড়িয়ে তাদের বীভৎস দাঁতগুলো দেখাতে লাগলো। হঠাৎ পার্থর মনে হলো ওরা যদি এখন ঝাঁপিয়ে পড়ে তাহলে তার কিছুই করার থাকবে না। সে পিছু হটতে লাগলো। যত দরজার কাছে পৌঁছে যাচ্ছে তত নেকড়েগুলো বারান্দার ওপর উঠে আসছে। শেষপর্যন্ত দরজার গায়ে হাত রেখে নিশ্চিন্ত হলো। পার্থ চকিতে সামনের দিকে তাকাল। চারধারে কেমন ঘোলাটে ভাব। জ্যোৎস্নায় সেই ঘোলা রঙ মাখামাখি হয়ে রয়েছে। বাংলোর পেছনের মাটিতে ঝুরঝুর করে সেই ঘোলাটে সাদাটে রঙ ছড়ানো। তুষার পড়ছে। চট করে দরজা বন্ধ করে ঘুরে দাঁড়িয়ে টর্চ জ্বাললো সে। মাইক লোকটার পাশে হাঁটু মুড়ে বসে পকেট খুঁজছে। কিছুক্ষণ আগে যে মানুষটা ঠান্ডায় জমে যাচ্ছিল তাকেই এখন সচল হতে দেখে অবাক হচ্ছিল সে। একেই বলে সাহেবের রক্ত, সপ্রশংস চোখে তাকালো পার্থ, এইজন্যেই ওর জাত এতদিন গোটা পৃথিবীটাকে চাকর বানাতে পেরেছিল। মাইক বললো, 'নাথিং, এর পকেটে এমন কিছু নেই যা থেকে ওর পরিচয় জানা যেতে পারে। কিন্তু এই ঘরেই ওকে খুন করা হয়েছে।'

'লোকটা এই বাংলোর চৌকিদার। ওর গায়ে খাকি পোশাক রয়েছে। তাছাড়া নিচে আমাকে বলা হয়েছিল যে এই বাংলোয় চৌকিদার আছে। আমি

এসে ওকে দেখি নি। আমি আসার আগেই— ।' পার্থ চুপ করলো।

'অন্তত দিন তিনেক। তুমি বাংলোয় ঢুকলে কি করে ?'

'তালা ভেঙে।' পার্থ টর্চটা আবার দেওয়ালে ঘোরালো। এবার তার চোখে পড়ল পেরেকে ঝোলানো চাবির গোছাটা। চৌকিদারটা নিশ্চয়ই বাইরে থেকে সদর দরজায় তালা দিয়ে রাখতো।

মাইক উঠে দাঁড়াল, 'এটা একটা খুনের কেস। পুলিশকে জানানো উচিত।'

'পুলিশ!' পার্থ হাসলো, 'এর ধারেকাছেও পুলিশ নেই। কাল নিচে নেমে গিয়ে ওদের অফিসে খবর দিতে হবে। এখন ওকে ওইভাবেই রেখে দাও, আমি আর সহ্য করতে পারছি না।'

এইসময় বন্ধ দরজায় নখের শব্দ শুরু হলো। নেকড়েগুলো আঁচড়াবার চেষ্টা করছে। আর তখনই শোওয়ার ঘর থেকে অ্যানের গলা ভেসে এলো, 'ওহো। নো! নো।' সেইসঙ্গে চার্লির হাসি। পার্থ চমকে মাইকের দিকে তাকালে তারপর দৌড়ে শোওয়ার ঘরের দরজায় চলে এলো। চার্লি বিছানায় বসে। তার দুটো হাত অ্যানের কাঁধে। অ্যান প্রাণপণে চেষ্টা করছে হাত দুটো সরিয়ে দিতে।

'চার্লি!' চিৎকার করে উঠলো পার্থ। চার্লি মুখ ফিরিয়ে ওকে দেখলো। তারপর কাঁধ নাচিয়ে অ্যানকে ছেড়ে উঠে দাঁড়াল, 'ওয়েল বয়েস। তোমাদের শোওয়ার ঘর পাওয়া গেল ?'

'তুমি কি করছিলে? অ্যান, তুমি ঠিক আছ তো?' মাইক পেছনে এসে দাঁড়াতে পার্থ জোর পেল।

অ্যান উত্তর দিল না। সে খাটের এক কোণে উবু হয়ে বসে রয়েছে। কম্বলটা পড়ে গিয়েছিল, একহাতে সেটাকে তুলে নিয়ে চোখ বন্ধ করলো।

মাইক এগিয়ে এল ঘরের মধ্যে, 'কি হয়েছে?' প্রশ্নটা চার্লির উদ্দেশ্যে।

'নাথিং। এ লিটল্‌বিট ফ্যান্‌।' চার্লি লাল দাঁত বের করে হাসলো। মাইক চলে এলো খাটের পাশে, তারপর ঝুঁকে বললো, 'আমাকে বলো, ওকি তোমাকে আপমান করেছে?'

'হেই মিস্টার।' চার্লি চেঁচিয়ে উঠল, 'তোমার কি করে মনে হলো আমি অপমান করেছি?'

পার্থ বললো, 'ও চেঁচাচ্ছিল, আমরা শুনতে পেয়েছি।'

'চেঁচাচ্ছিল। তা একটু আধটু তো চেঁচাবেই। যাক। তোমরা যখন ঘর খুঁজে পেয়েছ তখন আর নষ্ট করো না। অনেক রাত হয়ে যাচ্ছে।' একটা চেয়ার টেনে নিয়ে চার্লি বসলো।

'তার মানে?' পার্থ চমকে উঠলো।

'খুব সোজা। তোমরা চলে যাও সেখানে, আমরা এবার শুয়ে পড়বো। তাই না মিস?'

হঠাৎ মাইকের কণ্ঠস্বর চড়ায় উঠলো, 'এই ঘরে তোমাকে কে থাকতে দিচ্ছে!'

'কে আর দেবে? আমি নিজেই থাকছি।'

'নো।' মাইক চিৎকার করলো, 'এই ঘরে আমি থাকবো।'

পার্থর মাথা গরম হয়ে যাচ্ছিল। সে এগিয়ে এলো মাঝখানে, 'কি আশ্চর্য'। আমি বুঝতে পারছি না কোন অধিকারে তোমরা এইসব কথা উচ্চারণ করছো। যাও, এখনই এই ঘর থেকে বেরিয়ে যাও, অনেক হয়েছে। আমি এই বাংলো রিজার্ভ করেছি। অতএব আমার হুকুম তোমাদের মানতে হবে। এখানে আমি শোব।'

মাইক যেন খুব অবাক হয়েছে এমন ভঙ্গীতে বললো, 'তুমি শোবে?'

'হ্যাঁ। এই বাংলো আমার। আমি তোমাদের দয়া করে থাকতে দিয়েছি। তা যদি না দিতাম তাহলে এতক্ষণে তোমরা ঠাণ্ডায় মরে যেতে। তাছাড়া অ্যানের সঙ্গে আমার আণ্ডারস্ট্যাণ্ডিং হয়েছে।'

সঙ্গে সঙ্গে চার্লি হো হো করে হেসে উঠলো, 'কি বোকার মতো কথা। বারংবার শোনাচ্ছ এই বাংলো তুমি রিজার্ভ করেছ কিন্তু সেটা প্রমাণ করবে কে? কোনো অফিসার তো দূরের কথা একটা চৌকিদার তোমার দাবী সমর্থন করতে এগিয়ে আসবে না।'

এবার মাইক অ্যানের দিকে তাকালো, 'ওই ইণ্ডিয়ানটা যা বলছে তা ঠিক?'

অ্যান তাকালো। চোখে জিজ্ঞাসা।

'ও বলছে তোমাদের আণ্ডারস্ট্যাণ্ডিং হয়েছে।'

'মিথ্যে কথা।' চার্লি চেঁচিয়ে উঠলো, 'একটু আগেই অ্যান আমাকে বলেছে পাতরো ওকে শেল্টার দেবার পর থেকেই বিছানায় নিয়ে যাওয়ার তাল করেছে।'

কথাটা কানে যেতেই পার্থ খুব কষ্ট পেল। সে অ্যানকে বললে, 'তুমি, তুমি একথা ওকে বলেছ?'

অ্যান ফায়ারপ্লেসের দিকে তাকালো, 'আমি কি খুব মিথ্যে বলেছি।'

চার্লির হাসি কানে যেতেই পার্থ বললো, 'আমি তোমার সঙ্গে ভালো ব্যবহার করি নি?'

'করেছ। কিন্তু তোমার আসল উদ্দেশ্য তো একটাই। তুমি ঠিক সাহস পাচ্ছিলে না। আর তোমরা ওই ঘরে চলে যাওয়ামাত্র ও লাফিয়ে কাছে এসে আমাকে জড়িয়ে ধরতে চাইলো। আমি বাধা দিলাম। তখন ও তোমার কথা বলে ঠাট্টা করলো। তখন আমি বলেছি তোমরা দুজনেই সমান, কেউ আস্তে কেউ ধীরে।'

অ্যান মুখ ফেরালো না।

হঠাৎ মাইক ওদের দুজনের মাঝখানে চলে এলো, 'তোমরা দুজন মন দিয়ে শোনো, এই ঘরে আমি অ্যানের সঙ্গে থাকবো। অতএব জলদি বিদায় হও।'

পার্থ চার্লির দিকে তাকালো। চার্লি নড়লো না, শুধু ঠোঁট বেঁকিয়ে বললো, 'কেন?'

'খুব সোজা কথা। আমার আর অ্যানের গায়ের চামড়া সাদা। একজন হোয়াইট উওম্যানের সঙ্গে রাত কাটাবার অধিকার তোমাদের নেই।'

মাইক নির্বিকার মুখে কথাগুলো বললো।

পার্থ আঁতকে উঠলো, 'তুমি আমাকে ব্ল্যাকি বলছ?'

এবার চার্লি উঠলো। তার বিরাট হাতের থাবা পার্থর কাঁধে রেখে বললো,

'শোনো সাদা চামড়াদের কাছে আমরা সবাই ব্ল্যাকি । এতে এত ভেঙে পড়ার কি আছে ।'

মাইক এবার অ্যানের দিকে এগিয়ে গিয়ে ওর হাত ধরলো, 'এখন থেকে আমরা বন্ধু । ওই লোক দুটোকে বিদায় করে দিলেই রাতটা আমাদের । তুমি রাজী ?'

ধীরে ধীরে হাতটা সরিয়ে দিল অ্যান, 'ভগবানের দোহাই, আমাকে একটু একা থাকতে দাও । আমি আর পারছি না ।'

চার্লি শব্দ করে হাসলো, 'ও তোমাকেও চাইছে না ।'

মাইক যেন কথাটায় উত্তেজিত হলো, 'কে চাইছে কি চাইছে না তা আমি বুঝবো । একজন হোয়াইট ম্যান সবসময় হোয়াইট উওম্যানের সঙ্গে থাকবে । নাউ, গেট আউট ।'

'তা তো হয় না । আমি এই ঘর থেকে নড়ছি না ।'

'তার মানে ?' মাইক ঘুরে দাঁড়ালো ।

'এই নির্জন পাহাড়ে আমি একটা সাদা চামড়ার মেয়েকে পেয়েছি । এ আমার অনেক দিনের ইচ্ছে । আমার ওকে চাই । দু'মিনিট সময় দিচ্ছি নইলে আমি তোমাদের বের করে দেব ।'

'তুমি কি মারামারি করতে চাও ?' মাইক জানতে চাইল ।

'ওয়েল, যদি বাধ্য কর ।'

সঙ্গে সঙ্গে তীরের মতো ছিটকে এল মাইক । তার ডান হাত প্রচণ্ড জোরে চার্লির মুখে আঘাত করলো । চার্লি ঠিক প্রস্তুত ছিল না তাই অনেকটা পিছু হটে গেল । তারপরেই বিকট শব্দ করে দুই হাতে মাইককে তুলে ধরলো ওপরে । একটা তীক্ষ্ম চীৎকার ফেটে পড়লো অ্যানের গলা থেকে । পার্থ কিছু বুঝে ওঠার আগে মাইকের শরীরটা আছড়ে পড়লো বিছানায় । ত্রস্তে উঠে দাঁড়ালো অ্যান । ভয়ে আতঙ্কে ওর দুই চোখ বিস্ফারিত । আর তখনি খাটটা সশব্দে ভেঙে পড়লো । পার্থ দেখলো মাইকের শরীরটা দু'তিনবার পাক খেয়ে আস্তে আস্তে স্থির হলো । এবং হাতের ওপর ভর রেখে উঠে বসতে চাইল সে । চার্লি এগিয়ে গেল ওর দিকে, 'আর কিছু চাই ?'

মাইকের তখন কথা বলার মতো অবস্থা নয় । ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে আছে সে চার্লির দিকে । চার্লি বললো, 'আমার মুখে হাত তুলেছিলে, তোমার ভাগ্য যে আমি মেরে ফেলি নি । আজকের রাতটার জন্যে নিশ্চয়ই শিক্ষা হয়েছে ।'

তারপর ঘুরে দাঁড়ালো সে পার্থর দিকে, 'নাউ ইন্ডিয়ান, তুই ওই সাদা চামড়াটার পা চাটছিলে কিন্তু ও তোমাকে ব্ল্যাকি ছাড়া কিছু মনে করে না । আই ওয়ান্ট দিস গার্ল ।' এক হাত বাড়িয়ে সে অ্যানকে কাছে টেনে আনল, 'তোমার আপত্তি আছে ?'

পার্থ কি করবে বুঝতে পারছিল না । চার্লির শরীরের শক্তির যে পরিচয় একটু আগে পাওয়া গেল তারপরে গায়ের জোর খাটানো বোকামি । সে দেখলো অ্যান ছটফট করছে চার্লির আলিঙ্গনে । দু'হাতে ঘুষি মারার চেষ্টা করছে চার্লির

শরীরে কিন্তু চার্লি নির্বিকার, 'হাউ নাইস। আমার এইরকম দরকার। মেয়েরা বেড়াল না হলে খেলাটা জমে না। এরকম সাদা মেয়ে আমি জীবনে পাইনি।'

পার্থ বললো, 'এটা খুব অন্যায়।'

'অন্যায় ?' অ্যানকে ছেড়ে দিয়ে এক পা এগিয়ে এল চার্লি, 'আমি কেন ওকে পাব না ? একটা হোয়াইট উওম্যানকে ভোগ করার অধিকার আমার চেয়ে বেশী কারো নেই। আই হেট দেম সুতরাং আমার চাই। এতে কোনো অন্যায় নেই। আমি তোমাকে বাইরে ছুঁড়ে ফেলবো।' বীভৎস মুখ করে চার্লি এগিয়ে আসছিল পার্থর দিকে।

খুব নার্ভাস ভঙ্গীতে পার্থ সরে গেল দেওয়ালের দিকে। তারপরেই তার নজর পড়লো হ্যান্ডেলটার ওপর। চকিতে সেটা তুলে নিল সে, তারপর শাসাল, 'আর এক পা এগিয়ে এলেই আমি তোমাকে খুন করবো চার্লি।'

চার্লি ছোট চোখে হ্যান্ডেলটাকে দেখলো তারপরেই আচমকা একটা লাথি ছুঁড়লো পার্থর পেট লক্ষ্য করে। সামান্য সরে গিয়ে সজোরে হ্যান্ডেলটা দিয়ে আঘাত করলো ওর পায়ে। আর্তনাদ করে চার্লি মাটিতে বসে পড়ে দুহাতে পা চেপে ধরলো। আর তখনি অ্যান ছুটে গেল প্যাসেজের দরজায়। কেউ কিছু বোঝার আগেই মিলিয়ে গেল ওপাশে।

চার্লি আঘাত করে নার্ভাসনেসটা আরও বেড়ে গিয়েছিল পার্থর। এই সময় চার্লি উঁচু হয়ে বসতেই তার মনে হলো নিগ্রোটাকে মারার এই সুযোগ। ওর মাথায় এখন স্বচ্ছন্দে আঘাত করা যায়। মাইক্ আঘাত পেয়েছে, চার্লি যদি আহত হয় তাহলে আর অ্যানকে পাওয়ার কোনো অসুবিধে নেই। সে হ্যান্ডেলটা তুললো। ওই মুহূর্তেই চার্লি মুখ ফিরিয়েছিল দরজার দিকে। অ্যান পালিয়ে যাচ্ছে এই বোধ তাকে সজাগ করেছিল। ফলে সে নড়ে উঠতেই পার্থর হ্যান্ডেল লক্ষ্যভ্রষ্ট হলো। মাথার বদলে চার্লির কাঁধে পড়লো সেটা। কোঁক করে উঠলো চার্লি। তারপরেই ওর শরীর মেঝেয় দু-তিনটে পাক খেল। পার্থর মুখে তখন হাসি ফুটেছে। সে মাইকের দিকে তাকাল। মাইক তখনও ভাঙা খাটের ওপর আধশোওয়া। চোখাচোখি হতে মাইকের ঠোঁট নড়লো, 'থ্যাঙ্কু। তুমি ওই ব্ল্যাকিটাকে শেষ করেছ ?'

'অলমোস্ট।' পার্থ হ্যান্ডেলটা নিয়ে ভাঙা বিছানার পাশে এগিয়ে এলো, 'এখন আমি যা বলবো তাই তোমাকে শুনতে হবে। ওর চোয়াল শক্ত।'

'ইয়েস।' মাইক কোনোমতে বললো।

'একটু আগে তুমি আমাকে ব্ল্যাকি বলেছ। তাই তো ?'

'ওয়েল, আমি কি ভুল বলেছি ?'

'অফকোর্স ভুল বলেছ। কি ভাব তোমরা নিজেদের ?'

'আমি কিছুই ভাবি না। এখন তুমি কি চাও ?'

'আমি ওই মেয়েটিকে নিয়ে রাত কাটাতে চাই।'

'রাত ! রাতের আর কতটুকু অবশিষ্ট আছে ?'

'অনেক। তুমি কি উঠে দাঁড়াতে পারবে ?'

'কেন ?'

'তাহলে ওই নিগ্রোটাকে নিয়ে পাশের ঘরে যাও। আমি অ্যানকে ফিরিয়ে আনছি।'

বাধ্য ছেলের মতো মাইক ওঠার চেষ্টা করছিল। পার্থ ঘুরে দেখলো চার্লি নিথর হয়ে পড়ে আছে দরজার কাছে। ওই বিশাল শরীরটাকে সে শুইয়ে দিতে পেরেছে—ভাবতেই নিজের ওপর খুব আস্থা বেড়ে যাচ্ছিল ওর। লম্বা লম্বা পা ফেলে চার্লি'র শরীরটা বাঁচিয়ে দরজার কাছে পেঁছে গেল ও। তারপর হ্যাণ্ডেল-টাকে দেখলো। এটা নিয়ে অ্যানের সামনে যাওয়াটা খুব শোভন হবে না। আর তখনই প্রচণ্ড আঘাত পেল সে হাঁটুর ওপরে। হুড়মুড়িয়ে দরজার পাশে পড়ে গিয়ে সে মুখ ফেরাতেই দেখলো চার্লি পা গুটিয়ে নিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াচ্ছে। ও তাহলে অজ্ঞান হয় নি। পার্থ হ্যাণ্ডেলটাকে আঁকড়ে ধরে উঠে বসতে চাইল কিন্তু তার আগেই আর একটা লাথি খেল মুখে। শরীরটা দেওয়ালের সঙ্গে ঘষটে যেতেই হ্যাণ্ডেলটা তুলে নিল চার্লি। মুখে চটচটে নোনতা স্বাদ, পার্থ অস্পষ্ট দেখলো, চার্লি'র হাত ওপরে উঠে যাচ্ছে আর্তনাদ করে পার্থ কেঁদে উঠলো, 'মেরো না, আমাকে মেরে ফেল না।'

সে চোখ বন্ধ করলো অন্তিম আঘাতের জন্যে। এক সেকেণ্ড দু সেকেণ্ড। তারপর ফায়ারপ্লেসের আগুন ছিটকে উঠলো। হ্যাণ্ডেলটাকে সেখানে ছুঁড়ে ফেলে চার্লি থুতু ফেললো মেঝেয়। পার্থ চোখ বন্ধ করলো আবার।

চার্লি'র দাঁড়াতে খুব কষ্ট হচ্ছিল। কাঁধ যেন ব্যথায় ছিঁড়ে যাচ্ছে। সে টল-ছিল। এবং সেই অবস্থায় প্যাসেজে পা বাড়ালো। এবং তখনই তার খেয়াল হলো এই ঘরের বাইরেটা অন্ধকার। আবার ঘরে ঢুকলো সে। মাইক তখন উঠে দাঁড়িয়েছে কিন্তু দাঁড়ানোর ভঙ্গীতেই বোঝা যায় যে সে অশক্ত। চার্লি সেটা যাচাই করে বললো, 'ওকে ধন্যবাদ দেওয়া হচ্ছিল, না? আমি শেষবার বলে দিচ্ছি আর আমি ছেড়ে দেব না। তারপর টর্চ তুলে নিয়ে প্যাসেজে চলে এলো। কাঁধে যন্ত্রণা তার শীতবোধও কমিয়ে দিয়েছে সে থপ থপ করে স্টোরের কাছে গিয়ে ফেলে দেখলো। টয়লেটটা খুঁজলো। না, অ্যান এখানে নেই। কোথায় যাবে? এই ঠাণ্ডায় নিশ্চয়ই বাইরে বের হবে না। ওরা বলেছিল এখানে আর একটা ঘর আছে। প্যাসেজ ধরে এগিয়ে এলো চার্লি। ওর চোখের সামনে একটি উলঙ্গ সাদা মেয়ে ছাড়া কিছু নেই।

দরজাটাকে খুঁজে পেল চার্লি। বুঝলো, ভেতর থেকে বন্ধ। অন্ধকারে নিঃশব্দে হাসলো সে। তারপর কয়েক পা পিছিয়ে গিয়ে অন্য কাঁধে সজোরে আঘাত করলো পাল্লায়। তিনবারের বার ছিটকে খুলে গেল দরজা। অন্ধকার ঘরের দিকে তাকিয়ে চার্লি ডাকলো, 'ওয়েল, অনেক হয়েছে, এবার চলে এসো মিস। আই ওয়াণ্ট ইউ।'

সামান্য অপেক্ষা করলো সে। ভেতর থেকে কোনো শব্দ এলো না। এবার টর্চ জেলে আলো ফেললো। ঘরটা ফাঁকা। কোনো মানুষ নেই। এমন কি লুকোবার জায়গা বলতে একটা তক্তাপোষ। নিচু হয়ে তার তলাটা দেখলো সে। না, সেখানেও অ্যান নেই। মাথা গরম হয়ে গেল চার্লি'র। এবং তখন আলো

পড়লো ভেতরের দরজার ওপরে। দৌড়ে সেখানে চলে এলো সে। ওপাশেও তাহলে আর একটা ঘর আছে। দরজাটাকে বন্ধ করেছে অ্যান। চার্লি চিৎকার করলো, 'দরজা খোল।' এইসময় তার কানে এলো কোথাও যেন আঁচড়ানোর শব্দ হচ্ছে। সে আর একবার চিৎকার করে ডাকতেই কয়েকটা জন্তু আচমকা চেঁচিয়ে উঠলো। ডাকটা এমনই সাংঘাতিক যে চার্লি ঘাবড়ে গেল। এখানে জন্তু এলো কোত্থেকে। সে পাগলের মতো বন্ধ দরজার ওপরে আছড়ে পড়লো। মিনিট তিনেক বাদে একটা পাল্লা ভাঙতেই মনে হলো বাইরের জন্তুগুলো প্রচন্ড রেগে হল্লা জুড়ে দিয়েছে। বড় বড় নিঃশ্বাস ফেললো সে। দুটো দরজা ভাঙার পরিশ্রম জখম কাঁধটাকে আরও কাহিল করেছে। সে টর্চ জ্বালতেই অ্যানকে দেখতে পেল। ঘরের ডানদিকের কোণে জড়সড় হয়ে মেয়েটা বসে আছে। দুহাতে মুখ ঢাকা, সমস্ত শরীর থরথর করে কাঁপছে। চার্লি হাসলো, 'পারলে? পারলে আমাকে ঠেকাতে: নাউ, কাম অন। মাঝখানের ঘরে একটা তক্তাপোষ আছে।'

অ্যান ধীরে ধীরে মুখ সরালো। তার চোখে টর্চের আলো স্থির হয়ে থাকায় সে ভালো করে তাকাতে পারছিল না। একটু একটু করে উঠে দাঁড়িয়ে সে বললো, 'ও ভগবান।'

'নো, নো বডি উইল সেভ ইউ। তুমি এখন আমার জন্যে।' চার্লি হাসলো।

হাসিটা কানে আসামাত্র অ্যান চিৎকার করে উঠলো, 'না, কক্ষনো না।'

'কক্ষনো না!' ব্যঙ্গ ছুঁড়লো চার্লি, 'কেন, ওই ইন্ডিয়ানটা কি আমার চেয়ে খুব কাজের ছিল? বেশ তো দরজা বন্ধ করে শুয়েছিলে। নাকি ওই হোয়াইটিকে দেখে—, চলে এসো, আর ন্যাকামি ভালো লাগছে না।' চার্লি অ্যানের মুখ থেকে আলো না সরিয়ে দু তিন পা এগিয়ে এলো।

ওপাশের দরজায় শব্দ করে জন্তুগুলো নখ দিয়ে আঁচড়াচ্ছে। অ্যান পাগলের মতো সেদিকে ছুটে যেতেই হোঁচট খেল এবং শরীরের ভার রাখতে না পেরে একটা কিছুর ওপর দিয়ে ওপাশের মেঝেয় টলে পড়লো। অ্যান পালিয়ে যাচ্ছে ভেবে চার্লি ত্রস্তে আলোটা দরজার গায়ে ফেলতেই মৃতদেহটাকে দেখতে পেল। অ্যান ওর গায়েই হোঁচট খেয়ে ওপাশে পড়েছে।

মৃতদেহ! সঙ্গে সঙ্গে সিঁটিয়ে গেল চার্লি। ওর হাত কাঁপতে লাগলো।

আলোটাকে মৃতদেহের মুখের ওপর ফেলতেই নেকড়েদের আধখাওয়া মুখ বীভৎসভাবে যেন তার দিকে তাকালো। আর তখনই চার্লি একটা ভৌতিক আর্ত-নাদ করে দরজার কাছে ছিটকে সরে গেল। 'ডেড বডি, এখানে একটা ডেড বডি!' চিৎকার করে উঠলো চার্লি। তার হাতের আলো তখন মৃতের ওপর কাঁপছে। চার্লির ভয় পাওয়াটা বুঝতে পারলো অ্যান। সে অবাক হয়ে মুখ তুলতেই দেখতে পেল কিছু একটা তার সামনে পড়ে আছে। ওটা ডেড বডি? ওটা দেখেই চার্লি ভয় পেয়েছে? সে অবাক হয়ে মৃতদেহের দিকে তাকালো। বীভৎস দৃশ্যটা দেখে ওর চোখ বন্ধ হয়ে গেল। এবং তখনই ঘরটা অন্ধকার হয়ে গেল এবং পালিয়ে যাওয়া চার্লির শব্দ কানে এলো। পেছনের দরজায় তখনও নেকড়েগুলো আঁচড়ে

যাচ্ছে। অ্যানের মনে হলো ওর হৃদপিন্ড বন্ধ হয়ে যাবে। সে আতঙ্কে উঠে দাঁড়ালো। এবং তক্ষুনি আর একটা কথা তার খেয়ালে এলো। এই মৃতদেহের জন্যে চার্লি ভয় পেয়ে পালিয়েছে। তার মানে, এই মৃতদেহ তাকে চার্লির হাত থেকে বাঁচিয়েছে। অতখানি আতঙ্কের মধ্যেও তার বুক থেকে একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস বেরিয়ে এলো। তার মনে হলো, যাই হোক না কেন এই ঘরে থাকা তার পক্ষে নিরাপদ। একটা মৃতদেহ কয়েকটা জীবন্ত মানুষের লোভ থেকে নিশ্চয়ই বাঁচিয়ে রাখবে তাকে। কিন্তু তারপরেই চোখের সামনে সেই বীভৎস মুখটা ভেসে উঠতেই গলা থেকে গোঙানি ছিটকে এলো। নখের আওয়াজ তার সমস্ত নার্ভকে ফালাফালা করে দিচ্ছিল।

অ্যান আর পারলো না। এক দৌড়ে সে মাঝের ঘরে চলে এল। দরজাগুলো চার্লি ভেঙেছে। ঠান্ডা জড়িয়ে ধরছে অক্টোপাসের মতো। হাতড়ে হাতড়ে অ্যান তক্তাপোষটা খুঁজে পেল।

শোওয়ার ঘরে চার্লিকে কেউ যেন তাড়িয়ে নিয়ে এলো। ঘরে ঢুকেই সে চিৎকার করে উঠলো, 'ডেডবডি! ওই ঘরে একটা ডেডবডি রয়েছে, কি ভয়ঙ্কর সেটা। তোমরা জানো?'

পার্থ এবং মাইক তখন দুটো চেয়ারে পাশাপাশি বসে, পিছনে ফায়ারপ্লেসের আগুন কমে এসেছে। ওরা দেখলো চার্লির চেহারাটা নিমেষেই পাল্টে গেছে। শরীর কাঁপছে, চোখ বিস্ফারিত, বারংবার পেছন ফিরে তাকাচ্ছে সে। চার্লি ওদের সামনে চলে এল, 'তোমরা শুনতে পাচ্ছ? ওই ঘরে একটা ডেডবডি পড়ে রয়েছে। তার মুখের মাংস কেউ খেয়ে নিয়েছে!'

মাইক ধীরে ধীরে মাথা নাড়লো, 'জানি।'

'জানো? তোমরা জানো? ও গড! তোমরা জেনেও আমাকে বল নি!'

'মৃতদেহ দেখে তুমি ভয় পেয়েছ?' পার্থ এখনও তার মুখের যন্ত্রণাটাকে ভুলতে পারছিল না।

'হ্যাঁ পাই। ওইরকম বীভৎস মুখ দেখলে যে কেউ ভয় পাবে।' চার্লি ভাঙা খাটের একপাশে কোনোরকমে স্থির হয়ে বসবার চেষ্টা করলো। সে তখনও কাঁপছে।

মাইক জিজ্ঞাসা করলো, 'অ্যান কোথায়?'

'অ্যান! তোমাকে একটা খবর দিচ্ছি, মেয়েটা হয় ডাইনী নয় প্রেতিনী। খুব ভয়ঙ্কর মেয়ে!'

চার্লি চোখ বন্ধ করে যেন কোনো দৃশ্য কল্পনা করেই শিউরে উঠলো।

মাইক চিৎকার করে উঠলো, 'কি যা-তা বলছো?'

'ঠিক বলছি ঠিক। নাহলে একটা অন্ধকার ঘরে ওইরকম মাংস ওঠা মৃতদেহের আড়ালে কেউ বসে থাকতে পারে? লাখ টাকা দিলেও আমি পারতাম না।' চার্লি ফিসফিস করে বললো।

পার্থ উঠলো। মাইককে এই মুহূর্তে অত্যন্ত ভীতু এবং সরল মনে হচ্ছে। এই লোকটাই যে কিছুক্ষণ আগে অত ভয়ানক চেহারার হয়ে উঠেছিল তা কে

বলবে। মাইক জিজ্ঞাসা করলো, 'কোথায় যাচ্ছ ?'

'ওকে নিয়ে আসি, ওই ঘরে অ্যানের একা থাকা ঠিক নয় !'

'ওকে তুমি কোথায় নিয়ে আসবে ?'

পার্থ মাইকের মুখ দেখে বুঝতে পারলো সে কি বলতে চাইছে। চটপট সিদ্ধান্ত নিলো সে, 'মাঝখানের ঘরে। ওখানে একথা তক্তাপোষ আছে।'

'না।' মাইক মাথা নাড়লো, 'তুমি সেটা করতে পারো না।'

'কেন ?' পার্থ ওর মুখের যন্ত্রণা ভুলে গেল।

'একমাত্র সাদা চামড়ার মানুষ হিসেবে আমারই সেই অধিকার আছে।'

'ভুলে যেও না, আমি তোমাদের আশ্রয় দিয়েছি।'

মাইক কাঁধ নাচালো, 'তাহলে তো চার্লির গায়ের জোরের কাছে আমরা হার মেনেছিলুম। তাছাড়া তোমরা দুজনেই ওকে আলাদাভাবে চেয়েছ কিন্তু পাওনি। আমি সুযোগটা পেতে চাই।'

মাইক উঠলো। তারপর পার্থ পাশ কাটিয়ে দরজার দিকে পা বাড়ালো। ওর যে হাঁটতে খুব সুবিধে হচ্ছে না তা বোঝা যাচ্ছিল। অন্ধকার প্যাসেজে দাঁড়িয়ে মাইক চিৎকার করলো, 'অ্যান।'

কোনো সাড়া এল না। শব্দটা বন্ধ দেওয়ালে ধাক্কা খেতে লাগলো। মাইক আবার ডাকলো, 'অ্যান ! আমি মাইক বলছি, চলে এসো।'

এবার অ্যানের গলা শোনা গেল, 'কেন ?'

'তোমার আর কোনো ভয় নেই। আমি কথা দিচ্ছি।'

'আমি এখানে বেশ আছি।'

'তুমি একটা ডেডবডির সঙ্গে থাকতে পারো না।'

'ওখানে গিয়ে কি হবে ? তোমরা আমাকে দয়া করে একা-থাকতে দাও, প্লিজ।'

মাইক অসহিষ্ণু হলো, 'ওঃ নো। তুমি মিথ্যে ভয় পাচ্ছ। এরা আর তোমাকে ভয় দেখাবে না।'

অ্যানের গলা শোনা গেল, 'ওখানে গিয়ে আমি কি করবো ?'

'কি করবে ? অ্যান, তুমি বুঝতে পারছ না কেন ? যা হবার তা হয়েছে। এসো, এখন আমরা রাতটাকে এনজয় করি। তুমি আর আমি। অ্যান, চলে এসো।' মাইকের গলায় আকুলতা।

কিন্তু অ্যান এ-কথার জবাব দিলো না। বেশ কয়েকবার ডাকাডাকি করে ব্যর্থ হলো মাইক। শেষ পর্যন্ত ক্লান্ত পায়ে ফিরে এলো সে ঘরে। পার্থ তার মুখের দিকে তাকিয়ে বললো, 'কি হলো ? ওঘরে গিয়ে ওকে টেনে নিয়ে এলে না কেন ?'

চেয়ারে বসতে বসতে মাইক নিজের কোমরে হাত রাখলো, 'এখানে ব্যথা হচ্ছে। ওর সঙ্গে বোধহয় শক্তিতে পেরে উঠবো না এখন। চার্লি আমার বারোটা বাজিয়েছে।'

'তাহলে তোমার সুযোগ চলে গেল।' পার্থ যেন কিছুটা স্বস্তি পেল।

মাইক কথাটা শুনে পার্থর দিকে তাকালো, 'তুমি পারবে ?'

পার্থ নিজের মুখে হাত দিল। তার চোয়াল এখনও চিনচিনে ব্যথা। ঠোঁটের ভেতরে কেটে গিয়েছিল তখন, রক্ত পড়েছিল, এখনও নোনতা স্বাদ লেগে রয়েছে। সে মাথা নাড়লো, 'না, জোরজবরদস্তি করে কোনো কাজ হবে না। আমি এবং তুমি একটু আহত হয়েছি, চার্লি যাক না, ওর গায়ে তো খুব জোর।'

চার্লি দ্রুত মাথা নাড়লো, 'নো, নেভার। আমি একটা ডেডবডির কাছে ফিরে যেতে চাই না।'

পার্থ বললো, 'তাহলে আমরা কেউ আজ রাত্রে আর অ্যানকে চাইছি না ?'

চার্লির মুখের চেহারা আবার পাল্টে গেল। সে মাইকের দিকে তাকাতেই দেখতে পেল মাইক সম্মতির ঘাড় নাড়ছে। অতএব চার্লি বললো, 'চাই, নিশ্চয়ই চাই। তুমি চাও না ?'

পার্থ বললো, 'চাই। কিন্তু কি ভাবে পাবো তাই জানি না।'

কয়েক সেকেন্ড কেউ কোনো কথা বললো না। নিভে আসা কাঠ-কয়লা থেকে ফুটফাট শব্দ হচ্ছিল। মাইক উঠলো। হাত বাড়িয়ে কয়েকটা শুকনো কাঠ তুলে নিয়ে সে ফায়ারপ্লেসের ভেতর গুঁজে দিল। চার্লি কিছুক্ষণ সেই ধোঁয়াটে আগুনের দিকে তাকিয়ে বলে উঠলো, 'মেয়েটা নিশ্চয়ই ঠাণ্ডায় জমছে।'

পার্থ উদাস গলায় বললো, 'ওখানে তো ফায়ারপ্লেস নেই।'

মাইক খাটের দিকে তাকিয়ে বললো, 'ওর সঙ্গে তো একটার বেশী কম্বলও নেই।'

পার্থ বললো, 'এভাবে ওঘরে থাকা যায় না।'

চার্লি বললো, 'আর কিছুক্ষণ থাকলে অ্যান নিজেই মৃতদেহ হয়ে যাবে, ওঃ ভগবান।'

মাইক বললো, 'অ্যান ডেডবডি হয়ে গেলে আমাদের আর কি লাভ হবে ? তাই না ?'

চার্লি মাথা নাড়লো, 'নিশ্চয়ই। ওরকম একটা দারুণ চেহারার মেয়ে ডেড-বডি হবে ভাবা যায় না।'

পার্থ বললো, 'ঠিক ঠিক। আমাদের যা করার খুব দ্রুত করতে হবে। কি করা যায় ?'

কয়েক সেকেন্ড আবার তিনজনেই চুপচাপ। ফায়ারপ্লেসের গুঁজে দেওয়া কাঠে নতুন আগুন ধরে যাওয়ায় সেটা দাউ দাউ করে জ্বলছে। ঘরটা হয়ে গেছে আলোকিত। মাইকের মুখটা আরও লাল দেখাচ্ছে। পার্থ সেদিকে তাকিয়ে বললো, 'আমাদের এক হতে হবে।'

'মানে ?' মাইক তাকালো ওর দিকে।

'আলাদা আলাদা ভাবে আমরা অ্যানকে চাইছি। কেউ কাউকে ছেড়ে দিতে রাজী হই নি, তাই না ? আমার অধিকার আছে, তোমার চামড়ার রঙ আছে আর চার্লির গায়ে শক্তি রয়েছে। আলাদা করে অ্যানকে দখল করতে চেষ্টা করে আমরা সফল হই নি। এখন তিনজনে যদি এক হই তাহলে বোধহয় ওকে পেতে অসুবিধে

হবে না।' পার্থ খুব ভেবে-চিন্তে কথাগুলো বললো।

সঙ্গে সঙ্গে চার্লি তার বিশাল হাত পার্থর দিকে বাড়িয়ে দিল, 'কি ভাবে পাবো সেটা নিয়ে আমি মোটেই ভাবি না। ওই সাদা চামড়ার মেয়েটাকে আধঘণ্টার জন্যে পেলেই আমি খুশী। আমি এক হতে রাজী আছি।'

পার্থ মাইকের দিকে তাকালো। মাইক একদৃষ্টিতে চার্লিকে দেখছে। ওর দুই ঠোঁট টান টান। পার্থ তার নাম ধরে ডাকতে সে মুখ ফেরালো, 'হোয়াই শুড আই ?'

'তুমি কি অ্যানকে চাও না ?'

'চাই। কিন্তু কারো সংগে শেয়ার করে নয়।' কারো শব্দটা যেন ইচ্ছে করেই বেঁকিয়ে বললো সে।

'তাহলে তুমি আজ কিছুতেই পাবে না ওকে। ব্যাপারটা বোঝার চেষ্টা করো।' পার্থ বললো।

'কিছু বোঝার নেই। তিনটে ডিফারেন্ট টাইপের পুরুষ একসংগে একটা মেয়েকে ভোগ করবে, এসব তোমাদের দেশে চলতে পারে কিন্তু আমার রুচিতে বাধে।' পরিষ্কার জানিয়ে দিলো মাইক। তারপর পা ছড়িয়ে দিলো সামনে।

'একসংগে ? একসংগে কে বললো তোমাকে ?' পার্থ অবাক গলায় বললো।

'একসংগে নয় ? তাহলে এক হতে বলার মানে কি ?'

'কি আশ্চর্য! তোমার দেখছি মাথায় কিছুই নেই।'

'মাথায় কিছুই নেই ? হুঁ। আমাদের মাথায় যদি কিছু না থাকতো তাহলে দু'শ বছর তোমরা আমাদের অধীনে থাকতে না। তাই না ?' কাঁধ নাচালো মাইক।

চার্লি থুক করে থুতু ফেললো, 'এসব কথা বলার সময় এখন নয়। তবু প্রসংগ উঠলো বলেই বলছি, ওরা যেই বুঝেছিল তোমরা শক্তিহীন অমনি এদেশ থেকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিল তোমাদের।'

'ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিল ?' হো হো করে হেসে উঠলো মাইক, 'আমরা দয়া করে চলে না গেলে ওরা কি করতে পারত। এখন, এদের সো-কলড স্বাধীনতার পঁয়ত্রিশ বছর পরে এদেশে এসে আমি কি দেখলাম ? সাধারণ লোক আমাকে দেখে সেলাম করে। আমার জন্যে তারা রাস্তা ছেড়ে দেয়। টিকিট চেকার অন্যদের নাজেহাল করে কিন্তু আমার টিকিট দেখতে চায় না। লোকে আমার দিকে তাকিয়ে সসম্ভ্রমে বলে সাহেব। আর তুমি বলছো আমার মাথায় কিছুই নেই। আমি ভেবেছিলাম তোমরা যৌথ বৌনখেলা খেলতে চাইছ।'

পার্থ মাথা নাড়লো, 'না। মোটেই না। আমি বলতে চাইছি আমরা তিনজনে যদি খেয়োখেয়ি না করি তাহলে ওই মেয়েটাকে ভোগ করতে কোনো অসুবিধে হবে না।'

মাইক একটু ভাবলো, 'অন্যসময় হলে আমি কি বলতাম জানি না তবে এই মুহূর্তে আমি ওকে চাইছি। যথেষ্ট অপমানিত হয়েছি। সুতরাং তোমাদের সংগে হাত মেলাচ্ছি।'

চার্লি'র মুখে হাসি ফুটলো, 'দ্যাটস লাইক এ গুড বয়।'

পার্থ বললো, 'তাহলে এই ঠিক হলো, আমরা যা করবো তিনজনে এক হয়ে সিদ্ধান্ত নিয়েই করবো।'

বাকী দুজন মাথা নাড়লো, 'ডান।'

পার্থ এবার উঠে দাঁড়ালো, 'তাহলে চলো যাওয়া যাক।'

চার্লি'র মুখের হাসি মিলিয়ে গেল, 'কোথায় ? ওই ঘরে ? নো, নেভার। আমি যেতে পারব না।'

'কিন্তু অ্যানকে ওখান থেকে নিয়ে আসতেই হবে। ঠান্ডায় ও জমে গেলে আমাদের কোনো লাভ হবে না। আফটারঅল, একটা ডেডবডির সঙ্গে ওসব করা যায় না।'

'কিন্তু ও একটা ডেডবডির সঙ্গে রয়েছে, ওঃ, কি ভয়ংকর।' চার্লি বিড়বিড় করলো।

'ও ঠিকই বলেছে চার্লি, অ্যানকে এই ঘরে ফিরিয়ে আনা দরকার।' মাইক উঠলো।

'ঠিক আছে, ওকে ফিরিয়ে আনতে তিনজনের যাওয়ার কোনো মানে হয় না। তোমরা যাও, আমি ততক্ষণে কিছু একটা করি, এই ধরো, খাটটাকে ঠিক করে রাখি।' চার্লি বললো।

'না।' পার্থ আপত্তি জানাল, 'আমাদের তিনজনকেই একসঙ্গে যেতে হবে। যা করবো তা তিনজনে শেয়ার করে করবো। তাছাড়া আমরা দুজনে ওর সঙ্গে পেরে নাও উঠতে পারি।'

চার্লি হা হয়ে গেল, 'তোমরা দুটো পুরুষ একটা মেয়ের সঙ্গে পারবে না ?'

'পারতাম যদি তুমি আমাদের আহত না করতে। অতএব এ ব্যাপারে তোমার দায়িত্ব অনেক বেশী। গায়ের জোরের প্রয়োজন হলে তোমাকে দরকার হবে। লেটস গো।' মাইক পা বাড়াল।

চার্লি মনে মনে বোধহয় গালাগাল দিচ্ছিল। তারপর হঠাৎ ফায়ারপ্লেসের আগুনের দিকে হাঁটু মুড়ে বসে বিড়বিড় করে কয়েকটা শব্দ উচ্চারণ করলো। শব্দগুলো উচ্চারণ করার সময় ওর বিশাল মাথা বারংবার ঝুঁকে পড়ছিল। মাইক এবং পার্থ অসহিষ্ণু চোখে এই দৃশ্য দেখছিল। চার্লি'র যেন মন্ত্র পড়া আর শেষ হচ্ছিল না। পার্থ বিরক্ত-গলায় ডাকলো, 'চার্লি'!' ইশারায় তাকে অপেক্ষা করতে বলে জামার ভেতরে হাত ঢুকিয়ে একটা লোহার লকেট বের করে তাতে কয়েকবার চুমু খেয়ে নিল চার্লি। তারপর সেটাকে সযত্নে আবার বুকের ভেতরে চালান করে ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ালো। পার্থ দেখলো এখন আর চার্লি'র মুখে সেই অসহায় ভাবটা নেই। চোখাচোখি হতে হেসে বললো, 'চল।'

তিনটে কম্বল এবার তিনজনে জড়িয়ে নিল। তারপর একে একে প্যাসেজে চলে এল। চার্লি বললো. 'এই ঘরের ওপাশে আর একটা ঘর আছে। সেখানেই ডেডবডি আর অ্যান, পাশাপাশি।' পার্থ টর্চ জ্বাললো। দরজার পাল্লা ভেঙে হেলে রয়েছে। খুব সন্তর্পণে পা ফেলা দরকার। আলো নিভিয়ে ফেললো সে।

মাইক বললো, 'ও যেন টের না পায় আমরা যাচ্ছি। বুঝলে ?'

পার্থ বললো, 'টের পেলেই বা কি এসে যায়। এই বাংলো থেকে তো আর পালাতে পারবে না।'

মাইক বললো, 'কিছুই বলা যায় না। ওপাশের দরজা দিয়ে যে কেউ নেমে যেতে পারবে।'

'তুমি পাগল হয়েছ ? বাইরে এখন মাইনাস তিন-চার ডিগ্রী হবে। ওখানে পা দিলেই মৃত্যু। তাছাড়া, ওই শয়তান নেকড়েগুলোর নখের শব্দ শুনতে পাচ্ছ না ? অ্যান ওই দরজা দিয়ে গেলে ওরা ছেড়ে দেবে ?'

'তবু আমাদের চুপচাপ যাওয়া উচিত। চার্লি তুমি মাঝখানে এস। ওকে গায়ের জোরে আনতে হবে।' শব্দ না করে ওরা মাঝখানের ঘরটা পেরিয়ে এল। এঘরের পাল্লাও ভেঙেছে চার্লি। পার্থ তা দেখে নিচুস্বরে বললো, 'গায়ের জোরে যে কাজ হয় না তার প্রমাণ তো দেখতে পাচ্ছ।'

'কাজ হতো, কাজ হতো! শুধু ওই বীভৎস ডেডবডিটা যদি না থাকতো!'

চার্লি ফিসফিস করলো। দরজায় দাঁড়িয়ে টর্চের আলো ফেললো পার্থ। চার-পাশে একবার বুলিয়ে নিয়ে মৃতদেহের ওপর আলোটাকে স্থির রাখলো। চার্লি সঙ্গে সঙ্গে একটা শব্দ করে চোখ বন্ধ করেছে। ওরা দু'জন অবাক হয়ে দেখলো মৃতদেহটি একা, অ্যানের কোনো চিহ্ন নেই। মাইক ফ্যাসফেসে গলায় বললো, 'ও পালিয়েছে!'

পার্থ মরীয়া হয়ে ঘরের মধ্যে ঢুকলো। চৌকিদারের মুখের হাড় দেখা যাচ্ছে। সে ঘরটাকে দেখে নিয়ে বললো, 'না, পালাতে পারে না। অ্যান নিশ্চয়ই এই বাংলোয় আছে।'

মাইক হাত নাড়লো, 'কিন্তু আমরা তো ভেতর থেকেই এলাম, থাকলে দেখতে পেতাম না ?'

চার্লি চোখ বন্ধ করেই বললো, 'শী ইজ উইচ। ওই মৃতদেহটা ওকে হেল্প করছে নিশ্চয়ই। চল, এঘর থেকে বেরিয়ে যাই। আমাদের এখন আগুনের পাশে থাকা উচিত, বি কুইক্।'

পার্থ চিৎকার করে উঠলো, 'তোমরা ভীতু, ভীষণ ভীতু। মেয়েটা কক্ষনো পালাতে পারে না।' ওর চিৎকার শুনে নখের শব্দগুলো আচমকা থেমে গেল। পার্থ দৌড়ে মাঝখানের ঘরে চলে আসতেই বাকী দু'জন তাকে অনুসরণ করলো। খাটের ওপর সেই জীর্ণ গদিটা নেই। টর্চের আলো ফেলে সেটাকে খাটের নিচে আবিষ্কার করলো পার্থ। সে আর মাইক যখন প্রথম এই ঘরে ঢুকেছিল তখন গদিটা খাটের ওপরে ছিল। নিশ্চয়ই অ্যান এটাকে নিচে নামিয়েছে। তার অর্থ হলো ওরা যখন এই ঘর দিয়ে নিঃশব্দে পাশের ঘরের দরজায় গিয়েছিল তখন অ্যান ওই তক্তাপোষের নিচে গদি পেতে লুকিয়েছিল। ওরা ওপাশের ঘরে ঢুকে যেতেই সে লুকোন জায়গা ছেড়ে পালিয়েছে। সঙ্গীদের এতো বিশদ না বুঝিয়ে পার্থ ঝটপট প্যাসেজে চলে এল। মুখে বললো, 'ও নিশ্চয়ই এখানে আছে।' তার টর্চের আলো প্যাসেজের শেষপ্রান্তে পেঁছে গেল। তিনটে লোক বিজয়দর্পে

সেখানে গিয়ে উপস্থিত হলো। পার্থ ডাকলো, 'অ্যান, আমরা এসেছি।' ভেতর থেকে কেউ সাড়া দিল না। পার্থ চার্লিকে বললো, 'স্টোরটা ভালো করে খুঁজে দ্যাখো। এখানে অনেক হাবিজাবি জিনিস রয়েছে। মেয়েটাকে এখানেই খুঁজে পাবে।' চার্লি কথাটা শুনে মাইকের দিকে তাকাল। স্পষ্টতই তার ভেতরে ঢোকার একটুও ইচ্ছে নেই। তাকে ইতস্তত করতে দেখে পার্থ বললো, 'কি হলো? তুমি কি অ্যানের ওপর তোমার দাবি ছেড়ে দিচ্ছ?'

তৎক্ষণাৎ কাজ হলো। স্টোর-রুমের ভেতরে ঢুকে গেল চার্লি পার্থর হাত থেকে টর্চটা ছিনিয়ে নিয়ে। কয়েক মুহূর্ত মাত্র। জিনিসপত্র সরানোর শব্দ হলো। তারপর বিরক্ত হয়ে বেরিয়ে এল সে। বিড়বিড় করে বললো, 'মেয়েটা নির্ঘাৎ ডাইনী' নইলে ডেডবডি ওকে হাওয়া করে দেয়!'

পার্থ জিজ্ঞাসা করলো, 'কি হলো? কি বলছো অমন করে!'

সেইসময় বাইরে নেকড়েগুলো একসঙ্গে ডেকে উঠলো। পার্থর মনে হলো ওর সমস্ত শরীরে কাঁটা ফুটেছে। মাইক চাপা গলায় বললো, 'নেকড়েগুলো বোধহয় ওকে পেয়ে গেছে। অতসুন্দর মেয়েটাকে নেকড়েগুলো ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাবে। ওঃ!'

মাইকের কথায় চার্লি মাথা নাড়লো, 'নো। হতেই পারে না। নেকড়েগুলো আমাদের পেছনে লেলিয়ে দেবে। নিশ্চয়ই প্রতিহিংসা নিতে চাইবে। নেকড়েরা ডাইনীদের অনুচর হয়, আমি শুনেছি, বিলিভ মি।'

পার্থ কি করবে বুঝতে পারছিল না। সত্যি সত্যি নেকড়েগুলো এতক্ষণে ওপাশের দরজা ছেড়ে ঘুরে এদিকে চলে এসেছে। যেন কানের কাছেই ওরা চিৎকার শুরু করেছে। না, ভূতপ্রেতে সে বিশ্বাস করে না। মৃতদেহের স্বাদ পাওয়ায় এরকম খেপে উঠেছে জন্তুগুলো। অ্যানের সঙ্গে সে সমস্ত বিকেল পাশাপাশি কাটিয়েছে। এক বিছানায় গা লাগিয়ে থেকেছে। ও যদি ডাইনী হতো তাহলে— না, চার্লির বোকামিকে প্রশ্রয় দেবার কোনো মানে হয় না। সে টয়লেটে আলো ফেললো। কেউ নেই ওখানে। তাহলে মেয়েটা গেল কোথায়? আর এই প্রথম পার্থর শরীর সিরসির করে উঠলো। মাইকের গলা শোনা গেল, 'আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। চার্লির কথা যদি ঠিক হয় তাহলে আমাদের আগুনের পাশে ফিরে যাওয়া উচিত। অন্তত শরীর গরম হবে।'

নেকড়েগুলো বোধহয় এবার এপাশের দরজা আঁচড়াচ্ছে। শব্দ শুনে মনে হচ্ছে ওদের সংখ্যা এখন আরও বেড়ে গিয়েছে। তিনজনে ক্লান্ত পায়ে প্যাসেজটা অতিক্রম করে শোওয়ার ঘরের দরজায় এসে পাথর হয়ে গেল। ফায়ারপ্লেসের দিকে পিঠ দিয়ে অ্যান তাদের দিকে তাকিয়ে আছে।

মাইক এবং পার্থ একসঙ্গে বলে উঠলো, 'আরে, তুমি!'

চার্লির হাত কাঁপতে লাগলো। সে কোনোমতে পার্থকে আঁকড়ে ধরলো, 'যেও না, যেও না।'

পার্থ ঝাঁকুনি দিয়ে ওর হাত ছাড়িয়ে নিল। ওরা যখন চৌকিদারের ঘরে ছিল তখনই অ্যান সোজা এখানে চলে এসেছে। অ্যান যে তাদের দেখে একটুও খুশী

হয়নি তা ওর মুখের অভিব্যক্তিতেই বোঝা যাচ্ছে। মাইক সন্দেহের গলায় জিজ্ঞাসা করলো, 'কোথায় ছিলে তুমি ?'

অ্যানের ঠোঁট সামান্য ফাঁক হলো কিন্তু সে কোনো শব্দ উচ্চারণ করলো না। ওরা তখনও ঠিক দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছে। চার্লি হঠাৎ ওদের সরিয়ে এক পা এগিয়ে গেল, 'দোহাই অ্যান, যথেষ্ট হয়েছে। তুমি ওই নেকড়েগুলোকে সরিয়ে নাও, আমি প্রমিজ করছি।'

আর তখনই সেই বিকট চিৎকারগুলো বন্ধ হয়ে গেল। যেন সুইচ টিপে কেউ শব্দ থামিয়ে দিল। আর নখের আওয়াজও। তারপর একটু দূরে, আরো দূরে শব্দগুলো উঠে উঠে মিলিয়ে গেল। চার্লি বড় বড় চোখে ওদের দিকে ফিরে তাকালো। ভাবখানা যেন, কি বলেছিলাম এখন বিশ্বাস করছো তো। কিন্তু পার্থ লক্ষ্য করেছিল চার্লি বলামাত্র অ্যানও খুব অবাক হয়েছে। সে-ও কান পেতে শব্দটা শুনতে চেয়েছে যেন। চেয়ারে বসে দু'হাত কোলে নিয়ে এখন স্তব্ধ হয়ে চেয়ে রয়েছে। পার্থ কিছু বলার আগে মাইক এগিয়ে গেল, 'যতসব বুজরুকি। অ্যান ; ওরা তোমাকে ডাইনী ভাবছে। তুমি কি ডাইনী ?

এ্যান এবার মুখ ফেরাল। ফায়ারপ্লেসের আগুনে ওর মুখের একাংশ লালচে দেখাচ্ছে। সামান্য হাসির রেখা ফুটলো কি ফুটলো না, 'ডাইনী, এখন আমি ডাইনী হতে পারলে খুশী হতাম।' গলার স্বর কাঁপছিল ওর। মাইক আরো কয়েক পা এগিয়ে ওর সামনে দাঁড়ালো, 'কিন্তু আমি বিশ্বাস করি না ওকথা, আমি জানি তুমি রক্তমাংসের মানুষ।'

'তুমি আমাকে চাও ?' ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল অ্যান। ওর শরীরে তখনও কাঁপুনি।

'হ্যাঁ, চাই।' দু'হাতে অ্যানের কাঁধ আঁকড়ে ধরলো মাইক, 'প্রথম দেখার পর থেকেই আমি তোমাকে চাইছি।'

'কি ভাবে চাও ? ওই দুটো লোক ড্যাবডেবিয়ে তাকিয়ে থাকবে আর তুমি আমাকে ভোগ করবে ?' অ্যানের চোখ মাইকের মুখের ওপর স্থির, গলার স্বরে কি অভিমান ?

মাইক মাথা নাড়লো। না, তা হতে পারে না। সে মুখ ফেরালো। এক হাতে অ্যানকে বুকের ওপর টেনে নিয়ে এসে বললো, 'কি দেখছ তোমরা ? এখন আমাদের একা থাকতে দাও।'

পার্থ বললো, 'মাইক। তা হয় না। আমাদের মধ্যে যে কথা হয়েছে তা তুমি ভুলে যাচ্ছ।'

মাইক চিৎকার করলো, 'আমি কোনো কথা শুনতে চাই না, তোমরা যাও, প্লিজ।'

কথাটা শেষ হওয়ামাত্র চার্লি চাপা গলায় বলে উঠলো, 'শুনলে, শুনলে ওর কথা। মেয়েটা নিশ্চয়ই ওকে বশ করেছে। এতে কোনো ভুল নেই। যেই ওর শরীরে হাত দিতে যাবে অমনি ও পাখি হয়ে যাবে।'

প্রচণ্ড বিরক্তিতে পার্থ চার্লির হাতে আঘাত করলো, 'তুমি কি অন্ধ। তুমি

কি দেখতে পাচ্ছ না ও একটা সাধারণ মেয়ে। মাইক তোমার কুসংস্কারের সুযোগ নিচ্ছে।' আঘাত খেয়ে চার্লি'র মুখে ক্রোধ জমেছিল। সে এবার অ্যানের দিকে তাকালো, 'তুমি বলছো ও ডাইনী নয় ?'

'না। মাইক, তুমি ওখান থেকে চলে এসো।' পার্থ আদেশের ভঙ্গীতে বললো।

'তুমি হুকুম করার কে ? অ্যান, তুমি আমাকে পছন্দ কর তো ?' খুব আদরের ভঙ্গীতে অ্যানের মাথায় গাল ছোঁয়াল মাইক। তাই দেখে পার্থ দ্রুত কয়েক পা এগিয়ে গেল, 'মাইক !'

'ও অ্যান, তুমি কি সুন্দর। কি নরম তোমার দেহ।' পাগলের মতো অ্যানের শরীরে হাত বোলাচ্ছিল মাইক। হাত বাড়িয়ে ওর কাঁধ ধরে টানলো পার্থ, 'মাইক। তুমি চুক্তি ভাঙতে পারো না।'

এক হাতে পার্থকে ঝটকা মারলো মাইক, 'কোনো চুক্তি আমি মানি না। গেট আউট আই সে।'

পার্থর হাত উঠলো। সজোরে মাইকের চোয়ালে গিয়ে আঘাত করলো সেটা। পড়ে যেতে যেতে মাইক অ্যানকে ধরে কোনোরকমে সামলাতে চাইলো। দু'হাতে সেইমুহূর্তে অ্যানকে কাছে টেনে নিলো পার্থ। মার খেয়ে চোখ খুলতেই মাইক দেখলো পার্থ অ্যানকে জড়িয়ে ধরেছে। ক্ষিপ্ত মোষের মতো সে তেড়ে গেল সামনে। আর তখনই চটপট চার্লি মাঝখানে গিয়ে দাঁড়িয়ে মাইককে ঠেকাল।

'নো নো। এনাফ ফাইটিং। তার আগে আমি দেখতে চাই মেয়েটা সত্যি মেয়ে কিনা। পাতরো, তুমি ভালো করে মেয়েটাকে জড়িয়ে থাকো।' বাধা পেয়ে মাইক চার্লি'র দিকে তাকালো। চার্লি তখন অতি সন্তর্পণে অ্যানের দিকে এগোচ্ছে।

একটা আঙুল তুলে চার্লি প্রথম অ্যানের গালে ছোঁয়ালো। বিরক্তিতে অ্যান মুখ ফেরাতে চার্লি মাথা নাড়লো, 'মেয়েমানুষ বলেই মনে হচ্ছে। পাতরো, তুমি আরও শক্ত করে ধরো, ওর বুক ছুঁয়ে দেখতে হবে। ডাইনীদের বুক থাকে না।'

তৎক্ষণাৎ অ্যান চিৎকার করে উঠলো, 'নো, নো, পাতরো, আমাকে বাঁচাও।'

পার্থ চোখ বড় করলো, 'চার্লি। ডোন্ট ডু দিস। শী ইজ পারফেক্টলি অলরাইট।'

'অলরাইট ?' বিশ্বাস করতে যেন বাধ্য হচ্ছিল চার্লি।

'হ্যাঁ। ও একটা পুরোদস্তুর মেয়ে।' অ্যানকে জড়িয়ে ধরতে পার্থর খুব আরাম লাগছিল। কিন্তু চার্লি বোধহয় ওই কথায় সন্তুষ্ট হলো না। অ্যানের বুকের দিকে হাত বাড়িয়ে দিল সে। ছটপট করতে লাগলো অ্যান। এবং সেইসঙ্গে ঝুঁকে পড়ে দাঁত বসিয়ে দিল চার্লি'র হাতে।

'মেরে ফেললো, মেরে ফেললো।' প্রচন্ড আর্তনাদ করে হাত সরিয়ে লাফাতে লাগলো চার্লি। আর সেইসময় বোধহয় কিছুটা ভয়ে কিছুটা ঘাবড়ে গিয়ে পার্থ অ্যানকে ছেড়ে দিতেই সে ডিমঘরের দরজায় বসে হাউহাউ করে কাঁদতে লাগলো। চার্লি'র হাতের চামড়ায় বিন্দু বিন্দু করে রক্ত ফুটে উঠলো। রক্ত দেখতে দেখতে হঠাৎ চার্লি'র মুখে হাসি ফুটলো, 'লুক। হেয়ার ইজ মাই ব্লাড। ডিপ অ্যান্ড রেড।' তারপর হঠাৎ মাইকের দিকে তাকিয়ে সে বলে উঠলো, 'তোমার রক্ত কি

রকম ? এই রকম ঘন আর লাল ?'

মাইক বোধহয় কোনো মতলব ভাঁজছিল, প্রশ্নটা শুনে মুখ বেঁকালো, 'মানুষের রক্ত একই রকম।'

'মানুষ!' চার্লি চেঁচিয়ে উঠলো, 'লুক মিস। ওই সাদা চামড়াটা শেষপর্যন্ত স্বীকার করলো আমি মানুষ। সুতরাং তোমার আর আপত্তি থাকার কথা নয়।' এক হাতে সে খামচে ধরলো অ্যানকে। পার্থ সঙ্গে সঙ্গে হ্যাণ্ডেলটা তুলে ধরলো, 'নো, এভাবে তুমি ওকে পেতে পারো না।' চার্লি ঘাড় ঘুরিয়ে হ্যাণ্ডেলটাকে দেখলো। তারপর ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়িয়ে বললো, 'তাড়াতাড়ি বলো কিভাবে পেতে পারি।'

অ্যানের শরীরটা ধীরে ধীরে ডিমঘরে পা রাখলো। ওরা তিনজন হুমড়ি খেয়ে ওর পেছনে এসে দাঁড়ালো। হঠাৎ অ্যান ঘুরে দাঁড়ালো, 'কি চাও তোমরা ?'

'তোমাকে।' তিনটে মুখ একসঙ্গে শব্দটা উচ্চারণ করলো।

'তিনজনে ? একসঙ্গে ?' কাঁপছিল অ্যান।

ওরা তিনজন পরস্পরের দিকে তাকাল। পার্থ মাথা নাড়লো, 'নো, আমিই প্রথম।'

সঙ্গে সঙ্গে চার্লি বাধা দিল, 'না, আমিই প্রথম।'

মাইক চিৎকার করলো, হতেই পারে না, আমিই প্রথম।'

পার্থ দাঁত ঘষলো, 'কেন ? তুমি প্রথম হবে কেন ? সাদা চামড়া বলে ?'

চার্লি হাসলো। যেন লালা ঝরছিল তার হাসিতে, 'কিন্তু চামড়ার তলার রক্ত একরকম।'

এইসময় অ্যান কেঁদে উঠলো হাউহাউ করে, 'তোমার যা করার করো, আমি আর পারছি না।' কান্নাটা ঘরের ভেতর পাক খেতে লাগলো।

চার্লি বললো, 'এইসব কান্নাফান্না থামাও মিস।'

অ্যান টলতে টলতে দরজার গায়ে গিয়ে সেখানে গাল চেপে ধরলো, 'ওঃ, আমি আর পারছি না।' ডুকরে ডুকরে কাঁদতে লাগলো সে।

চার্লি এগোতে যাচ্ছিল কিন্তু বাকী দুজন তাকে বাধা দিল। পার্থ বললো, 'লেটস ডিসাইড, কে আগে ওকে পাবে ?' সে ধীরে ধীরে কার্পেটের ওপর বসলো। তাকে দেখে অন্য দুজন হাঁটু গেড়ে মুখোমুখি হলো, 'কি ভাবে ?'

পার্থ বললো, 'আমি টস করবো। প্রথমে আমি আর চার্লি যে জিতবে তার সঙ্গে মাইকের ভাগ্য ঠিক হবে।'

সজোরে হাত নাড়ল চার্লি, 'ইম্পসিবল। দুবার লাক ট্রাই করতে আমি রাজী নই। আর মাইক একবারেই ওকে পেয়ে যাবে ? কি বুদ্ধি তোমার ?'

'তাহলে ?' পার্থর মাথায় কিছুই ঢুকছিল না।

এবার মাইক বললো, 'তাহলে ওকেই দায়িত্ব দাও। ও বলুক কাকে প্রথমে চায়।'

চার্লি মাথা নাড়ল, 'না, তা হয় না। পাতরো ওর সঙ্গে বিকেলবেলায় শুয়েছিল। ন্যাচারালি ও পাতরোকে চাইতে পারে। বেটার, একটা কাজ করো। ছটা কাগজের টুকরো নাও। তার তিনটেতে ওয়ান টু থ্রি লেখ। কাগজগুলো

গোল্লা পাকিয়ে এখানে ফেলে দাও। আমরা তিনজনে একটা করে গোল্লা তুলে দেখি কার ভাগ্যে কি পড়লো। বুঝতে পারলে তোমরা ?'

পার্থ হাসলো, 'গুড আইডিয়া।' সে উঠে কাগজ খুঁজতে লাগলো। তারপর বিস্কুটের প্যাকেট থেকে কাগজ ছিঁড়ে আবার সেখানে ফিরে এসে বাবু হয়ে বসলো, 'কলম আছে কারো কাছে।'

মাইক হাত বাড়িয়ে রুকস্যাকটা টেনে এনে কলম বের করে এগিয়ে দিল। চার্লির যেন তর সইছিল না। পার্থ কাগজের ওপর লিখতে চেষ্টা করছিল কিন্তু ভিজে কাগজ বলে অসুবিধে হচ্ছিল। হঠাৎ মাইক বললো, 'যদি আমরা তিনজনে তিনটে সাদা কাগজ তুলি ? যদি নম্বর দেওয়া তিনটে কাগজ পড়ে থাকে ?'

সমস্যাটা মাথায় আসতেই পার্থ মুখ তুলে অ্যানকে দেখলো, 'তাহলে ওকে ছেড়ে দেওয়া ঠিক হবে। আমাদের ভাগ্যে ও নেই।'

'নো।' চার্লি বাধা দিল, 'ছয়টা কাগজ নয়, তিনটেতে লেখ। আমি কোনো চান্স নিতে চাই না। কি বলো মিস ?' শেষ প্রশ্নটা ঠাট্টায় জড়ানো।

কাগজে লেখা হয়ে গেলে গোল্লা পাকাচ্ছিল পার্থ। বাকী দুজন সতর্ক দৃষ্টি রাখছিল গোল্লার মধ্যে কোনো সংকেত রেখে দিচ্ছে কিনা। হঠাৎ মাইক বললো, 'আমার মনে হয় ওকে একবার জিজ্ঞাসা করা উচিত।'

'কি জিজ্ঞাসা করবে ?'

'ওর কিছু চাই কি না ?'

পার্থ হাসলো, 'তুমি কি ওর ফাঁসি দিচ্ছ ?'

মাইক বললো, 'অনেকটা তো সেইরকম। অন্তত চার্লির হাতে পড়লে।'

'ওকে ওকে।' চার্লি ওঁদের থামাল, 'হেই মিস, তুমি কি কিছু চাও ?'

অ্যান কোনো সাড়া দিলো না। চার্লি আবার প্রশ্ন করলো।

এবার অ্যান মুখ তুললো। তারপর ধীরে ধীরে মাথা নাড়লো, 'হ্যাঁ।'

'বলে ফেল কি চাও। এই ঘরে বসে আমরা তোমাকে যা দিতে পারি দেবো। তার বদলে তোমার কাছে সুখ চাই, খুব কড়া ডোজের সুখ।' চার্লি হাসলো।

'ফ্রেস এয়ার।' অ্যান চোখ খুললো, 'একটু টাটকা বাতাস নিতে দাও।'

'টাটকা বাতাস ?' পার্থ অবাক হলো।

'এখানে টাটকা বাতাস কোথায় পাবে ?' চার্লি জিজ্ঞাসা করলো।

'আমাকে একটু দরজাটা খুলতে দাও ; এক মিনিটের জন্যে।' মিনতি করলো অ্যান ওদের দিকে তাকিয়ে।

'মাথা খারাপ। ও পালাতে চায়।' পার্থ চেঁচিয়ে উঠলো।

'কোথায় পালাবে ? চারধারে নিশ্চয়ই এতক্ষণে বরফ জমেছে। ও কোথায় পালাতে পারে ?' চার্লি উত্তর দিলো।

'কিন্তু ঠান্ডা হাওয়া ঢুকবে।' মাইক আপত্তি করলো।

'তা ঢুকুক। আমাদের শরীর এখন যথেষ্ট গরম।' চার্লি উদার হলো, 'এই যে মিস, নট মোর দ্যান এ মিনিট। যত পারো তার মধ্যে টাটকা বাতাস বুক ভরে নিয়ে তৈরী হও।'

ধীরে ধীরে দরজাটার ছিটকিনি এবং হুড়কো খুললো অ্যান। চার্লি ইশারা করতেই পার্থ গোল্লাগুলোকে সামনে গড়িয়ে দিলো। ওরা তিনজনে চিলের মতন সতর্ক চোখে গোল্লাগুলোকে ঠাওর করতে চেষ্টা করছিলো। ওর মধ্যে কোনটাতে এক নম্বর লেখা? ওই তিনটে গোল্লার বাইরে সমস্ত জগৎ ওদের কাছে মুছে গেল এক পলকে।

দরজায় পিঠ দিয়ে অ্যান ওদের দেখলো। তিনটে মানুষ বন্যজন্তুর মতো ঝুঁকে আছে। তিনরকম চামড়ার তিনটে মানুষ। নিজের অধিকার অর্জন করার জন্যে তিনটে শকুন ওৎ পেতেছে। সে নিঃশ্বাস ফেললো। আমি মেয়ে, আমি কেন মেয়ে? এই তিনটে শকুনকে ঠেকাবার সাধ্য তার নেই। যতক্ষণ এদের মুখে মুখোশ ছিল ততক্ষণ সে কিছুতেই হয়তো আপত্তি করতো না। কিন্তু এখন তার ঘেন্না করছে। এদের হাত থেকে সে পালাবে কোথায়। চারধারে বরফ আর বরফ। তিনটে পুরুষের মিলিত শক্তির হাত তাকে ঠিক টেনে নিয়ে আসবে। দখল চাই, ক্ষমতা চাই। পৃথিবীর যেখানেই যা কিছু নরম তাই দখল করার জন্যে হাত বিস্তৃত হচ্ছে। আর আশ্চর্য, শরীরের চামড়ার রঙ ভিন্ন হলেও ওদের তিনটে হাতের রঙ এক, কুচকুচে কালো।

অ্যান ফিরলো। তারপর ধীরে ধীরে দরজার পাল্লা খুললো। এক ঝলকা হিম বাতাস তার শরীর ভিজিয়ে দিল যেন। কিন্তু চোখের সামনে গভীর অন্ধকারের বদলে নরম আলোয় মাখামাখি হয়ে গেছে পৃথিবীটা। অ্যান বুক ভরে নিঃশ্বাস নিতে গিয়ে চমকে উঠলো। ওটা কি? বেথেলহেমের সেই তারা? যা জ্ঞানীদের পথ চিনিয়ে নিয়ে গিয়েছিল একটা আস্তাবলে? কিন্তু এ তো তারার চেয়ে বড়। লাল বল, গড়িয়ে গড়িয়ে যাচ্ছে আকাশের গায়ে। তারপরে দূরের এক পাহাড়ের চুড়োয় বলটা স্থির হলো। পরমুহূর্তেই এক আশ্চর্য রক্তরঙা চেহারা নিয়ে নিল সারা আকাশ। এপাশে তখন মাথা তুলেছে সোনার তাল। ওপাশের সেই লাল বল ক্রমশ লক্ষ মণিমুক্তাখচিত মুকুট হয়ে গেল আচমকা। ওটা কি কাঞ্চনজঙ্ঘা? অ্যান পাগলের মতো চিৎকার করে উঠলো।

তিনটে হাত তখন কাগজের গোল্লাগুলো মুঠোয় ধরেছে। চিৎকারটা শুনতেই তারা কেঁপে উঠলো। এটা যেন ঠিক কোনো মানুষের গলা থেকে স্বাভাবিকভাবে আসে নি। অবাক হয়ে কার্পেটের ওপর বসা তিনজন মুখ তুলতেই দেখলো দরজা জুড়ে অ্যানের শরীর। সেই শরীর সমস্ত পৃথিবী থেকে তাদের আড়াল করে রেখেছে। সেই শরীরের পাশ দিয়ে নরম সোনার আলো ঝিকমিকিয়ে এই ঘরে ঢোকার চেষ্টা করছে। দু'হাত মাথার ওপরে ছড়িয়ে অ্যান প্রবল আনন্দে আবার চিৎকার করে উঠলো। এই চিৎকারে কোনো ভয় নেই, কোনো জাগতিক দুঃখ নেই, ঘৃণা নেই। পরম সুখে আপ্লুত না হলে মানুষের শরীরে এই শব্দ জন্ম নেয় না।

অ্যান কি দেখছে তা ওরা জানলো না। কিন্তু এদের মুঠো শিথিল হওয়ায় কাগজের গোল্লাগুলো পড়ে গেল। ওদের চোখের সামনে অ্যানের শরীর এখন সিলুয়েটের চেয়েও ঝাপসা। নবীন সূর্যরশ্মি ওদের যেন অন্ধ করে দিচ্ছিল। শুধু ওরা শুনলো অ্যান মন্ত্রোচ্চারণের মতো বলছে, 'ও, ভগবান, আমার ভগবান।'